PRABANDHA SAMGRAHA

By Balendranath Tagore

প্রথম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৬৬

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

শাখা : ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রক : সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস। ৩০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

২'২

সূচীপত্র

ভূমিকা

॥ ১ ॥

জীবনকথা

[বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ও বাংলা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ৬ই নভেম্বর (২১ কার্তিক, ১২৭৭) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র। বলেন্দ্রনাথ প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। পরে হেয়ার স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৮৬)। ছাব্বিশ বছর বয়সে, ৪ ফেব্রুআরি ১৮৯৬ (২২ মাঘ, ১৩০২) ডাক্তার ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সাহানা দেবীর সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ বিবাহোপলক্ষে 'নদী' কবিতাটি উৎসর্গ করেন।

স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথের জীবনে সাহিত্য-সাধনা ছাড়া দুটি বৃহত্তর কর্মসাধনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। অর্থকরী বিদ্যার দিকে তিনি খুব অল্প বয়সেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় তিনি স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: "বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্বেই তাঁহার এই অর্থকরী বিদ্যার দিকে মনের টান গিয়াছিল। স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে তিনি প্রথমে হস্তক্ষেপ করেন। এই বাণিজ্যে বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়ে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও পরে যোগদান করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল পরামর্শদাতা ছিলেন, আমরা দেখিতাম যাহা কিছু করিতেন তাহা বলেন্দ্রনাথই। যাহা হউক বলেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রথম স্বদেশী ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত হয় বলা যায়। এই সকল বাণিজ্যোপলক্ষে অধিক কায়িক পরিশ্রমই বোধ হয় তাঁহার শারীরিক বলক্ষয় করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহার মনোবলের বড় একটা হ্রাস হয় নাই।"[১] সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ কুষ্টিয়াতে ব্যবসায়ের জন্য একটি কুঠি (ফার্ম) খোলেন। অর্থ ও উৎসাহ দিয়ে রবীন্দ্রনাথও এই ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।[২]

১। বলেন্দ্র জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গ্রন্থাবলী, পৃ ৬।

২। রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খণ্ড), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ৩৮৭।

পঞ্জাবের আর্যসমাজ ও কলকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের মিলনে বলেন্দ্রনাথ সচেষ্ট ছিলেন। এই দুই সমাজের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের সম্ভাবনা কোথায় এই বিষয় নিয়ে তিনি আর্যসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা আর্যসমাজীদের কাছেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আর্যসমাজের সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হন। ১৩০৫ সালের ভাদ্র মাসে রাঁচি আর্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি নিমন্ত্রিত হন। মুরাদাবাদ, বেরিলি থেকেও তিনি নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু অনিবার্যকারণে তিনি যোগ দিতে পারেন নি। তবে আর্যসমাজের একবিংশ বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে লাহোরে গিয়েছিলেন। লাহোরের আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাগুলিতে তাঁর কার্যাবলী প্রশংসিত হয়েছিল। লাহোর থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি দ্বিতীয়বার পঞ্জাব যাত্রা করেন (মাঘ ১৩০৫)। পথশ্রমে ও অনিয়মে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকার পর ১৩০৬ সালের ৩রা ভাদ্র (২০ অগস্ট, ১৮৯৯) তাঁর মৃত্যু হয়। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পঞ্জাবের 'আর্য পত্রিকা'য় যে শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়, তা থেকে বলেন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় :

The melancholy news comes as a sudden and unexpected surprise upon the Punjab people···Babu Balendra Nath paid two visits to this province. The last time he visited Lahore was in March, 1899···His labours in connection with bringing about a happy alliance between the Adi Brahmo Samaj and Arya Samaj will long be remembered with gratitude by those interested in this work. He had his own seheme of work and the last time we spoke to him on his noble mission he told us that he did not believe in fuss but would silently give effect to his scheme which he did not want to put into print or communicate to anybody. Alas, the scheme will now remain unrealized.[৩]

এই দুটি বৃহত্তর কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের শিল্পজীবনের কিছু সম্পর্ক আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে তিনি হাত দিয়েছিলেন। ব্যবসায়ী বুদ্ধির চেয়ে তাঁর কাছে আদর্শবাদই বড়ো ছিল। তাই তাঁর বাণিজ্য-তরণী নিমজ্জিত হতে বেশি

দেরি হয় নি।[৪] ব্যবসায়ের মূলে জাতীয় শিল্প ও স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও প্রচারের মহৎ আদর্শ ছিল। বলেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যানুভূতির সঙ্গে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের গভীর সংযোগ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমিকতার পিছনে এক প্রবল উন্মাদনা ছিল। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সেই তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জীবনের সেই কর্মচঞ্চল প্রহরে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ও গৃহজীবনের দিকে তাঁরা তেমনভাবে চেয়ে দেখার অবকাশ পান নি। বাঙালীর অন্তঃপুরে, সামাজিক জীবনে, দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে, পোশাক-পরিচ্ছদে বলেন্দ্রনাথ এক নূতন মহিমা আবিষ্কার করেছিলেন। স্বদেশী জিনিস সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধে তিনি তাঁর অভিমতকে সুস্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় বলেছেন :

"নিজের দেশের সহিত সুপরিচিত হওয়া সম্বন্ধে আমাদের বাস্তবিকই কেমন একটু ঔদাসীন্য ছিল। স্বদেশ সম্বন্ধে যে পরিশ্রম করিয়া জানিবার কিছু থাকিতে পারে, এ কথাটা অনেক সময় সহজে মনে আসে না। বিলাতীর পরিবর্তে যথাসম্ভব দেশী জিনিস ব্যবহার সংকল্প সুসিদ্ধ করিতে কত অজ্ঞাত অশ্রুতপূর্ব প্রান্ত হইতে বিবিধ দ্রব্যজাত সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়, সুতরাং দেশের শিল্পজাতের কল্যাণ সাধন চেষ্টায় তাহার যথার্থ অবস্থার সহিতও পরিচয় স্বতই সংঘটিত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ ক্রমে আমাদের মনে তাহার ধনধান্যে, কৃষিশিল্পবাণিজ্যে, তাহার বক্ষতল-বিহিত গুপ্ত যক্ষভাণ্ডারে ও বিধিদত্ত সহজ শোভাসম্পদে স্ফুটতর হইয়া উঠে। এবং এই অতুল সম্পদের দারুণ দুর্দশা বিস্মৃত হইয়া কুক্কুরের মত পরপদলাঞ্ছিত হীন বিলাসে জীবন যাপন করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়।"[৫]

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উপনয়নের স্মৃতি সম্পর্কে লিখেছেন : "১৮৯৭ অব্দের কাছাকাছি একটা সময়ে বলুদাদা (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নিখিল ভারত ধর্মসম্প্রদায় গঠন করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগেন। বাংলাদেশের আদি, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, পঞ্জাবের আর্যসমাজ ও বোম্বাই-এর প্রার্থনা সমাজ—এই তিন সমাজের সমন্বয় করে একটি Theistic Society গঠন করা—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ইতিপূর্বে তিনি পঞ্জাব বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে বিভিন্ন সমাজের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহযোগিতার সম্ভাবনা কতখানি আলাপ করে বাড়ি ফিরেছেন।"[৬] 'নিখিল ভারত

ধর্মসম্প্রদায়' গঠন উপলক্ষে বলেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই সমন্বয় সাধনা ও মিলনস্পৃহার মধ্যে তাঁর মানসিক ঔদার্য প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি লাভবান হয়েছে বাংলাসাহিত্য। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ তাঁর এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। [বিরুচি বলেন্দ্রনাথ ভারত-বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সেখানকার ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের যে চিত্ররূপময় বর্ণনা দিয়েছেন, তার সাহিত্যিক মূল্য সর্বজনস্বীকৃত।]

বলেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ ক'বছর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নানাভাবে রবীন্দ্র-নাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য তিনি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উড়িষ্যা-ভ্রমণ বলেন্দ্র-জীবনের এক বিশিষ্ট অধ্যায়। জমিদারী তদারক করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে উড়িষ্যা যাত্রা করেন (ফেব্রুআরি ১৮৯৩)। নৌকো করে তাঁরা কটক পৌছান। কটক থেকে পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে তাঁরা ভ্রমণ করেছিলেন। কবি নিজেই লিখেছেন: "যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারি সুখী হতুম।"[৭] বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে উড়িষ্যা-ভ্রমণের প্রভাব অসামান্য। 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র', 'খণ্ডগিরি', 'কণারক', 'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত প্রবন্ধ এই উপলক্ষে রচিত হয়েছে।

(নিতান্ত অল্প বয়সেই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার উন্মেষ হয়।) বলেন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহবাণী সমন্বিত হয়েই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনাকে ত্বরান্বিত ও পূর্ণতর করে তুলেছিল। 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তার সর্বকনিষ্ঠ লেখক বলেন্দ্রনাথ।[৮] ঋতেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "[সংস্কৃত কলেজের] ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিয়া সংস্কৃত কাব্যরসের আস্বাদ অল্প অল্প লাভ করিলাম। সে সময়ে তাঁহার (বলেন্দ্রনাথের) বয়ঃক্রম নবম বর্ষ মাত্র। সেই সময়ে আমাদের সাহিত্যরচনার প্রবৃত্তি উষাকিরণের রক্তিম আভার ন্যায় প্রথম দেখা দিল। আমরা কোন একটা বিষয় লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিতাম। একই বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ লিখিতেন গদ্যে আমি লিখিতাম পদ্যে।"[৯]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় প্রথম তাঁর লেখা ছাপার অক্ষরে

প্রকাশিত হয়। 'বালক' পত্রিকায় তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত গল্পরচনা "একরাত্রি" (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)। উক্ত পত্রিকাতেই তাঁর সর্বপ্রথম কবিতাও প্রকাশিত হয় (ফাল্গুন ১২৯৩)। ঐ বছরেই শেষবারের মতো স্বতন্ত্রভাবে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাস থেকেই 'ভারতী'-র সঙ্গে 'বালক' পত্রিকা মিশে গেল। নূতন পত্রিকার নাম হলো 'ভারতী ও বালক'। এই নূতন পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই (বৈশাখ ১২৯২) বলেন্দ্রনাথের একটি গল্পরচনা প্রকাশিত হয় (মিলন)।

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নূতন পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকেও আকর্ষণ করেছিল। বলেন্দ্রনাথও 'সাধনা' পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। 'সাধনা' পত্রিকার যুগকে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়। এই পর্বের প্রবন্ধগুলির মধ্যে অধিকতর পরিণতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন এবং চৈত্রসংখ্যা প্রকাশ করার পর তিনি এই ভার ছেড়ে দেন। বলেন্দ্রনাথের শেষদিকের সমস্ত রচনাই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলেন্দ্রনাথের রচনাবলীর ক্রমপর্যায় থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমত, 'বালক', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা' ও 'ভারতী'—যে পত্রিকাগুলি ঠাকুর-পরিবারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রকাশিত হতো, তাদের বাইরে তিনি লেখেন নি। তাঁর রচনার আধার এই পত্রিকাগুলি। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কবি উক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে যখন যেদিকে ঝুঁকে পড়েছেন, বলেন্দ্রনাথও সেই পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। সে যুগে এত নিবিড়-ভাবে আর কোনো সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি।

॥ ২ ॥

মনোজীবনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

গল্পশিল্পী হিসাবেই বলেন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয়। কিন্তু তাঁর মানসলোকের অখণ্ড পরিচয় লাভ করতে হলে কবিতাগুলিকেও বাদ দেওয়া যায় না। বলেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়: 'মাধবিকা' (১৮৯৬) ও 'শ্রাবণী' (১৮৯৭)। কাব্যগ্রন্থদুখানি ছাড়া তিনি মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন (পনেরটির বেশি হবে না)। নামকরণের মধ্যে যথাক্রমে বসন্ত ও বর্ষার ইঙ্গিত

থাকলেও কাব্যদুটির মূল সুরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যৌবনস্বপ্ন ও মুগ্ধ মনের সৌন্দর্যতৃষ্ণাই কাব্যযুগলের সাধারণ ধর্ম।

বলেন্দ্রনাথের কাব্যযুগলের মূল আশ্রয় নারীসৌন্দর্য। এখানে প্রকৃতি গৌণ হলেও কখনো ঐ নারীর লীলাপীঠিকারূপে বিচিত্রময়ী, কখনো বা নারীরূপিণী প্রেয়সীসত্তা। কবির সৌন্দর্যচেতনা ও প্রেমানুভূতি হৃদয়াবেগের উত্তপ্ত স্পর্শে, বর্ণের নিগূঢ় সুষমায় ও 'দিব্যকল্পনা'র ইন্দ্রজালে লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। শব্দচয়ন, গাঢ়বদ্ধ বাগ্‌বৈভব, অলঙ্করণের সূক্ষ্মতা বলেন্দ্রনাথের পরিণত শিল্পদৃষ্টির পরিচায়ক। সনেট অথবা সনেটকল্প কবিতা রচনাতেই তাঁর প্রবণতা লক্ষণীয়। 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) থেকে 'চিত্রা' (১৮৯৬) পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের অধ্যায়টি বলেন্দ্রনাথের কবিজীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রোমান্টিক কল্পস্বপ্নের সমুচ্চ ভাবভূমি রবীন্দ্রকাব্যের এই পর্বকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। বলেন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্য অনুপস্থিত। একটি ভাবকেই তিনি বিচিত্র ভঙ্গিতে আরতি করেছেন। কবির বাসনালক্ষ্মী ইন্দ্রধনুর রশ্মিচ্ছটায় মেঘলোকে চিত্রিত, শরৎ কৌমুদীর মতো শুভ্র, স্বচ্ছ ও স্বপ্রকাশ :

পরশ লাগিয়া
উঠিবে আমারো চিত্ত আকুল হইয়া
নবরাগে, ইন্দ্রধনুসম দিশি দিশি
বিচ্ছুরিব বিশ্বজাল মম অহর্নিশি
দিবালোকে চন্দ্রিকায় বর্ণে নব নব
মৌন সুখভরে ; স্নিগ্ধ শুভ্র কান্তি তব
স্বচ্ছ অম্বরের তলে উঠিবে ফুটিয়া
শরৎ কৌমুদী সম অম্বর টুটিয়া
চারু রশ্মিজালে।[১০]

তবু বলেন্দ্রনাথের কবিতায় অপরিণতির চিহ্ন বিদ্যমান। নীহারিকার অস্পষ্ট জগৎ তখনো সম্পূর্ণভাবে রূপ পরিগ্রহ করে নি। কিন্তু তাঁর গদ্য সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না। প্রিয়নাথ সেন যথার্থই বলেছেন : "গদ্যে ও পদ্যে উভয়েই তাঁহার নিজত্ব ছিল—এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে তিনি যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন পদ্যে আজও তাহা পারেন নাই। আমার বক্তব্য এই যে গদ্যের সকল পর্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যের এমন কোন

রহস্য বা ভঙ্গী নাই যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার পদ্য সম্বন্ধে আমরা ঠিক এ কথা বলিতে পারি না।"[১১] কিন্তু রচনা-পরিণতির দিক থেকে মন্তব্যটি যথার্থ হলেও, স্বরূপধর্মের দিক থেকে বলেন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্যের মধ্যে একটি নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক আছে। চিত্রধর্মিতা, রূপ-রসিকতা, প্রসাধননৈপুণ্য ও গাঢ়বদ্ধ পদবিন্যাস বলেন্দ্রনাথের গদ্য ও কবিতার সাধারণ ধর্ম। বলেন্দ্রনাথের গদ্য তথ্যের তল্পীবাহী মর্ত্যচারী নয়, দূরবিস্তৃত কল্পলোকে তার মুক্তপক্ষ স্বচ্ছন্দ-বিহার। ব্যক্তি-হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শে তাঁর গদ্যরচনাগুলি অনেক ক্ষেত্রে কাব্যের প্রতিস্পর্ধী।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার প্রধান আদর্শ ছিল রবীন্দ্রনাথের গদ্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গদ্য বলতে বাংলাসাহিত্যের একটি প্রধান অংশকেই বোঝায়। কিন্তু রবীন্দ্রগদ্যের একটি বিশেষ পর্বের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার নিকট সম্পর্ক নির্ণয় করা মোটেই দুরূহ নয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের কোনো কোনো রচনার বক্তব্য ও বাচনভঙ্গিকে যেন বলেন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যরচনার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘবিতানিত অলঙ্কারসমৃদ্ধ তৎসমশব্দমন্থর গদ্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গদ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলেন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনাই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জাতীয়, রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছেন 'বাজেকথা'। এই জাতীয় রচনাকে কবি নিজে এক বিশেষ সাহিত্যিক কৌলীন্য দিয়ে বলেছিলেন: "…ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনারস সম্ভোগে।"[১২] সামান্য বিষয় অবলম্বন করে বলেন্দ্রনাথ কত সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসাবে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যের আস্বাদন লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ফলে তাঁর এই আস্বাদন অধিকতর পরিমার্জিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় তিনি সূক্ষ্ম রসবোধ ও বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা তিনি প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বন করে নূতন সৃষ্টি করেছেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথই তাঁর পথপ্রদর্শক। প্রাচীন ভারতের দিব্যমনীষা এই তরুণ শিল্পীর সৌন্দর্যচেতনাকে তীক্ষ্ণতর করেছিল। সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের মধ্যে তাঁর সৌন্দর্যভোগস্পৃহাই চরিতার্থ হয়েছিল। সৌন্দর্যপিপাসা

ও মানসিক আভিজাত্য যেমন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে তাঁর মনে বিশেষভাবে সংক্রামিত হয়েছিল, তেমনি পুরাতন দিনের কবিভাষাকেই তিনি গদ্যরীতির একটি প্রধান উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির উপর তাই সংস্কৃতসাহিত্যের বর্ণময় ভাষা, পদবিন্যাস ও শব্দসম্পদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

বলেন্দ্রনাথের রচনাবলীর শ্রেণীগতবৈচিত্র্য কম নয়। কিন্তু এই বিচিত্র শ্রেণীর রচনা একটি মূলভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মূলভাবটিকে তাঁর সাহিত্যজীবনের মূল সুর বললেও অত্যুক্তি হয় না। সৌন্দর্যপিপাসাই তাঁর কবিজীবনের মূল সুর। শিল্প সাহিত্য সমালোচনায়, ঐতিহাসিক চিত্র রচনায়, সামাজিক প্রবন্ধে, এমন কি দৈনন্দিন জীবনচর্যার মধ্যেও তিনি সৌন্দর্যের মোহমন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন: "সৌন্দর্য আবিষ্কারই তাঁহার প্রধান কার্য ছিল। যে সৌন্দর্য অন্যের চোখে প্রকাশ পাইত না, তিনি তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিতেন।"[১৩]

বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন সম্পর্কে আর একজন সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "তাঁহার কবিমন অখণ্ডকে খণ্ডিত করিতে, সৌন্দর্য নিঙড়াইয়া তত্ত্ব বাহির করিতে অত্যন্ত পীড়া বোধ করে। সৌন্দর্য জগৎ ব্যাপারের পরিণাম ও পরা নিয়ম, ইহাই যেন তাঁহার ধারণা। সৌন্দর্যে বিশ্বরূপ দর্শনই মানবজীবনের মহৎ কর্তব্য, ইহাই যেন তিনি বলিতে চাহেন। সৌন্দর্যদর্শনের ও সৌন্দর্যভোগের এমন কীট্সীয় দৃষ্টি ও মন লইয়া আর কোনো বাঙালি লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই।"[১৪] বলেন্দ্রনাথ যেন কীট্সের মতোই বলতে পারতেন—"I have loved the principle of beauty in all things." সৌন্দর্যসম্ভোগের অখণ্ড দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয়সচেতন রূপপিপাসা বলেন্দ্রমানসের প্রধান উপকরণ। কিন্তু তাঁর এই বিশিষ্ট প্রবণতার মধ্যে প্রগল্‌ভতা বা অসংযম ছিল না। বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যস্পৃহা সুস্থ, সুভদ্র ও সংযত।—অনেকখানি আধ্যাত্মিক জাতীয়। অথচ তিনি সচেতনভাবে কোনো নীতি প্রচার করেন নি। বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যলক্ষ্মী তাই তাঁর ভাবস্থির অচঞ্চল হৃদয়পদ্মাসনে এক অদ্ভুত ভারসাম্যে অধিষ্ঠিতা।

বিশ্বপ্রকৃতি, ললিতকলা বা অতীত ইতিহাসের মধ্যেই বলেন্দ্রনাথ তাঁর সুন্দরকে অনুসন্ধান করেন নি, আমাদের অতিসাধারণ লৌকিক জীবনের মধ্যেও তিনি সৌন্দর্য-

লক্ষ্মীর চরণধ্বনি শুনতে চেয়েছিলেন। তিনি যে রূপলোকের অধিবাসী ছিলেন, সেখানে আমাদের সমাজ-জীবন ও গৃহকোণ পর্যন্তও স্নিগ্ধোজ্জ্বল সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। আড়ম্বরবাহুল্য না থাকলেও আমাদের সমাজ-সংসারের রমণীয়তা বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিদৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করেছে—দারিদ্র্যও কল্যাণে সৌন্দর্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন; "ক্ষীণ প্রদীপশিখাটুকুর বিকম্পনে আমরা যে মাতৃদৃষ্টির স্নেহালোক, তরুণী বধূর করুণ মুখের পৌর্ণমাসী সুধা, স্নেহ-প্রীতি-ভক্তির সহস্রধার-নিস্যন্দিত মৃদুরশ্মি বিকিরণ অনুভব করি, সেটুকু ত বাহিরের এডিসন দিতে পারে না।—এবং এই বধূ ও মাতৃরূপিণী গৃহিণীর চারু চরণচ্ছটাতেই আমাদের গৃহ উজ্জ্বল। এমন কি, সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দরিদ্রের সামান্য ঘটি বাটি পিলসুজ কাজললতা সিন্দুরের কৌটাটি পর্যন্ত একটি নূতন শ্রী ধারণ করে, এবং আমাদের মর্মস্থল অবধি তাহার প্রভা আসিয়া পড়ে।"[১৫]

বলেন্দ্রনাথের স্বল্পপ্রসারিত সাহিত্যিক জীবন পর্যালোচনা করলেই তাঁর মনের বিস্ময়কর দ্রুত পরিণতি চোখে পড়ে। মনে হয় একই সঙ্গে যেন তিনি অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করে চলেছেন। ফলে অপরের পক্ষে যা দীর্ঘসময় সাপেক্ষ ছিল, তা তিনি অবলীলাক্রমে স্বল্প সময়ে অতিক্রম করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন, "বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিনি প্রৌঢ়ের অন্তর্দৃষ্টি-ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন।" কোন্ শক্তির বলে তিনি নিতান্ত তরুণ বয়সেই প্রৌঢ়ের পরিণতি লাভ করেছিলেন? প্রতিভাবানের গভীরাশ্রয়ী চিত্তধর্ম ও অনলস অনুশীলন নিঃসন্দেহে তাঁর সাহিত্যজীবনের বিকাশকে এমন ত্বরান্বিত করেছিল।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মোটামুটি তিনটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। (ক) 'বালক' ও 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার প্রথম দিকের রচনা, (খ) 'ভারতী ও বালক'-এর শেষ দিকের ও 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী, (গ) রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' (১৩০৫) পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী ও 'প্রদীপ' পত্রিকার জন্য রচিত অর্ধসমাপ্ত তিনটি প্রবন্ধ। প্রথমপর্বের রচনাগুলি বর্ণনামূলক। পল্লীপ্রকৃতির বিস্তৃত ও নিখুঁত বর্ণনা ছাড়া রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই। 'একরাত্রি' (বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২), 'চন্দ্রপুরের হাট' (বালক, শ্রাবণ ১২৯২), 'বনপ্রান্ত' (বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২), 'পুলের ধারে' (বালক, ফাল্গুন ১২৯২) প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনাগুলি বর্ণনামূলক। কোথাও গ্রামপ্রান্তের সুপ্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে

ভূমিকা

নিরুদ্বিগ্ন গ্রাম্য জীবন যাত্রার নিখুঁত ছবি, কোথায়ও চন্দ্রপুরের হাটের বিচিত্র বর্ণনা, কোথাও বনপ্রান্তে গরুর গাড়ির যাত্রীদের ক্ষণিক বিশ্রামালস্যের রেখাচিত্র, কোথাও বা পুলের ধারে নানাশ্রেণীর মানুষের কৌতুককর পরিচয়—পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীর জীবনযাত্রা বলেন্দ্রনাথের বাল্যরচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু তাঁর এই বাল্যকালের রচনাগুলিকে অবিমিশ্র বর্ণনা বললেও ভুল হবে। রচনাগুলিতে কাহিনী রচনার অস্পষ্ট প্রয়াস আছে। হয়তো জীবনসম্পর্কিত যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাব কিম্বা উপন্যাস রচনায় যে পরিমাণ স্থৈর্যের প্রয়োজন, তরুণ লেখকের পক্ষে তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নি।

রচনাগুলির গল্পরস অস্বীকার করা যায় না। 'একরাত্রি' রচনাটির মধ্যে যে পথিক জ্যোৎস্নারাত্রিতে মুড়ি খেতে খেতে পথ চলতে লাগলো, তার কি হলো জানার জন্য কৌতূহল থাকে। 'চন্দ্রপুরের হাট' রচনাটির মধ্যেও বেশ একটু গল্পরস জমে উঠেছিল, কিন্তু গৃহস্বামীর কুটীরদ্বারে করাঘাতের শব্দেই তা দূরে মিলিয়ে গেল। রচনাগুলিকে উপন্যাসের এক একটি অসমাপ্ত অধ্যায় বলে মনে হয়। বর্ণনার ঢঙ্টি বঙ্কিমপর্বের কথাসাহিত্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনায় কি কাহিনী রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না? আসল কথা বাল্যকালের এই অপরিণত রচনাগুলির মধ্যে কোনো বক্তব্য নেই—কোনো রকমে নিজেকে প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য ছিল না। তাই বক্তব্যের অভাবে খানিকটা গল্পাংশ জুড়ে দিতে হয়েছে অথবা বর্ণনাকেই গল্পের ছলে বলতে হয়েছে। তা ছাড়া আর একটি গৌণ কারণও থাকা সম্ভব। হয়তো বলেন্দ্রনাথ তখনো স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করতে পারেন নি।

'ভারতী ও বালক' পত্রিকার প্রথম দিকের রচনায় কাহিনী-কল্প অংশ নেই বললেই হয়। এখানকার বর্ণনাগুলিও নিছক বর্ণনা মাত্র নয়, ব্যক্তিহৃদয়ের বিচিত্র রসে তারা সঞ্জীবিত। 'মিলন' (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৩), 'সন্ধ্যা' (ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৩), 'ঊষা ও সন্ধ্যা' (ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৩) প্রভৃতি রচনাগুলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জাতীয়। এই রচনাগুলিতে কিছু কিছু ভাবগভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করে তাঁর মন বিচিত্র চিন্তাজাল রচনা করতে পারে। সামান্য প্রসঙ্গ তাঁর সমৃদ্ধ মনের স্পর্শে অসামান্য হয়ে ওঠে।

'ভারতী ও বালক' পত্রিকার শেষ দিকের রচনায় (১২৯৫—১২৯৮) বলেন্দ্রনাথের মন অনেকখানি পরিণত হয়েছে। শুধু হৃদয়ানুভূতিকেই তিনি প্রকাশ করেন না, এখানে তিনি সাহিত্যব্যাখ্যাতা ও সাহিত্যবিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী', 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর', 'ভারতচন্দ্র রায়' প্রভৃতি রচনায় তাঁর রসবোধ ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার শেষ দিকের কয়েকটি বছরকে বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার শ্রেষ্ঠ যুগ বলা যায়। তুচ্ছ এক একটি বিষয় ঘিরে আত্মগত ভাবনার অর্থগূঢ় ব্যঞ্জনা ও কল্পনার চকিত দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

'সাধনা' পর্বকে (অগ্রহায়ণ ১২৯৮ - জ্যৈষ্ঠ ১৩০২) বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার ঐশ্বর্যযুগ বলা যায়। শিল্প-সাহিত্য সমালোচনায় তিনি এই পর্বে পরিণত প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃতসাহিত্য সমালোচনাগুলির অধিকাংশই এই পর্বে রচিত হয়। শিল্পতীর্থ উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ও শিল্পজীবনের মর্মবাণী তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও শিল্পসমালোচনাকে কেন্দ্র করে বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যরসিকতা একটি ধ্রুপদী মহিমা লাভ করেছে। চিত্রসমৃদ্ধ অলঙ্কৃত গদ্যরীতি এখানে সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলেন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্যমন্ত্রটি পেয়েছিলেন, তাকে রূপবান করে তোলার উপযুক্ত ভাষা ও প্রকাশরীতি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।

জীবনের শেষ দু'বছরে তাঁর মানস-উন্মোচনের আর একটি সূত্রপাত ঘটেছিল। কিন্তু সেই অধ্যায়টির প্রারম্ভেই তাঁর মৃত্যু হয়। আয়ুষ্কালের স্বল্পতা সাহিত্যিক অকাল মৃত্যুর মাপকাঠি নয়। ছত্রিশ ও ত্রিশ বছর বয়সে যথাক্রমে বায়রন ও শেলীর মৃত্যু হয়। সাধারণ বিচারে দুটি প্রতিভাদীপ্ত জীবনের অকাল পরিসমাপ্তি আমাদের ব্যথিত করে। কিন্তু বায়রন তাঁর কবিজীবনের সিদ্ধিতে পৌঁছেছিলেন, শেলীর কবিমানসও আয়ুষ্কালের মধ্যেই তার চূড়ান্ত শীর্ষ স্পর্শ করেছিল। কিন্তু কীট্‌স সম্পর্কে ঠিক একথা বলা যায় না। মৃত্যুকালেও তার প্রতিভা বিকাশোন্মুখ—সেখানে সদ্যবিকশিত যে সোনার পাপড়িগুলির আভাস দেখা গিয়েছিল, তা অকালেই ঝরে পড়ল। বলেন্দ্রনাথের শেষ দিকের রচনাগুলিতেও নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল।

বলেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যেই তাঁর প্রতিভাবিকাশের নূতন সঙ্কেত আছে। 'প্রাচ্য প্রসাধন কলা', 'নিমন্ত্রণ সভা', 'শুভ উৎসব', 'শিবসুন্দর' প্রভৃতি প্রবন্ধে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের একটি নম্র-সুন্দর মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। সৌন্দর্যের কল্যাণ-পরিণাম এক মহত্তর আদর্শের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রথম কোনো কোনো রচনায় নন্দনতত্ত্ব-সর্বস্বতা ও কলাকৈবল্যবাদের লক্ষণ ছিল। কিন্তু জীবন-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য-সর্বস্বতাকেও বোধ হয় তাঁর অপূর্ণ মনে হয়েছিল—তাই সৌন্দর্যের সঙ্গে শুভবোধ ও কল্যাণের

দাহহীন প্রশান্তিকে তিনি অনুভব করেছেন। 'শিবসুন্দর' প্রবন্ধের গোড়াতেই তিনি তাঁর সৌন্দর্যানুভূতির স্বরূপধর্মের কথা জানিয়েছেন: "আমাদের মনে সৌন্দর্যের সহিত সর্বত্রই একটি বিশেষ শুভ ভাব বিজড়িত। সুন্দরীর রূপবর্ণনায় এই জন্য আমরা কথায় কথায় লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার উপমা দিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহার কল্যাণী মূর্তিখানিই আমাদের অন্তরে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রূপের দাহিকাশক্তি নিতান্ত প্রবল না হয়।"

সৌন্দর্যদর্শনের এই বিশিষ্ট পর্যায় কালিদাস-অনুশীলনের অনিবার্য ফলশ্রুতি। অবশ্য সৌন্দর্যের এই 'আধ্যাত্মিক আভিজাত্য' রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলও বটে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য, শ্রী হ্রী এবং কল্যাণে উদ্ভাসমান, তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একাগ্র এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব। সেই সৌন্দর্যে নরনারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয়বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গলমহাসমুদ্রের মধ্যে পরমস্তব্ধতা লাভ করিয়াছে—এইজন্য তাহা বন্ধনবিহীন দুর্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান্ ও বিস্ময়কর।"[১৬] রবীন্দ্র-সাহিত্য কল্যাণাশ্রয়ী—সৌন্দর্যদর্শন তার বিপুলায়তন সাহিত্যের মধ্যে নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে সেই গভীরতা ও বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে ভারতীয় সৌন্দর্যদর্শনের জ্যোতির্ময় তীর্থলোকের সন্ধান দিয়েছিল। সৌন্দর্যে যার আরম্ভ শিবত্বে তার পরিণাম। অবশ্য বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য করলে তাঁর দৃষ্টিকে আকস্মিক বলে মনে হয় না। তাঁর সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই এক জাতীয় আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি ছিল। এক প্রীতিমুগ্ধ প্রসন্ন মনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি যেমন সুন্দরের অখণ্ড মূর্তি উদ্ভাসিত করে তুলেছিল, তেমনি সেই আলোক সুন্দরের শিব-পরিণামমুখী জয়যাত্রাকে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু স্বল্পায়ু জীবন তাঁর সেই সৌন্দর্যসাধনাকে খণ্ডিত করেছে। এই কারণেই বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু দ্বিগুণ শোকাবহ। •

॥ ৩ ॥

সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে দ্বিবিধ প্রবণতা লক্ষণীয়। সৃষ্টিসুখের অভিনব উল্লাস যেমন তার ভাবজীবনকে সফল করে তুলেছিল, তেমনি পুরাতনের পুনর্বিচারও এই যুগেই শুরু হয়েছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের জন্মলগ্ন। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি প্রধান অংশই সংস্কৃত-সাহিত্য সমালোচনা। কারণ সেই যুগে আধুনিক বাংলা-সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, তার নিতান্তই শৈশবকাল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণাও ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্য পঠন-পাঠন ও অনুশীলন বর্তমান-কালের মতো এতো সঙ্কুচিত হয় নি। তাই স্বভাবতই সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যবান ক্লাসিকগুলির উপর সমালোচকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা-গুলির মধ্যে আর একটি প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। এই সময় পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটে। সংস্কৃত সাহিত্য বিচারেও মূলত পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছিল। পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতির অভিনব প্রয়োগের ফলে সংস্কৃত ক্লাসিকগুলির নূতন রসমূর্তি উদ্ভাসিত হলো।

বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার প্রধান অংশই কালিদাসের কাব্য-নাটকের সমালোচনা। 'মেঘদূত', 'দুষ্মন্ত', 'ঋতুসংহার', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা' প্রভৃতি প্রবন্ধে কালিদাসের সৃষ্টি ও তাঁর মানসবৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। 'মেঘদূত' প্রবন্ধের প্রথমেই বলেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে মেঘদূতের ঘটনাসূত্র বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়াংশে মেঘদূত কাব্যের সমালোচনা। তৃতীয়াংশে মেঘদূত থেকে কয়েকটি চিত্র নিয়ে এই কাব্যের সৌন্দর্য বিচার করা হয়েছে। এই কাব্যের শ্রেণী নির্ণয় করতে গিয়ে লেখক স্বল্পভাষণে এর অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন: "মেঘদূতে ঘটনার আর আবশ্যক নাই। কারণ, ইহা নাটক অথবা উপন্যাস নহে যে, বিরহ নিশ্বাসের মর্মস্পর্শিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অসংখ্য সখীর অশ্রুসিক্ত সান্ত্বনাবাক্যের সাহায্য লইতে হইবে। মেঘদূত গীতিকাব্য—কালিদাস ইহাতে বর্ষাকালে বিরহের প্রভাব দেখাইতেছেন। বাহ্য জগৎ অন্তরের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, ইহা দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য।" ঘটনাভারাক্রান্ত হলে গীতিকবিতার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপ অনেকখানি ব্যাহত হয়। ঘটনা বা তথ্যের পাষাণস্তূপ অতিক্রম করে গীতিকাব্যের নির্ঝর সহজলীলায় উৎসারিত হতে পারে না। মেঘদূত গীতিকাব্য—তাই ঘটনাবৃত্ত

সামান্যই। যক্ষের ব্যক্তিহৃদয়ের বেদনাই এখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বলেন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের একটি মৌলিক ধর্মকেই ইঙ্গিত করেছেন।

বলেন্দ্রনাথ যে শুধু মেঘদূতকে 'বিরহের শ্রেষ্ঠ কাব্য' বলেছেন, তাই নয়—'গুটিকয়েক শ্লোকে' ও সামান্য কয়েকটি গূঢ়ার্থবোধক শব্দে কালিদাস কত স্বল্পকথায় এই বিরহবেদনাকে প্রকাশ করেছেন, তা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। বিরহবিধুর যক্ষের ক্ষীণদেহ ও অন্তর্বেদনা—দুয়েরই বর্ণনায় কালিদাস যথাক্রমে 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠঃ' ও 'অন্তর্বাষ্পঃ' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য এই দুটি বলেন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি কালিদাসের যক্ষচরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। পথের বর্ণনায় বিরহী যক্ষের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ই আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি যথার্থই বলেছেন: "যক্ষকে বিলাসপ্রিয় দেখিতে যাঁহারা কাতর, তাঁহারা কালিদাসকে দোষ দিতে পারেন। কিন্তু বুঝা উচিত, কালিদাস আদর্শ মানুষ খাড়া করিবার চেষ্টা করেন নাই, যক্ষের প্রকৃত চিত্র আঁকিয়াছেন মাত্র। আরও মনে রাখিতে হইবে, মেঘদূত কালিদাসের সৃষ্টি বটে, কিন্তু যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে।"

সর্বশেষে বলেন্দ্রনাথ মেঘদূতের ছন্দোগাম্ভীর্য ও কথানির্বাচন শক্তির উল্লেখ করেছেন। উত্তর মেঘের অলকাপুরী ও যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনার চিত্রসৌন্দর্য সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। বলেন্দ্রনাথ মেঘদূত কাব্যের খুব বেশি বিশ্লেষণ না করে সাধারণভাবে রসাস্বাদন করেছেন। তাঁর 'মেঘদূত' আলোচনাটি নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত সম্পর্কিত কবিতা, প্রবন্ধ ও প্রৌঢ় মন্তব্যগুলির তুলনায় বলেন্দ্রনাথের আলোচনাটি কাঁচা হাতের লেখা বলে মনে হয়। প্রায় সমসাময়িককালে রচিত 'মেঘদূত' কবিতায় (১৮৯০) ও দু'বছর পরে লেখা 'মেঘদূত' প্রবন্ধে (১২৯৮) রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মেঘদূতের অপূর্ব কবিব্যাখ্যা দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যে যা বিরহবিলাস, রবীন্দ্রকাব্যে তা-ই সূচীতীক্ষ্ণ বিরহ-ব্যথায় রূপান্তরিত হয়েছে—কবি এই কাব্যের মধ্যে পেয়েছেন নিখিল মানবের চিরন্তন বিরহ।

'ঋতুসংহার'কে বলেন্দ্রনাথ কালিদাসের 'প্রথম রচনা' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কালিদাসের এই প্রথম রচনাটির মধ্যেও তিনি প্রতিভার পরিচয় পেয়েছেন: "রচনায় এখনও সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ হয় নাই, সবেমাত্র অল্পদিন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সকল সময়ে ছায়া আলোকের মৃদু স্পর্শে সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র ফুটাইতে পারেন না; কিন্তু কবির প্রতিভা আছে, সৌন্দর্য তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায় না, ছায়ালোক-সন্নিবেশে আভাসে সমস্ত ব্যক্ত না করিলেও যথাযথ সূক্ষ্ম বর্ণনায় সুনিপুণভাবে তিনি চিত্রটিকে খাড়া করিয়া তুলেন।" বলেন্দ্রনাথ ঋতুসংহারকে কালিদাসের অপরিণত

রচনা বললেও কাব্য হিসাবে এর সরসতাকে অস্বীকার করেন নি। এই কাব্যের বর্ণনাতিরেক সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "…ঋতুসংহারের মত বর্ণনাকাব্যে দুই ছত্র অধিক বর্ণনা অসঙ্গত বলা সাজে না। আর প্রথম রচনায় বর্ণনার দিকে লোকের একটু ঝোঁক থাকেও।"[১৭] মেঘদূতও আদিরসপ্রধান বর্ণনামূলক কাব্য—সেখানেও বিরহী হৃদয়ে বর্ষাপ্রকৃতির গভীর প্রভাব বর্ণিত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এই দুই কাব্যের পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন: "মেঘদূতে মানবহৃদয়েরই প্রাধান্য। কালিদাস বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া বর্ষার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। ঋতুসংহারে বাহ্যজগতেরই প্রাধান্য। বহিঃপ্রকৃতির অন্তরে বসিয়া কালিদাস মানবহৃদয় অনুভব করিয়াছেন। এই জন্য হৃদয়ও এখানে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। মেঘদূতে মৃদুস্পর্শে অনেকটা ভাব ফুটাইয়া তোলা হয়। বর্ণনা সেখানে বিরহের অধীন। গীতিকাব্যের সহিত বর্ণনাকাব্যের এই প্রভেদ।" এই নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণটি সমালোচকের মৌলিকচিন্তা ও সূক্ষ্মরসবোধের পরিচয় দেয়।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি শ্রীহর্ষের নাটকখানিকে মালবিকাগ্নিমিত্রের উপরে স্থান দিয়েছেন। অথচ ঐ প্রবন্ধেরই অন্যত্র তিনি বলেছেন: "রত্নাবলী ইহাপেক্ষা পাকা নাটককারের রচনা। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহাতে ইহার লেখককে রত্নাবলীর লেখক অপেক্ষা সুকবি বলিয়া মনে হয়—কেবল এখনও হাত পাকে নাই।" বলাবাহুল্য এই মন্তব্যকে তিনি যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর করে তুলতে পারেন নি। প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি নাটকখানির রচয়িতা-সমস্যার উপর কিছু আলোকপাত করেছেন।

১৭ এই প্রসঙ্গে কীথ সাহেবের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

"Thus it has been complained that the poem lacks Kalidasa's ethical quality, that it is too simple and uniform, too easy to understand. The obvious reply is that there is all the difference between the youth and maturity of a poet, that there is as much discrepancy between the youthful work of Virgil, Ovid, Tennyson or Goethe, and the poems of their manhood as between Kalidasa's primitive and the rest of his work…In point of fact the Ritusamhara is far from unworthy of Kalidasa, and, if the poem were denied him, his reputation would suffer real loss."

—A History of Sanskrit Literature, Keith, Pp. 82—83.

বলেন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' প্রসঙ্গে কোনো স্বতন্ত্র আলোচনা না করলেও তাঁর একাধিক প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় কবি-মনীষার এই শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। 'দুষ্মন্ত' প্রবন্ধে তিনি দুষ্মন্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে শকুন্তলা নাটক সম্পর্কেও কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। বলেন্দ্রনাথের মতে (ক) মহাভারত থেকে আখ্যায়িকা গৃহীত হলেও বৈচিত্র্যে কালিদাসের নাটক মূলকে অতিক্রম করেছে, (খ) শুধু নাট্যাংশেই নয়, কাব্যাংশেও শকুন্তলা অসাধারণ, (গ) দুষ্মন্ত চরিত্রে নায়কোচিত গুণের অভাব নেই, (ঘ) তবে "দুষ্মন্ত কিছু অধিকমাত্রায় রূপসীপ্রিয়", (ঙ) কিন্তু বলেন্দ্রনাথ তাঁকে অসংযত-চরিত্র বলেন নি—"দুষ্মন্তের সংযমের পরিচয় প্রথম—বিবাহের বাসনায়, দ্বিতীয়—শকুন্তলার জাতিবিচারে।" বলেন্দ্রনাথ দুষ্মন্ত চরিত্র বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন: "সংক্ষেপে বলিতে গেলে রূপসীপ্রিয়তাই দুষ্মন্তের চরিত্রের লক্ষণ। অন্যান্য অনেকগুণ ইহারই ফল মাত্র।" সমালোচক দুষ্মন্তের মধ্যে তিনটি সত্তা লক্ষ্য করেছেন—রাজা, প্রণয়ী ও পুরুষ। দুষমন্ত চরিত্রটির আলোচনা অধিকাংশস্থলেই বর্ণনামূলক। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ বা মননশীলতার দীপ্তি এখানে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা সমালোচনায়[১৮] যে অন্তর্মুখী ভাবদৃষ্টি ও অভিনব ব্যাখ্যা নবসৃষ্টির মহিমায় সমুজ্জ্বল, তার আভাসমাত্রও বলেন্দ্রনাথের রচনায় নেই। দুর্বাসার অভিশাপের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন মাত্র, কিন্তু দুষ্মন্ত চরিত্রের উপর তার গূঢ় প্রভাব বিশ্লেষণ করেন নি। রচনাটিতে দুষ্মন্তের চিত্র পাওয়া গেলেও চরিত্র পাওয়া যায় না।

বর্তমান সঙ্কলনটির কালিদাস সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা'। কালিদাসের প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের মতে কালিদাস চিত্ররচনায় নিপুণ। রঘুবংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কোনও মূল ঘটনা বা প্রধান চরিত্রের প্রভাব লক্ষিত হয় না—কেবলি ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত।" শুধু রঘুবংশ সম্পর্কেই নয়, মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা থেকেও অংশবিশেষ উদ্ধার করে সমালোচক তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বলেন্দ্রনাথ একটি যথাযোগ্য উদাহরণ সহযোগে বাল্মীকি ও কালিদাসের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। রঘুবংশে দশরথের মৃগয়া বর্ণনার সঙ্গে ও রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার কাছে বর্ণিত দশরথের মৃগয়াবৃত্তান্তের তুলনা করে বলেন্দ্রনাথ

১৮। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' ও 'শকুন্তলা' প্রবন্ধদ্বয় (প্রাচীন সাহিত্য) দ্রষ্টব্য।

বলেছেন ঃ "রামায়ণের এই মৃগয়াবর্ণনার পার্শ্বে কালিদাসের মৃগয়া সৌখীন বিলাস মাত্র। কালিদাস মৃগয়াবলম্বনে কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্র ফুটাইতে চাহেন বৈ ত নয়। রামায়ণের এই বর্ষাবর্ণনায় বাল্মীকি সেই অন্ধকার কালরাত্রির ভয়ঙ্করী ঘটনার পূর্বসূচনা করিয়াছেন। বাল্মীকির চিত্রে একটি গম্ভীর ভীষণতা ব্যক্ত হয়। কালিদাসের চিত্র উজ্জ্বল এবং মধুর।" মধুর রসের বর্ণনায় কালিদাস সিদ্ধহস্ত। রূপসীর রূপবর্ণনা ও প্রেমাভিব্যক্তির বিচিত্র লীলাবিলাস কালিদাসের রচনায় বহুবর্ণ-রঞ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু করুণরস তাঁর হাতে তেমন ফোটে নি। দশরথের মুনিপুত্রবধ, অজবিলাপ, রতিবিলাপ—প্রভৃতি শোকাবহ ঘটনার কোনোটির মধ্যেই করুণরস তেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। নারী ও প্রকৃতির মধুর চিত্র অঙ্কনেই কালিদাসের দক্ষতা ঃ "ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি রূপসীর চিত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে কালিদাসের স্ফূর্তি ধরে না।"

প্রবন্ধটির শেষদিকে সমালোচক নিপুণভাবে কালিদাসের চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে কালিদাস খণ্ডচিত্রের কবি—খণ্ডচিত্রগুলি তাঁর নিপুণ কলাকৌশলে অপূর্ব হয়ে ওঠে, কিন্তু বৃহৎ চিত্র রচনায় তিনি তেমন কৃতকার্য হতে পারেন না। বলেন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "সমুদ্র পর্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট্ দৃশ্যে কবি যদি এক মুহূর্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন, তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ, বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব ; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব করা হয়।··· কালিদাস নিপুণ চিত্রকর হইয়াও তাঁহার অতিনৈপুণ্যবশতই হিমালয় ও সমুদ্র বর্ণনায় অকৃতকার্য হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র বর্ণনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘমন্দ্র সমাসে বিন্ধ্যপর্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্তিমান করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার ও ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।"

প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'কাদম্বরীচিত্র' (প্রাচীন সাহিত্য) স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সাতবছর পরে লেখা (১৩০৬)। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যের শ্লোকসমূহের বিচ্ছিন্নতা ও মুক্তানিটোল সৌন্দর্যের কথা বলেছেন।[১৯] কালিদাসের খণ্ডচিত্র প্রসঙ্গটিকে আরও পরিস্ফুট করা উচিত ছিল।

১৯। "প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরকহারের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি ও অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।"—কাদম্বরী চিত্র।

কালিদাসের খণ্ডচিত্র অখণ্ড ভাবপ্রকাশের বিরোধী নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি খণ্ডচিত্রের মধ্যেই এক অখণ্ড ও সর্বব্যাপক সৌন্দর্যচেতনাকে অনুভব করেছেন। তা না হলে তিনি এত বড় কবি হতে পারতেন না। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর কালিদাস ভবভূতির তুলনামূলক বিচার অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্লেষণাত্মক: "কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অধিক শোভাধারণ করিয়া বসে।...ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্র করেন না। যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের মত শুধু বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটি কথায় এমন একটু রস ঢেলিয়া দেন যে তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।"[২০]

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ রসজ্ঞ ব্যাখ্যাতার পরিচয় দিয়েছেন। নানা কারণে এই আলোচনাটি বিশিষ্ট। উত্তরচরিতের স্নিগ্ধনম্র বিগলিত করুণার মূল উৎসটি এই তরুণ সমালোচক তুলে ধরেছেন। উত্তরচরিতের ভাষা ও শব্দবিন্যাস নিয়ে বলেন্দ্রনাথ একটি নূতন রসলোক সৃষ্টি করেছেন—প্রবহমান শব্দতরঙ্গের সঙ্গে সমালোচক তাঁর আবেগস্পন্দিত কবিকণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন। 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' প্রবন্ধটি যেখানে শেষ হয়েছে, 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধটি সেখান থেকেই শুরু হয়েছে। কালিদাস ও ভবভূতির কবিকৃতির পার্থক্য এখানে স্পষ্টতর করা হয়েছে। প্রবন্ধটির প্রথমেই লেখক উত্তরচরিতের মহিমা-সুগম্ভীর পটভূমিকা পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করেছেন। এ জগৎ কালিদাসের জ্যোৎস্না-মলয় সেবিত চিরবসন্তের রাজ্য নয়—উদ্ভিন্নযৌবনা প্রকৃতি এখানে মন্দরাগ ও চুম্বনবিলাসে আতপ্ত হয়ে ওঠে না। দক্ষিণাবর্তের নিবিড় অরণ্যানী, নীল শৈলশ্রেণী, গোদাবরীর তরঙ্গ-কল্লোল—নির্জন-প্রদেশের নিঃসঙ্গমহিমাকে নিবিড়তর করে তোলে। বলেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই উত্তরচরিতের বিষণ্ণ-গম্ভীর মহিমা ঘনিয়ে তুলেছেন।

ভবভূতির সুখ ও দুঃখের মতো, কালিদাসের দুঃখও যেন একজাতীয় দুঃখবিলাস। বলেন্দ্রনাথ এই সত্যটিকে সূক্ষ্মরসবোধ ও মননশীলতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করেছেন:

২০। উত্তরচরিত: বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ)।

"ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মত হইয়া আসে। হয়, তাহার সহিত কতকগুলি দুঃখকাহিনী বিজড়িত, নয়, তাহার মধ্যে একটা অনির্দেশ্য বিবশ ব্যাকুলতা—সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; যদি বা মিলন হয়, মিলনের মাঝখানে যেন শতবর্ষের বিরহ জাগিয়া থাকে এবং মিলনান্ত উপসংহারেও পুরাতন বিরহ পরিতৃপ্ত হয় না। কালিদাসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস-অলসিত মোহন মধুরবেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবদ্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্ম্মস্থলে বেদনাবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ ও নিবিড় হইয়া উঠে।"

চিত্রদর্শন, দণ্ডকারণ্যের ভীষণ-রমণীয় বর্ণনা, ছায়াসীতার অধ্যায়, তৃতীয় অঙ্কের করুণ রস প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথ উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। ভবভূতির ভাব, ভাষা ও শব্দবিন্যাসের সঙ্গে সমালোচক নিজের হৃদয়ের অংশ যোগ করেছেন। ভবভূতির 'করুণাবিগলিত বেদনা' বলেন্দ্রনাথের স্পর্শসচেতন কবিমনের স্পর্শে নূতন সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। উত্তরচরিত সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলেই বলেন্দ্রনাথের সমালোচনারীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত' সমালোচনাটি বিশ্লেষণাত্মক ও যুক্তিনিষ্ঠ। তিনি এই নাটকের প্রতিটি অংশ স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ভবভূতির আতিশয্য দোষের তিনি নির্মম সমালোচনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের সমালোচনাটি বিশ্লেষণধর্মী নয়—তিনি তাঁর কবিমন নিয়ে উত্তরচরিত আস্বাদন করেছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্লেষণ-পন্থী নন, আস্বাদনপন্থী। তাই এখানে তিনি জাগ্রতবুদ্ধি বিশ্লেষণপন্থী সমালোচক নন, স্বপ্ন-তন্ময় আবিষ্টচিত্ত কবি। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যকে চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর সমালোচনার সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের সমালোচনার তুলনা করে বলেছেন: "অজিতকুমারের সমালোচক-দৃষ্টি অখণ্ডকে ভাঙিয়া সত্যকে দেখিতে চাহিয়াছে, বলেন্দ্রনাথের সমালোচক দৃষ্টি খণ্ডকে জুড়িয়া সৌন্দর্য দেখিতে চাহিয়াছে। একজনের দৃষ্টি সত্যসন্ধ, অপরের সৌন্দর্যসন্ধ। অজিতকুমারের কাছে সমালোচনা বিজ্ঞান, বলেন্দ্রনাথের কাছে সমালোচনা কলা; অজিতকুমার সমালোচনার বৈজ্ঞানিক, বলেন্দ্রনাথ সমালোচনায় শিল্পী;..."[২১]

'উত্তরচরিত' সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথ যে মনস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন, 'মৃচ্ছকটিক'

২১। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলার লেখক, পৃঃ ৮২।

ও 'রত্নাবলী' আলোচনায় তার আভাসমাত্রও পাওয়া যায় না। উভয়ক্ষেত্রেই নাটকের মূল ঘটনাংশ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে মাত্র। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বাস্তবধর্মী সমাজ-চিত্রণ ও জীবনযাত্রা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ এই নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তেমন বিশ্লেষণ করেন নি। চরিত্রবিশ্লেষণের দিকেও তিনি দৃষ্টি দেন নি। চিত্রবিশ্লেষণে ও চিত্রব্যাখ্যায় সমালোচক বলেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। মৃচ্ছকটিক সমালোচনাতেও তা বাদ পড়ে নি। শকুন্তলা ও মৃচ্ছকটিকের চিত্রধর্মিতার পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গটিই প্রবন্ধটির মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য অংশ। এ সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন: "সংস্কৃত নাটককারেরা এইরূপ আনুপূর্বিক চিত্রন্যস্ত বর্ণনা করিতে যেন কিছু ভালবাসেন। কালিদাসের শকুন্তলাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলি চিত্রাঙ্কিত।—এমন কি ছোটখাট উপমাগুলি এক একটি সুন্দর চিত্রে উদ্ভাসিত। মৃচ্ছকটিকও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে এইরূপ একটি চিত্রপরম্পরা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তবে কালিদাসের নাটকের মত ইহাতে কেবলি সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সমাবেশ নহে। বাস্তব জগতের দুই চারিটা নাতিসুন্দর স্থূল দৃশ্যও ইহাতে আছে। কালিদাস বসন্তসেনার আলয়ে প্রবেশ করিলে তদীয়া স্থূলাঙ্গী জননীটিকে মৈত্রেয়ের সমক্ষে কিছুতেই বাহির করিতেন না। একেবারে নৃত্যগীত মদিরা উৎসব ও রূপসীগণের অর্ধ-অনাবৃত চারু যৌবনের মধ্য দিয়া মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার বৃক্ষ-বাটিকায় লইয়া যাইতেন—যেখানে যুবতীগণের সনূপুর পদতাডনে অশোকতরু মুকুলিত হইয়া উঠে এবং সেই অশোকশাখা হইতে বিলম্বিত দোলায় বসিয়া মৃদু সান্ধ্য পবনে দূর মৃদঙ্গধ্বনির তালে তালে বসন্তসেনা যৌবনের আন্দোলন সুখ অনুভব করেন।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধকারদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেকালের পত্র-পত্রিকাগুলি অনুসন্ধান করলে এই জাতীয় রচনার পরিধি ও প্রকৃতি দেখলে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগেই এক বিপুলায়তন সংস্কৃত সমালোচনা সাহিত্য গড়ে ওঠে। প্রথম যুগের সমালোচকদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'মৃচ্ছকটিক', 'উত্তর চরিত' ও 'রত্নাবলী'-র সমালোচনা লিখেছিলেন।[২২] ভূদেবের আলোচনাগুলি মূলত নীতিবিদের বিচার, সাহিত্যিকের

২২। উত্তরচরিত ১২৮৭ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে প্রকাশিত হয়। রত্নাবলী ঐ সালের ৯ই আশ্বিন থেকে ৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে এবং ১২৯০ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৬ই আষাঢ়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়। মৃচ্ছকটিক প্রকাশিত হয় ৭ই মাঘ থেকে ১১ই চৈত্রের মধ্যে। তিনটি প্রবন্ধই ভূদেব-সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়।

নয়। এইখানেই বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য। বলেন্দ্রনাথের 'রত্নাবলী' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ 'একটু আধটু সংশোধন' করে দিয়েছিলেন।[২৩]

'পশুপ্রীতি' ও 'কাব্যে প্রকৃতি' প্রবন্ধ দুটিও সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কিত। প্রবন্ধ দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক বলা যায়। প্রথম প্রবন্ধে ইতর প্রাণীর উপর মানুষের সহজ সামাজিকতা সংস্কৃত সাহিত্যে কি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা বর্ণিত হয়েছে; দ্বিতীয় প্রবন্ধে সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানুষের স্নেহকরুণ সম্পর্কের পরিচয় আছে। ইতরপ্রাণী ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহৃদয় সামাজিকতা সংস্কৃত সাহিত্যের পটভূমিকা রচনা করেছে: 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধের প্রথমেই বলেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্যের পশুপ্রীতি বর্ণনার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের পশুপ্রীতি বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ইংরেজ কবি বার্নস্ করুণার্দ্র হৃদয়ে মূষিকের উপর কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তার পিছনে একটি বিশেষ কারণ আছে। যেহেতু মূষিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, সেইজন্য ইংরেজ কবির দয়া এমনভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংস্কৃত কবিদের পশুপ্রীতির মূলে কোনো উদ্দেশ্য নেই, বাধা পাওয়ার জন্যও তাঁদের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় নি। তাঁদের পশুপ্রীতি সহজ ও স্বতস্ফূর্ত। সেখানকার সামাজিক জীবনের স্বরূপের মধ্যেই এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ "প্রকৃতি, পশু এবং মানব একটি সহজ প্রেমে যেন এক গার্হস্থ্যের অঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছে।"

সংস্কৃত কবিদের পশুপ্রীতিকে সমালোচক কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করেছেন। প্রথমেই কাদম্বরী থেকে উদাহরণ নিয়েছেন। শুকমুখে যেখানে বাণভট্ট ব্যাধদের নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা করেছেন সেখানে তাঁর শোকাহত মনের বেদনা আন্তরিকভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। রঘুবংশের নবম সর্গে দশরথের উদ্যত বাণের সম্মুখে যখন হরিণী তার প্রিয়তম হরিণকে রক্ষা করার জন্য আড়াল করে দাঁড়ায় তখন রাজার মনেও স্নেহ উৎসারিত হয়—রাজা নিরস্ত হন। নন্দিনীকে সেবা করার মধ্যেও পশু ও মানবের স্নেহকরুণ সম্পর্ক দ্যোতিত হয়েছে। হরিণ-শিশু পতিগৃহে গমনোদ্যতা শকুন্তলার আঁচল ধরে যখন আকর্ষণ করে তখন মৃগহৃদয় ও মানবহৃদয় একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উত্তর চরিতের তৃতীয় অঙ্কে সীতার পালিত করিশিশু ও ময়ূর বর্ণনায় এই অনুরাগ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। আদিকবির প্রথম শ্লোকই ক্রৌঞ্চমিথুনের

২৩। "তোমার রত্নাবলী বেশ হয়েচে—একটু আধ্‌টু সংশোধন করে দিলুম।"—বলেন্দ্রনাথের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। —বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৭-২৯০।

একটিকে শরাহত হতে দেখে উচ্চারিত হয়েছিল। বৈষ্ণবসাহিত্যের গোষ্ঠলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও ধেনুগণের সম্পর্ক যেমন স্নেহোচ্ছল, তেমনি সহজ।

'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধটির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের হাতের স্পর্শ আছে। বলেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক রচনাই প্রকাশের আগে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে নিতেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছেন: "পশুপ্রীতি বলে ব— একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে; আজ সমস্ত সকালবেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম।...আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে— আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি...আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে—বলুর লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি।...কাদম্বরীর সেই মৃগয়াবর্ণনা থেকে অনেকটা আমি বলুকে তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতটা আমাদেরই মতো—একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই.. এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনা শক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন।"[২৪]

'কাব্যে প্রকৃতি' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যে প্রকৃতি ও মানবের গূঢ় সম্পর্কের কথা প্রধানত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইয়োরোপীয় কবিদের প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়, তার তুলনামূলক বিচার করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের এই তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতিও (Comparative criticism) এই যুগের খ্যাতনামা প্রবন্ধকাররাই প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতির সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে কালিদাস ও সেক্সপীয়রের তুলনামূলক আলোচনা নিয়ে। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথই নন, এ যুগের অনেক কৃতকর্মা গদ্যলেখকই এই দুই কবি-মনীষীর তুলনামূলক বিচার করেছেন।

'কাব্যে প্রকৃতি' প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেন্দ্রনাথ বলেছেন: "শেক্ষপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হয় যে, শেক্ষপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার সামাজিকতা বড় নাই।...সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ন্যায় প্রকৃতি সেখানে মানবজীবনের সহিত বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া মানবহৃদয়ের সহমর্মিণী সঙ্গিনী হইয়া উঠে নাই, এবং মানবী সখীর সুখে দুঃখে মানবীর ন্যায় সে বিচলিত হয় না বা মানবীর বিরহে একান্ত সন্তপ্ত ও মিলনে অতিমাত্র হৃষ্টও হয় না।"—এই সূত্রটিকে

২৪। ছিন্নপত্রাবলী, পতিসর. ২২ মার্চ ১৮৯৪। বলেন্দ্রনাথের মনোজীবন রবীন্দ্রমানসলোকের যে কত কাছাকাছি ছিল, তা এই চিঠিখানা থেকে বোঝা যায়।

তিনি একাধিক উদাহরণের সাহায্যে সম্প্রসারিত করেছেন। প্রথমেই তিনি শকুন্তলার সঙ্গে টেম্পেস্টের তুলনা করেছেন। শকুন্তলা নাটকে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের যে স্নেহকরুণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, টেম্পেস্টে তা অনুপস্থিত। সেখানে আরিয়েল ও ক্যালিবান—প্রকৃতির দুই প্রচণ্ড শক্তিকে প্রস্পেরো তার জাদুশক্তি দিয়ে দমন করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক প্রেমের নয়,—মানুষ এখানে প্রকৃতিকে দমন করতে চেয়েছে। বলেন্দ্রনাথ বলেছেন: "শেক্ষপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব জয়ী হইয়াছে—প্রকৃতির উপর সে কর্তৃত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না।"

শুধু শকুন্তলার কথাই নয়, কুমারসম্ভব ও ভবভূতির উত্তরচরিতের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ভবভূতির নাটকে তমসা, মুরলা, বাসন্তী প্রভৃতি নদ নদী ও অরণ্য প্রকৃতি সীতার দুঃখে সমবেদনা অনুভব করেছে।—"প্রেমে, করুণায়, শুশ্রূষাপরায়ণতায় উত্তরচরিতের প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছে।" কুমারসম্ভবেও উমা-মহাদেবের প্রেম, প্রকৃতির পুণ্যময় স্পর্শে ও স্নেহমমতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বৃহত্তর প্রকৃতির মঙ্গলময় স্পর্শে মানব-মানবীর প্রেম এখানে দিব্য মহিমা লাভ করেছে। শেক্সপীয়রের নাটক সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না। কারণ "প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না, হয় ছায়ার মত, নয় মানবের আজ্ঞাধীন সেবক-রূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চেন্ট অফ্ ভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয়ঘটনায়।"

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এমন কিছু নূতন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার সঙ্গে মিরাণ্ডার তুলনা করেছিলেন। তবে বলেন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের একটি গভীর মিল আছে। 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর শকুন্তলা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' ও 'টেম্পেস্টে'র তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি বিস্তৃততর ও পূর্ণতর। তা ছাড়া এই প্রবন্ধে কবি কালিদাসের প্রতিভারও একটি মূলতত্ত্বে পৌঁছেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদিও কালিদাস ও শেক্সপীয়রের প্রকৃতিচেতনা সম্পর্কে তাঁদের দেশ-কালগত ব্যবধানের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। কালিদাসের যুগ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহ-অবস্থানের যুগ। কালিদাসের যুগ ও শেক্সপীয়রের যুগ এক নয়। শেক্সপীয়রের পৃথিবী রেনেশাঁস-পরবর্তী কালের জগৎ। সেকাল মানুষের মুখর জয়যাত্রার লগ্ন। মানুষ তাই প্রকৃতিকে পরাজিত করে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রস্পেরোর মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির উপরে মানুষের সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয়ার্ধে বলেন্দ্রনাথ প্রকৃতিতত্ত্ব থেকে সৌন্দর্যতত্ত্বে উপনীত হয়েছেন।

সংস্কৃত কবিরা প্রকৃতিকে নারীরূপে দেখেছেন। কালিদাসের কাছে প্রকৃতি সুন্দরী রমণী—ভোগ-সহচরী; ভবভূতির কাছে প্রকৃতি শুশ্রূষাপরায়ণা—কল্যাণদায়িনী। শিভাল্‌রির যুগে নারীকে কেবল উপভোগ্যা হিসেবেই দেখা হয় নি—"জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের অন্তরে যে সৌন্দর্যশক্তি নিহিত আছে, নারীসৌন্দর্যে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট বলিয়া নারীপূজায় সেই সৌন্দর্যেরই পূজা করা হয়। এবং এই সৌন্দর্যপূজা নারী হইতে ক্রমে সমস্ত প্রকৃতিতে যেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

আধুনিক কবিদের কাব্যে সৌন্দর্যশক্তির এক সূক্ষ্মতর অথচ রহস্যময় উপলব্ধির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ—"বসন্তের বাতাস যেমন চঞ্চল পক্ষে ফুলে ফুলে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া যায়, এই অদৃশ্য প্রভাবের ছায়াও সেইরূপ সর্ববিশ্বের উপর দিয়া—লোক-লোকান্তর স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয়। এই অদৃশ্য প্রভাব—এই ছায়া—শুধু সঙ্গীতের স্মৃতির মত—অত্যন্ত রহস্যময়, কিন্তু এই রহস্যবশতই প্রিয়তর। এই সৌন্দর্যের মূলশক্তি বাহ্যপ্রকৃতিতে, মানবহৃদয়ে, প্রেমে, আশায়, সর্বত্র ছায়া ফেলিয়াছে। কবি এই চরাচরপ্লাবী সৌন্দর্যরহস্যে নিমগ্ন হইয়া দেখিতেছেন যে, এই সমস্তই সেই মহাসৌন্দর্যে ওতপ্রোত; এবং এই সৌন্দর্য অবলম্বন করিয়াই মানবের অন্তরের সহিত প্রকৃতির অন্তরের অনির্বচনীয় যোগসূত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে।"

'আধুনিক কবি' বলতে বলেন্দ্রনাথ মূলত ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক কবি-গোষ্ঠীকেই বুঝিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথ বর্ণিত এই সৌন্দর্যশক্তির 'অদৃশ্যপ্রভাব'কেই ইংরেজ কবি আরতি করেছেন ঃ

The awful shadow of some unseen Power
Floats through unseen among us—visiting
This various world with as inconstant wing
As summer winds that creep from flower to flower,—
Like moonbeams that behind some piny mountains shower,
It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance ;
Like hues and harmonies of evening,—
Like clouds in starlight widely spread,—
Like memory of music fled,—
Like aught that for its grace may be
Dear, and yet dearer for its mystery.[২৫]

২৫। শেলীর Hymn to Intellectual Beauty কবিতার প্রথম স্তবক।

বলেন্দ্রনাথ যে সময় এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্য রচনা শেষ হয়েছে। 'সোনার তরী-চিত্রা'র সৌন্দর্যদর্শনও যে বলেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরেজ রোমান্টিক কবি ও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্যবাদ বলেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। বৈদিক ঋষিরা সৌন্দর্যের যে মহাসঙ্গীত রচনা করেছেন, যে সুগভীর আনন্দ-রহস্য অনুভব করেছেন, তা যথার্থ সৌন্দর্যদর্শনের সবচেয়ে বড়ো কথা। প্রবন্ধটির আরম্ভ প্রকৃতি নিয়েই, কিন্তু সৌন্দর্য-দর্শনে তার পরিসমাপ্তি।

॥ ৪ ॥

বাংলাসাহিত্য সমালোচনা

শুধু সংস্কৃতসাহিত্য সমালোচনাই নয়, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের কবি ও কাব্য সম্পর্কেও বলেন্দ্রনাথের রচনার পরিধি কম নয়। বাংলাসাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'জয়দেব'-ই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটির প্রথমেই বলেন্দ্রনাথ প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রেমের এতো বৈচিত্র্য ও রহস্য যে, তাকে অনেক ক্ষেত্রেই খণ্ড খণ্ড করে দেখা হয়। কেউ শারীরিক সম্ভোগকেই প্রেমের চূড়ান্ত সিদ্ধি বলে মনে করেন, কেউ কেউ আবার প্রেমকে সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার মনে করেন। কেউ এই বৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে 'ইন্দ্রিয়জ' মনে করেন, আবার কারো কারো মতে প্রেম "এক অতীন্দ্রিয় মনোজ ভাব"। বলেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন: "যে কেন্দ্রভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই শরীর, মন, সম্ভোগ এবং প্রীতি, আলিঙ্গন এবং ধ্যান একটি সমগ্র সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয় সে কেন্দ্রভূমিতে এই সকল ভিন্নমতাবলম্বী বিরোধিবর্গের কেহই উপনীত হয়েন নাই।" প্রেমের এই সামগ্রিক উপলব্ধি যাঁর কাব্যে শিল্পিত হয়ে ওঠে, বলেন্দ্রনাথ তাকেই প্রেমকাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলেছেন। কারণ সম্ভোগকেই যিনি সর্বার্থসার মনে করেন, তাঁর তৃপ্তি স্বল্পস্থায়ী। এই দেহসর্বস্ব প্রেমের মনের সঙ্গে কোনো যোগই নেই। আবার যাঁরা দেহকে অস্বীকার করে প্রেমকে নিতান্ত মানসিক ব্যাপার মনে করেন, তাঁদের দৃষ্টিও খণ্ডিত। বলেন্দ্রনাথ প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণে এই দুই বিপরীত মতকে সমন্বয় করতে চেয়েছেন: "বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিতে গেলে, শরীরমাত্রগত সম্ভোগ ও দর্শন-স্পর্শনাকাঙ্ক্ষাহীন অতিসূক্ষ্ম ধ্যানমাত্রগত সম্ভোগ—মৃতদেহ ও প্রেতাত্মা—উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম।"

প্রেমের এই স্বরূপধর্ম বিশ্লেষণ করে বলেন্দ্রনাথ প্রেমসাহিত্যে গীতগোবিন্দের স্থান নির্দেশ করেছেন। যাঁরা গীতগোবিন্দের দেহনিষ্ঠতা দেখে একে অস্বীকার করেন, তাঁদের তিনি বিদ্যাপতির কবিতা স্মরণ করতে বলছেন। বিদ্যাপতির কাব্যেও দেহনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু তার কাব্যগুণকে কেউ অস্বীকার করেন না। "সখি রে, কি পুছসি অনুভব মোয়—" পদটি উদ্ধার করে বলেন্দ্রনাথ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন: "তাঁহার কবিতায় শরীর শরীরের সহিত মিলিত হইয়া সেই প্রেমকেই চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, যে প্রেম যতই প্রগাঢ় হয়, ততই অপরিতৃপ্ত এবং ততই তাহার সম্ভোগানন্দ।...এখানে কেবলমাত্র প্রেমের শীতল ইন্ধন সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু সেই দীপ্ত অগ্নিশিখা বহু উর্ধ্বে উঠিয়া চতুর্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। শুদ্ধ শরীর মাত্র সম্ভোগ হইলে অনুরাগ তিলে তিলে এমন নূতন হইয়া উঠিত না, প্রতি মুহূর্তে ম্লান ও জীর্ণ হইয়া পড়িত।"

কিন্তু জয়দেবের কাব্যে যে দেহনিষ্ঠতা, তার জাত আলাদা—সেখানে দেহের কামনা ও আত্মার রহস্য—এই দুয়ের ভেদ লুপ্ত হয়ে এক চির-অতৃপ্তির স্রোত প্রবাহিত হয় না! সুরসিক সমালোচক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জয়দেবের কথা বলেছেন: "গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায়শাস্ত্রবর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহুল বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়া গিয়াছেন; তিনি খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, অন্তরের অসীমতার দ্বারে ধূলিস্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছেন, সে ধূলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্যরাজ্যের পথে বাধাস্বরূপ।"

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি প্রথাবদ্ধ উপমার উপরে নির্ভর করে এই কাব্যে ছড়িয়ে পড়েছে। অনঙ্গরঙ্গের নানা স্থূল বর্ণনা এই কাব্যে বিস্তৃতস্থান অধিকার করেছে। এর ফলে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পাঠকচিত্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, এই কাব্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর শব্দ বর্ষিত হলেও, কল্পনাপটে কোন চিত্র অঙ্কিত করে না। এই কাব্যের গীতধ্বনি শ্রবণমনোহর, কিন্তু বর্ণনা বিশেষত্ববর্জিত ও চিত্র অনুপস্থিত—সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিরও অভাব। "বসন্তবর্ণনায় 'ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে' কেবল লকার-লসিত ধ্বনির লহরীলীলা মাত্র, তাহা কোন নির্দিষ্ট চিত্র নহে।" বলেন্দ্রনাথ সঙ্গীত হিসাবে গীতগোবিন্দের উচ্চস্থান নির্দেশ করেছেন। সঙ্গীতে চিত্রবৈচিত্র্য প্রত্যাশা করা যায় না। একটিমাত্র রসকে অবলম্বন করেই সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হয়। শৃঙ্গাররসই এই কাব্যের মূল রস।

কেউ কেউ জয়দেবের কাব্যকে 'জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক মিলনেরই শরীরী রূপক' বলেছেন। জয়দেব যদি এই জাতীয় রূপক ব্যবহার করেন, তা হলে তাঁকে অপরাধী করা যায় না। প্রাচীনযুগের সাহিত্যের অনেকক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক মিলন বর্ণনায় লৌকিক সম্ভোগের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক বর্ণনায় মানবীয় ভাবই নানাভাবে প্রকাশিত হয়। রামপ্রসাদ জগজ্জননীর সঙ্গে পুত্রের মতো আচরণ করেছেন, বৈষ্ণবসাহিত্যেও পরমাত্মাকে মানবীয় ভাববৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আস্বাদন করা হয়েছে। সুতরাং জয়দেবের অপরাধ কি? জয়দেব 'হরিস্মরণ' ও 'বিলাসকলা'—দু'দিকেই দৃষ্টি রেখেছিলেন—কিন্তু দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য ঘটে নি। বলেন্দ্রনাথ এর কারণ নির্দেশ করে বলেছেন: "দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং গীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাবসুলভ দুর্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়।"

প্রবন্ধটির শেষদিকে বলেন্দ্রনাথ কাব্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা সাহিত্যক্ষেত্রের এক অতিপ্রাচীন ও বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ। জয়দেব 'বিলাসকলা'র যে 'রতিরসোজ্জ্বল' ছবি এঁকেছেন, তাকে বলেন্দ্রনাথ অস্বীকার বা আপত্তি করেন নি। তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ, যে উপায়ে তিনি ঐ ছবি এঁকেছেন, সেই উপায়টি। 'সচেতন বিলাসিতা' জয়দেবের কাব্যের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করেছে। কিন্তু গ্রীকদেশের নগ্ন প্রস্তরমূর্তি অথবা বৈদিক পুরুরবা উর্বশীর চিত্রের যে সহজ স্বাভাবিকত্ব, তার তুলনায় জয়দেবের সম্ভোগচিত্রাবলী নিতান্ত কৃত্রিম ও প্রাণহীন মনে হয়। এ বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন: "গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ নিষ্প্রয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসে না। কিন্তু এই গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্তির পার্শ্বে ফরাসী চিত্রশালার একখানি নগ্নদেহ-চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্ত গৌরব নাই। ফরাসী চিত্রকর ঐ নারীমূর্তির সর্বাঙ্গ হইতে বসন স্খলিত করিয়া দিয়া পায়ে হয় ত জুতা রাখিয়াছেন, কিম্বা এমন করিয়া এমন কিছু রাখিয়াছেন, যাহাতে এই বর্তমান শতাব্দীর বসন-ভূষণের একটি ভাব মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে সচেতন উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।"

বলেন্দ্রনাথের আগেও কোনো কোনো সমালোচক গীতগোবিন্দের কাব্যসৌন্দর্য ও রুচি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের

সমালোচনাটি।[২৬] অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বলেন্দ্রনাথের মতো শুধু জয়দেব সম্পর্কেও প্রবন্ধ লেখেন নি—তিনি জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথও তাঁর প্রবন্ধের প্রথমাংশে জয়দেব-বিদ্যাপতির তুলনা করেছেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো পার্থক্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন: "বিদ্যাপতির দল মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহাদের কবিতা ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য ও পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ,—বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-পূর্ণ।…জয়দেবের গান মুরজবীণ-সঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি—বিদ্যাপতির গান—সায়াহ্ন-সমীরণের নিঃশ্বাস।" বঙ্কিমচন্দ্র যাকে 'বহিঃপ্রকৃতি' বলেছেন, বলেন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'বিপুল বহুল বহিরঙ্গ'। প্রেম সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ যে দেহ ও মনের প্রশ্ন তুলেছেন এবং এদের সমন্বয়ের অভাবে যে খণ্ডতার বেদনা অনুভব করেছেন, তাও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বলেছেন: "যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে।…ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth."

রবীন্দ্রনাথ জয়দেব সম্পর্কে কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন নি, বলেন্দ্রনাথের সমকালীনদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর জয়দেব প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটি বলেন্দ্র-নাথের প্রবন্ধের তিন বছর আগে লেখা। প্রমথ চৌধুরী এই কাব্যে কোনো আধ্যা-ত্মিকতার সন্ধান পান নি। তাঁর মতে দেহজ আকাঙ্ক্ষা ও বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্টই এই কাব্যের মূল বক্তব্য। দ্বিতীয়ত, জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনার মধ্যেও কোন সজীবতা নেই। কালিদাসের যক্ষবধূর বিরহ-চিত্রের তুলনায় জয়দেবের বিরহ-চিত্র ম্লান ও নিতান্ত প্রথানির্ভর। জয়দেবের অভিসার বর্ণনা বৈচিত্র্যহীন, নায়িকার বাইরের বেশভূষাই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে, সেখানে তাঁর বিচিত্র হৃদয়াবেগ স্পন্দিত হয়নি। বসন্ত বর্ণনাও কতকগুলি কবিপ্রসিদ্ধির সমুচ্চয় মাত্র। সমালোচক জয়দেবের উপমার মধ্যেও নূতনত্ব দেখতে পান নি। কালিদাস যেখানে একটিমাত্র উপমায় তাঁর বক্তব্যের নিগূঢ় অন্তস্থলে প্রবেশ করেছেন, জয়দেব সেখানে শব্দের চাতুর্যই

২৬। বিদ্যাপতি ও জয়দেব: বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড)।

দেখিয়েছেন। চৌধুরী মহাশয় সিদ্ধান্ত করেছেন: "যাঁহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিকতার ভাব, মানবদেহের সৌন্দর্য যাঁহার দৃষ্টিতে ততটা পড়েনা, যিনি মানব-দেহকে শুধু ভোগের বস্তু বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান, যাঁহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক—এক কথায়, যাঁহার কাব্যে স্বাভাবিকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি।"

প্রমথ চৌধুরীর মনে জয়দেবের কাব্য কোনো আবেদনই সৃষ্টি করতে পারে নি। এদিক থেকে তিনি চরমপন্থী সমালোচক। জয়দেবের কাব্যের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র ও বলেন্দ্রনাথ এই কাব্যের কিছু গুণের কথাও বলেছেন। প্রমথ চৌধুরী জয়দেব সম্পর্কিত মনোভাবকে নানাভাবে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। তাঁর মতে ললিতলবঙ্গলতা, বসন্ত ও অনঙ্গ জয়দেবের কাব্যকুঞ্জবনকে সুখালসতৃপ্ত ইন্দ্রিয়জ কামনায় বিহ্বল করে তুলেছিল। আদিরসের বন্যায় যখন সমস্ত দেশ নিমজ্জিত, তখন সেই পৌরুষহীন সম্ভোগ-মত্ত দেশ 'তুরস্ক সোয়ারে'র পদানত হলো।[২৭] জয়দেবের ভাষা সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন যে এই ভাষা "মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।" প্রমথ চৌধুরীও জয়দেবের ভাষার শিথিলতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন—কিন্তু তাঁর অভিযোগ ভাবলেশহীন ও নির্মম-কঠিন: "যখন রূপসীদিগের কবরী শিথিল হইয়া যাইতেছে, নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িতেছে, যখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে, তখন আর ভাষার বাঁধুনি কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায়?" বলেন্দ্রনাথ স্বল্পপরিসরে জয়দেবের কাব্যের দেহনিষ্ঠতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর মৌলিক চিন্তাশক্তিরই পরিচয় দেয়।

'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের মাধ্যমেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের

২৭। আদিরসে ভাসে দেশ অজয়ে জোয়ার!
ডাকো কল্কি, মেচ্ছ আসে, করে করবাল,
ধূমকেতু কেতু সম উজ্জ্বল করাল,
বঙ্গভূমি পদে দলে তুরস্ক সোয়ার।
—জয়দেব: সনেট-সঞ্চাশৎ

যোগসূত্র নির্ণয় করা যায়। তাঁর মতে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্য। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন: "সমাজের অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অশ্লীলতা বই আর কিছুতেই মন উঠিত না।" বলাবাহুল্য বলেন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ-নির্ভর নয়। দ্বিতীয়ত, লেখকের মতে বাংলাসাহিত্যে বীররসের অভাব। তৃতীয়ত, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যকে তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন—ভাবের সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যের সাহিত্য। চতুর্থত, প্রাচীন বাংলাসাহিত্য ধর্মাশ্রয়ী। পঞ্চমত, বাংলা-সাহিত্যের আরম্ভ গীতিকাব্যে। ষষ্ঠত, লেখক সে-যুগের বাংলাসাহিত্যের উপর জয়দেবের প্রভাবের কথা আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি বিশেষত্বহীন। বক্তব্যগুলিও অস্পষ্ট ও ভাসা-ভাসা। বিশেষত, বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে যেখানে আলোচনা করেছেন, সেই অংশটি সবচেয়ে দুর্বল। তবে এ কথাও ঠিক যে, তখনো বিজ্ঞানসম্মত ভাষাতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত ঘটেনি।

'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'রাধা', 'যশোদা'—এই তিনটি প্রবন্ধ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কিত। 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' রচনাটি একটি তুলনামূলক আলোচনা এখানেও তাঁর বিশেষ কোন মৌলিক বক্তব্য নেই। এর দু'বছর পরে লেখা রবীন্দ্র-নাথের 'বিদ্যাপতির রাধা' প্রবন্ধটির সঙ্গে তুলনা করলেই বলেন্দ্রনাথের সীমা সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। 'রাধা' প্রবন্ধটি খানিকটা লঘুমেজাজের রচনা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা নিবন্ধ নয়। সীতা সাবিত্রীর মতো আদর্শ চরিত্রের পাশে রাধার কোনো স্থান নেই। রূপে-গুণে রাধার এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যা তাকে বিশেষ মর্যাদা দিতে পারে। তবুও বাংলাসাহিত্যে রাধিকার স্থানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। রাধা চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নারীচরিত্রকে আমরা মাতা, কন্যা, পত্নীভাবে দেখতেই অভ্যস্ত, কিন্তু রাধা চরিত্রে এই ভাবগুলির বিকাশ নেই। রাধা শুধু নারী—"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"। নারীর সাধারণ সামাজিক বন্ধন তার নেই। বলেন্দ্রনাথ রাধা চরিত্রের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার কারণ হিসেবে যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য: "বোধ করি, আমাদের সমাজে প্রেমচর্চা তখন অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মানবহৃদয় কিছু আর সকল সময়ে সমাজ-নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলে না। রাধার আবির্ভাবে সে আপন অন্তর-তন্ত্রীতে আঘাত অনুভব করিল। দেখিল, তাহার হৃদয়ের সহজ আকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনীতে ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ নানা কারণে·· প্রেমচর্চায় রাধার বিশেষ প্রভাব।"

কেউ কেউ আধ্যাত্মিক আদর্শের দিক থেকে রাধা চরিত্রটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। রাধা চরিত্রকে কিভাবে দেখা সঙ্গত—আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে, না কবির

সৃষ্টি হিসাবে? কাব্য ও ধর্ম এখানে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, পরিণতি দেখে এর মূল নির্ণয় করা কঠিন। প্রবন্ধের শেষদিকে লেখক পদাবলীবর্ণিত রাধা চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। বসন্ত-বর্ষার বিরহ ও অভিসার প্রসঙ্গ বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাঙালীর মানসলোকে রাধা চরিত্রের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা ও তার গুরুত্বকে লেখক ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। বক্তব্যের মধ্যে তীক্ষ্ণতা না থাকলেও সাবলীল রচনারীতিতে প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য।

'যশোদা' প্রবন্ধটির প্রথমেই লেখক রাধা ও যশোদার তুলনা করেছেন। রাধার বিকাশ প্রণয়িনীরূপে, যশোদার বিকাশ মাতৃরূপে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গর্ভজাত পুত্র না হলেও তাকে দুদণ্ড না দেখলেই তিনি অধীর হয়ে পড়েন। যশোদার এই বাৎসল্য রসের জন্য বিশেষ কোনো উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না। বলেন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে যশোদার এই স্নেহ-বাৎসল্যের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন: "যশোদার এই স্নেহভাবে এমন একটি সরল স্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখা যায়, তাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। আমাদের চক্ষের সম্মুখে সেই আভীরপল্লীর ছায়াসুপ্ত গ্রাম্য ছবি ফুটিয়া উঠে। সেখানে গিয়া হৃদয় যেন মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া আসে।"

রাধা চরিত্রের মতো যশোদা চরিত্র জটিল নয়। রাধা চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে। তা ছাড়া, প্রেমানুভূতির মধ্যে যে সূক্ষ্মতর বৈচিত্র্য ও রহস্যময়তা আছে, বাৎসল্যরসের মধ্যে তা থাকা সম্ভব নয়। রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক সমাজবিগর্হিত, তাই এখানে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাও বেশি। কিন্তু যশোদার স্নেহ-বাৎসল্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন হয় না। এখানে প্রেমের জ্বালা নেই, চিত্তবিক্ষোভ নেই—আছে অগাধ স্নেহের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রশান্তি। রাধা ও যশোদার উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন: "রাধা এবং যশোদা, উভয়েই এই সকল গ্রাম্যকাহিনীর অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন। ক্রমে কবি এবং সংস্কারকদিগের হস্তে পড়িয়া হয় কাব্য হইতে আধ্যাত্মিক রূপকে, নয় আধ্যাত্মিক রূপক হইতে কাব্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।" শাক্তপদাবলীর উমার সঙ্গেও যশোদার পার্থক্য আছে। উমা শক্তিরূপিণী, কিন্তু যশোদা "স্নেহময়ী জননী মাত্র"।

প্রসঙ্গক্রমে বলেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কাব্যের লিরিসিজিমের হেতু নির্ণয় করেছেন: "বৈষ্ণব সাহিত্যে এক একটি বিভিন্ন চরিত্রে প্রেমের এক একটি বিশেষভাব আলোচিত হইয়াছে। একই চরিত্রে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ বড় দেখা যায় না। আমার বোধ হয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠতার কারণ এই।" বলেন্দ্রনাথের এ ধারণা অমূলক নয়। এক একটি আইডিয়াকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব চারত্রগুলি মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

আইডিয়াগুলি স্বভাবতই বৈষ্ণব ভাববৃত্তির কোমল-মাধুর্যে রচিত হয়েছে। বিরুদ্ধভাবের দ্বন্দ্ব, নানাভাবের বিচিত্র সমাবেশ কিম্বা তথ্যবাহুল্য লিরিকের সহজ স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে ব্যাহত করে। বৈষ্ণব কবিতার এই সহজ-বিগলিত ভাবপ্রবাহ কোনো বিরুদ্ধ উপকরণের উপলখণ্ডে ব্যাহত হয় নি। তাই বৈষ্ণব লিরিসিজম্ এত সহজ ও স্বপ্রকাশ।

'যশোদা' প্রবন্ধটিতে বলেন্দ্রনাথ কৃষ্ণগতপ্রাণা নন্দরাণীকে নিজের কল্পনা ও হৃদয় মাধুর্যের দ্বারা নূতন করে রচনা করেছেন। বৈষ্ণব কাব্যের এই মমতাময়ী বলেন্দ্রনাথের মনলোকে সহজেই তাঁর আসন করে নিয়েছেন। কারণ বলেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের যে নম্র-মধুর কল্যাণ-রমণীয় মূর্তির বন্দনা করেছেন, যশোদা চরিত্রে তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঘটেছে। কিন্তু প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি যশোদার সঙ্গে উমার যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তার আংশিকতা সহজেই চোখে পড়ে। শাক্ত সাহিত্যে যশোদা চরিত্রের যথার্থ প্রতিরূপ উমা নন, মেনকা। 'আগমনী' ও 'বিজয়া' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে গিরিরাণীর যে বেদনা ও ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা নেই। যশোদার চেয়েও মেনকার বাৎসল্য ব্যাপকতর ও নিবিড়তর। এখানে বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, মেনকার বাৎসল্যরস কন্যাকে নিয়ে, যশোদার বাৎসল্যের আধার পুত্র। চিরদিনের জন্য কন্যাকে পর করে দিতে হয়—এ হলো নিষ্ঠুর সত্য! তাই শঙ্কাতুর মাতৃহৃদয়ের বেদনা এখানে শতধারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মেনকার মাতৃহৃদয় তরঙ্গ-উদ্বেলিত অশান্ত সমুদ্রের মতো—তার সীমাহীন ব্যাপ্তি ও নাটকীয় বৈচিত্র্য শাক্তপদ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। যশোদা কৃষ্ণকে চোখের আড়াল হতে দেন না, গোচারণরত কৃষ্ণের দুদণ্ডের অদর্শনেই তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। মেনকার বাৎসল্যের মতো প্রসার ও বৈচিত্র্য এখানে অনুপস্থিত। অবশ্য প্রত্যাশা করাও ঠিক নয়। কারণ বৈষ্ণবপদাবলীতে মূল রস বাৎসল্য নয়, মধুর। উমার সঙ্গে যশোদার তুলনা না করে মেনকার সঙ্গে তুলনা করলে বলেন্দ্রনাথের আলোচনাটি পূর্ণতর হতে পারতো।

'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস' প্রবন্ধটি লঘুমেজাজে লেখা। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস সম্পর্কে লেখক এখানে কোনো নূতন বিষয়ের অবতারণা করেন নি। সর্ব্বজনস্বীকৃত বিষয়কেই তিনি গল্পের মতো করে শুনিয়েছেন। মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের সঙ্গে বাংলা রামায়ণ-মহাভারতের পার্থক্য, কৃত্তিবাস-কাশীদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য, রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনা, সমাজ ও দেশকালের উপর কাব্যদ্বয়ের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেছেন। রচনারীতির মধ্যে যে সহজ-স্বচ্ছন্দ বৈঠকী মেজাজ আছে, তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মুকুন্দরাম, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ মধ্যযুগের কবিদের সাহিত্যকৃতির উপর বলেন্দ্রনাথ আলোকপাত করেছেন। 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' প্রবন্ধটির মধ্যে সমালোচনার অংশ যৎসামান্য। বলেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুটি আখ্যায়িকাকেই বিশ্লেষণ করেছেন। মুকুন্দরামের পর্যবেক্ষণনিপুণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন: "মুকুন্দরামে ভাবের হিল্লোল কোথাও বড় খেলিতে পায় নাই, কবিত্ব বিকশিয়া উঠিয়া সৌন্দর্যের রহস্যদ্বার খুলিয়া দেয় না। বস্তুর অতীত প্রদেশে তাঁহার তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না—চর্মচক্ষুতে যাহা যেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেইরূপই বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন; উচ্চদরের কবি তিনি নহেন, কিন্তু সাজাইয়া গল্প করিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে।" ফুল্লরার বারমাস্যা বর্ণনাও বলেন্দ্রনাথের কাছে কৃত্রিম মনে হয়েছে।

'কেতকা-ক্ষেমানন্দ' প্রবন্ধটিতেও বলেন্দ্রনাথ সাধারণভাবে কাহিনীর গল্পাংশ বিবৃত করেছেন। তিনি যখন এই প্রবন্ধ রচনা করেন, তখনও বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত ঘটেনি। তাই তথ্যগত দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এখানে আছে। তিনি অনুমান করেছেন যে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দু'জন কবির নাম— "কেতকাদাস খানিক লিখিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন, ক্ষেমানন্দ লেখনী চালাইয়াছেন; আবার ক্ষেমানন্দ থামিতে কেতকা কলম ধরিয়াছেন। উভয় কবিই নিজ নিজ রচনার শেষে ভণিতায় স্বনাম উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।" প্রকৃতপক্ষে কবির নাম ক্ষেমানন্দ, তিনি নিজেকে "কেতকাদাস" বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮] তবে ক্ষেমানন্দের উপরে মুকুন্দরামের যে প্রভাবের কথা বলা হয়েছে, তা অযথার্থ নয়। ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয় অংশে মুকুন্দরামের প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্ট।

'ভারতচন্দ্র রায়' ও 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর' প্রবন্ধদ্বয় বিশেষত্ববর্জিত। গল্পাংশ বিবৃতি ছাড়া প্রবন্ধ দুটির কোনো উদ্দেশ্য নেই। প্রথম প্রবন্ধে মুকুন্দরামের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের যে তুলনাটি আছে, তাতেও মৌলিকতা ও দীপ্তি নেই। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত আস্বাদন করে যাঁরা মুগ্ধ হন, তাঁরা বিদ্যাসুন্দরের মধ্যেও জোর করে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আবিষ্কার করতে চান। 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর' প্রবন্ধে

২৮ "ভণিতায় ক্ষেমানন্দ নিজেকে প্রায়ই 'কেতকাদাস' অর্থাৎ মনসা-দাস ('কেতকা' আদ্যাশক্তির নাম, পরে মনসার নামান্তর হইয়া গিয়াছে) বলিয়াছেন। 'কেতকাদাস' ভণিতার মর্ম না বুঝিয়া অনেকে ইহা স্বতন্ত্র কবির ভণিতা মনে করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন।" —বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড): ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৭৬।

বলেন্দ্রনাথ এই কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বিরোধী। তিনি কাব্যকে কাব্য হিসাবেই বিচারের পক্ষপাতী। 'বঙ্গসাহিত্য : রামপ্রসাদের গান' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতের আন্তরিকতা, দিব্য ভাবানুভূতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধের শেষদিকে রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে রামমোহনের ধর্ম্মসঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কিন্তু একথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রামপ্রসাদের গানের একটি কাব্যমূল্যও আছে।

'বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা' একটি সুলিখিত প্রবন্ধ। লেখক এখানে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল থেকে উদাহরণ নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী চরিত্রগুলি খামখেয়ালী, তোষামদপ্রিয় ও পরপীড়ক। নবাবী আমলের অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়ের আদর্শেই সে যুগের দেবচরিত্রগুলি রচিত হয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যই দেবদেবী চরিত্রের উপর ছায়াপাত করেছে। বলেন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : "যেমন রাজ্য শাসন, দেবশাসনও তেমনি। এই পার্থিব শাসনতন্ত্রেরই আদর্শে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল আপনার দেবতাগুলি দিয়া একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করিয়াছেন মাত্র। অপরিণত বুদ্ধি একটা দোর্দণ্ড প্রতাপ নবাবশাবকের পরিবর্তে সেখানে একজন অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্ধর্ষ দেবতা বসিয়া রাজত্ব করেন; সর্বনাশ ভয়ে দুর্বল ভক্তবৃন্দ চৌত্রিশ অক্ষরে দুর্বোধ ছড়া বাঁধিয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করে, ষোডশোপচারে সেবার বিধান করিয়া দিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে।" মধ্যযুগের প্রবল প্রতাপশালী নবাবদের আমল আর নেই—উপধর্ম ও উপদেবতার প্রভাবও তাই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই প্রবন্ধ রচনার প্রায় দশ বছর পরে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (দ্বিতীয় সং) সমালোচনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[২৯]

'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী' প্রবন্ধে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের দুই নায়িকার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাই করেন নি, তিনি সংক্ষেপে উপন্যাসটির ঘটনাংশটি বর্ণনা করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বলেন্দ্রনাথ উপন্যাসখানিকে

২৯ "এই সকল কারণে যে-সময় বাদশাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভবের ভেদচিহ্নকে ক্ষীণ করিয়া আনিয়াছিল, হর্ষশোক-বিপৎ-সম্পদের অতীত শান্ত সমাহিত বৈদান্তিক শিব সে-সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্বেষ-প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ। সেইজন্যই তখনকার লোকে ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : সাহিত্য।

বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি দু'একটি সূক্ষ্ম বর্ণসম্পাতে এই দুই নায়িকার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্লেষণের স্থান অধিকার করেছে দু'একটি ভাবচিত্র—চিত্রগুলি কবিহৃদয়ের ভাবানুভূতির স্পর্শে সজীব ও অন্তরঙ্গ: "সন্ধ্যার সহিত সূর্যমুখীর মুখশ্রীর কেমন একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—দুইজনের ভাবে যেন বিশেষ ঐক্য আছে। সন্ধ্যার যেমন পবিত্র মহান্ ভাব, দেখিলেই কেমন স্নেহময়ী গৃহিণী বলিয়া মনে হয়, সূর্যমুখীরও সেইরূপ বড় একটি সুন্দর ভাব দেখা যায়। সে মুখে পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি মাখান। সেখানে হৃদয় খুলিয়া আনন্দ আছে—প্রাণবলি দিয়া প্রাণ পাওয়া যায়। কুন্দনন্দিনীকে আমরা সন্ধ্যা কি উষার সহিত তুলনায় আনিতে পারি না। উষা অপেক্ষা তাহার ধীর গতি—উষার মত সে ফুল তুলিয়া, পাতা কুড়াইয়া, লাফাইয়া বেড়ায় না। উষার মত বালিকা কুন্দ নহে। উষার ভালবাসায় যৌবন নাই—প্রণয়ে হতাশ হইয়া উষা মরিবে না। কুন্দের ভালবাসা যৌবনের প্রণয়—তাহাতে নৈরাশ্য, ভয়, শিহরণ সকলই আছে।"—বলাবাহুল্য এখানে চিত্রচতুর কবিকল্পনা ও অভিনব রূপসৃষ্টি বিশ্লেষণের অভাব অনেকটা পূরণ করেছে।

তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বলেন্দ্রনাথের বাংলাসাহিত্য সমালোচনা সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার তুলনায় অনেক দুর্বল। এর কারণ একাধিক। প্রথমত, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের একটি আত্মিক সম্পর্ক ছিল। বলেন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিচিত্ত সংস্কৃত সাহিত্যের মর্মমূলে একটি সহজ প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। তাঁর মানসিক আভিজাত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মিল ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ছিল তাঁর স্বক্ষেত্র—সেখানে তিনি তাঁর মানস-লীলাভূমির সন্ধান পেয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দসম্পদ, ধ্বনিগৌরব ও চিত্রবিন্যাস তাঁর সুকর্ষিত গদ্যস্টাইলের আদর্শ ছিল। দ্বিতীয়ত, তখনো বাংলাসাহিত্যের বিজ্ঞান-সম্মত সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে নি। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে। সুতরাং বলেন্দ্রনাথের বাংলাসাহিত্য সমালোচনার সামনে তেমন কোনো বড় আদর্শ ছিল না।

বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনায় বিশ্লেষণের স্বল্পতা লক্ষণীয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্লেষণপন্থী নন, আস্বাদনপন্থী। বিশ্লেষণের অভাব পূরণ করেছে তাঁর সুমার্জিত রসবোধ ও উচ্চতর কল্পনাশক্তি। সমালোচনার বিষয়বস্তুকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। সংস্কৃতসাহিত্য সমালোচনায় তাঁর এই ক্ষমতা সর্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করেছে। বাংলাসাহিত্য সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শক্তি প্রকাশিত না হলেও, পাঠকসাধারণ বঞ্চিত হয় নি। মধ্যযুগের বাংলা-

সাহিত্যের ক্ল্যাসিকগুলি সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে একটি বৈঠকী মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সহজ ও অন্তরঙ্গ রীতি তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধাবলীর (Personal Essays) মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে

॥ ৫ ॥

শিল্প সমালোচনা ও ঐতিহাসিক রোমান্স

বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা শুধু সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য সমালোচনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি ললিতকলার সমালোচনাতেও সূক্ষ্ম রসবোধ ও নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান সঙ্কলনের 'দেয়ালের ছবি' ও 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধ দুটিকে বিশুদ্ধ চিত্রসমালোচনা বলা যায়। প্রবন্ধ দুটির মধ্যে একটি আত্মিক যোগসূত্র আছে। 'দেয়ালের ছবি' রচনাটির (১২৯৮) পূর্ণ রূপ যেন সাত বছর পরে রচিত 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' (১৩০৫) প্রবন্ধটি। অতি তরুণ বয়সেই কল্প-পৃথিবীর মায়াস্বপ্ন এই তরুণ সৌন্দর্য-সাধকের চোখে রূপের কাজল পরিয়ে দিয়েছিল—তাই তিনি এই রূপতীর্থে দুর্লভের সন্ধান করে ফিরেছেন: "এই ছবিগুলি দিয়া আমার মনের মধ্যে জগতের মায়াময়ী ছায়াপুরী রচনা করিয়াছি। বসিয়া বসিয়া দেখি, আর আমার মনের মধ্যে ইহারা জীবন্ত হইয়া উঠে, ছায়ার মত আসে যায়, বিচরণ করে। আমি ইহাদের সুখ দুঃখ বেদনার মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হই।"

'দিল্লীর চিত্রশালিকা' বলেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর আভিজাত্যমণ্ডিত কারুখচিত গদ্যরীতির বাদশাহী বিলাস অতীত পৃথিবীর ইন্দ্রজাল বর্ষণ করেছে। বলেন্দ্রনাথের মধ্যে এক অতীতচারী রোমান্টিক কবিমন ছিল, ইন্দ্রিয়সচেতন রূপানুভূতি ছিল। প্রাচীন প্রাচ্যচিত্রকলার বর্ণনায় সেই দূরাভিসারী কবিমন এক লুপ্ত পৃথিবীর বর্ণগন্ধঘন স্বপ্ন ঘনিয়ে তুলেছে। বিস্মৃতির অন্তরালে রূপময় ভারতবর্ষের কত ছবি—আর চিত্রধর্মী পেলব-মসৃণ ভাষাতেই তার অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যা ও কথাবিস্তার! কথার রসে নূতন কথা ছবি হয়ে ভেসে উঠেছে। তার সঙ্গে অতীতের ঐশ্বর্যদীপ্ত বিলুপ্তনগরীর স্মৃতিসৌরভ ধূপের মায়াবী লঘুপক্ষ বিস্তার! বলেন্দ্রনাথ ছবির কথা বলতে গিয়ে ছবি আঁকছেন—আর, লাক্ষারঞ্জিত ছাদের নীচে যে সোনার প্রদীপ থেকে লঘুস্নিগ্ধ গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল তারই চারপাশে স্বপ্নমুগ্ধ পতঙ্গের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। জনমানবহীন মহৎ রূপের কারাগারে রূপতন্ময় বলেন্দ্রনাথ যেন চিরকালের জন্য পথ হারিয়েছেন: "লাক্ষাবিলেপচিত্রিত সহস্রবর্ণের আভা-

নিস্যন্দী ছাদহর্ম্যতলে দন্তিদন্তখচিত আত্যন্তখোদিত চন্দনপাদপীঠোপরি জয়পুরী কারুকার্যময় সুবর্ণদীপাধানে সুগন্ধী স্নেহাভিষিক্ত বর্ত্তিকাশিখামুখ হইতে ধূপধূম্রগন্ধবৎ একপ্রকার লঘুস্নিগ্ধসৌরভ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে মৃদু অনুকূল মোহ সঞ্চারিত করিতে থাকিবে।" রাজকীয় বর্ণনার উপযুক্ত এই কারুখচিত রাজকীয় গদ্য! দিল্লীর চিত্রশালিকা একটি অবলম্বন মাত্র, আসল উদ্দেশ্য ছবিগুলিকে অবলম্বন করে রোমান্টিক বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতীর্থে মানসিক অভিসার। বহুকাল পূর্বের লুপ্ত জীবনচর্যার যে কয়েকটি স্থিরচিত্র চিত্রশালায় সংগৃহীত হয়েছে, তাকেই বলেন্দ্রনাথ বাসনার উত্তাপে বিগলিত করে জীবনরসসমৃদ্ধ করেছেন। 'প্রয়োগবিজ্ঞানের আমোঘ পটুত্বে'র কথা উল্লেখ করে বলেন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের অতীত গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন। অতীত ভারতের রূপময় আত্মা তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের জীবন সাধনার পূর্বাভাস বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনায় পাওয়া যায়।

চিত্রসমালোচনা বলেন্দ্রনাথের চিত্ররীতির প্রথম ধাপ এবং এই রীতির পরিণতি ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক অথবা ইতিহাস-রসাশ্রিত প্রবন্ধাবলীতে। 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র', 'খণ্ডগিরি', 'কণারক', 'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যনিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধ চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করেছে। প্রচলিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সঙ্গে এই জাতীয় রচনার একটি পার্থক্য আছে। গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তথ্য সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে একটি ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস লক্ষণীয়। সেখানে তথ্য ও যুক্তির গতি সামন্তরাল—নির্ধারিত এলাকার বাইরে তার যাত্রা নিষিদ্ধ। এই জাতীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ভাবাবেগমুক্ত বস্তুনিষ্ঠাই কাম্য। কিন্তু রসস্রষ্টার কাছে ইতিহাসের তথ্যনির্ভর বস্তু-অংশই একমাত্র সত্য নয়—"সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।" বস্তু-ছাড়া অতীত ইতিহাসের আর একটি দিক আছে—ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স রসের দিক। দূরকালের সঙ্গে স্রষ্টার আপন কালের যে ব্যবধান আছে, সেই অংশটুকুকে ভাব ও কল্পনায় পরম রমণীয় করে তোলা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সেই কালগত ব্যবধানকে বলেছেন 'চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব'।[৩০] ইতিহাস-নির্ভর রোমান্স রসের মর্ম্মমূলে এই দূরকালেরই কলধ্বনি।

৩০ "ক্লিয়োপাট্রার বিলাসকক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহার-শৃঙ্গধ্বনি তাহার সঙ্গে একই সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি ও করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" —ঐতিহাসিক উপন্যাস: সাহিত্য

বলেন্দ্রনাথ ইতিহাসের বস্তু-অংশকে গৌণ করে বিশুদ্ধ ইতিহাস-রসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি উড়িষ্যা ভ্রমণ করেছিলেন। উড়িষ্যার ঐতিহ্য, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য বলেন্দ্রনাথের মনে একটি গভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছিল। বলেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যনিষ্ঠ শিল্পীমন প্রাচীন উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করে ভাবচ্ছটার বর্ণবিচিত্র-কলাপ বিস্তার করেছে।

'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' প্রবন্ধে রূপতীর্থ উড়িষ্যার শিল্পগৌরবপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মুসলমান আক্রমণের ফলে মন্দিরে মন্দিরে দেবমূর্তি লাঞ্ছিত হলেও, মসজিদ গড়ে ওঠেনি। মন্দিরগুলির অভ্রভেদী পাষাণ-শীর্ষ অতীত গৌরবের স্মৃতি বহন করে: "সমস্ত উৎকলদেশ যেন দেবতার বিহারভূমি এবং মানবের তীর্থক্ষেত্র।" মন্দিরের দেশ উড়িষ্যার ঐতিহ্যময় পথে দাঁড়িয়ে ভাবদৃষ্টির সম্মুখে একটি রমণীয় স্মৃতিদৃশ্য জেগে ওঠে: "সম্মুখে আম্র-মুকুলিত ছায়াময় প্রাচীন পথ, কাঠজুড়ির বালুগহ্বর হইতে উঠিয়া পুরুষোত্তমের দ্বার অবধি প্রসারিত। এই পথ বাহিয়া চিরন্তন মানব-প্রবাহ নিশ্চল দেবতার দ্বারে আপন বেদনা জানাইতে আসে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী বাসন্তী নগনদী পথের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদুপ্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। দূরে মেঘের মত নীল শৈলশ্রেণী কখনও ছায়াসুপ্ত কখনও রবিকিরণে উদ্ভাসিত।"

বিজন ধাউলির পাহাড, ভুবনেশ্বরের শিল্পখচিত দেবধানী, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কণারকের সূর্যমন্দির প্রভৃতি দেবতীর্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের সঙ্গে উড়িষ্যার প্রাচীন ধর্মজীবনের কথা আলোচিত হয়েছে। এই অংশে বলেন্দ্রনাথ ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। জগন্নাথ মন্দিরে আচণ্ডাল সকলেরই অধিকার। পরকে আপন করাব ক্ষমতা এখানে সুস্পষ্ট—"কেমন দ্বিধাশূন্য মনে তিনি সুভদ্রা ও বলরামকে লইয়া বৌদ্ধ সংঘ-ধর্ম-বুদ্ধমূর্তির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন।" বলেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন: "উৎকলভূখণ্ডের সর্বত্র মতবিরোধের মধ্যে একটা নির্বিবাদ ঐক্যস্থাপনচেষ্টা দেখা যায়।" এখানে বৈষ্ণবেরাও শিবের মন্দির নির্মাণ করেছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা হয়, কণারকের সূর্যমন্দিরেও রথযাত্রার কথা শোনা যায়।

বলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাবের ফলে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হয়ে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়েছে—হিন্দুধর্ম একটি নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বলেন্দ্রনাথ একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বিষয়টি স্বচ্ছ করে তুলেছেন: "পদ্মার প্লাবনে যেমন সমস্ত আল ভাঙিয়া গিয়া ভিন্ন ভিন্ন জমির সীমানা মিশাইয়া যায়, এই ধর্মবিপ্লবে সেইরূপ উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এলাকার

ব্যবধান ভাঙিয়া গিয়া একসা হইয়া গিয়াছে—কতটুকু কাহার অধিকার, নির্ণয় করা সুকঠিন।”

তৃতীয়ত, বলেন্দ্রনাথের মনে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জেগেছে। যেখানে নীতিধর্মের এত শাসন-সংযম, সেখানে শিল্পকলায় নগ্ন শৃঙ্গার-বিলাসের অসংকোচ অভিব্যক্তি কেমন করে সম্ভব হলো? বলেন্দ্রনাথ অনুমান করেছেন যে, এই সময় বৌদ্ধধর্মের আদিম বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়েছিল। আর একটি কারণ হলো শিল্প-কলায় গ্রীকপ্রভাব। ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক কল্পনা ও গ্রীক সৌন্দর্যচর্চা—এই দুয়ের প্রভাব বৌদ্ধধর্মকে শুষ্কনীতির সিংহাসন থেকে নামিয়ে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে জনসাধারণের মনোরঞ্জন করেছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে য়ুরোপীয় ছাঁচের ‘উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবয়বা নারীমূর্তি’ দেখা যায়। বলেন্দ্রনাথ বলেছেন, “বিশেষতঃ যখন পার্বতীমূর্তির সন্নিহিত নিভৃত কোণে কলানিপুণা রমণীগণমধ্যে সহসা গ্রীসীয় লায়র যন্ত্রহস্তা নারীমূর্তি দেখা যায়, তখন চমকিয়া উঠিতে হয়—এ কি গ্রীস, না ভারতবর্ষ!”

ভুবনেশ্বরের মন্দির দর্শনের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথও বর্ণনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির প্রায় দশ বছর পরে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কবির কাছে এই মন্দির ‘পাথরের মন্ত্র’ মনে হয়েছে। কবি বলেছেন: “ইহা কোনো-একটি প্রাচীন নবযুগের মহাকাব্যের কয়েক খণ্ড ছিন্নপত্র।” মন্দিরের চিত্রগুলি কবির কাছে অশ্লীল মনে হয় নি। কবি এর মধ্যে এক অভিনব তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন—মানুষ ও দেবতার এই নৈকট্য তাঁকে বিস্মিত করেছে। তিনি বলেছেন: “এই ছবিগুলির মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমন ভাবে চলিতেছে তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিস চোখে পড়ে যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।…এখানে দেবতারা যেন একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসংকোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।”[৩১]

‘খণ্ডগিরি’ প্রবন্ধে অতীত স্মৃতির মনোরম পর্যালোচনার সঙ্গে প্রাচীন উড়িষ্যার ধর্মজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। বৌদ্ধ রাজা ও রাণীদের কীর্তিমুখরিত শিল্পপীঠে দাঁড়িয়ে বলেন্দ্রনাথ বৌদ্ধযুগের একটি বিলুপ্ত অধ্যায়কে কল্পনার মন্ত্রে সঞ্জীবিত

৩১। মন্দির: বিচিত্র প্রবন্ধ।

করেছেন। চারুশিল্পমণ্ডিত গুহাবলীর চারদিকে কত অতীতস্মৃতি—বিগতদিনের বৌদ্ধসন্ন্যাসীর গম্ভীরনাদী ত্রিশরণ মন্ত্রোচ্চারণ, গিরিপ্রাঙ্গনে সন্ধ্যাঘণ্টার নিনাদ, গুহায় গুহায় গন্ধধূপের উৎসব ;—সেদিনের মুখর শৈলশিখর প্রাণস্পন্দনে জেগে উঠেছে।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মুক্তিলাভের পথকে সহজ করে দিলেন। তাঁরা দেখলেন যে জ্ঞান সাধারণ মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। তাঁরা তাই বিধান দিলেন যে, যাজকমণ্ডলীর সামনে অপরাধ স্বীকার করলেই পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সন্ন্যাসীরা মালা-মন্ত্রেরও বিধান দিলেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানমার্গচ্যুত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগত হলো। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হলো। বৌদ্ধ মঠে হিন্দু দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত হলো, বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার রূপে পূজিত হলেন। এইভাবে একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হলো। বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষেই হিন্দুধর্মের নবজাগরণ ঘটেছিল। এইখানে বৌদ্ধধর্মের কাছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ঋণী। বলেন্দ্রনাথ খুব সংক্ষেপে ও সহজভাবে প্রাচীন উড়িষ্যার ধর্মবৈচিত্র্যের ইতিহাস শুনিয়েছেন, তিনি ইতিহাস-গবেষক বা পুরাতত্ত্ববিদ নন, কিন্তু তাঁর এই বিশ্লেষণের মধ্যে কোথায়ও অস্পষ্টতা নেই। তিনি খণ্ডগিরির গুহাবলীতে দেখেছেন 'প্রাচীন ধর্মযুগের সমাধি'।

'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রবন্ধে উড়িষ্যার বিগত দিনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে লেখক একটি সঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। বর্তমানের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হৃতগৌরব উড়িষ্যার সঙ্গে ঐশ্বর্যময় প্রাচীন উড়িষ্যার তুলনা দিতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথের ঐতিহ্য প্রীতি ও অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগই বেদনাময় ভাষায় রূপ পেয়েছে। প্রাচীন উড়িষ্যার ধর্মাচরণ, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও দৈনন্দিন জীবনচর্যা কয়েকটি স্বল্পায়ত অথচ উজ্জ্বল চিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিকল্পনা বিলুপ্ত অতীতকে প্রত্যক্ষবৎ ফুটিয়ে তুলেছে : "এখন যাহা পাষাণে খোদিত মাত্র, এক সময়ে এ সকলি জীবন্ত ছিল। কুলনারীরা প্রাসাদের নিভৃত বাতায়ন সম্মুখে বিচিত্র কারুকার্য খচিত সুখাসনোপরি উপবেশন করিয়া কেশ এলাইয়া দিতেন ; দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কেদারার মকরমুখশোভিত পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িত এবং সুন্দরী পরিচারিকা কঙ্কতিকা হস্তে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কেশের পরিচর্যা করিত। পার্শ্বে সুনির্মিত টিপায়ের উপরে পানের বাটা, সম্মুখের পাদপীঠে দুইখানি অলক্তকরঞ্জিত কোমল পদপল্লব।"

বলেন্দ্রনাথ সে যুগের দরিদ্র উৎকলবাসীর জীবনযাত্রার ছবিও এঁকেছেন। দারিদ্র্যের মধ্যেও শ্রী ও সৌন্দর্য ছিল। রাজাও পুত্রনির্বিশেষে প্রজাপালন করতেন। প্রাচীন উড়িষ্যায় সভ্যতা পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : "ব্রাহ্মণ্যের পক্ষপুটচ্ছায়ায় রাজন্যের পরিপোষণে

ধর্ম-কর্ম আচার-অনুষ্ঠান বেশভূষা শিল্পকলা পুঞ্জীভূত হইয়া কেমন একটি শান্ত সমগ্রতা লাভ করিয়াছিল। ইহাই সভ্যতা এবং প্রাচীন উড়িষ্যার ইহাই প্রধান গৌরব।” বলেন্দ্রনাথের অতীতচারী মন প্রাচীন উড়িষ্যার মহিমা উদ্‌ঘাটিত করেছে।

এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে ‘কণারক’ প্রবন্ধটিই শ্রেষ্ঠ। বলেন্দ্রনাথ যে ক’টি রচনায় তাঁর সৃষ্টিনৈপুণ্য ও গদ্যস্টাইলের চূড়ান্ত সীমায় উঠেছেন, এই প্রবন্ধটি তার অন্যতম। একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় অবলম্বন করে বলেন্দ্রনাথের মণি-মাণিক্য দীপ্ত ভাষা ইন্দ্রজাল বর্ষণ করেছে। কণারকে পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপে কোন্ এক বিলুপ্ত দিনের মায়াজাল বিস্তৃত। লেখক সেই মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছেন—কোন্ এক পুরাতন উপকথার নির্জন মহিমাতটে তাঁর তৃষাতুর দৃষ্টি যেন কিসের অনুসন্ধান করেছে। প্রাচীন উড়িষ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রবন্ধে কিছু কিছু তথ্য ও উপকরণ ছিল। ‘কণারক’ রচনাটিতে তথ্যসন্নিবেশ দূরের কথা, বস্তু-অংশকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করা হয়েছে। কণারকের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বকে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

বলেন্দ্রনাথ এই পরিত্যক্ত পাষাণমন্দিরকে এক অভিনব ভাবরূপে মণ্ডিত করেছেন। বৈরাগ্য ও বিলাসের যুগপৎ লীলা দেবতা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তরে কামনার বহ্নিশিখা পাষাণশিল্পে মুদ্রিত—নগ্ন নারীমূর্তির বিচিত্র দেহভঙ্গি এখানকার শিল্পকলার প্রধান অবলম্বন। আবার মন্দিরের মধ্যেও নর্তকীর লাস্যলীলা দেবতার মনোরঞ্জন করত। আবার সাংসারিক মায়াপাশ ছিন্ন করে কতজন এই দেবতার কাছেই সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হয়েছে। একদিকে মোহমুক্তির ব্যাকুল প্রার্থনা ও বৈরাগ্যের কঠিন শপথ, অন্যদিকে শত দীপালোকে মদনোৎসবের নিত্যলীলা! বলেন্দ্রনাথ এই আপাতবিরোধী কাহিনীকে মানবজীবনের সত্যে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন: “তাই বুঝি কবিহৃদয় তোমার মন্দির দেখিয়া মনে করে, বিশ্বসংসারেরও বহিঃপ্রাচীরে আমরা এইরূপ ভাস্কর্যের মত—আপন আপন বিচিত্র জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্বপাষাণে মুদ্রিত হইতেছি; কিন্তু বিশ্বের অন্তরে যে মহান্ দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন, এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পৌঁছে না। বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক্ হইতে আসিয়া মিশিয়াছে—শুধু এপিঠ ওপিঠ, শুধু ভিতর বাহির, শুধু দেহমন।”

প্রবন্ধ হলেও ‘কণারক’-এর অন্তঃপ্রকৃতি কাব্যের। তথ্যভারমুক্ত বলেন্দ্রনাথের সমৃদ্ধ কবিকল্পনা বিলীয়মান অতীতের অন্তঃপুরে যে বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ অংশ খুব বেশি নেই: “কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার

মত ; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবাল শয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে।”—একটি বিলীয়মান মহিমার বিস্ময়কর চিত্র।

॥ ৬ ॥

সামাজিক প্রবন্ধ

বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধগুলি তাঁর পরিণত চিন্তার ফসল। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি বাঙালীসমাজজীবনের কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তানায়কদের সমাজচিন্তার সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার একটি পার্থক্য আছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর সমাজ-জীবনের কুসংস্কার দূর করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জীবনযুদ্ধে তাঁরা ছিলেন সৈনিক, তাঁদের জীবনের একটি বৃহৎ অংশ প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যয়িত হয়েছে। সমাজ-জীবনের সেই অংশই তাঁরা দেখেছিলেন, যেখানে সে যুগের প্রধান প্রধান সমাজ-সমস্যা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বৃহত্তর সংগ্রাম ক্ষেত্রের এই সৈনিকেরা কিন্তু ঘরের দিকে মুখ ফেরানোর অবকাশ পান নি।

বলেন্দ্রনাথ যখন সামাজিক প্রবন্ধ রচনায় হাত দিলেন তখন যুগ-সংঘাতের প্রবল উন্মাদনা খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছে। রণক্লান্ত সৈনিকদের তখন ঘরে ফেরার দিন। বলেন্দ্রনাথ বাঙালীর পারিবারিক ও গৃহজীবনের মধ্যেই প্রধানত তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। বাঙালীর গৃহজীবন, পারিবারিক সম্পর্কবৈচিত্র্য, পাল-পার্ব্বণ, সামাজিক উৎসব প্রভৃতির মধ্যে যেখানেই শিব-সুন্দরের পরিচয় পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর লেখনী মুখর হয়ে উঠেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘সামাজিক প্রবন্ধ’, ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নানা সমস্যার আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি প্রধানত শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গুরুগম্ভীর উপদেশ, নীতিবাক্য ও ভাবাবেগনির্মুক্তযুক্তি প্রবন্ধাবলীকে যে পরিমাণে সারগর্ভ করেছিল, সে পরিমাণে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করে নি। তাই ভূদেবের প্রবন্ধাবলীর সাহিত্যিক মূল্য তেমন নেই। তিনি হিতবাণীকে শিল্পে পরিণত করতে পারেন নি। বলেন্দ্রনাথ সচেতনভাবে কোনো উপদেশ দেন নি, নীতি প্রচার করেন নি—তিনি যা কিছু বলেছেন তাই তাঁর শিল্পীমনের প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন:

"বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই ; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত স্বদেশীয়কে আপন ঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খঘোষও তখনও শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথার ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টি দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।"[৩২]

'বেনোজল' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ দেশীয় শিল্প ও দ্রব্যজাত সম্পর্কে স্বদেশবাসীকে অবহিত হওয়ার কথা বলেছেন। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল। বলেন্দ্রনাথ আমাদের সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। বিলাতী দ্রব্যের নাগপাশ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে চারপাশে বেঁধে রেখেছিল। বলেন্দ্রনাথ মোহমুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। বিলাতী দ্রব্যের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা সংযম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। বলেন্দ্রনাথ তাই আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন, "বসন ভূষণের চাকচিক্য কোথাও ভদ্রতার পরিচায়ক নহে, আচরণই তাহার একমাত্র পরিচয় স্থল এবং ভদ্রজনের পক্ষে যে বেশভূষায় একটি পরিপাটি সংযম প্রকাশ পায় তাহাই সর্বাপেক্ষা সুশোভন।" ইংরেজি শিক্ষার প্রবল জোয়ারে বাঙালী জীবনের মধ্যে যে মত্ততা এসেছিল, সেখানে সংযম ও শুভবুদ্ধি ছিল আচ্ছন্ন। বলেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বাঙালীকে সুভদ্র, সুসংযত ও সুশোভন জীবনের মধ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বদেশী শিল্পজাতের মহিমা বর্ণনাই এখানে বড় কথা নয়, উন্মার্গগামী রুচিবিকৃতিকে সুসংযত শালীনতার মধ্যে ফিরিয়ে আনা তার চেয়েও বড়ো কথা।

'প্রাচ্য প্রসাধন কলা' প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসাধন কলার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে প্রাচ্য প্রসাধন কলার 'নিরুদ্বেগ সহজ গার্হস্থ্য ভাব' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের চিত্র-নিপুণ লেখনী এখানে প্রাচ্য প্রসাধনকলার যে চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন, তা তাঁর কলাকুশলী মনের পরিচয় বহন করে। সংস্কৃত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্লাসিক বর্ণনাগুলির নির্যাস দিয়ে তিনি যেন একখানি তিলোত্তমা-চিত্র রচনা করেছেন।

যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে

৩২। বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর (আগস্ট ১৯০৭) ভূমিকা।

প্রসাধনের প্রতি মানবমনের গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত কবিরা প্রসাধন-কলাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান নিত্য নূতন আবিষ্কারের দ্বারা প্রসাধন অনেক বাড়িয়ে তুলেছে, কিন্তু "যে রমণীয় কুহক-সঞ্চারে নারী জাতির এই নিত্যকর্ম সেকালে কবিতার কল্পলোক লাবণ্যে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কুহক, সে মোহময়ী রমণীয়তা এ প্রসাধনশালায় কোথায়?" আধুনিক যুগের প্রাচ্য কবিরাও যখন প্রসাধন বর্ণনা করেন, তখন হয় 'পুরাতন উজ্জয়িনীর প্রাসাদবাতায়ন সম্মুখে' না হয় 'তমাল তরুচ্ছায়ানীল বৃন্দাবনের আভীরকন্যা পরিসেবিত প্রাঙ্গনে' গিয়ে দাঁড়ান। নব্যাঙ্গনাদের প্রসাধনের যত বৈচিত্র্যই থাক না কেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। এ যুগে প্রসাধনের উপকরণের অন্ত নেই, কিন্তু সেকালের প্রসাধনকলার মতো কবিকল্পনার দ্বারা বন্দিত হয় না।

আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য প্রসাধনকলার মধ্যে একটি সদা-সচেষ্ট কৃত্রিম ভাব, যত্নকৃত কলাকৌশলের অতি সচেতনতা উগ্র হয়ে ওঠে। বলেন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে বলেছেন: "ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে, সেকালে প্রসাধনকলা এখনকার মত এত গোপন ব্যাপারও ছিল না এবং তাহার মধ্যে কোনপ্রকার রহস্য ভেদাশঙ্কা না থাকায় সর্বদা আবরণরক্ষার দুশ্চিন্তাও ছিল না। নব্য পাশ্চাত্য প্রসাধনকলা সে হিসাবে সর্বদাই সতর্ক ও সন্দিগ্ধ, এবং নানা ছদ্ম আচ্ছাদনে আত্মগোপন করা তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, তাহার মধ্যে অনেক নিদারুণ দ্বন্দ্ব এবং চেষ্টা-কঠিন পীড়ন এবং নিষ্ঠুরতা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা ব্যক্ত হইলে তাহার সমস্ত সৌকুমার্য একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়।"

আমাদের অন্তঃপুরের প্রসাধনের জন্য কোনো স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সেখানে আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা অনুপস্থিত। বলেন্দ্রনাথ এই সহজ নিরুদ্বিগ্ন প্রসাধনের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেন নি, কিন্তু একটি রসোজ্জ্বল চিত্রের মাধ্যমে এই সহজ সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করেছেন: "আমাদের রমণীগণ পঙ্খকারুপিচ্ছিল হর্ম্যতলে মাদুরটি বিছাইয়া সম্মুখে দর্পণখানি স্থাপিত করিয়া কাজললতা ও সিন্দূরের কৌটা...কেশবিন্যাস সম্পাদনে নিযুক্ত হয়েন, সে স্থান প্রায়ই গতিবিধির পথপ্রান্ত হইতে প্রচ্ছন্ন নহে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বাধা হয় না।"

প্রাচ্য প্রসাধনকলার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। লোধ্ররজ তাম্বূলরাগ, কুঙ্কুমলেখা, চন্দন অনুলেপন—প্রভৃতি সমস্তই প্রকৃতির দান। পাশ্চাত্য প্রসাধন-কলার মধ্যে প্রকৃতির এই সহজ দান অনুপস্থিত। রাসায়নিক প্রক্রিয়া, ট্রেডমার্কের

ছাপ ও বিজ্ঞাপনের বৈচিত্র্যের মধ্যে 'বল্কলধারিণী বনচারিণী'কে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচ্য প্রসাধনকলার এই 'নিরুদ্বেগ সহজ গার্হস্থ্যভাব' বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি সুন্দরের কল্যাণীমূর্তিকেই বন্দনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে বলেন্দ্রনাথ প্রাচ্যনারীর প্রধান বৈচিত্র্যের এক বর্ণাঢ্য চিত্র এঁকেছেন। শব্দসম্পদে ও সমাসবদ্ধ বাগ্‌বিন্যাসের সুগম্ভীর আভিজাত্যে চিত্রটি অতুলনীয়; কালিদাসের ঋতুসংহারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়:

"কখনও হর্মতলে নিদাঘকাতর আলুলায়িত দেহযষ্টি, প্রখর রবিকরজ্বালায় স্থূল বস্ত্র পরিহার করিয়া সূক্ষ্মাম্বর পরিহিতা, কণ্ঠে লঘু মুক্তাহার, মণিবন্ধে মণিময় বলয়, শ্লথ দেহলতা মেখলাভার বহনেও অক্ষম; কখনও যেদিন ঘনঘটা করিয়া নীল মেঘ নামিয়া আসে, শিখী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, জলদ মেঘমল্লারে গম্ভীর গর্জন করে, ঘননীল চোলীখণ্ডোপরি কুসুম্ভরাগরক্ত শাটীখানি জড়াইয়া, কর্ণাট ছন্দে কবরী বাঁধিয়া, চিবুক-কুহরে কস্তুরীবিন্দুটুকু নিবদ্ধ করিয়া, বন্ধুজীব অম্বুজ এবং নীপকুসুমের মালা পরিয়া, কর্পূর চন্দন চর্চিত দেহে সীঁথি-কুণ্ডল-হার-অঙ্গদ-কঙ্কণ-কাঞ্চী-মঞ্জীর মণ্ডিতা—বর্ষার মর্মমন্দিরে যেন তাহার অধিষ্ঠাত্রী তড়িল্লতা; কখনও সুদীর্ঘ শারদ নিশান্তে কাশশুভ্রাংশুকা, অগ্রহায়ণে আপক্ক শালিশ্যামলাম্বরা, বসন্ত জ্যোৎস্নায় বকুল মাল্যভূষণা।"

'শুভ উৎসব', 'গৃহকোণ', 'নিমন্ত্রণসভা', 'শিবসুন্দর' প্রভৃতি প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ আমাদের অন্তঃপুর, পারিবারিক জীবন, সামাজিক উৎসব প্রভৃতির মধ্যে একটি তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। আমাদের সামাজিক উৎসব, সম্মেলন প্রভৃতির মধ্যে একটি ভাবাত্মক দিক ছিল। বাইরের আড়ম্বরের চেয়ে বৃহত্তর কল্যাণের দিকই ছিল মুখ্য। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে সেদিনও কোনো ভাঙন ধরে নি—অতিথির জন্য দ্বার ছিল অবারিত। তাই সেদিনের উৎসবে নিমন্ত্রণে লৌকিকতায় হৃদয়ের ভাগই প্রাধান্য লাভ করেছিল। একটি সুভদ্রসৌজন্য ও বিনয়মত্র ভাবই তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাই বর্তমান জীবনযাত্রার 'আফিসী' ছাঁচকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তাই তিনি কল্যাণী বধূদের সম্বোধন করে বলেছেন: "হে গৃহিণী, তোমার তকৃতকে গৃহপ্রাঙ্গনে পুরাতন দিনের মত আমাদিগকে আহ্বান কর এবং তুমি স্বহস্তে পাতে পাতে অন্ন পরিবেশন করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন কর। তোমার ভাণ্ডার অক্ষয় হউক, তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।"

আমাদের ব্রত-পার্বণ ও অনুষ্ঠানসমূহের কল্যাণশ্রী তাঁকে মুগ্ধ করেছে। আমাদের পুরাতন জীবনযাত্রায় ও গার্হস্থ্যচর্যায় যে স্নিগ্ধতা ছিল, তাকেই বার বার স্মরণ

করেছেন। এইভাবে আমাদের অনুকরণবিলাসী বহির্মুখী দৃষ্টিকে পরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। তাই বিলিতিভাবাপন্ন গৃহসজ্জা ও গৃহজীবন সম্পর্কে তিনি শ্লেষাত্মক মন্তব্য করতেও পশ্চাৎপদ হন নি: "সেইজন্য এই বাহুল্য-বিবর্জিত সরল সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গন হইতে আসিয়া প্রথম যখন অগণ্য কৌচ-ক্যাবিনেট্-কণ্টকিত আধুনিক কোনও নব্যতন্ত্রীর ভবনে প্রবেশ করা যায়, অনেকক্ষণ ধরিয়া কিছুই যেন ভালরূপ ঠাহর হয় না—এমন কি, বলিতে সাহস হয় না, অনেক সময় সেই অভ্যর্থনা কক্ষের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীকে দেখিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না যে, তিনি আমাদেরই একজন ভ্রমপ্রমাদসুখদুঃখমোহময়ী মানবী—না, বিলাতী সাহেবের অদৃশ্য-তার-বিলম্বিত কোনরূপ আশ্চর্য কলের পুতুল।" অবশ্য আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্কোচন ও ভাঙনের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণ বিশ্লেষণ করেন নি। পুরনো দিন আর ফিরবে না, অথচ নূতন কালের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নূতন কাঠামোর ইঙ্গিতও তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। কিন্তু দেশ জাতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যবোধ ও জাতীয় আদর্শের প্রতি প্রীতিবোধ বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনাকে এমন একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে যা বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ।

বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার অধিকাংশই তাঁর শেষজীবনে লেখা। এই সময় বলেন্দ্রনাথের নন্দন-স্বপ্ন একটি বৃহত্তর পরিণতির দিকে চলেছিল। প্রথম দিকের সংস্কৃত-সাহিত্য-সমালোচনা ও শিল্পকলা আলোচনার মধ্যে একটি নন্দন-স্বপ্নবিলাস ছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপনিষ্ঠ সৌন্দর্যমুগ্ধতা একটি সুখচারী বাসনার মতোই আত্মবিহ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরিণত মন সেই রূপের রঙ্‌মহলেই পরিতৃপ্তি লাভ করে নি। তাই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচর্চাকেও সম্ভবত একসময় তাঁর অপূর্ণ বলেই মনে হয়েছিল—তাই সৌন্দর্যের সঙ্গে শুভবোধ ও কল্যাণী শক্তিকেও তিনি অনুভব করেছেন। 'শিবসুন্দর' প্রবন্ধটিতে[৩৩] বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য চেতনার পরিণত-তম আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধের প্রথমেই বলেন্দ্রনাথ বলেছেন: "আমাদের মনে সৌন্দর্যের সহিত সর্বত্রই একটি শুভভাব বিজড়িত। সুন্দরীর রূপ-বর্ণনায় এইজন্য আমরা কথায় কথায় লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার উপমা দিয়া থাকি, যাহাতে

৩৩। 'শিবসুন্দর' প্রবন্ধটির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের হাত আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "রবি বর্মার চিত্রশিল্প ও লাহোরের বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে যে প্রবন্ধটি তিনি প্রদীপের জন্য লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহাকেই কথঞ্চিৎ সম্পূর্ণ করিয়া শিবসুন্দর নাম দিয়া পরে প্রকাশ করা গেল।"—বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। (প্রদীপ: আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬)

তাঁহার কল্যাণীমূর্তিখানিই আমাদের অন্তরে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রূপের দাহিকাশক্তি নিতান্ত প্রবল না হয়।" বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন ভারতীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই মঙ্গল ও সুন্দর একার্থক: "আমাদের ভাষায় যেমন শুভ ও শোভা শব্দের একই ধাতু, তেমনি ভারতবর্ষীয়ের মনের মধ্যেও মঙ্গল ও সুন্দর একত্র মিশিয়া আছে।"

সৌন্দর্যের পরিণতি প্রশান্ত-মধুর কল্যাণে, মঙ্গল ও শুভবোধের দীপ্তিতে। সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণ যুক্ত হওয়াতে পারিবারিক ও গৃহজীবনের প্রাঙ্গনে তাকে সহজেই পাওয়া যায়। ভারত সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে এর মূল্য কম নয়। বলেন্দ্রনাথের সুন্দর সুধারূপিণী—'সুধাপাত্র' ও 'বিষভাণ্ডের' দ্বন্দ্ব তার কবিচরিতে অনুপস্থিত।[৩৪] আবার বলেন্দ্রনাথ কীটস্‌ধর্মী হয়েও কীটস্ নন। কীট্‌সীয় সৌন্দর্যদৃষ্টি যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। সুন্দর সেখানে সত্যসন্ধ। তাই তিনি সুন্দরের একটি গভীর তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত মন্তব্যটিকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়: 'The excellence of every art is its intensity' capable of making all disagreeables evaporate from their being in close relationship to Beauty and Truth.' সৌন্দর্য প্রত্যয়ের এমন গভীর দর্শন বলেন্দ্রনাথের ছিল না। যার মধ্যে কল্যাণ নেই, তাকে তিনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই এক সময় সৌন্দর্যকৈবল্যের উপরে আরো কিছু চেয়েছিলেন। সে চাওয়া বোদলেয়ারের মতো বিষপুষ্পের অনুসন্ধান নয়, আপাত-অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের লীলাচিত্রণ নয়, সে চাওয়া শিব-সুন্দরের অদ্বৈত সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত।

৩৪। বলেন্দ্রনাথ নিজেই একটি কবিতায় বলেছেন:

আমি নহি নীলকণ্ঠ, নাহিক সে ক্ষুধা
নিতে পারি যাহে বিষে সুধাসম করি,
হে সুন্দরী, তাই সদা ডরি মনে মনে
কি জানি গরল উঠে অমৃত মন্থনে।

—আশঙ্কা: মাধবিকা

॥ ৭ ॥

বর্ণনামূলক ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ

বলেন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'পার্সোনাল এসে' জাতায় এই প্রবন্ধের স্বরূপধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন : "অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে-রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে সে রাস্তা বাঁধা ; কাজের কথা যে-পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে, সে-পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।...এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝল্‌মল্‌ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহার কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশ্যক হয় না।"[৩৫] এই শ্রেণীর রচনার স্বরূপধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে সব কথাই বলেছেন।

বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়মুখ্য প্রবন্ধে বিষয়ের সতর্ক-শাসন মেনে চলতে হয়। বস্তুর গুরুত্ব সেখানে অনেকখানি। যুক্তি তর্ক ও বিচারের দ্বারা বিষয়কেই সেখানে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রবন্ধের বন্ধনের দিকটিও সেখানে লক্ষ্য রাখতে হয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে বিষয় অপেক্ষাকৃত গৌণ, রচয়িতার আত্মপ্রকাশই মুখ্য। সামান্য কোনো বিষয়কে ঘিরে রচয়িতার মন প্রকাশের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তথাকথিত বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের তুলনায় এই জাতীয় রচনার যুক্তিনিষ্ঠা ও বিশ্লেষণধর্মিতা নেই বললেই চলে, কিন্তু তার অভাব পূরণ করে রচয়িতার ব্যক্তিরসের আস্বাদন। কবি বলেছেন : "ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনা-রস সম্ভোগে।"[৩৬] ইংরেজ সমালোচকগণ 'formal' ও 'familiar' ভেদে দু' জাতীয় রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। গদ্য রচনার এই শেষোক্ত ধারাটি রবীন্দ্রনাথের হাতে বিচিত্রলীলায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

Formal প্রবন্ধের তথাকথিত বন্ধন থেকে Familiar প্রবন্ধ অনেকখানি মুক্ত হলেও এই শ্রেণীর রচনার জন্য প্রয়োজন উচ্চাঙ্গের শিল্প কৌশল। হ্যাজলিট্‌ বলেছেন :

৩৫। বাজে কথা : বিচিত্র প্রবন্ধ।

৩৬। বিচিত্র প্রবন্ধের ভূমিকা।

"It is not easy to write a familar style. Many people mistake a familiar for a vulgar style, and suppose that to write without affection is to write at random. On the contray, there is nothing that requires more precision, and, if I may so say. purity of expression, than the style I am speaking of."[৩৭] প্রমথ চৌধুরী এই জাতীয় লেখার নাম দিয়েছেন 'খেয়াল খাতা'। তিনি বলেছেন: "খেয়ালীলেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদ্‌খেয়ালী লোকেরও কিছু কম্‌তি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকেরই বড়ই অভাব।···কিন্তু খেয়ালের স্বাধীনভাব উচ্ছৃঙ্খল হলেও যথেচ্ছাচারী নয়। খেয়ালী যতই কর্দানী করুক না কেন, তালচ্যুত কিম্বা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই।"[৩৮]

'বসন্তের কথা', 'আষাঢ়ে গল্প', 'আষাঢ় ও শ্রাবণ'—রচনা তিনটি প্রধানত ঋতু-রূপকে আশ্রয় করে লেখা হয়েছে, কিন্তু ঋতুবর্ণনামূলক বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ নয়। রচনাগুলির মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রচনাগুলির মধ্যে চিত্ররীতি ও সঙ্গীতরীতির সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। খুব সহজেই রসিকের মন নিয়ে বলেন্দ্র-নাথ বসন্ত প্রকৃতির ভাবরূপের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। বসন্তের কবিতাপ্রসঙ্গে তাঁর জয়দেবের কথা মনে হয়েছে। বর্ষা ও বসন্তের তুলনা করতে গিয়ে লেখক নূতন রূপ সৃষ্টি করেছেন: "বসন্তের কবিতায় মৃদুস্পর্শনের ভাব অনেকটা প্রকাশ পায়। কিন্তু সে ভাব অন্তঃসলিলা নদীর মত হৃদয়ে বহিতে থাকে। বর্ষার ভাব অন্তঃসলিলা নহে বটে—বসন্তের মত স্থায়ীও নহে।···বর্ষার ছন্দ মহাকাব্য রচনার উপযোগী। বসন্তের ছন্দ গীতিকাব্যেরই উপযুক্ত।"

'আষাঢ়ে গল্প' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এ-কে রীতিমতো সমালোচনা বলা চলেনা। গুরুগম্ভীর ভঙ্গি বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য, কোনোটিই এখানে নেই। খেয়াল-খুশীর আনন্দে লেখক এখানে আলাপের ছলে যা বলেছেন, তার মূল্য কম নয়। তিনি স্বল্প উপকরণে ও লঘুভঙ্গিতে আষাঢ়ে গল্পের স্বরূপধর্মকে চমৎকার ভাবে উদ্ভাসিত করেছেন: "আষাঢ়ে গল্পে সম্ভব অসম্ভব এক হইয়া গিয়াছে—একীকরণের চূড়ান্ত উদাহরণ। প্রতি মুহূর্তেই ষোড়শী রূপসী মরা বরের সহিত মালাবদল করিতেছে, সাতটি ভাই সাতটি চাঁপা হইয়া ফুটিতেছে; কেহ আপত্তি করে না। অধ্যায়ের পর

৩৭। On Familiar Style: Table-Talk.

৩৮। খেয়াল খাতা: বীরবলের হালখাতা।

অধ্যায়, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ নাই—ঔপন্যাসিক কমা সেমিকোলনেরও সম্পর্ক-শূন্য। অন্তিমে মৃত্যুর চিত্র থাকিলেও আষাঢ়ে গল্পে ট্র্যাজেডি হইতে পারে না।" 'আষাঢ় ও শ্রাবণ' রচনাটিতে আত্মভাবমুগ্ধ কবিহৃদয় খুব সহজেই আষাঢ় ও শ্রাবণের অন্তঃপ্রকৃতির পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছে। কাব্যবর্ণিত এই দুটি মাসের বর্ণনায় লেখকের মধ্যে একটি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কবিমনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবি উদ্ধব দাসের দুটি পদের তুলনা দিয়ে লেখক যে সুরসিক মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য : "আষাঢ়ের দুঃখ গভীর বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু আশা আছে। শ্রাবণে কেবলই অন্ধকার ঘনাইতেছে—কোথায় আশা কোথায় ভরসা! আষাঢ়ে মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার কথা মনে করিতে পারা যায়—মনে হয়, এমনিতর মেঘের মতো সে-ও যদি আসে। শ্রাবণে সব একেবারে স্তম্ভিত।"

বলেন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনায় জীবনের দু'একটি নিগূঢ় ভাববৃত্তি বা মার্মিক অবস্থার অন্তরঙ্গ অথচ গভীর সুরের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান সঙ্কলনটিতে 'ক্ষণিক শূন্যতা' ও 'অশ্রুজল' এইজাতীয় রচনার অন্তর্গত। 'ক্ষণিক শূন্যতা' সম্পর্কে তিনি গুরুগম্ভীর দার্শনিক প্রবন্ধ লিখতে বসেন নি। কিন্তু জীবনে ক্ষণিক শূন্যতারও যে একটি প্রয়োজনীয়তা আছে তা তিনি নিবিড়ভাবেই উপলব্ধি করেছেন : "এই ক্ষণিক শূন্যতা নহিলে কিন্তু চলে না। ইহার মধ্যে জীবনের ধারাবাহিকতা প্রচ্ছন্ন। সমগ্র জীবনের ঘটনার শৃঙ্খলা অনুভব করিতে হইলে কয়েক মুহূর্ত ত অবসর চাই। নহিলে গুছাইয়া লওয়া বড় দুরূহ।...বাস্তবিক, দীর্ঘজীবনে মধ্যে মধ্যে শূন্যতাই তাহার ভাবের একতা বজায় রাখিয়াছে। শূন্যতার জন্য আমরা জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করিতে সমর্থ হই।" 'অশ্রুজল' রচনার মধ্যে বলেন্দ্রনাথের ভাবুকচিত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। "অশ্রুজল হৃদয়ের নীরব ভাষা।" কিন্তু অভিমান, অনুতাপ, হৃদয়ের সুগভীর বেদনা ও প্রেমের—অশ্রুর বিচিত্রলীলার কথা তিনি শুনিয়েছেন। রচনাভঙ্গি কত সরস ও অন্তরঙ্গ। কালীপ্রসন্ন ঘোষের রচনার মতো (অশ্রু : প্রভাত-চিন্তা) উচ্ছ্বাসের আতিশয্য, নীতি ও পাণ্ডিত্যের ভার এখানে অনুপস্থিত।

'বোল্‌তা', 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন'—আসলে একটি রচনারই দুটি অংশ। প্রথমটিতে লেখকের বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় নি সেই জন্যই পরবর্তী রচনাটির অবতারণা। রচনা দুটি বোল্‌তার আত্মকাহিনীর মাধ্যমে রচিত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথ বোল্‌তার বক্তব্যের সঙ্গে নিজের হৃদয়ের অংশ যুক্ত করেছেন। বোল্‌তার বিড়ম্বিত জীবনে প্রেম ও সৌন্দর্যের জন্য ব্যাকুল তৃষ্ণা ফুটে উঠেছে : "তোমরা কেবল আমার বাহিরের কনক-কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হও, অন্তরের গভীর জ্বালা বুঝ না।" দ্বিতীয় রচনাটিতে বোল্‌তার

বিস্তৃততর হৃদয়াবেগের মাধ্যমে বলেন্দ্রনাথের সংবেদনশীল কবিহৃদয় নিজেকে অধিকতর প্রকাশ করেছে। বোল্‌তা প্রেমের তীব্রতা ও দহনশীলতার উপাসক, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য তেমন কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি: কোনও কোনও কবি মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে ছায়ায় দাঁড়াইয়া।" বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় রচনায় হাত দিয়েছিলেন; আপাত দৃষ্টিতে যা অত্যন্ত সাধারণ তাকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'বৃষ্টি' রচনাটির কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানেও বৃষ্টির উক্তির মাধ্যমেই তিনি সুন্দর একটি কথাকাব্য রচনা করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ 'বসন্তের কোকিল' জাতীয় রচনার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকচিত্তের অন্তরঙ্গ স্পর্শ পাওয়া যায়। আসলে এই শ্রেণীর রচনার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, রচয়িতার রসিকচিত্তের মৃদুস্পন্দনগুলি লক্ষ্য করা যায়।

'পুরাতন চিঠি' ও 'জানালার ধারে' রচনা দুটি বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জাতীয় রচনার মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই দুটি রচনার বক্তব্য সামান্যই, প্রায় কিছু নেই বললেই হয়, কিন্তু লেখকের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতিতে সামান্যই অসামান্য হয়ে ওঠে। ছোট্ট একটু ঘর, আসবাবপত্রও সামান্যই, সামনের ডেস্কে লেখার সরঞ্জাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে শুধু চেয়ে থাকা—কোলের উপর অস্পষ্ট চন্দ্রালোক। বাইরের পৃথিবীর সুখ-দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মনের সঙ্গে তিনি খেলা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের আত্মমগ্ন নিভৃতচিত্ত কত নিবিড়ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে: "আমি কেবলি জানালার ধারে বসিয়া দেখি আর অনুভব করি। রজতপ্লাবিত নীল আকাশ, জ্যোৎস্নাবগুণ্ঠিতা নিশীথিনী, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ব্যাপিয়া এক অনন্ত জ্যোৎস্নালোক, আমার এই ঘরে শুধু চঞ্চল আলোকবিস্তারের পার্শ্বে সুখসুপ্ত নিভৃত ছায়া। সীমাহীন ছায়াহীন বাহিরের অগাধ রূপরাশি আমাকে বাহিরে টানে, গৃহ হইতে জগতে লইয়া যাইতে চায়, আমার গৃহকোণে এই নিভৃত মলিন ছায়া ম্লান নীরব কাতরতায় আমাকে বাঁধিয়া রাখে। আমি সংসারের সুখের মাঝে বাহির হই না, এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পার্শ্বে এমনি বসিয়া থাকি, মানবহৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করি।"—ইংরেজ কবি বর্ণিত "Sad music of the humanity" বলেন্দ্রনাথের কাছে অনায়াস-আয়ত্ত—এত গভীর তাঁর অনুভবশক্তি।

'পুরাতন চিঠি' রচনাটিতে ব্যক্তি বলেন্দ্রনাথ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। পুরাতন চিঠির এক জাতীয় রস আছে—সে রস পুরাতনের রসও বটে, আবার পত্রলেখকের হৃদয়ের রসও বটে। পুরাতন চিঠির কালির ঈষৎ ম্লান রেখায় বহু স্নেহ-

সখ্যের নিদর্শন থাকে। চিঠিগুলির প্রতি অপরিসীম মায়া ও স্নেহাসক্তি রচনাটির মধ্যে স্বতোৎসারিত—কর্মবিরল মুহূর্তের নিভৃত আস্বাদনকে পরিতৃপ্ত করে। চিঠির মধ্যে ব্যক্তিত্বের আস্বাদন থাকে—সেই বন্ধু-ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ একটি বিরল ভাবুকতা এই স্বল্পায়ত রচনাটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বলেন্দ্রনাথের স্মৃতি-সচেতন মনের পরিচয় তাঁর ঐতিহাসিক স্মৃতি পরিবেশনের মধ্যে আছে, কিন্তু সে পরিচয় স্মৃতিচারণার রাজপথ, গরিমাময় ঐতিহাসিক পথ। 'পুরাতন চিঠি' প্রাচীন উড়িষ্যার কোনো শিল্পকীর্তির স্মৃতিচারণা নয়, দিল্লীর চিত্রশালিকার বর্ণাঢ্য রূপচিত্র নয়—এখানে এ শ্রেণীর কোনো রাজকীয় উপকরণের প্রয়োজন নেই, বন্ধুজনের পুরাতন চিঠির বিবর্ণ পাতাগুলিই যথেষ্ট। এগুলি যেন স্মৃতির প্রায়ান্ধকার গলি-পথ। কিন্তু তার মূল্যও কি কম? ঘরের দেয়ালে বহুদিনের আঁকা একটি অসমাপ্ত ছবি আছে। যে পেন্সিলে বন্ধু ছবিটি এঁকেছিল, পুরাতন চিঠির সঙ্গেই তিনি তা যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। সব কিছু তুচ্ছ আজ অসামান্য গৌরবে উদ্ভাসিত: "আমি বর্তমান শ্রান্ত পথিক, মধ্যে মধ্যে এই পুরাতন স্নেহে শান্তিলাভ করিতে আসি। চুপিচাপি আমার শৈবালাচ্ছন্ন অতীতের সমাধি মন্দিরে গিয়া একা একা বসিয়া থাকি। একটি পেন্সিলের দাগে, দুইটি পুরাতন পরিচিত হাতের অক্ষরে আমার সমস্ত পুরাতন—আমার সমস্ত অতীত।"

॥ ৮ ॥

বিবিধ প্রবন্ধ

বর্তমান সঙ্কলন গ্রন্থের অন্তর্গত 'জীবন-ট্রাজেডি', 'স্মৃতি ও কবিতা' এবং 'স্বভাব ও সাহিত্য' প্রবন্ধ তিনটিকে কাব্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সম্পর্কিত রচনা বলা যায়। বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনাগুলি পাণ্ডিত্য ও পরিভাষা কণ্টকিত নয়। 'জীবন-ট্রাজেডি' রচনাটির মধ্যে লেখকের মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। ট্রাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে অনেকের ধারণা মৃত্যু ট্রাজেডি। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ এই মতকে স্বীকার করেন নি: "উপসংহারেই ত কাব্য বুঝা যায় না—গঠন দেখিয়াই ট্রাজেডি কি না বলা যায়।…বিরহ মাত্রই ট্রাজেডি নহে, বিরহ বিশেষ ট্রাজেডি।…একটি সূক্ষ্ম সূত্রের উপরে ট্রাজেডি নির্ভর করে। মিলন হোক, বিরহই হোক, তাহার ভিতরে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত একটি ভাব বহিয়া চলিয়াছে।" এ সম্পর্কে খ্যাতনামা নাট্য সমালোচক নিকোল বলেছেন: "Indeed, we might say that

death never really matters in a tragedy···tragedy assumes that death is inevitable and that its coming is of no importance compared with what a man does before his death."[৩৯] বলেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন যে বিরহমাত্রেই ট্রাজেডি হয় না এবং ট্রাজেডির নির্ণয়ের পক্ষে মিলন বা বিরহ বড়ো কথা নয়। বলেন্দ্রনাথ বলেছেন : "মিলন হইলেও ট্রাজেডি অবশ্য থাকিতে পারে, দুই চারিজনের মৃত্যুতেও ট্রাজেডি না হইতে পারে।"

হাস্যরস ও প্রহসন সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের উক্তিও উল্লেখযোগ্য : "হাস্যরস যে ট্রাজেডিতে থাকিতেই পারে না, এমন কোন আইন নাই।···প্রহসনের মধ্যে অনেক সময় ট্রাজেডি ঘুমাইয়া থাকে।···বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্যবিহীন কতকগুলা বিদ্বেষপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি প্রহসন নহে। কিন্তু প্রহসন অবশ্য ট্রাজেডিও নহে, তবে অনেক সময় ট্রাজেডির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বটে।" হাস্যরস ট্রাজেডিকে অনেক সময় বিশদ করে তোলে। প্রহসনের মধ্যেও যে ট্রাজিক উপাদান থাকে, দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'জীবন-ট্রাজেডি' প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে প্রবন্ধটি দুর্বল। লেখকের বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়, তা ছাড়া এমন মন্তব্য আছে, যা পরস্পরবিরোধী। ট্রাজেডি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা করেছেন, তা না করলে ভালো হতো।

'স্বভাব ও সাহিত্য' প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক প্রকৃতির সঙ্গে সাহিত্যের গভীর যোগের কথা বলেছেন। রহস্যময় প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করে মানব তার প্রবহমান আনন্দস্রোত নিজের হৃদয়ে অনুভব করে, প্রকৃতির ভাষাকেই সে ব্যক্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু একথাও ঠিক যে সাহিত্যের ক্ষেত্র 'জ্যোৎস্না, আকাশ, নদী, সমুদ্র এবং রৌদ্রতপ্ত ধরণীর মধ্যে' সীমাবদ্ধ নয়। বলেন্দ্রনাথ এখানে মানবহৃদয়ের কথাও বলেছেন। মানুষের রহস্য-জটিল জীবন সাহিত্যের উপজীব্য, বলেন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের 'স্বভাব' ব্যক্ত হয় সমালোচনার মাধ্যমে। সমালোচনা সম্পর্কে লেখক একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। দুই শ্রেণীর সমালোচকের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন ? "একজন সমালোচক পাঠককে খুঁটিনাটি আচ্ছন্ন না করিয়া, কিছু না বলিয়া কহিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে প্রকৃতির হৃদয়ের মধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেন, পাঠক ভাব অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠেন। আর এক ব্যক্তি তন্ন তন্ন খুঁটিনাটি

৩৯। The Theory of Drama (1937): Nicoll. Page 124.

বিশ্লেষণ দ্বারা ভাব পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পান।” বলাবাহুল্য বলেন্দ্রনাথ এখানে ‘সামগ্রিক সমালোচনা’ ও ‘বিশ্লেষণী সমালোচনা’র কথাই উল্লেখ করেছেন।

সুকবির রচনার বৈশিষ্ট্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন করে কবির বিমুগ্ধতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি সাহিত্য সম্পর্কে যে সাধারণ মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য: “ভাবের পূর্ণতাই বোধ করি স্বাভাবিকতার লক্ষণ। পূর্ণতার মধ্যে সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে। ভাববিশেষকে যেমন তেমনি ফুটাইতে পারিলেই সাহিত্যে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়। দুরূহ দুর্বোধ্য শব্দাম্বুধিমথিত কথা-সমূহে ভাব চাপা পড়িয়া না যায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পদে, প্রত্যেক কথায় বক্তব্য ভাব যেমন ফুটিয়া উঠিবে, সাহিত্য স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে।” আলোচ্য প্রবন্ধের অংশ বিশেষে লেখকের সূক্ষ্ম রসদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেলেও, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের তালিকা বলে মনে হয়—সমগ্রতার অত্যন্ত অভাব। তার প্রধান কারণ, ‘স্বভাব’ শব্দটিকে লেখক অত্যন্ত শিথিলভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রবন্ধের এক-একটি অংশে ‘স্বভাব’ শব্দটিকে এক-একটি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে প্রবন্ধটির বক্তব্য অস্পষ্ট ও ভাসা-ভাসা—কোনো গভীর বক্তব্যের স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না।

এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে ‘স্মৃতি ও কবিতা’ সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, মৌলিকতায় ও মননশীলতায় প্রবন্ধটিকে বলেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যায়। এখানে তিনি কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তথাকথিত পাণ্ডিত্য ভারাক্রান্ত ‘অ্যাকাডেমিক’ প্রবন্ধের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। কাব্যরসিক ও শিল্পী বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধিই রচনাটিকে রমণীয় করে তুলেছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে কবির সামগ্রিক দৃষ্টির পার্থক্যের কথা দিয়েই তিনি প্রবন্ধ শুরু করেছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি সূত্রাকারে যা বলেছেন, তার মধ্যে চিন্তার অনেক খোরাক আছে। প্রবন্ধটিকে সূত্রাকারে সাজালে মোটামুটি এই রকম দাঁড়ায়:

(ক) ‘স্মৃতির মন্দিরেই কবিতার প্রতিষ্ঠা।’ (খ) ‘চিত্রে বস্তুর ছায়া থাকে, কবিতায় ছায়াও থাকে না—যাহা থাকে, আবছায়া।’ (গ) ‘বস্তুর মধ্যে যে অশরীরী প্রাণ আছে তাহা ব্যক্ত করিয়া তুলাই যথার্থ কবির কাজ।’ (ঘ) ‘কবির মনে স্মৃতিই প্রথম কবিতা রচনা করে।’ (ঙ) ‘উচ্ছ্বাসকে আপন অধীনে আনিতে পারিলে তখনই ভাবা ব্যক্ত করা যায়।’ (চ) ‘কবিতা স্মৃতির অভিব্যক্তি। স্মৃতির অভিব্যক্তি মাত্রই কিন্তু কবিতা নহে।’

স্মৃতির সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় করাই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সূত্র

ধরে কবি কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি গভীর বিষয় আলোচনা করেছেন। বাস্তব থেকে কবি উপাদান সংগ্রহ করেন, কিন্তু ঐ বস্তু-অংশই কবিতা নয়, বস্তু যখন স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়, তখনি কাব্যের অভিব্যক্তি ঘটে। হৃদয় যখন ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে, তখন সেই চাঞ্চল্যের মধ্যে কবিতার জন্ম সম্ভব নয়। হৃদয়ের সেই উদ্বেলতা যখন সংযত হয়ে একটি বিশেষ ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করে, একমাত্র তখনি কবিতার জন্ম হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন : "Poetry takes its origin from emotion recollected into tranquility." বলেন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'স্মৃতি'র মধ্যে এই 'tranquility'-র ভাবটি পরিস্ফুট। প্রথম শ্রেণীর কবিকল্পনার মধ্যে গভীর সংযম থাকে। অনিয়ন্ত্রিত অসংযত কল্পনার দ্বারা কখনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। উচ্চতর সৃজনী কল্পনার মধ্যে এক গভীর ধ্যানশীলতা থাকে।

স্মৃতির আর একটি প্রসঙ্গও বলেন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন : "বস্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য থাকে, ততক্ষণ তাহা হৃদয়ে তেমন মিশাইতে পারে না।" বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ভাবসৃষ্টির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে, তাই ইন্দ্রিয় অতিক্রম করে যখন তা ভাবের মধ্যে প্রবেশ করে তখনি কাব্যের অভিব্যক্তি ঘটে। বলেন্দ্রনাথ স্মৃতির কথা বলেছেন বটে, কিন্তু স্মৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তা যে কিরূপে কাব্যে পরিণত হয়, সে কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। অলঙ্কার শাস্ত্রানুমোদিত 'রসাত্মক বাক্য' সংজ্ঞাটিকেও তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করেননি। মনে হয় এই সংজ্ঞাটিকে তিনি সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। রস সম্পর্কে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা অনেক গভীরে প্রবেশ করেছেন, বলেন্দ্রনাথ সেখানে তাঁর বক্তব্যের একটি সুপরিণত রূপ লক্ষ্য করতে পারতেন। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের এই সূত্র-সংক্ষিপ্ত রচনাটির মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না, এর এক একটি মন্তব্য চমৎকৃত করে।

'ইংরাজি বনাম বাঙ্গালা' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রস্তাব করেছেন। তিনি মাতৃভাষার স্বপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বলেন্দ্রনাথ যে সময় প্রবন্ধটি লেখেন (১২৯৯) তখন এ সম্পর্কে খুব বেশী আলোচনা হয়নি। সুতরাং বলেন্দ্রনাথের চিন্তা ও বিশ্লেষণের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। কোনো কোনো সমালোচকের মতে বাংলা ভাষাকে কেবলমাত্র 'ঘরকন্নার কাজে লাগিয়ে' সাহিত্য ও উচ্চতর জ্ঞানালোচনা ইংরেজিতেই করা উচিত। এর বিরুদ্ধে বলেন্দ্রনাথের যুক্তি হলো এই যে, জনসাধারণ ইংরেজি ভাষা জানে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে সংস্কৃতভাষা শিক্ষিতদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সাধারণ লোকের সহিত সংস্কৃত ভাষার তেমন সম্পর্ক ছিল না। বুদ্ধদেব যখন সর্বসাধারণকে আহ্বান

করলেন, তখন তাঁকে সংস্কৃত ভাষা ছেড়ে পালি ভাষার আশ্রয় নিতে হলো। সর্বসাধারণের মধ্যে তাই বৌদ্ধ ধর্মের এতো দ্রুত প্রচার হলো। চৈতন্যদেবও যখন প্রেমধর্ম প্রচার করলেন, তখন তিনি তাঁর মাতৃভাষায় আহ্বান করলেন। কারণ "প্রেমের ভাষা আমাদের মাতৃভাষা—মাতৃস্তন্যের সহিত প্রতিদিন যাহা পান করিয়া পিতৃ-পিতামহক্রমে আমরা বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছি।"

ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছে। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যখন বাংলাভাষাকে গ্রাম্য বলে উপেক্ষা করতেন, তখন ইংরেজি শিক্ষিতেরাই বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে বাংলাভাষার উন্নতিসাধন করেন। দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভাষার প্রভাব ততই কমে যাবে। মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই জাতীয় জীবনের বিকাশ ঘটে। ফরাসী প্রভাব-বর্জিত জার্মান ভাষা, ল্যাটিন প্রভাব-মুক্ত ফরাসী ও স্পেনের ভাষার উদাহরণ দিয়ে বলেন্দ্রনাথ বক্তব্যটিকে পরিস্ফুট করেছেন। একটি কৌতুকরসোজ্জ্বল মন্তব্যের সাহায্যে বলেন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির উপসংহার করেছেন: "বিবাহের পূর্বে বাঙ্গলা বই কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিতে রাজি না হইলেও গৃহিণীর শুভাগমন হইতে অনেক ইংরাজিনবীশের বাঙ্গলা গ্রন্থের সহিত পরিচয়ও সাধিত হয়।"

'নীতিগ্রন্থ' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ নীতিগ্রন্থগুলির ত্রুটি ও যথার্থ নীতিশিক্ষা কিভাবে সম্পন্ন হতে পারে, এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শিশুকে জোর করে নীতিকথা শেখানোর চেষ্টা 'আর শোলার পাখীকে হরিনাম পড়ানো'ও একই ব্যাপার। তার কারণ নীতির মূল্য প্রয়োগগত। যতক্ষণ নীতি কার্যে পরিণত করার উপযোগী না হয়, ততক্ষণ এর কোনো মূল্যই থাকে না। নীতিকে জীবনে প্রয়োগ করতে হলে তাকে শুধু জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেই হবে না, তাকে ভাবের বিষয়ে পরিণত করতে হবে। কারণ "পুরাতন জ্ঞানের কথাকে যতবার পুনরুক্ত করিবে, ততই সে পুরাতনতর জীর্ণতর হইয়া উঠিবে—কিন্তু ভাবকে যতই অনুভব করাইবে, ততই সে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে।" নীতিকথাকে উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করাতে পারে সাহিত্য। কিন্তু নীতিকথা রচনা করা যত সহজ, সাহিত্য রচনা করা তত সহজ নয়।

পারিবারিক জীবনের বিচিত্র সম্পর্কের মধ্য দিয়েই যথার্থ নীতিশিক্ষা হয়। কিন্তু শাস্ত্রশাসন, গুরুমন্ত্র, চটি বইয়ের প্রবল প্রতাপে প্রীতিহীন কৃত্রিমতাই বড়ো হয়ে ওঠে। গৃহজীবনের প্রভাব বর্তমান যুগে ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছে। সুতরাং নূতন উপায় উদ্ভাবন না করলে নীতিরক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ একটি

সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন: "এখন আমাদের পুরাতন গৃহের মধ্যে নূতন দরজা জানালা কাটিয়া তাহার অন্তরে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা এবং বাহিরের সহিত যোগসাধন করিতে হইবে। কতকগুলি পারিবারিক পুত্তলি প্রস্তুত না করিয়া স্বাধীন এবং জীবনপূর্ণ মানুষ গড়িতে হইবে।" বলা বাহুল্য, বলেন্দ্রনাথ সময়োচিত সিদ্ধান্তই করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে নীতি উপদেশ অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠেছিল। বলেন্দ্রনাথ যে শুধু রসের চর্চাই বলেছেন তাই নয়, তিনি মানসিক ঔদার্যেরও পরিচয় দিয়েছেন।

'মত্ততা সুখ' প্রবন্ধেও লেখক চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। মত্ততার মধ্যে মানুষ এক জাতীয় আনন্দ অনুভব করে। মত্ততার মধ্যে উচ্চকণ্ঠ কোলাহল ও লম্ফঝম্প থাকে। কিন্তু এই মত্ততার একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া আছে—প্রবল মত্ততার পরেই শারীরিক ও মানসিক অবসাদ হয়। মত্ততার মধ্যে সংযমের অভাব থাকে। সেইজন্য মত্ততার মধ্য দিয়ে কোনো মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না। বলেন্দ্রনাথের মতে মত্ততা সুখকে সংযত করার একমাত্র উপায় আত্মবিশ্লেষণ, আত্মবিশ্লেষণ সংযমের সহায়তা করে। বলেন্দ্রনাথ কত সহজে নৈতিক জীবনের পথনির্দেশ করেছেন! উপদেশবাক্যের তর্জনীসঙ্কেত এখানে অনুপস্থিত। তাই নীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলি এখানে রসের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

'প্রেম: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রকৃত পক্ষে দুটি প্রবন্ধের সংযোজন। প্রথম প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রেমের তুলনায় প্রথমোক্তটিকেই উচ্চে স্থান দিয়েছেন। বিচ্ছেদের ভাবপ্রকাশক শব্দ ইংরেজিতে আছে, কিন্তু বিরহের প্রতিশব্দ ইংরেজিতে নেই। ইংরেজিতে একমাত্র 'Love' শব্দ আছে, কিন্তু আমাদের ভাষায় প্রেমবাচক শব্দের অনেক প্রতিশব্দ আছে। বলেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য প্রেমের কবিতার তুলনায় বৈষ্ণব কবিতার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্য বর্ণিত প্রেমের স্বাধীন মুক্তভাব একমাত্র বৈষ্ণবসাহিত্যেই পাওয়া যায়। অবশ্য সংস্কৃত কবিরাও মাঝে মাঝে দাম্পত্য প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মুক্তভাব যোগ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রেমের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে সামাজিক পটভূমি আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য দেশে প্রেমের যে স্বাধীন. চর্চা হয়েছে, আমাদের দেশে সামাজিক কারণেই তা সম্ভব হয়নি। দাম্পত্য বন্ধনেই আমাদের দেশে প্রেমে ক্ষূর্তি, সুতরাং এখানে স্বাধীন প্রেমচর্চার কোনো অবকাশ নেই। প্রবন্ধটির শেষাংশে লেখক আবার বৈষ্ণব কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই অংশে লেখকের দু'একটি মন্তব্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, যেমন: "বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বর-

প্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে।" প্রবন্ধটি খুব স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন নয়। প্রচুর পরিমাণে পুনরুক্তি দোষও আছে।

'নগ্নতার সৌন্দর্য' প্রবন্ধটির মধ্যেও বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'জয়দেব' প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি এই প্রসঙ্গটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের মতে নগ্নতার সৌন্দর্য হলো সহজ ও স্বপ্রকাশ, সেখানে আবরণ ও আভরণের কোনো প্রয়োজন নেই। বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিদৃষ্টি কত সহজে গভীর প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন। সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা বলেন্দ্রনাথের স্বক্ষেত্র, তাই তিনি এই প্রবন্ধে অত্যন্ত সহজেই গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন: "নগ্নতার চতুর্দিকে একটা দীপ্ত লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই লাবণ্যদীপ্তির মধ্যে সৌন্দর্যের আত্মা সন্নিবিষ্ট। নগ্ন প্রকৃতির হৃদয়ে ডুবিয়া দীর্ঘ জীবন-পথের কাতর কোলাহল আমরা যে বিস্মৃত হই, সে কেবলই এই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্যে।"

নগ্নতার মধ্যে স্বাভাবিকতা আছে। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে শ্রী-কে তুলনা করে বলেন্দ্রনাথ যথার্থ শ্রীমতী কে, তা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথ নগ্ন সৌন্দর্যের ভাবগভীরে প্রবেশ করেছেন। প্রাচীন গ্রীস নগ্নতার মধ্যে এক অপরিসীম সত্য আবিষ্কার করেছিল। বলেন্দ্রনাথ নিরাবরণ নগ্নতার মধ্যে গভীর রহস্য আবিষ্কার করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে লেখক ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর 'স্কাইলার্ক' কবিতাদ্বয়ের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তার রসবিশ্লেষণনৈপুণ্য ও মৌলিকতা অনস্বীকার্য: "শেলীর skylark-এ সৌন্দর্যের সম্যক স্ফূর্তির কারণ নগ্ন আত্মার অভিব্যক্তি। শেলী দেহাবরণের প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গে আত্মা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। তিনি তাহার গতির মধ্যে কেবলই তাহার আত্মার আকুল গীতি শুনিয়াছেন; পক্ষী স্বর্গের দুয়ার হইতে যতই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে, শেলী তাহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যান, সমস্ত জীবন সৌন্দর্যপ্লাবিত হইয়া উঠে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের skylark-এ নগ্ন আত্মার এমন বিকাশ হয় নাই।"

'নগ্নতার সৌন্দর্য'-সম্পর্কে মূল ধারণাও সম্ভবত বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রকাব্য থেকেই পেয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'লাজহীনা পবিত্রতা' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। এই প্রবন্ধটির মূল রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা।[৪০] কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবমূর্তিটিকেই তিনি প্রবন্ধাকারে রূপ দিয়েছেন।

৪০। ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল,
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ

॥ ৯ ॥

বলেন্দ্রনাথের গদ্যস্টাইল

বলেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। (উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে ক'জন গদ্যশিল্পী বাংলা গদ্যকে শিল্প-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছিলেন, বলেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।) রবীন্দ্রনাথের সমকালীনদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া চারজন গদ্য শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথচৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর মধ্যমায়ু হলেও তাঁর গদ্য স্টাইল চরম পরিণতি লাভ করেছিল। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মতো সিদ্ধকাম গদ্যশিল্পীকেও বলেন্দ্রনাথের রচনারীতি আকর্ষণ করেছিল। তিনি বলেছেন : "এই রচনাভঙ্গীই আমাকে প্রথমে আকর্ষণ করিয়াছিল ; এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তাহার পূর্বে আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি, বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল ; শিক্ষানবিশী অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না ; কিন্তু শব্দগুলিকে বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া কোথায় কোন্‌টি বসিলে মানাইবে ভাল, তাহা স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিগরের হাতের অপূর্ব কারুকার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"[৪১]

সুরবালিকার বেশ কিরণবসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।
সর্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ,
সর্বাঙ্গে মলয়বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মত।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানব-ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে। —বিবসনা : কড়ি ও কোমল।

৪১ বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর (আগস্ট ১৯০৭) ভূমিকা।

বলেন্দ্রনাথের গদ্য স্টাইলের উৎসমূল অনুসন্ধান করতে হলে দুটি সূত্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রথমটি হলো রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি। রবীন্দ্রজীবনের বিশেষ একটি পর্বে যে-জাতীয় গদ্যরীতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তার সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। ভাষার প্রসাধনকলা, অলঙ্কৃত বাগ্‌বৈভব, সমাসবদ্ধ বাক্যাংশগুলির মন্থর পদবিক্ষেপ, মহিমা-সুগম্ভীর অভিজাতশ্রী, আবেগদীপ্ত কাব্যধর্মিতা বলেন্দ্রনাথের গদ্য স্টাইলের কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্ম। সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব আরো স্পষ্ট। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত পর্যন্তও অনুসরণ করা হয়েছে। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির নানা স্তর বিদ্যমান। রূপ-রীতি ও আঙ্গিকের বহুবিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবাহ অগ্রসর হয়েছে। কবি বারবার তাঁর সৃষ্টিকে অতিক্রম করেছেন। স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের উনিশশতকীয় গদ্যরীতিই মোটামুটি আদর্শ ছিল। এই কাঠামোর উপরেই তিনি যত্নে ও কৌশলে এক শিল্পসুষমামণ্ডিত গদ্যরীতি গড়ে তুলেছিলেন।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির দ্বিতীয় উৎস সংস্কৃত সাহিত্য। তাঁর গদ্য রচনার একটি প্রধান অংশের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়। সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনাগুলি বাদ দিলেও নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের বিদগ্ধ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আছে। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে মূলের ভাষা ও শব্দ-বিন্যাসকে তিনি আত্মসাৎ করেছেন। তৎসম শব্দ-সমন্বিত সমাসবদ্ধ বাক্যাংশগুলি বর্ণনামুখ্য ও চিত্রধর্মী গদ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। 'উত্তর চরিত' সমালোচনায় দণ্ডকারণ্যের আরণ্যক সৌন্দর্যের ভীষণ রমণীয় চিত্র উদ্‌ঘাটনে বলেন্দ্রনাথের চিত্র-নৈপুণ্য মুখর হয়ে উঠেছে :

"কোথাও স্নিগ্ধ শ্যাম, কোথাও ভীষণ রুক্ষ দৃশ্য; স্থানে স্থানে নিরন্তর নির্ঝর ঝরঝর মুখরিত; কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্বত, কোথাও নদী, কোথাও ঘন বন। ঐ যে জনস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ দক্ষিণারণ্য চলিয়াছে। এই অরণ্যভূমি চিরদিন সর্বলোক-লোমহর্ষক—এখানকার গিরিগহ্বর সকল উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল। কোথাও একেবারে নিষ্কুজস্তিমিত, কোথাও নিরন্তর গর্জনধ্বনিত, কোথাও বা গভীর গর্জনকারী ভুজঙ্গগণের নিশ্বাসে জ্বালিত-অগ্নি; কোথাও গর্তমধ্যে অল্প জল দেখা যাইতেছে, এবং তৃষিত কৃকলাসেরা স্বেদবিন্দু পান করিতেছে।"

মূলের শব্দ-বিন্যাস, ভাষা ও ভাবকে পর্যন্ত আত্মসাৎ করে বলেন্দ্রনাথ এক-একটি রমণীয় শব্দ-চিত্র এঁকেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে বলেন্দ্র-নাথের উক্ত ভাষার শব্দ-বিন্যাস ও বাঁধুনিকে যত্নের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন।

ভাষাকে অনেকখানি মেজে-ঘষে পালিশও করেছিলেন। তাঁর স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য-জীবনের মধ্যে ভাষাচর্চার তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বলেন্দ্রনাথের শব্দচয়ন-দক্ষতা-প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন বলেছেন: "তাঁহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনি সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণ-প্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাঙ্গালা গদ্যে কোথাও দেখি নাই।"[৪২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধটিতে কাদম্বরী কাব্যের চিত্রধর্মিতার কথা বলতে গিয়ে তাকে 'চিত্রশালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা সম্পর্কে উক্ত শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। 'মৃচ্ছকটিক' সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন: "সংস্কৃত নাটককারেরা এইরূপ আনুপূর্বিক চিত্রন্যস্ত বর্ণনা করিতে যেন কিছু ভালবাসেন।" সংস্কৃত কাব্য-নাটক-আখ্যায়িকার চিত্রধর্মিতা বলেন্দ্রনাথের মানস-জীবনেও যেন সংক্রামিত হয়েছিল। এই ছবিগুলির সঙ্গে তিনি তাঁর হৃদয়ের অংশটুকু যোগ করে দিয়েছেন। তাই ছবিগুলি তাঁর বিদগ্ধ মনের স্পর্শে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'ক্লাসিক্যাল' 'রোমান্টিক' প্রভৃতি পর্ব বিভাগের কোনো চেষ্টা হয় নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের একটি মোটামুটি চরিত্র-লক্ষণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, গদ্যরীতির যে ক্লাসিক্যাল রূপ দানা বাঁধার চেষ্টা করেছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তা ক্রমশই রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে ক্লাসিক্যাল রীতির স্পষ্টতা, ঋজুতা ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ-দক্ষতা শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরও মূলত গদ্যরীতির ক্লাসিকমার্গেরই পথিক। যদিও তাঁর রচনায় অনেক সময়েই ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক রীতির সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে, তবু মনোধর্মের দিক থেকে তিনি প্রথমোক্ত রসেরই সাধক। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না। তিনি রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক ভাবনার কবি। তাঁর 'শ্রাবণী' ও 'মাধবিকা' কাব্যদ্বয়ের মতো গদ্য রচনাতেও এই বিশিষ্ট ভাবনাই জয়যুক্ত হয়েছে।

বলেন্দ্রনাথের গদ্য রচনায় ব্যক্তিহৃদয়ের বাসনা-বেদনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। সাহিত্য ও চিত্রসমালোচনায় এই ব্যক্তিগত সুরের প্রাবল্যে অনেক সময় বস্তুগত বিশ্লেষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলিতে তাঁকে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। কোথাও তুচ্ছ বিষয়কে ঘিরে তাঁর কল্পনা-সমৃদ্ধ মন বিচিত্র লীলায় বিলসিত, আবার কোথাও

৪২। স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬।

সামান্য কোনো উপলক্ষ নিয়ে তাঁর ভাববৃত্তিগুলি লঘু স্বচ্ছ মেঘখণ্ডের মতো স্বচ্ছন্দ-বিহারী। বলেন্দ্রনাথের মনটিই এমন যে অন্তর্গূঢ় ভাবলোকে প্রবেশ করতে তার কোনো উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় তাঁর মগ্নমনের নিভৃত ভাবনার যে ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে, তা বিস্ময়কর। তাঁর গদ্যরীতি নিরূর্ষণ নয়। বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, অলঙ্কারের দীপ্তিতে, বর্ণনার ঘনবদ্ধতায় ও কল্পনার ইন্দ্রজালে তাঁর গদ্য বহুদিন বিস্মৃত এক-একটি যুগের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে। তাই বলেন্দ্রনাথের গদ্য ঐতিহাসিক স্মৃতিরচনায় নিপুণ, কারণ অতীতকে অবলম্বন করে কল্পনা বিস্তারের সুবিস্তীর্ণ অবকাশ পাওয়া যায়। বলেন্দ্রনাথ সেই দুর্লভ অবকাশকে কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত করেছেন। 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধের চিত্রবর্ণিত রাজকুমারীর বিবাহ উৎসবের নিতান্ত আনুষঙ্গিক যারা—সেই রক্ষী ও নর্তকীরাও বলেন্দ্রনাথের কল্পনা-উৎসব থেকে বাদ পড়ে নি:

"দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ রক্ষিবর্গ—আসমানী গোলাপী শ্বেত পীত হরিদ্বর্ণের আজানুতল-বিলম্বিত বসনোপরি সোনার জরীর কটিবন্ধে নিবদ্ধ গাঢ় বেগুনি মখমলের ছোরার খাপ, স্কন্ধে সুবর্ণমণ্ডিত চারুদণ্ড, এবং তাম্বূল রাগরক্ত অধরে সচেতন পদমর্যাদায় ঈষৎ স্মিতভাব। এবং এই সুরঞ্জিত দৃশ্যপটে পার্শ্ববর্তিনী নর্তকীদিগের পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিঘূর্ণিত ও বিচ্ছুরিত জরীর পাড়ের ঢাকাই মস্‌লিনের গিলা করা পোশোয়াজের মধ্য হইতে ঈষদ্ব্যক্ত বিবিধবর্ণের চুড়ীদার পায়জামা ও পিনদ্ধ কঞ্চুলিকা-নিবদ্ধ সঘনস্পন্দিত কনক-যৌবনমোহ সঞ্চারিত হইয়া যেন বসন্তমদোন্মত্ত বুলবুলের গীতমুখরিত সিরাজপুরীর একখানি সুন্দর মরীচিকা রচনা করিয়াছে।"

উদ্ধৃত অংশটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির অনুরূপ অংশের কথা মনে পড়বে। ভাবে, ভঙ্গিতে বলেন্দ্রনাথের গদ্য স্টাইল যে রবীন্দ্র গদ্য স্টাইলের কতখানি অনুগত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বলেন্দ্রনাথের এই রাজকীয় গদ্য সম্পর্কে রসিক সমালোচক তাঁর মুগ্ধমনের বিস্ময় নিবেদন করেছেন: "বলিব কি, ঘরের দরজা খুলিয়া পরম বন্ধুর মত হাতে ধরিয়া যে জগতে আমাদের টানিয়া আনিলেন বলেন্দ্রনাথ, সেখানে বর্ণবিচিত্র শোভাযাত্রা কখনও ফুরায় না এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিভাসে ললিতে ইমনে কেদারায় বাহারে বেহাগে অনুক্ষণ কোন্ সানাই বাজিয়া চলিয়াছে?··· অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষীভূত আর অপরিচিতকে পরিচিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় লেখক অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ দুইই যেন ব্যবহার করিয়াছেন, মনে হয়।"[৪৩]

৪৩ চিরায়ু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর: কানাই সামন্ত, শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৬০।

বিষয়ানুসারে বলেন্দ্রনাথের গদ্য স্টাইলের পরিবর্তন ঘটেছে। সংস্কৃত সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনায় শব্দাঢ্য ও বর্ণাঢ্য রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়ের আভিজাত্য ও মহিমার সঙ্গে অতীতচারী মনের রোমান্স মিলিত হয়ে এই জাতীয় গদ্যরীতির ভিত্তি রচিত হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধে তাঁর রচনারীতি অনেক সহজ ও অনাড়ম্বর। লঘু পরিহাস ও নির্দোষ কৌতুকরসও তাঁর এ জাতীয় রচনায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর হাস্যরস আঘাত করে না, স্নিগ্ধতায় চিত্তকে প্রসন্ন করে।

বলেন্দ্রনাথের রচনারীতিতে আতিশয্য আছে। বিশেষণের বাহুল্য, চিত্রাতিরেক ও অতিকথন দোষ তাঁর রচনায় অনুপস্থিত নয়। দীর্ঘকাল অনুশীলন করার সুযোগ পেলে হয়তো তাঁর স্টাইল আরো পরিমার্জিত হতে পারতো, হৃদয়াবেগের প্রাথমিক জোয়ার কেটে গেলে হয়তো তাঁর গদ্যরীতি অনেকখানি বাহুল্যবর্জিত ও তীক্ষ্ণ হতে পারতো! বলেন্দ্রনাথের পাঠকের মনে চিরকালই এই অপূর্ণ সম্ভাবনার বেদনা জেগে থাকবে। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিকে আজ কেউ অনুসরণ করে না, অন্তত অদূর ভবিষ্যতে কেউ করবে বলে মনে হয় না। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতি তাই আজ এক পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদের মতো বাংলা সাহিত্যের নির্জন প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। পথচারীর অভাবে সে পথ আজ রুদ্ধপ্রায়। কিন্তু আজো যদি কোনো কৌতূহলী পথিক পথশ্রম উপেক্ষা করে সেই পাষাণ-প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়ায়, তা হলে প্রাচীন যুগের এই স্থাপত্যকীর্তি তাকে বিস্মিত করবে। পাষাণ সোপান অতিক্রম করে যদি একবার সে ভিতরে প্রবেশ করে, তা হলে শিল্পনিপুণ ভাস্কর্য ও দেয়ালচিত্রের সূক্ষ্ম রেখাবিন্যাস তার মুগ্ধ দৃষ্টিকে অভিভূত করবে—হয়তো এক বিস্মৃতপ্রায় তরুণ কবির অর্ধসমাপ্ত সঙ্গীতের পাষাণস্তম্ভিত সুর তাকে বেদনায় ব্যথিত করবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

রথীন্দ্রনাথ রায়

প্রবন্ধ সংগ্রহ

বসন্তের কবিতা

কবিতার সৌন্দর্য্য সকলে অনুভব করিতে পারে না—সকলে চাহেও না। আত্মম্ভরিতার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বাস করিয়া যাহাদের হৃদয়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে, তাহারা কবিতাকে প্রলাপের হিসাবে দেখে—ভাব আয়ত্ত করিতে না পারিয়া গালি দেয়। কিন্তু তাহাদের কথায় কবি গান বন্ধ করিতে পারেন না—যেমন গাহিয়া যান, সেইরূপই গাহিবেন। বসন্তের কবিতার মৃদু স্পর্শন অনুভব করা তার্কিকের সাধ্যাতীত। মলয়ানিলের মত তাহা আমাদের হৃদয়কে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিয়া যায়—আমাদের হৃদয় উথলিয়া উঠে। প্রশান্ত সাগরবক্ষের উপর দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া যেমন বাতাস বহিয়া যায়, বসন্তের কবিতাও সেইরূপ আমাদের স্থির হৃদয়ের উপর দিয়া নীরবে বহিয়া যায়। আমাদের হৃদয়ের উথলিত ভাব ঈষৎ শিহরণে প্রকাশ পায়। বসন্তের কবিতায় ঝঞ্ঝা ঝটিকা নাই। মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র জ্যোৎস্না, মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল তাহার প্রাণ। মেঘ, অন্ধকার বসন্তের কবিতায় থাকিবে কিরূপে? বসন্তে তেমন মাতামাতি দেখা যায় না—কিন্তু তাহার মৃদু স্পর্শনগুলি অতি সুন্দর।

বর্ষার কবিতার মধ্যে মধ্যে একটা একঘেয়ে ভাব আছে। এই একঘেয়েত্ব সময় সময় এমনি বিরক্তিকর বোধ হয় যে, ঐখানেই পুঁথি বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে। সাত আট পৃষ্ঠা ধরিয়া হয় ত টিপিটিপি বৃষ্টিই পড়িতেছে—আকাশের মুখ ভার—পৃথিবী বিষণ্ণা—এক গৃহের দুই কোণে যেন দুই জনে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। পাঠকের মন এরূপ অবস্থায় উৎসাহহীন হইয়া পড়ে—সকল উদ্যম উৎসাহ যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ষার কবিতায় যে মহান্ সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তখন উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু আষাঢ়ারম্ভে যখন নূতন ছন্দে, নূতন সুরে বর্ষা গানারম্ভ করে, তখন হৃদয় কিছুতেই নিরুদ্যম থাকিতে পারে না। বর্ষার তালে তালে হৃদয়ও নাচিয়া উঠে।

বসন্তের কবিতায় পদবিন্যাস অতি চমৎকার। কথাগুলি ছোট ছোট, কিন্তু মর্ম্মস্পৃক্। জয়দেবের সহিত বসন্তের কবিতার কোমলতা তুলনা হইতে পারে। 'কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীর' বসন্তেরই সৃষ্টি। জয়দেব বসন্তের কবিতার হেলিয়া দুলিয়া বাতাসের সঙ্গে টলমল করিয়া যাওয়ার ভাব আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কবিতাও হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। বসন্তের কবিতা ফুলসৌরভে, জ্যোৎস্না-লোকে ভাসিয়া বেড়ায়। তাহা ক্রমে ক্রমে আকাশে উঠিয়াছে। ঊর্দ্ধগামী পক্ষীর গতির সহিত বসন্তের কবিতার গতির অনেক সাদৃশ্য আছে। বর্ষার কবিতা স্বর্গের

ও·মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে—বৃষ্টির ভারে পৃথিবী হইতে অধিক উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। বসন্তের গান অনেক উচ্চে উঠে।

কিন্তু বর্ষার কবিতায় তত্ত্বকথা অধিক আছে বলিয়া মনে হয়। বর্ষার দার্শনিক কবিতা। রূপকের প্রাদুর্ভাবও বর্ষায়। বসন্তের কবিতায় মৃদুস্পর্শনের ভাব অনেকটা প্রকাশ পায়। কিন্তু সে ভাব অন্তঃসলিলা নদীর মত হৃদয়ে বহিতে থাকে। বর্ষার ভাব অন্তঃসলিলা নহে বটে—বসন্তের মত স্থায়ীও নহে। বৃষ্টিতে খাল বিল ভরিয়া উঠে—বৃষ্টি ধরিয়া যায়, খালবিলও শুকাইয়া আসে। বর্ষার কবিতার এই ভাব। গাম্ভীর্য্য কিন্তু বর্ষার কবিতায় অধিক। ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা যেমন কূলে কূলে পরিপূর্ণ—গম্ভীর, বর্ষার কবিতাও সেইরূপ গম্ভীর। বর্ষার ছন্দ মহাকাব্য রচনার উপযোগী। বসন্তের ছন্দ গীতিকাব্যেরই উপযুক্ত। বসন্তে বীররসের সংস্রব নাই—বর্ষায় বীররসই অনেক স্থলে আসর জমকাইয়াছে। বসন্তকে দেখিলে আমাদের সহসা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া মনে হয়। বর্ষাকে সহজেই শৈব মনে করিয়া লই।

বসন্তের কবিতায় বিবাহের বাঁশী শুনিতে পাওয়া যায়। সে বাঁশীর সুর উদাস বটে, কিন্তু তাহাতে মিলনের গানই বাজে। বর্ষার বাঁশীর স্বরও কেমন ভিজা ভিজা ঠেকে। তেমন ষোলকলার মিলন উপলব্ধি করা যায় না। মধ্যে মধ্যে বীর-রসের অবতারণায় মিলনের ভাব অনেকটা মারা গিয়াছে। বর্ষায় নায়কের একটা প্রধান দোষ—দাপাদাপি। বসন্তের নায়কের মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাস বর্ষায় কোথায়? বর্ষার নায়ক কাঁদিয়াই আকুল, ক্রোধেই অজ্ঞান। সে অনেকটা খামখেয়ালী বলিতে হইবে।

বর্ষার কবিতায় কেহ না মনে করেন যে, কোমল রস নাই। বর্ষার কবিতায় কোমল রসের অভাব নাই, কিন্তু বসন্তে বীররসের অভাব আছে। বর্ষার সহিত বসন্তের মজ্জাগত প্রভেদ এই যে, বর্ষা আমাদিগকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে—বসন্ত আমাদিগকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্ষায় আমরা জানালা খুলিয়া প্রকৃতির পানে চাহিয়া থাকি—বসন্তে প্রকৃতির সহিত মিশাইয়া গিয়া তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করি। বসন্ত ও বর্ষার কবিতা তুলনা করিয়া আমরা আরও বলিতে পারি—বসন্ত অদ্বৈতবাদী, বর্ষা দ্বৈতবাদী।

বসন্তের কবিতায় উদাস ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। বসন্তের বিরহ-গানগুলিও কেমন উদাস ভাবে ঢালা। বর্ষার কবিতায় উদাস ভাবের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই বোধ হয়, বর্ষার বিরহে অভিশাপ লুকান থাকে। বসন্তে উদাস ভাবেরই প্রাধান্য। বর্ষার গানে একটা জমাট ভাব আছে। বসন্তের গানে ততটা আছে

কি না সন্দেহ। কিন্তু বসন্তের গান খুব হৃদয়স্পর্শী। সুর হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে, বসন্ত সর্ব্বাপেক্ষা চড়ায় উঠিতে সমর্থ।

বর্ষার কবিতায় অনেক পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে। অনেক পুরাতন কাহিনী মনে পড়ে। বসন্তে স্মৃতির আকুলি ব্যাকুলি অনুভব করা যায়। স্মৃতির সহিত বসন্তে সহস্র বিস্মৃতি জড়াইয়া থাকে। বর্ষার স্মৃতি বিস্মৃতিতে এতটা মেশামেশি থাকে না। এই জন্যই বোধ করি, অনেকে বসন্তকে মিলনের কাল বলিয়া থাকেন।

বর্ষা ও বসন্তের কবিতার মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে আরও অনেক প্রভেদ বুঝা যাইবে। কিন্তু প্রবন্ধ বাড়াইবার আর আবশ্যকতা নাই। উপসংহারে আমরা বর্ষার কবিতাকে গোলাপের সহিত এবং বসন্তের কবিতাকে চম্পকের সহিত তুলনা করিতে পারি। বসন্তের কবিতা—যৌবনের প্রথম বিকাশ। বর্ষার কবিতা—যৌবন বটে, কিন্তু প্রথম যৌবন নহে।

'ভারতী ও বালক', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

আষাঢ়ে গল্প

দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যখন আকাশের এক প্রান্তে একখানি শুভ্র মেঘ কোন্ পুরাতন দিনের স্মৃতির মত আসিয়া দেখা দেয়, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তখন কেমন এক নূতন ভাবের উদয় হয়। সুপ্তোত্থিত যেমন উষার প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়, গ্রীষ্মের প্রখর তাপের পর আষাঢ়ের নূতন জলদজাল দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আষাঢ়ের গল্পের আশায় আমরা তৃষিত চাতকের মত চাহিয়া থাকি। সে আশাপূর্ণ উৎসাহ মনে করিতে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।

আষাঢ়ের গল্প আমাদের স্মৃতির তীর্থক্ষেত্র। সহস্র স্মৃতি তাহার সহিত সুখে দুঃখে জড়িত। বাহির হইতে উঠাইয়া আনিয়া আমরা মনকে গৃহের অন্ধকারে যে বদ্ধ করিতে পারি, সে কেবল আষাঢ়ে গল্পের আকর্ষণে। আষাঢ়ের ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে যখন আফিসের তাড়া পড়ে—গৌরাঙ্গ প্রভুর গুম্ফশোভিত দন্তকিড়মিড়ি মনে পড়ে, তখন প্রাণে কি গভীর নৈরাশ্য উপস্থিত হয়! জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়, সংসারকে নিষ্ঠুর মনে হইতে থাকে, খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটে মাত্র। আষাঢ়ে বন্ধু বান্ধব লইয়া—আত্মীয় স্বজন লইয়া গৃহের অন্ধকারে

বসিয়া থাকিতেই লাগে ভাল। এ সময় আফিস কেন? আষাঢ়ে গল্প—হিসাবনিকাশ কিসের?

আষাঢ়ে গল্পের কৈফিয়ৎ নাই। বসন্তের উপন্যাসে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে একটা ছেদ আছে। আষাঢ়ে গল্পে সম্ভব অসম্ভব এক হইয়া গিয়াছে—একীকরণের চূড়ান্ত উদাহরণ। প্রতি মুহূর্ত্তেই ষোড়শী রূপসী মরা-বরের সহিত মালাবদল করিতেছে, সাতটি ভাই সাতটি চাঁপা হইয়া ফুটিতেছে; কেহই আপত্তি করে না। অধ্যায়ের পর অধ্যায়, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ নাই—ঔপন্যাসিক কমা সেমিকোলনেরও সম্পর্কশূন্য। সহসা সপ্তম পরিচ্ছেদে দু'জনের বিরহনিশ্বাসে আসিয়া তাহার অবসান হয় না। অন্তিমে মৃত্যুর চিত্র থাকিলেও আষাঢ়ে গল্পে ট্র্যাজেডি হইতে পারে না। যদি বা তর্ক তাহাকে ট্র্যাজেডি বলিয়া প্রমাণ করে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, ট্র্যাজেডির মত তাহার প্রভাব লক্ষিত হয় না।

আষাঢ়ে গল্পের নায়ক প্রায়ই সৃষ্টিছাড়া কোন জীব, কিম্বা নায়কের স্থান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী এক ব্যক্তি। অনেক সময় রাক্ষস, পিশাচ, ব্রহ্মদৈত্য, ভূত, ব্যাঘ্র, শৃগাল এবং হনুর বংশধরেরাই গল্পের নায়ক। গল্পও অনেক সময় বেগুনক্ষেতের কাঁটায় কোন প্রকারে বিঁধিয়া থাকে মাত্র। দৃশ্য বর্ণনা ইহাতে প্রায় নাই—ষোল আনার মধ্যে এক আনা থাকে ত যথেষ্ট। রাজপুত্রেরা দেশভ্রমণে বাহির হইলেই স্ত্রী এবং শ্বশুরের অর্দ্ধেক রাজ্য লাভ করেন। আষাঢ়ে গল্পের এই স্ত্রীলাভ ঘটনাটিতে রামায়ণ মহাভারতের খানিকটা প্রভাব আছে বোধ হয়। থাকে ত আমাদের জিৎ। না থাকিলে আষাঢ়ে লেখার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না।

আষাঢ়ে নায়িকা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা বাহুল্য মাত্র। নায়িকার চরিত্রে মহৎ ভাব অতি সামান্যই—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নায়িকার কুল শীল সময় সময় উচ্চ হয় বটে, কিন্তু সে কেবল রাজপুত্রের বিবাহের সুবিধার জন্য। অসম্ভব ঘটনা কোন কোন নায়িকাকে বড় করিয়াও দেয়। সময়বিশেষে নায়কের জ্যেষ্ঠতাত হইবার মত নায়িকাও দু'একটি মিলে। কিন্তু উপন্যাসের যোগ্য নায়িকা আষাঢ়ে গল্পে বড় একটা মিলে না।

আধুনিক বাঙ্গলা উপন্যাসে মধ্যে মধ্যে দু'একটি আষাঢ়ে নায়িকাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, আষাঢ়ে গল্পে বিশেষ মন্দ না লাগিলেও উপন্যাসে এইরূপ নায়িকা ভাল সাজে না। নায়িকাকে পুরুষ করিলেই তাহার চরম উন্নতি হইল না। স্ত্রীলোকের স্ত্রীভাব থাকা বিশেষ আবশ্যক। পুরুষবেশ স্ত্রীজাতিকে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলে মাত্র। আষাঢ়ে গল্পে তাহা যদি

বা শোভা পায়—তাহাও সকল সময়ে পায় না—উপন্যাসে কিছুতেই শোভা পায় না।

বসন্তের সহিত বর্ষার যে তফাৎ, উপন্যাসের সহিত আষাঢ়ে গল্পেরও সেই তফাৎ। একটি রীতিমত উপন্যাসে আমাদিগকে জগতের অভ্যন্তরে খানিক দূর টানিয়া লইয়া যায়; আষাঢ়ে গল্প আমাদিগকে চারি দিক্ হইতে আনিয়া গৃহে বদ্ধ করে। আষাঢ়ের সহিত শীতের গল্পের প্রভেদ এই যে, আষাঢ়ে গল্প বৃদ্ধার গল্প—শীতের গল্প বৃদ্ধের গল্প। শীতের গল্পে খানিকটা বিজ্ঞান, খানিকটা 'এ-ও-তা' গুঁজিয়া দিলে বেশ চলিয়া যায়। আষাঢ়ের গল্পে বিজ্ঞানের গন্ধ সহ্য হয় না। ভিজা ভিজা ভাব আষাঢ়ে গল্পে বিশেষ আবশ্যক। শীতের গল্প ঝরঝরে হৌক না কেন।

উপসংহার আষাঢ়ে গল্পে সকলগুলিতেই এক। গল্পের সঙ্গে উপসংহারের বড় একটা সম্পর্ক নাই। বরঞ্চ গল্প-বক্তার সহিত তাহার সম্পর্ক থাকিতে পারে। আষাঢ়ে গল্পের সাধারণ উপসংহার "আমার কথাটি ফুরোলো—নটে শাকটি মুড়োলো" ইত্যাদি। রাজার কথাই হৌক, রাখালের কথাই হৌক, শৃগাল ব্যাঘ্রের কথাই হৌক, এ উপসংহারটি সর্বত্রই বসিয়া থাকে।

আষাঢ়ে গল্পে আমাদের জাতীয় জীবনের ভাব যেরূপ সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়, অন্য কিছুতে সেরূপ হয় না। আষাঢ়ে গল্প শুনিলে বাঙ্গলার শারীরিক মানসিক অবস্থার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য দেশে আষাঢ়ের কিরূপ আদর জানি না। কিন্তু যেখানে আষাঢ় আছে—রীতিমত আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের মত জমাট্ আষাঢ় আছে, সেখানে নিশ্চয়ই তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। আমাদের এখানে জমাট্ বর্ষা—জমাট্ গল্প। যেখানে বর্ষা জমাট্ নয়, সেখানে গল্পও জমিতে পায় না। হায়! সে দেশের কি দুর্ভাগ্য!

'ভারতী ও বালক', আষাঢ় ১২৯৫

আষাঢ় ও শ্রাবণ

সহসা বাহির হইতে দেখিলে অনেক জিনিসের মধ্যে কেমন সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দিন দিন যত নিকটে আসা যায়—বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতে থাকি, সাদৃশ্যের মধ্যে ততই বৈসাদৃশ্য মাথা উঁচু করিয়া উঠে। প্রতি দিন সহস্র প্রভেদ চক্ষে পড়ে—সাদৃশ্য কমিয়া যায়, বৈসাদৃশ্যের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ উভয়েই বর্ষার পরিবারমধ্যে গণ্য। কিন্তু এক পরিবারের হইলেও মুখশ্রী উভয়ের এক

নহে। মানব-হৃদয়ে উভয়ের প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন। আষাঢ়, শ্রাবণ আমাদের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে না। দুই জনের ভাবগত প্রভেদ আলোচনা করিলে সময় সময় এমন সন্দেহও হয় যে, উভয়ে বুঝি এক পরিবারের লোক নহে। ভাদ্রের দুর্ভাগ্য—ভাদ্র শরতের পরিবারভুক্ত। কিন্তু শ্রাবণের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। অনেকে নাকি ভাদ্রকে আশ্বিনের আত্মীয় না জানিয়া শ্রাবণের আত্মীয় ঠাহরাইয়া থাকেন। যাক্, সে কথার আলোচনায় আমাদের আবশ্যক নাই। আষাঢ় ও শ্রাবণের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য লইয়াই আমাদের কথা।

আষাঢ়ে গল্প পৃথিবীবিখ্যাত। শ্রাবণের এ বিষয়ে বড় খ্যাতি নাই। খ্যাতি নাই থাক্, তাই বলিয়া শ্রাবণের যে গল্প নাই, তাহা নহে। শ্রাবণের কাব্যরচনায় ক্ষমতা অধিক। আষাঢ়ে গল্পে চোখের জলের তেমন ঘটা নাই—নেহাৎ যদি কান্না পায়, দুই মুহূর্ত্তের অধিক তাহা থাকে না। শ্রাবণে অশ্রুজলে হৃদয় ঝরিয়া পড়ে—নয়নে যে জল বহে, তাহার প্রতি বিন্দুতে হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। বাসন্তী উপন্যাস শ্রাবণের বারিধারায় অবশ্য আশা করা যায় না। কিন্তু শ্রাবণের কাব্যে উচ্চদরের চরিত্রও পাওয়া যায়। আষাঢ়ে চিল, ব্যাঘ্র, ব্রহ্মদৈত্য নায়ক, শ্রাবণের গল্পে বড় দেখা যায় না। আষাঢ়ে গল্পে গাম্ভীর্য্য নাই—শ্রাবণের গম্ভীর ভাষা, গম্ভীর ভাব। আষাঢ়ে গল্পে অসম্ভবের যেমন প্রাদুর্ভাব, শ্রাবণের গল্পে তেমন নাই। তবে শ্রাবণের গল্পেও বর্ষার প্রভাব একেবারে মুছিয়া যায় নাই। আষাঢ়ের সহিত তুলনায় শ্রাবণের গল্প গম্ভীর বটে, তাই বলিয়া তাহা উপন্যাস-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

বিরহিণীর হৃদয়ে আষাঢ় শ্রাবণ উভয়েরই প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু আষাঢ়ের ভাবের সহিত শ্রাবণের ভাবের কেমন একটু তফাৎ আছে। আষাঢ়ে বিরহিণীর হৃদয়ে একটা নূতন ভাব আসিয়াছে—সে ভাবে একটু আশাপূর্ণ ঔৎসুক্য। শ্রাবণে বিভীষিকাটা কিছু পাকিয়া দাঁড়ায়। আষাঢ়ে বিরহিণী মেঘের নিকট প্রণয়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রাবণে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না—নির্জ্জনে নীরবে আপনার বিভীষিকামধ্যে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। মোটের উপর, বর্ষায় সহচরীসঙ্গ বড় ভাল লাগে না—একেলা থাকিতেই ইচ্ছা করে। সহচরীদের সান্ত্বনা-বাক্য এ সময়ে হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিতে থাকে। সুখের সময় সান্ত্বনা সহিতে পারা যায়—দুঃখের সময় যায় না। বসন্তে সহচরীসঙ্গ ভাল লাগে—বর্ষায় বিজনে বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

উদ্ধবদাসের একটি কবিতার অংশবিশেষ উঠাইয়া বসন্ত ও বর্ষার বিরহের প্রভেদ

আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। আষাঢ় শ্রাবণের তুলনার মধ্যে বসন্ত ও বর্ষার কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে বোধ হয় না। কবি বসন্তে বলিতেছেন,—

"সো বরনারী তোহারি লাগি ঝুরত,
রোয়ত সহচরী সঙ্গে।"

বর্ষা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—

"বর্ষা ঋতু ভেল, ঝরয়ে নয়নে জল,
দুখ সায়রে ধনী ভাসে॥"

বসন্তে ক্রন্দন আছে—কিন্তু 'রোয়ত সহচরী সঙ্গে', বিজনে একেলা বসিয়া নয়, সহচরীরা সঙ্গে আছেন। আর বর্ষায় নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে, দুঃখও গুরুতর। তাই সহচরীর নামগন্ধ নাই।

বসন্ত ও বর্ষায় যেমন, আষাঢ়ে শ্রাবণেও কতকটা সেইরূপ। আষাঢ়ে দুঃখ গভীর বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু আশা আছে। শ্রাবণে কেবলই অন্ধকার ঘনাইতেছে —কোথায় আশা! কোথায় ভরসা! আষাঢ়ে মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার কথা মনে করিতে পারা যায়—মনে হয়, এমনিতর মেঘের মত সেও যদি আসে! শ্রাবণে সব একেবারে স্তম্ভিত।

রসিক ভাব আষাঢ়ে শ্রাবণের চেয়ে বেশী। শ্রাবণে রসিকতা সব সময়ে জমে না—অনেক রসিকতা এমনি দীনহীন বেশে ম্লানমুখে বাহির হয় যে, তাহাদিগকে দেখিলে মায়া করে। বর্ষাকালীন দেশলায়ের মত অনেক কথা হাওয়া লাগিলেই ভিজিয়া যায়। চকমকির আগুনে সময় সময় তাহাদিগকে না তাতাইয়া লইলে চলে না। আষাঢ়েও এমন ঘটিতে পারে। কিন্তু শ্রাবণেই যেন চকমকির অধিক আবশ্যক। এ বিষয়ে রসিক রসিকারাই বুঝেন ভাল, আমরা—সাদাসিধা যাহা মনে আসিল, বলিলাম মাত্র। কৈফিয়ৎ তলব হইলে আমরা এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ দিতে পারিব বোধ হয় না। কিন্তু আষাঢ়ে লেখার সহিত কৈফিয়তের নাকি বড একটা মুখদেখাদেখি নাই, তাই সাহস করিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। কৈফিয়ৎ তলব হইলে রসিক রসিকারা আমাদের হইয়া ঝগড়াঝাঁটি করিতে বোধ হয় সম্মত আছেন। সে তাঁহাদের অভিরুচি।

শ্রাবণের মুখশ্রীর অনেকে খুব সুখ্যাতি করেন—তাঁহারা বলেন, শ্রাবণের মুখে কি একটি মিষ্ট ভাব আছে। আষাঢ়েরা অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যে কেহ একবার রথের ভেঁপু শুনিয়াছে, সে আর এমন কথা বলে না। গাল দুটি ফুলাইয়া রথের দিনে ছেলেরা কেমন ভেঁপু বাজায়—আষাঢ় না হইলে সে ভেঁপু বাজে

না'। আষাঢ়ের মিষ্ট ভাবে ভেঁপু মধুর শুনায়। তাঁহারা আষাঢ়ের মাধুর্য্য সম্বন্ধে আরো অনেক প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু এই প্রমাণটি নাকি সকলের সেরা। দিদিমারাও আষাঢ়ের তরফে—কেন না, আষাঢ়ের গল্প তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল। বিরহিণীরা কিন্তু আষাঢ়কে কি শ্রাবণকে ভালবাসেন সন্দেহ। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তাঁহাদের টান অধিক, কি "শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা" তাঁহাদের অধিক প্রিয়, বুঝিবার জো নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে প্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, আষাঢ় শ্রাবণের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তাহা না বলিলেও চলে—কারণ, সকলেই তাহা জানেন। গুটিকতক সামান্য তফাৎ দেখাইয়াই আমরা বিদায় লইতেছি—আরও অনেক তফাৎ আছে ; কিন্তু সে সকল বিস্তারিতরূপে বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। অতএব এইখানেই শেষ করা যাক্।

'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৫

কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী

গভীর দুঃখ যন্ত্রণায় যাহাদের হৃদয় গঠিত, তাহারা সুখের তীব্র সূর্য্যালোক সহিতে পারে না। সূর্য্যালোকে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, মুদিত নয়ন অবনত করিয়া জীবনের উপকূলে কম্পিতপদে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। সংসারের কটাক্ষকুঞ্চিত হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহাদের মৃদু নিশ্বাস-মলয় শিহরিয়া উঠে, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হইতে কি যেন বিভীষিকা আসিয়া চারি দিকে অন্ধকার পক্ষপুট বিস্তার করিতে থাকে। অবশেষে সহসা তরঙ্গাঘাতে তটভূমি ভাঙ্গিয়া যায়, পার্থিব কোলাহল মিলাইয়া যায়, জীবনের জ্বালামাধুরী অনুভব করিবার পূর্ব্বেই অতল সমুদ্রকল্লোলে তাহাদের সমাধি রচিত হয়। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় এইরূপ কাতর দুঃখের রচনা। নগেন্দ্রনাথের ভালবাসার তীক্ষ্ণ রশ্মিচ্ছটায় তাহার আঁখি মেলিতে সাহস হইত না। নিস্পন্দের মত সে জীবনের তীরে দাঁড়াইয়াছিল—তাহার আশে পাশে ফুল ফুটিত, পাখী গান গাহিত, জ্যোৎস্নাহিল্লোলে কোকিলের কুহুস্বর নিশীথের ফুলসৌরভের প্রেমালিঙ্গনস্পর্শ অনুভব করিত—কুন্দ নগেন্দ্রের স্মৃতিতে বিলীন।

নিমীল-নয়নে সে জগতের কুঞ্চিত কটাক্ষের সম্মুখে জড়সড় হইয়া নগেন্দ্রের অধরপ্রান্তে বিলীন হৃদয়ের মৃদু উচ্ছ্বাস অনুভব করিত, সেই মৃদু উচ্ছ্বাসে ভোর হইয়া ধীরে ধীরে হৃদয় খুলিয়া দিত ; সেখানে নগেন্দ্রের ভালবাসা প্রতিফলিত হইত—

কুন্দকুসুম বিকশিত হইয়া উঠিত, সেই সলজ্জ স্নেহময়ী আঁখি দু'টি নীরবে নিঃশব্দে স্তরে স্তরে খুলিয়া যাইত, নগেন্দ্রের পানে চাহিয়াই আবার অবনত হইয়া পড়িত। কুন্দের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিত, নিশ্বাসে জীবনের দীর্ঘ দুর্দ্দিনের ছায়া শিহরিয়া উঠিত। সেই নিশ্বাস-সৌরভে নগেন্দ্র কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছেন--কূল নাই, কিনারা নাই—সংসার, গৃহদ্বার, বিষয় সম্পত্তি, মান সম্ভ্রম, সকলেই শূন্যে। তাঁহার গৃহ শ্মশানে পরিণত—যে গৃহে লক্ষ্মী নাই, সেখানে শ্মশান ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাঁহার বিষয় সম্পত্তি—বিপদে বন্ধু, সম্পদে সখী সূর্য্যমুখী নাই—সে বিষয় সম্পত্তি ক'দিন টিঁকিবে? তাঁহার মান সম্ভ্রম—প্রাণ নাই, থাকিবে কোথায়? নগেন্দ্রনাথের বৃহৎ সংসারে কালের করাল মূর্ত্তি অন্ধকার অমাবস্যার মত সকল শান্তির অবসান জন্য অতি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে—সেখানে জ্যোৎস্না ফুটিবে না, মলয় বহিবে না, বসন্ত জাগিবে না। সেখানে সম্মুখে শান্তি অবসান।

কিন্তু এই অশান্তির কারণ কি অভাগিনী কুন্দনন্দিনী? স্বপ্নদৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনা কুন্দ ত নগেন্দ্রের দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই, নগেন্দ্রই ত তাহাকে আশা ভরসা দিয়া, সান্ত্বনা মন্ত্রণা দিয়া আপনার সুখ শান্তির পথে কণ্টক করিবার জন্য লইয়া আসিলেন। দোষ কাহারও নাই—বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করিবে কে? নগেন্দ্র কুন্দকে দেখিয়া সূর্য্যমুখীকে ভুলেন নাই, কুন্দের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পদতলে হৃদয়-সিংহাসন পাতিয়া দেন নাই। দুরবস্থা দেখিয়া তিনি তাহাকে আশ্রয় দেন মাত্র--সূর্য্যমুখীই এ কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায়। তখন কমলমণি, নগেন্দ্রনাথ, সূর্য্যমুখী, কেহই জানিতেন না যে, এই সরলতার প্রতিমা বালিকা কুন্দনন্দিনী একদিন দত্তগৃহে অশান্তির কারণ হইয়া উঠিবে, যে সূর্য্যমুখী তাহার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন, সেই পতিপ্রাণা সাধ্বীর একমাত্র আশা ভরসা সম্বল স্বামীর স্নেহে কুন্দই ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইবে। সূর্য্যমুখী হাসিতে হাসিতে নগেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, কুন্দকে বিবাহ করিতে তাঁহার যদি অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সূর্য্যমুখীই বরণডালা সাজাইতে বসেন। তামাসা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, কে জানিত—চারি পাঁচ বৎসর পরে তাহাই সত্য ঘটনায় পরিণত হইবে? কিন্তু হইয়াছিল তাহাই। কুন্দনন্দিনী যাহা স্বপ্নেও জানিত না, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যাহা এক দিনের জন্যও ঠাঁই পায় নাই, কালের অনিবার্য্য ঘটনায় তাঁহাদের কপালে তাহাই ঘটিয়াছিল। কুমারী কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রকে আকর্ষণ করে নাই, কিন্তু বিধবা কুন্দ নগেন্দ্রময়ী হইয়া সূর্য্যমুখীকে স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল।

তাই বলিয়া কুন্দকে দোষ দেওয়া যায় না। সে নগেন্দ্রকে ভাল বাসিত মাত্র—ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু সে কখনও সূর্য্যমুখীর হিংসা করে নাই। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই তাহার সুখ—সূর্য্যমুখীকে নগেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কথা তাহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। বাপীতটে একাকিনী দেখিয়া নগেন্দ্র যে দিন কুন্দকে সহস্র কাতরবচনে আপনার প্রেম জানাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, ইচ্ছা করিলে কুন্দ সেই দিনই আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিত, কিন্তু সরলা কুন্দ ত তেমন নহে, সূর্য্যমুখীর মুখ চাহিয়াই কুন্দ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, একবার বল কুন্দ, তুমি আমার গৃহিণী হইবে কি না? কুন্দ উত্তর দিল, না। নগেন্দ্র বলিলেন, একবার শুধু বল, আমায় ভাল বাসিবে কি না? হৃদয়ের কষ্ট হৃদয়ে চাপিয়া কুন্দ উত্তর দিল, না। কুন্দের কথায় অভিনয় নাই, অভিমান নাই, ইহা সাধাইবার ফাঁদ পাতা নহে। প্রেমের পাক দেওয়া রোগ কুন্দের জ্ঞানের অতীত।

আর সূর্য্যমুখী—সূর্য্যমুখী আপনাতে আর নাই। নগেন্দ্রনাথ ধনে, মানে, জ্ঞানে, কিছুতেই নীচ নহেন। তাঁহার স্বভাব কত লোকের আদর্শ হইবার মত। আজ কি না এমন দেব স্বামী পতিব্রতার অকপট প্রেম তুচ্ছ করিয়া, সংসার বিষয় বিভব মানসম্ভ্রম পায়ে ঠেলিয়া, লালসার মোহে অকূলে ভাসিয়া চলিয়াছেন; ইহা দেখিয়া পতিহিত-কারিণীর হৃদয়ে আঘাত লাগিবে না ত লাগিবে কাহার? সূর্য্যমুখী বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কুন্দকে গোবিন্দপুরে আনাইয়াছিলেন, তাহার সহিত তারাচরণের বিবাহ দিলেন, তারাচরণের মৃত্যুর পর অনাথিনীকে আপনার আলয়ে আশ্রয় দান করিলেন, কুন্দকে চিরদিনই তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। কুন্দের উপর তাঁহার কিছুমাত্র হিংসা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া উদারতার আত্যন্তিকতাবশতঃ স্বামীর স্নেহ হইতে কে বঞ্চিত হইতে চায়? সূর্য্যমুখী দেখিলেন, অনিন্দ্যস্বভাব সংযমী নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতেছে, তাঁহার অবহেলায় সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়, হৃদয়ের সুগভীর বেদনা তিনি আর চাপিতে পারিলেন না, ভগিনীসমা ননন্দা কমলমণিকে একখানি পত্রে সকল কথা জানাইলেন। পত্রখানি যেন তাঁহার চোখের জলে লেখা—সেখানি পাঠ করিলেই সূর্য্যমুখীর মনের অবস্থা বুঝা যায়। যথাসময়ে কমলমণি পত্রের উত্তর দিলেন; পত্রের ছত্রে ছত্রে সূর্য্যমুখীকে বুঝাইয়াছেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইও না।

কমলের পত্র পাইয়া সূর্য্যমুখী মনকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। নগেন্দ্রের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—নগেন্দ্র মদ্যপ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিলেন। সূর্য্যমুখীর কষ্টের আর অবসান নাই। অঞ্চলে

চক্ষু মুছিয়াই তাঁহার দিন কাটে। নগেন্দ্রকে কোন কথা বলিতে গেলে তিনি রাগিয়া যান, ফল না হইয়া হিতে বিপরীত হয়। সুতরাং সূর্য্যমুখীকে আপনার মনেই গুমরিয়া থাকিতে হইত।

এই সময়ে একদিন সূর্য্যমুখীর গৃহে আবার হরিদাসী বৈষ্ণবীর আবির্ভাব হইল। দুই একটি গানের পর কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী এ কথা সে কথা অনেক কথা পাড়িল। সন্দেহ হওয়ায় সূর্য্যমুখী হীরাদাসীকে চর লাগাইয়া জানিলেন, হরিদাসী বৈষ্ণবী আর কেহ নহে—ছদ্মবেশী দেবেন্দ্র দত্ত। হীরা আরও প্রতিপন্ন করিল যে, দেবেন্দ্র দত্ত কুন্দের প্রণয়ী, তাহার সহিত কুন্দের অনেক দিনের পরিচয়। এই কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কুন্দকে যথেচ্ছা ভৎর্সনা করিলেন। তাঁহার ভৎর্সনায় সেই দিন রাত্রেই কুন্দ নগেন্দ্রনাথের গৃহ ছাড়িয়া গেল।

এত দিন যে প্রেম ধুঁয়াইতেছিল, কুন্দের বিরহে আজ তাহা জ্বলিয়া উঠিল। কুন্দকে পাইবার জন্য নগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—সূর্য্যমুখীর উপর তাঁহার আরও বিরক্তি জন্মিল। নগেন্দ্র একদিন কথায় কথায় সূর্য্যমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুন্দনন্দিনীকে তিনি কি বলিয়াছিলেন! সতীলক্ষ্মী সূর্য্যমুখী প্রাণাধিক স্বামীর চরণে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া সুস্থ হইলেন। অন্যা নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ভাগিনী জানিয়া তিনি আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় স্বামীর মুখ চাহিয়া তিনি মরিতেও পারেন না। নগেন্দ্রও সূর্য্যমুখীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সূর্য্যমুখীকে না বলিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। শেলসম হইলেও তিনি সূর্য্যমুখীকে বলিলেন যে, তিনি দেশত্যাগী হইয়া চলিলেন, যদি কুন্দকে ভুলিতে পারেন, তবেই প্রত্যাগমন করিবেন, নহিলে ইহাই শেষ দেখা। স্বামীর পায়ে ধরিয়া সূর্য্যমুখী তাঁহাকে আর এক মাস মাত্র অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নগেন্দ্র মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

নিরপরাধিনী কুন্দকে ভৎর্সনা করিয়া অবধি সূর্য্যমুখীর অন্তরে শান্তি নাই। রাগের মাথায়ই তিনি কুন্দনন্দিনীকে যথেচ্ছা ভৎর্সনা করিয়াছিলেন ; রাগ পড়িয়া গেল, ক্রমে অনুতাপ উপস্থিত হইল। নগেন্দ্রনাথ আবার কুন্দনন্দিনীর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। এক মাসের মধ্যে কুন্দকে না পাইলে তিনি দেশত্যাগ করিবেন। ভাবিয়া ভাবিয়া সূর্য্যমুখীর দেহ শুকাইয়া গেল। বিধাতা সূর্য্যমুখীর প্রতি সদয় হইলেন—নগেন্দ্র-বিরহকাতরা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের দর্শন-কামনায় অন্তঃপুরের উদ্যানে আসিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট ধরা পড়িল। "এসো দিদি এসো" বলিয়া সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া আসিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই নগেন্দ্রের সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হইল। এ

বিবাহে ঘটক—সূর্য্যমুখী স্বয়ং। কিন্তু বিবাহের পরে ঘটক নিরুদ্দেশ হইলেন। কমলমণিকে একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গেলেন, "জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছি।" আরও কমলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, যে দিন স্বামীর প্রেম হইতে বঞ্চিত হইবেন, সেই দিনই যেন তাঁহার আয়ুঃশেষ হয়। সূর্য্যমুখীকে এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।

নগেন্দ্রের গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য সূর্য্যমুখী আদবেই দোষী নহেন। গৃহত্যাগেও সূর্য্যমুখীর লাবণ্যহানি হয় নাই—বাহিরেও সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের। হৃদয়ে নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহাকে বল দিয়াছিল। কিন্তু পৌরুষিক কাঠিন্য কখনও সূর্য্যমুখীতে দেখা যায় নাই। হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল, সূর্য্যমুখী মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি নগেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন নাই। সূর্য্যমুখী দেখিলেন, নগেন্দ্রনাথ কুন্দের সৌন্দর্য্যে হৃদয় বাঁধা দিয়াছেন, যেখানে তাঁহার ভিন্ন কাহারও কখনও আসন বিছাইতে সাহস হয় নাই, সেই নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কুন্দ এখন অনুক্ষণ জাগিতেছে, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের ভয়ের কারণ—ভালবাসার প্রতিবন্ধ মাত্র, সূর্য্যমুখী গৃহ ত্যাগ করিলেন—শ্বশুরের গৃহ ও স্বামীর গৃহ, আপনার গৃহ ছাড়িয়া অসহায়া একাকিনী কুলবধূ সূর্য্যমুখী উন্মাদিনীর মত সংসারের ভীষণ তরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। কুন্দ এবং নগেন্দ্রের মধ্যে তিনি ব্যবধান থাকিবেন কেন? সূর্য্যমুখী দেখিলেন, স্বামী তাঁহার কথা শুনেন না, তাঁহার মঙ্গল পরামর্শ গ্রহণ করেন না, ভোগলালসাপরিচালিত নগেন্দ্রনাথের সংসার তীরবেগে উৎসন্নের পথে ছুটিয়াছে; সূর্য্যমুখী কুন্দকে নগেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সংসারে যথাসাধ্য শান্তি স্থাপন চেষ্টা করিলেন। হৃদয়বেদনায় অস্থির হইয়া আপনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—আত্মহারার মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

কুন্দনন্দিনীকে স্বর্গের শোভায় উঠাইবার জন্য বিজ্ঞ সমালোচকেরা সূর্য্যমুখীর এই কার্য্যকে যতই নিন্দনীয় বলুন না কেন, সূর্য্যমুখীর কুলবধূসৌন্দর্য্যের ইহাতে যে কিছু মাত্র হানি হয় নাই, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কুন্দ স্বর্গের শোভা হইতে পারে, কিন্তু সূর্য্যমুখী শোভামাত্র নহে, স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। নগেন্দ্রনাথের পার্শ্বে দুই জনকে দাঁড় করাইয়া দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের সংসারে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী—নগেন্দ্রনাথের "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।" সূর্য্যমুখীতে গুণের অভাব নাই—তিনি গৃহকার্য্যে দক্ষা, পড়াশুনায় নিপুণা, পতিভক্তিতে সীতাসমা। সূর্য্যমুখী মানবী—দেবী—লক্ষ্মী। লক্ষ্মী বলিয়াই

এত কষ্টেও তিনি আত্মহত্যা করিতে পারেন নাই—নগেন্দ্রনাথের জন্য হৃদয়ে জ্বালা বহন করিয়া জীবন্তে মৃত হইয়া ছিলেন।

কুন্দ যে নগেন্দ্রকে হৃদয় ঢালিয়া ভাল বাসিত, সে কথা কেহ অস্বীকার করিবে না; ভালবাসার জন্যই কুন্দের যাহা সৌন্দর্য্য। কিন্তু সূর্য্যমুখীর ভালবাসা ত কুন্দ অপেক্ষা হীন নহে। নগেন্দ্রে তিনি হৃদয় মিশাইয়াছিলেন—নগেন্দ্র হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারিতেন না। কুন্দ বিবেচনা শক্তিতে, গৃহকর্ম্মে তাদৃশ দক্ষা নহে—সূর্য্যমুখীর নিকট সারা জীবন শিক্ষা পাইলেও কুন্দের এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু কুন্দের এই সংসারানভিজ্ঞতাতেই আমরা অনেকটা মুগ্ধ হইয়া পড়ি, তাহার কষ্টে আমরাও দুঃখ অনুভব করি, সেই সরলতার প্রতিমার পানে চাহিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে থাকি। তাহার জীবনে আমরা একটা রহস্যচ্ছায়া দেখিতে পাই। আরম্ভ ও অবসানের মধ্যে কি যেন নীরব মাধুরী কুন্দের মুখে চোখে ফুটিয়া পড়িয়াছে—তাহার হৃদয়ের অন্তরতম আকুলতা হইতে কে বুঝি নীরবে সুধা ঢালিতেছে! কিন্তু তাহার জন্য যতই সহানুভূতি প্রকাশ করি না কেন, স্বীকার করিতে হইবে, সূর্য্যমুখী স্বর্গেও দুষ্প্রাপ্য। কুন্দনন্দিনীর বেশ একটি ভাব আছে বটে, তাই বলিয়া কুন্দকে আদর্শ স্ত্রী বলা যায় না। সূর্য্যমুখী যথার্থ সহধর্ম্মিণী; কুন্দ ভার্য্যা মাত্র। তথাপি আবার বলি, কুন্দ নগেন্দ্রকে সমস্ত হৃদয় দিয়া যেরূপ ভালবাসিত, সেরূপ ভালবাসিতে অনেক ভার্য্যা অক্ষম। অন্যান্য অনেক গুণে সূর্য্যমুখী অপেক্ষা হীন হইলেও কুন্দ এ বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা কম নহে।

সূর্য্যমুখীকে আমরা যে সহধর্ম্মিণী বলিলাম, তাহা কথার কথা নহে। নগেন্দ্রনাথও তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। দুই দিনের জন্য মেঘ আসিয়া সূর্য্যমুখীকে আড়াল করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু সূর্য্যমুখী "সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।" সূর্য্যমুখী তাঁহার সর্ব্বস্ব। মোহের ছলনায় এমন প্রাণ-প্রিয়া সহধর্ম্মিণীকেও তিনি ভুলিয়াছিলেন। এখন বিরহে সূর্য্যমুখী জাগিয়া উঠিতেছে। সূর্য্যমুখীর জন্য নগেন্দ্র দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, একবার কোনও প্রকারে দর্শন পাইলে যেমন করিয়া হোক্ লইয়া আসিবেন। এবারে তিনি সূর্য্যমুখীর অভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, সূর্য্যমুখীর অভাব সহস্র কুন্দনন্দিনীতে পূরণ করিতে পারিবে না।

সন্ধ্যার সহিত সূর্য্যমুখীর মুখশ্রীর কেমন একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—দুই জনের ভাবে যেন বিশেষ ঐক্য আছে। সন্ধ্যার যেমন পবিত্র মহান্ ভাব দেখিলেই

কেমন স্নেহময়ী গৃহিণী বলিয়া মনে হয়, সূর্য্যমুখীরও সেইরূপ বড় একটি সুন্দর ভাব দেখা যায়। সে মুখে পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি মাখান। সেখানে হৃদয় খুলিয়া আনন্দ আছে—প্রাণ বলি দিয়া প্রাণ পাওয়া যায়। কুন্দনন্দিনীকে আমরা সন্ধ্যা কি ঊষার সহিত তুলনায় আনিতে পারি না। ঊষা অপেক্ষা তাহার ধীর গতি—ঊষার মত সে ফুল তুলিয়া, পাতা কুড়াইয়া, লাফাইয়া বেড়ায় না। ঊষার মত বালিকা কুন্দ নহে। ঊষার ভালবাসায় যৌবন নাই—প্রণয়ে হতাশ হইয়া ঊষা মরিবে না। কুন্দের ভালবাসা যৌবনের প্রণয়—তাহাতে নৈরাশ্য, ভয়, শিহরণ, সকলই আছে। সন্ধ্যার মত কুন্দ গৃহিণীও নহে—মাতৃভাব কুন্দে বড় পরিস্ফুট নয়। সূর্য্যমুখীর সন্তানাদি ছিল না বটে, কিন্তু মাতৃভাব তাঁহাতে সমধিক পরিস্ফুট। এই মাতৃভাব না থাকিলে তিনি নগেন্দ্রের অত বড় সংসারে লক্ষ্মী হইয়া বিরাজ করিতে পারিতেন না।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া যখন আর কোথাও পাইলেন না, জানিলেন, সূর্য্যমুখী হরমণি বৈষ্ণবীর গৃহদাহে পুড়িয়া মরিয়াছেন, তখন হতাশচিত্তে গোবিন্দপুরে ফিরিবেন স্থির করিলেন। গোবিন্দপুরে তাঁহার আর বাস করিতে ইচ্ছা নাই, চিরজীবনের মত একবার তাহার নিকট বিদায় লইয়া যাইবেন—একবার সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিবেন। গৃহধর্ম্ম তাঁহার আর ভাল লাগে না। শ্রীশচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় নগেন্দ্র দেখা করিলেন। বিষয়কর্ম্মের বিলিব্যবস্থা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কলিকাতায় আবশ্যকীয় কার্য্য শেষ করিয়া নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দপুরে চলিলেন, শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে গোবিন্দপুরে গিয়া বাড়ীঘর পরিষ্কার করাইয়া রাখিলেন। নগেন্দ্র গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর শোকে কাতর নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ বড় ব্যথিত হইল।

সেই দিন রাত্রিকালে নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার চারি দিকে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে সূর্য্যমুখীর স্মৃতি। এক স্থানে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন,

"১৯১০ সম্বৎসরে
ইষ্টদেবতা
স্বামীর স্থাপনা জন্য
এই মন্দির
তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী
কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইল।"

কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী

নগেন্দ্র এই লেখাটি অনেক বার পড়িলেন, তাঁহার আর আশ মিটে না—চোখের জল চোখে মুছিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া আসিল, আলোকের চিহ্নমাত্র রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। সেই অন্ধকারালোকে নগেন্দ্র একটি স্ত্রীরূপিণী ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন--চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে তিনি দেখিলেন যে, তিনি যেন কাহার কোলে শয়ন করিয়া আছেন। তখনও ঘুমের ঘোর ছাড়ে নাই—কুন্দের নাম সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে। রমণী উত্তর করিলেন, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি এত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।" নগেন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সূর্য্যমুখী। আর আনন্দের সীমা রহিল না—বাড়ীতে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিল। চারি দিকেই আনন্দ উল্লাস—সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এ দিকে সূর্য্যমুখী ও কমলমণি কুন্দকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন যে, কুন্দ বিষ পান করিয়াছে। কমল গিয়া তাড়াতাড়ি নগেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার আসিল, বৈদ্য আসিল, একে একে জবাব দিয়া চলিয়া গেল। কুন্দের আজ প্রথম মুখ ফুটিয়াছে। নগেন্দ্রকে বলিল, তোমাকে দেখিয়া মরিবার ইচ্ছা ছিল, সে সাধ পূর্ণ হইল, কিন্তু তোমাকে দেখিলে মরিতে আর ইচ্ছা হয় না। কুন্দের ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্যমুখী বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কমলও অতিশয় কাতর। নগেন্দ্রনাথও রোরুদ্যমান। অনেক কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নগেন্দ্র কুন্দের যথাবিহিত সৎকার করিলেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের হৃদয়ে এই দুর্ঘটনা জাগিয়াছিল।

কুন্দের মৃত্যুতে সূর্য্যমুখীর সকল শান্তি অবসান হইল। কুন্দকে তিনি আপনার কনিষ্ঠার ন্যায় স্নেহ করিতেন, কুন্দের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল। কুন্দও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিত। আজ দুই জনের ভালবাসার মধ্যে অশ্রুজল মাত্র অবশেষ, আনন্দ সুখ শান্তি সকলই নির্ব্বাণ হইল। বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডিতে দাঁড়াইল।

'ভারতী ও বালক', ফাল্গুন ১২৯৫

গোধূলি ও সন্ধ্যা

বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যই যদি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির মত সুন্দর। কোথায়? প্রকৃতিতে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তাহাতে শৃঙ্খলা এমনি যে, বিপ্লব অনুভব করা যায় না। যে রঙের পর যে রঙ্ মিলে, যে সুরের পর যে সুর শুনায় ভাল, যে ভাবের পর যে ভাব বসিলে উভয়েরই সৌন্দর্য্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায়, প্রকৃতিতে সকলই এইরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট। অশোভন জাঁকজমক তাহার কোথাও নাই—সর্ব্বত্রই শোভন গাম্ভীর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে। এই জন্যই প্রকৃতিতে লোকের অরুচি ধরে না।

সে যাহা হৌক্, প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে যেখানে যেখানে সাদৃশ্য অনুভূত হয়, সেখানে বিভিন্ন ভাবের বৈসাদৃশ্য সহজে অনুভব করা যায় না। সাদৃশ্যে দুইটি বিভিন্ন ভাব অনেক সময় এক বলিয়া প্রতিভাত হয়। গোধূলি ও সন্ধ্যা এইরূপে প্রায় এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভাবের মিলন থাকিলেও ইহাদের মধ্যে প্রভেদও অনেক আছে। আমরা একে একে যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গোধূলির রঙে সন্ধ্যার স্নেহময় ভাবের বিশেষ অভাব। তাহাতে একটা আরামের ভাব আছে বটে, কিন্তু সন্ধ্যার শান্তি নাই। গোধূলিতে কাজকর্ম্ম সমাপন হইল, সন্ধ্যায় বিশ্রাম আসিবে। গোধূলি নির্ব্বাণ হইয়া আসার অবস্থা, সন্ধ্যায় দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে—নির্ব্বাপিত দীপশিখায় একটি সূক্ষ্ম সিন্দূররেখা মাত্র অবশিষ্ট।

গোধূলি পুরাতনের মৃত্যু, সন্ধ্যা নূতন সৃষ্টি। গোধূলির অবসানের মধ্য হইতে সন্ধ্যার নূতন সৃষ্টির বিকাশ হয়। গোধূলির পরে একটা ছেদ পড়িয়াছে। সন্ধ্যা যেন অবসন্ন জগৎকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছে—গোধূলি অপেক্ষা সন্ধ্যায় গার্হস্থ্যের বিকাশ হইয়াছে। সন্ধ্যায় যেমন প্রাণ পূরিয়া উঠে, গোধূলিতে তেমন নহে। যোগীর চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হইয়া আসিতেছে, ইহাই গোধূলির ভাব; এখন তাঁহার সেই ভূমানন্দলাভস্পৃহা বড়ই বলবতী। সন্ধ্যায় প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে—যোগীর মুখে চোখে সেই আনন্দভাব দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু এ আনন্দে বড়ই স্থির ভাব। ঊষার আনন্দভাবের সহিত ইহার তফাৎ আছে।

গোধূলিতে গির্জ্জার ঘণ্টা বড় মধুর শুনায়, কিন্তু দেবমন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টা সন্ধ্যাতেই জমে ভাল। শঙ্খের শব্দ গোধূলিতে নিতান্ত কেমন কেমন ঠেকে। গির্জ্জার ঘণ্টায় কি যেন গোধূলির রাগিণী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ধীরে ধীরে থামিয়া আসার ভাব আছে। দেবমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে বন্দনার গান শুনা যায়—হৃদয় হইতে

ভগবানের নাম উঠিতেছে। গোধূলি হৃদয়কে কতকটা সংযত করিয়া আনে; সন্ধ্যায় সংযত হৃদয় সেই প্রেমময়ের ধ্যানে নিযুক্ত হয়।

পূরবী ঠিক সন্ধ্যার রাগিণী—পূরবীর মত সন্ধ্যার ভাব অন্য কোনও রাগিণীতে ব্যক্ত হয় না। যে দেশেরই অধিবাসী হোক্ না কেন, পূরবী রাগিণীতে তাহার মনে সন্ধ্যার ভাব উদয় হইবেই। সন্ধ্যার অন্যান্য রাগিণী সন্ধ্যা খানিকটা জমিয়া না আসিলে জমে না। পূরবী রাগিণীতে সন্ধ্যার উদয় ঠিক ধরা পড়িয়াছে। গোধূলি ও সন্ধ্যার সন্ধিস্থলে পূরবী।

উষার সহিত সন্ধ্যার যেমন একটা সাদৃশ্য আছে, সূর্য্য উঠিবার পর উষার সহিত গোধূলিরও সেইরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে দুয়ের ভাবে যে বিশেষ মিলন আছে, তাহা নহে, কিন্তু আকারগত সাদৃশ্য কতকটা আছে। কিন্তু সে কথা যাক্, গোধূলি ও সন্ধ্যার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

গোধূলিতে বিবাহের ভাব বিশেষ ব্যক্ত; সন্ধ্যায় বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহদিনের বর কন্যার লজ্জা-সঙ্কোচের ভাব সন্ধ্যায় ততটা নাই। গোধূলিতে মিলনটা তেমন এখনও হয় নাই, কিন্তু এ সেই তাহারই আয়োজন হইতেছে।

সন্ধ্যায় মন খুলিয়া সুখ আছে—যেন মনে হয়, আমার দুঃখ বুঝিবার কেহ আছে। সন্ধ্যার ভাবে আমরা কেমন শান্তি অনুভব করি। সন্ধ্যায় আমরা হৃদয়ের সাড়া পাই—তাই আমাদেরও হৃদয় উন্মুক্ত হয়। বাহিরের সুখ দুঃখ হইতে টানিয়া আনিয়া সন্ধ্যায় আমরা আপনাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করি। বাহির হইতে গৃহে আসিয়া জুড়াই।

গোধূলিতে মন খুলিয়া তেমন তৃপ্তি নাই—সন্ধ্যার মত গোধূলি আমাদের সুখ দুঃখ বুঝে না। গোধূলিতে অনেক ভাব আসিয়া জমে, কিন্তু তাহারা চাপা থাকিয়া যায়। গোধূলিতে ফুল ফুটে ফুটে, সন্ধ্যায় বিকশিত কুসুমের সৌরভ বিকীর্ণ হয়। সন্ধ্যা ভাবের বিকাশ—সন্ধ্যা না হইলে ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না।

সংক্ষেপতঃ গোধূলি স্থিতির দিকে গতি, সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্ব আয়োজন মাত্র। সন্ধ্যায় সব থিতাইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা স্থিতি—শান্তি।

'ভারতী ও বালক', চৈত্র ১২৯৫

মেঘদূত

কত দিন নীরবে হৃদয়ের জ্বালা বহন করিয়া আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তৃষিতনেত্রে বিরহী যখন নবীন মেঘপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া দেখে, তখন তাহার বিরহকাতর হৃদয়ে না জানি, কোন্ স্মৃতিময়ী মায়াপুরীর সুখদুঃখের কথা উদয় হয়! সারা বৎসরের মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম মেঘে বিরহের এমন কি স্মৃতি আছে যে, এত দিন প্রবাসের তীব্র যন্ত্রণায় যাহার বিরহ সহিয়া আসিতেছি, আজ সহসা তাহার জন্য প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠে—আজই তাহার বিরহ অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। কি আছে কে জানে, কিন্তু আষাঢ়ে বিরহকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না; প্রাবৃটের নবীন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে বিরহীর হৃদয়েও প্রিয়-বিরহ জাগিয়া উঠে। বিরহিণীরা প্রিয়তমের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকেন। প্রবাসক্লিষ্ট প্রিয়তমেরা প্রবাসের বিজন অরণ্যে বসিয়া মেঘকে বিরহিণীর নিকট সংবাদ লইয়া যাইতে বলেন। মেঘই বর্ষার বিরহে প্রাণ।

অন্য ঋতুর বিরহে দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় দিন আর কাটে না। মুহূর্ত্তকে তখন যুগান্তর বলিয়া মনে হয়—বিরহের বন্ধনে সময় যেন গতিশক্তিহীন হইয়া পড়ে। কুবেরশাপে অভিশপ্ত যক্ষ তাই বুঝি, আষাঢ়ের প্রথম দিনে রামগিরিশিখরে শ্যাম মেঘ দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না—তাহার মনে সম্মুখের দীর্ঘ বিরহদুঃখ উথলিয়া উঠিতেছে। এক বৎসর প্রবাসের কয় মাস মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে, যক্ষের শরীর এমনি শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রকোষ্ঠ হইতে বলয় খসিয়া পড়ে। এই দীর্ঘ বর্ষা প্রিয়ার সংবাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া সে জীবন ধারণ করিবে কিরূপে? নবপল্লবসজ্জিত বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী নিশির দারুণ বিরহও প্রণয়িনীর সংবাদ বিনা কাটান যায়; কারণ, মিলনেচ্ছার প্রভাবেই বিরহ তখন গুরুতর, তাহাতে বিভীষিকার ছায়া নাই; কিন্তু এই দীর্ঘ অন্ধকার বর্ষায় বিরহিণীর কথা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকা অতীব দুরূহ। যক্ষের বুক ফাটিয়া যাইতেছে যে, বিরহিণী কান্তার এই দীর্ঘ কাল আশাপথ চাহিয়াই দিন কাটিবে, কিন্তু যক্ষ প্রবাস হইতে ফিরিতে পারিবে না।

চিরদিন প্রবাসের তাপ ভোগ করিতেও যক্ষ কাতর নহে, যদি এই বর্ষার সময় প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পায়। কিন্তু কি করিবে, কান্তাদর্শন-স্পৃহা যতই বলবতী হৌক্ না, তাহাকে গুমরিয়া থাকিতে হইবে; কুবেরের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। যক্ষ ভাবিল, দর্শনলাভ কপালে না ঘটে, এক বার মেঘের দ্বারা প্রিয়তমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করি, তবুও তাহার ব্যথার কিছু উপশম হইবে। এই

স্থির করিয়া যক্ষ একদিন মেঘকে দৌত্যকার্য্য করিবার জন্য ধরিয়া বসিল। মেঘ দূত হইল।

কালিদাসের মেঘদূতে ঘটনা এইটুকু। কুবেরের শাপে অভিশপ্ত একজন যক্ষ মেঘের দ্বারা কান্তার নিকটে সংবাদ পাঠাইতে চাহে। কিন্তু ঘটনা এইটুকু বলিয়া মেঘদূত উপেক্ষণীয় নহে। মেঘদূতে ঘটনার আর আবশ্যক নাই। কারণ, ইহা নাটক অথবা উপন্যাস নহে যে, বিরহনিশ্বাসের মর্ম্মস্পর্শিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অসংখ্য সখীর অশ্রুসিক্ত সান্ত্বনাবাক্যের সাহায্য লইতে হইবে। মেঘদূত গীতিকাব্য—কালিদাস ইহাতে বর্ষাকালে বিরহের প্রভাব দেখাইতেছেন। বাহ্য জগৎ অন্তরের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, ইহা দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য তাঁহার সফলও হইয়াছে। যক্ষের মুখ দিয়া তিনি মেঘকে যে কথা বলাইয়াছেন, তাহার ছত্রে ছত্রে বিরহ জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। ভাবের সহিত সম্পর্কশূন্য একটি কথাও তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হয় নাই। ভাবের ঠিক রাগিণী ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কাব্যের এত গৌরব।

কালিদাস অপেক্ষা মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ গভীর চিন্তাশীল অনেক কবি আছেন স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার মত বিরহের কবি আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। তিনি যেন বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। বিরহ ঔৎসুক্যের কোন স্থানই তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। কালিদাস বুঝিতেন, মেঘকে সংবাদ লইয়া যাইতে বলা সচেতন প্রাণীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও যে তিনি মেঘকেই যক্ষের সংবাদবাহী ঠাহরাইয়াছেন, তাহার কারণ আছে। যক্ষ বিরহে এমনি কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার চৈতন্যভ্রংশ হইয়াছে বলা যায়। যক্ষের কতকটা উন্মাদাবস্থা। তাই সে মেঘকে ধরিয়াছে—হে মেঘ, তুমি আমার সংবাদ লইয়া যাও। কাজটা বেহিসাবী সন্দেহ নাই, কিন্তু কালিদাস যক্ষকে পাকা হিসাবী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না। সেই জন্য এই বেহিসাবী কাজেই মেঘদূতের কবিত্ব।

মেঘদূত বিরহের কাব্য; এবং বোধ হয়, বিরহের শ্রেষ্ঠ কাব্য। জয়দেব বল, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বল, বিরহজ্বালা অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকাশ করিতে সক্ষমও হইয়াছেন; কিন্তু কালিদাসের মত সংক্ষেপে অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বিরহীকে কেহ বাহির করিতে পারিয়াছেন বোধ হয় না। মেঘদূতের প্রথম গুটিকয়েক শ্লোকেই কালিদাস যক্ষের অবস্থা যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনেক কথা বলেন নাই বটে, কিন্তু এক একটি কথায় তাঁহার বলা হইয়াছে অনেক। যক্ষের শরীরের অবস্থা

তিনি এক কথায় বলিয়াছেন—কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ। কনকবলয় কথাটিতে যক্ষ যে কুবেরের অনুচর, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। পরের শ্লোকে তিনি মেঘ সন্দর্শনে বিরহীর মনের ভাব লিখিয়াছেন; আর, একটি বিশেষণে যক্ষের সমস্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়াছেন—অন্তর্বাষ্পঃ। তাহার পর যক্ষ যখন মেঘের স্তব করিতেছে, তখন বেশ বুঝা যায় যে, যক্ষ আপনার কাজ ভুলে নাই, এ দিকে জ্ঞানহারা হইলেও কিরূপে আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতে হয় জানে। মেঘকে সে কেমন গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতেছে, "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা"।

যক্ষের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিবার, তাহা কালিদাস এইটুকুর মধ্যেই একরকম সব ব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে যক্ষ মেঘকে অলকার পথের কথা বলিয়া দিতেছে, তাহা না হইলে প্রিয়ার নিকট সন্দেশ পঁহুছিবে কিরূপে? পথের বর্ণনার মধ্যে মধ্যে যক্ষের ভাব বেশ ধরা দেয়। সে বর্ণনা বিরহীর মতই হইয়াছে। বর্ষাও তাহার মধ্যে এমনি পরিস্ফুট যে, পড়িতে পড়িতে চোখের সম্মুখে কদম্ব ফুটিয়া উঠে, ধরণী হইতে বৃষ্টিবারি-সিক্ত একপ্রকার স্নিগ্ধ গন্ধ বাহির হইতে থাকে, চারি দিকে আনন্দোৎফুল্ল ময়ূর ময়ূরী বর্ষার তালে তালে নাচিয়া উঠে। পথের বর্ণনা করিতে করিতে ফাঁক পাইলেই যক্ষ বিরহকাতরতা প্রকাশ করিয়াছে। অথবা, অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। কিন্তু যাহাই হৌক্, কালিদাস যক্ষকে বর্ণনার স্রোতের মধ্যেও বিরহী রাখিতে পারিয়াছেন, মেঘদূতের সকল বর্ণনার মধ্যেই বিরহের ভাবের বরাবর কেমন একটা স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মেঘকে যক্ষ বলিতেছে, "কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং"। এখন কি আর তাহাকে উপেক্ষা করা যায়? তাহার পর বুঝাইতেছে—তুমি সংবাদ লইয়া যাও, অনুকূল বায়ু তোমার সহায় হইবে, চাতকেরা গান গাহিবে, কোন সুখেরই ত্রুটি হইবে না। যাও ভাই, তুমি গিয়া সেই দিবসগণনতৎপরা, কেবল আমার প্রত্যাগমনাশায় জীবিতা বিরহিণীকে সান্ত্বনা দাও; নহিলে সে কি আর বাঁচিবে? পথে ঐ রঘুপতি-পদাঙ্কিত শৈলকে আলিঙ্গন করিয়া তোমারও বিরহ-যাতনার উপশম হইবে। তাহার পর কত গিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া, কত সভ্রূভঙ্গ নদীর অধর পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইবে। উজ্জয়িনী না দর্শন করিলে জীবনই বৃথা। বিরহ-কৃশদেহ সিন্ধুর কার্শ্য ঘুচাইতেও চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। যাও মেঘ, আরও যাও। রজনীতে সূচিভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধালোক রাজপথে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিয়া প্রিয়ভবনাভি-মুখগামিনী যোষিৎদিগকে তুমি পথ দেখাইয়া দিও, কিন্তু তোমার গম্ভীর গর্জ্জনে তাহা-দিগকে ভয় প্রদর্শন করিও না। যাও মেঘ, আরও যাও। যাও, হিমাচল ছাড়াইয়া,

মানস-সরোবর পার হইয়া যাও। কৈলাসগিরিবক্ষে জ্যোৎস্নাময়ী অলকার রমণীয় শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

এইবারে যক্ষ অলকার বর্ণনা করিতেছে; অলকা বিলাসের লীলাক্ষেত্র। না হইবেই বা কেন, ধনপতির অনুচরেরা বিলাসী হইবে না ত হইবে কে? কালিদাস যক্ষকে বরাবর এই বিলাসের লীলাক্ষেত্রজাত রাখিয়াছেন। যক্ষের কথায় বিলাসলালসা সুব্যক্ত। অলকার বর্ণনা পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারি, কালিদাস যক্ষের মুখে যে সকল কথা বসাইয়াছেন, তাহা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে—তাঁহার যক্ষের চিত্র কত দূর নিখুঁৎ। যক্ষকে বিলাসপ্রিয় দেখিতে যাঁহারা কাতর, তাঁহারা কালিদাসকে দোষ দিতে পারেন। কিন্তু বুঝা উচিত, কালিদাস আদর্শ মনুষ্য খাড়া করিবার চেষ্টা করেন নাই, যক্ষের প্রকৃত চিত্র আঁকিয়াছেন মাত্র। আরও মনে রাখিতে হইবে, মেঘদূত কালিদাসের সৃষ্টি বটে, কিন্তু যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে।

বায়রণের চাইল্ড্ হ্যারল্ড্ একটি বিলাসীর চিত্র—বায়রণের নিজের সৃষ্টি। চাইল্ড্ হ্যারল্ড্‌কে ইচ্ছা করিলে বায়রণ আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছাঁচে গড়িতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার তাহাতে আবশ্যক কি? তিনি ত বিলাসীই আঁকিতে চাহেন। শিব গড়িতে বানর গড়িলে কবি নিন্দার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে বানর গড়াই উদ্দেশ্য, সেখানে নিন্দা কিসের? তবে উদ্দেশ্যের কেহ নিন্দা করেন, করুন—আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কালিদাসের যক্ষ বিলাসপ্রিয় বটে, কিন্তু চাইল্ড্ হ্যারল্ডের মত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি নহে। আর এরূপ হইলেও কালিদাস যক্ষকে আপনার ইচ্ছানুরূপ ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে পারেন না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে। তাঁহার নিকট আমরা যক্ষের প্রকৃত চিত্র দেখিবার আশা করি, যক্ষকে বাল্মীকি মুনির মত দেখিতে চাহি না।

মেঘদূতে ছন্দের কেমন একটি গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখা যায়। বর্ণনার সঙ্গে ছন্দের বেশ মিল খাইয়াছে। ছন্দের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কথার সঙ্গে এইরূপ প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছে বলিয়াই মেঘদূত এত উচ্চ অঙ্গের কাব্য। তাহাতে অনুপ্রাস আছে, কিন্তু অনুপ্রাসবাহুল্যে কাব্যের প্রধান সৌন্দর্য্য ভাবের কোথাও হানি হয় নাই। এক কথার পাশাপাশি দুই বার ব্যবহার আছে, কিন্তু ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে বৈ বিরক্তিকর পুনরুক্তি কখনও হয় নাই। বর্ণনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি নাই; যাহা আছে, তাহা স্বভাবের সুন্দর চিত্র। বাস্তবিক, মেঘদূত পড়িতে পড়িতে আষাঢ় মাস হইয়া আসে, আকাশে নবীন মেঘ দেখা দেয়।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, মেঘদূত হইতে গুটিকতক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দি, কিন্তু

কোন্‌টিকে রাখিয়া যে কোন্‌টি উঠাইয়া দিব, তাহা ঠাহরাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। অগত্যা এ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতে না পারিলেও কালিদাসের ভাবপ্রকাশক কথানির্ব্বাচন-শক্তির পরিচয়স্বরূপ দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। উত্তরমেঘের প্রথমেই সঙ্গীতপূর্ণা অলকার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, "সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্"। মৃদঙ্গ বাজিতেছে—তাহার শব্দ কিরূপ? না, স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর। কথাগুলি এমনি বসিয়াছে যে, শুনিলেই মৃদঙ্গধ্বনি মনে পড়ে। যেন মেঘগর্জ্জন হইতেছে। রঘুবংশের প্রথম সর্গে দিলীপের রথের গম্ভীরনিনাদপ্রকাশক এইরূপ একটি শ্লোক আছে,—

"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাশ্রিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব॥"

এখানেও স্যন্দন কথাটিতে কালিদাসের ভাবপ্রকাশক শব্দনির্ব্বাচন-শক্তির যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। অন্য কোনও প্রতিশব্দ বোধ হয় এমন বসিত না। আর স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষের ভাবপ্রকাশত্বের ত কথাই নাই। সমস্ত শ্লোকটি গম্‌গম্ করিতেছে। পূর্ব্বমেঘে এক স্থানে আছে, "তন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ"। ইহার মধ্যে বৃষ্টির ভাব কেমন জাগ্রত—কি যেন ঝম্‌ঝম্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিষ্যন্দ ও উচ্ছ্বসিত, এই দুইটি কথা উঠাইয়া লইলে সমস্ত ভাবই যেন মারা যায়। নিষ্যন্দ শব্দে যেমন বৃষ্টির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, উচ্ছ্বসিত শব্দে সেইরূপ বসুধাগন্ধের ব্যাপ্তির ভাব অনুভব হয়। এইরূপ কালিদাসের ভাবপ্রকাশক শব্দনির্ব্বাচন-শক্তির পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়; এবং বোধ হয়, এই ভাবময় শব্দনির্ব্বাচনের জন্য তাঁহার কাব্যে এত সৌন্দর্য্য।

যক্ষের অলকাবর্ণনা এমন পরিষ্কার যে, তাহার আলয় খুঁজিয়া লইতে মেঘের কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। তাহার পর যক্ষ বিরহিণীর বর্ণনা করিতেছে। সে বর্ণনায় কান্তার প্রতি যক্ষের প্রেম সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত। বাস্তবিক, সে বর্ণনা পড়িলে যক্ষের দুঃখে চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। যক্ষ স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছে, "যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ"। কান্তার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া যক্ষ বলিতেছে,—

"তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাং।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥"

মেঘদূতের এইখানকার শ্লোকগুলি বড়ই মধুর—ভাবপ্রকাশক। বিরহীর বেদনা এইখানে বড় চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। যক্ষ মেঘের নিকট হৃদয় খুলিয়া সকল কথা বলিতেছে, কিছুমাত্র সে গোপন রাখিতে চাহে না। যক্ষ বলিতেছে, তুমি যখন অলকায় গিয়া উপস্থিত হইবে, তখন হয় ত দেখিবে, প্রিয়া আমার বিরহকৃশ চিত্র আঁকিতেছে, কিম্বা আমার মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছে। হয় ত দেখিবে, মলিনবসন উৎসঙ্গে বীণা রাখিয়া আমার নামসংযুক্ত কোনও পদ গাহিবার চেষ্টা করিতেছে, নেত্রনীরে বীণার তন্ত্রী আর্দ্র। হয় ত দেখিবে, উদয়গিরি-প্রান্তে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের মত তাহার দেহ বিরহে কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, চোখের জলেই তাহার নিশিদিন কাটিয়া যায়। ভাই মেঘ! তুমি আমাকে বাচাল মনে করিতে পার, কিন্তু শীঘ্রই এ সকল তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। দেখিবে, আমার বিরহে তাহার কি কষ্টে দিন কাটে।

প্রিয়াকে কিরূপে কি বলিতে হইবে, তাহাও যক্ষ বলিয়া দিল। মেঘ বলিবে, আমার দ্বারা তিনি বলিয়া দিয়াছেন,—

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাম্ বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি॥
ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥"

তোমার তুলনা কোথাও পাই না; চিত্র আঁকিয়া যে তোমার মিলনসুখ অনুভব করিব, তাহাতেও বাধা, চোখের জলে দৃষ্টি আবৃত হইয়া আসে। প্রিয়াকে সান্ত্বনাও আছে। হে কল্যাণি, তুমি নিতান্ত কাতর হইও না, চিরসুখী বা চিরদুঃখী সংসারে কেহই নয়। নয়ন মুদিয়া এই কয় মাস কাটাইয়া দাও,

"পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষম্
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু॥"

জ্যোৎস্নাময়ী শারদীয়া নিশিতে আমাদের আবার মিলন হইবে।

কাব্যের শেষে যক্ষ মেঘকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে,—

"ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥"

যাও মেঘ, বর্ষায় সম্ভৃতশ্রী হইয়া অভিলষিত প্রদেশে বিচরণ কর, বিদ্যুতের সহিত তোমার যেন ক্ষণমাত্রও বিরহ না হয়। বিরহ-কাতরের হৃদয়ের আশীর্ব্বাদে মেঘদূত সমাপ্ত হইল। আমরা বিদায় গ্রহণ করি। প্রার্থনা এই যে, কালিদাসের সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয় যেন প্রতি দিন নূতন নূতন আনন্দ লাভ করিয়া তৃপ্ত হয়—তাঁহার সৌন্দর্য্য আমরা যেন দিনে দিনে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

'ভারতী ও বালক', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

কালসহকারে ভাষার পরিবর্ত্তন বুঝিতে গেলে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্য পুরাতন কালের ভাবের ইতিহাস, সেই জন্য পুরাতনকে জানিতে হইলে পুরাতন সাহিত্যকে বিশেষ করিয়া জানিতে হয়। সে সময়ের সাহিত্য না জানিলে সে সময়ের লোকের অবস্থা সম্যক্ বুঝিয়া উঠা অসম্ভব, সেই পুরাতন ভাবের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে কিরূপে আমাদের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। সাহিত্য আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বন্ধনসূত্র—প্রাচীন সাহিত্য অতীতের ভাবের একমাত্র স্মৃতি। এই জন্য পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে আমাদের গভীর আনন্দ আছে—পুরাতন সাহিত্যে কোথাও ভাবের মহত্ত্ব দেখিলে হৃদয় পূরিয়া উঠে, পুরাতন সাহিত্যে বর্ণনার সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, পুরাতনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আমরা যেন ভাল করিয়া দাঁড়াইবার ভরসা পাই।

বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য ইংরাজী প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই ধর্ত্তব্য। সে কালে বাঙ্গলায় গদ্য লেখা প্রচলিত ছিল না, পদ্যই সকলের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশের একমাত্র উপায় ছিল। গদ্য কেবল কথাবার্ত্তায় এবং চিঠি পত্রে ব্যবহৃত হইত। সেই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আর কিছুই নহে, কেবল কবিতা। কিন্তু যাহাই হৌক্, এই সকল প্রাচীন কবিতা হইতেই আমাদিগকে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইগুলি ভাল করিয়া না দেখিলে আমরা বঙ্গসাহিত্যের উপরে কোন্ কোন্ ভাষার কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে—সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারি না। এইগুলি বিশেষরূপে আলোচনা না করিলে বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ কোথায়, তাহাও

বুঝা যায় না। বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অধ্যয়ন করিতেই হইবে—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে অনেকে অশ্লীল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন। প্রাচীন সাহিত্য অশ্লীল কি না, সে কথা পরে বিবেচনা করা যাইবে, আপাততঃ দেখা যাউক, বাঙ্গলার পুরাতন সাহিত্যে কোন্ রসের বিশেষ প্রাধান্য। এ বিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আদিরসের আধার। আদিরসের আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই সমধিক আদর দেখা যায়—তখন বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই, এ বাঙ্গালী জাতির তখন জন্ম হইয়াছে কি না সন্দেহ। জয়দেবের নাম উল্লেখ করিতে চাহি না, আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস আদিরসের দ্বারাই বিখ্যাত হইয়াছেন। তবে বঙ্গসাহিত্যই অশ্লীল হইয়া পড়িয়া থাকে কেন? কারণ অবশ্যই আছে, সে কারণ বিশেষ দূরও নহে—সে সময়ের বঙ্গসমাজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যায়। সমাজের অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অশ্লীলতা বই আর কিছুতেই মন উঠিত না—ভাল জিনিসকে মন্দ করিয়া না লইলে তাহাতে আমোদ উপভোগ হয় না, দেবতাকে বানর করিয়া না গড়িলে মন প্রবোধ মানে না। শিবের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ইদানীং লক্ষ্মীছাড়া গঞ্জিকা-সেবকের অস্থিপঞ্জর হইয়া উঠিয়াছে—কৈলাসধাম হইয়াছে গঞ্জিকার প্রধান আড্ডা, রাজনীতিবিশারদ অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ছলনাপটু বংশীধর রমণীমোহনে পরিণত হইয়াছেন; মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য সুবিধামত ছিব্লামিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম কবিরা এই পরিণতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন। তাঁহারা পূর্ব্বতন কবিদিগের নিকট হইতে এই আদর্শ পাইয়াছেন। তবে তাঁহারা ইহার উপর যেরূপ কবিত্ব ফলাইয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা অবশ্য সম্পূর্ণ দায়ী। আরও একটি কথা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিলাসের সাহিত্য বটে, কিন্তু তাহা যে সব সময়ে অশ্লীল, তাহা বলা যায় না। সে কালের লোকের রুচি অনুসারেই সে কালের সাহিত্য হইয়াছে। তাহাতে বর্ত্তমান কালের রুচিবিরুদ্ধ যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা মার্জ্জনীয়। অশ্লীলতা সাময়িক সমাজের ভদ্র নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। বর্ত্তমান কালে কেহ যদি সে কালের রুচি অনুযায়ী বর্ণনা করিতে বসে, তবে তাহাকেই রীতিমত অশ্লীল বলা যায়। বঙ্গসাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইলে বর্ত্তমানের রুচিবিরুদ্ধ অনেক কথা পড়িতে হইবে। সে জন্য প্রাচীন কবিদিগকে বরতরফ করা চলে না; কারণ, তাঁহারা ভিন্ন প্রাচীন বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানের

কত আদরের গ্রন্থও হয় ত ভবিষ্যতে রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু সমাজ যেখানে রুচির জন্য দায়ী, সেখানে গ্রন্থকারকে দোষী করা যায় না।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যে কেবলই আদিরস, অন্য রসের ঐকান্তিক অভাব, তাহা নহে। অন্যান্য রসের একেবারে অভাব হইলে এ সাহিত্য এত দিন টিঁকিত না। কিন্তু একটি জিনিসের বাঙ্গলায় অভাব আছে—বীররস। বীররস বাঙ্গলা সাহিত্যে যেখানে যেখানে বসিয়াছে, ভালরূপ ফুটিতে পায় নাই। তাহার কারণ, বীররস বাঙ্গালীর প্রাণের রস নহে। প্রাচীন সাহিত্যে বীররস মধ্যে মধ্যে মাথা উঁচু করিয়াছে বটে, কিন্তু জমাইতে পারে নাই—কতকগুলা ঢাল তলোয়ার, লাঠি শড়কি সংগ্রহ হইয়াছে মাত্র, তাহার অধিক কিছু নয়। তাহা মোদ্দা বাঙ্গালীর মত হইয়াছে। নব্য সাহিত্যে বিদেশ হইতে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র, সেনা সেনাপতি আসিয়াছে, কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ বৈ আর অধিক কিছু করিতে হয় নাই। বন্ধুর গৃহ হইতে দুই চারিটা কামান বন্দুক ধার করিয়া আনিয়া শত্রুকে দেখাইবার জন্য গোটাকতক ফাঁকা আওয়াজ আর কি। আসল কথা, বাঙ্গলা সাহিত্যে বীররস অনেক সময় কোমল রসে ভিজান অথবা একেবারেই রসসম্পর্কশূন্য। বীররস আমাদের পক্ষে বিদেশীয়, অথচ তাহাকে আমরা স্বদেশীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে চাই, সুতরাং ভয়ে ভয়ে একটা গোল বাধাইয়া বসি, ইহাতেই সহজে ধরা দি। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই; এইখানেই শেষ করা ভাল।

বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে, মৈথিলী হিন্দী হইতে তাহার জন্ম। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীরাম দাস প্রভৃতির লেখার সহিত বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন লেখকগণের রচনা তুলনা করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব বটে, তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডীদাসের কবিতা তাঁহার অপেক্ষা বাঙ্গলা, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলা ভাষা মৈথিলী হিন্দীজাত—এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না। চণ্ডীদাসের কবিতায়ও এমন কিছু আছে, যাহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গলা হিন্দীজাত—একেবারে সংস্কৃতজাত নহে। সংস্কৃত বাঙ্গলা ভাষার পিতামহ অথবা প্রপিতামহ। বাঙ্গলা ভাষা অনেক পরিবর্ত্তনের ফল সন্দেহ নাই। সে কালের ভালরূপ ইতিহাসাভাবে এ বিষয়ে আমরা অধিক কথা বলিতে সমর্থ নয়, তবে বহুদর্শী চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করিয়া যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি বলিলাম।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ভাবের সাহিত্য এবং পাণ্ডিত্যের সাহিত্য। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের আমলে ভাবেরই প্রাধান্য ছিল, অক্ষরের

বড় একটা ক্ষমতা ছিল না; ইদানীং ক্রমে ক্রমে ভাবের নদীতে চড়া পড়িয়াছে, পাণ্ডিত্যের অক্ষর-শাসনে ভাবের সে স্বাধীনতা নাই, ভাবকেও আইন কানুনে বদ্ধ হইতে হইয়াছে। ইদানীন্তন কবিতায় মাজাঘষা কথার বিলক্ষণ পারিপাট্য দেখা যায়, দোষ হয় ত প্রায়ই মিলে না, কিন্তু দুই ছত্রে কবির ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। রসিকতা অনেক সময় কবিত্বের ছদ্মবেশে চুপিচাপি বসিয়া যায়, এবং গোঁফে চাড়া দিয়া আপনাকে অসাধারণ কবিত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করে। কিন্তু তাহা হইলেও শেষ প্রাচীন কবিদিগের নিকট বঙ্গসাহিত্য যে বিশেষ ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কল্যাণে বাঙ্গলা ভাষার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—বাঙ্গলা মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের সহস্র দোষ থাকিলেও নির্গুণ তাঁহারা নহেন। কারণ, যেমন করিয়াই হোক্, তাঁহাদেরই পরিশ্রমের ফল আজিকার এই নবীন বঙ্গসাহিত্য।

বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা এত কথা বলিয়া আসিলাম, অথচ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপূর্ণ ধর্ম্মভাবের কথার উল্লেখ করা হইল না, ইহাতে অনেক পাঠক বিশেষ বিরক্ত হইবেন। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই, কেবল গোটাকতক পুরাতন জানা কথা সংক্ষেপে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু যাহাই হোক্, বাঙ্গলা সাহিত্যে ধর্ম্মের ভাব সম্বন্ধে আমাদিগকে দুই চারি কথা বলিতে হইবে। নহিলে ধর্ম্মতর্কমগ্ন বঙ্গদেশের ধর্ম্মসর্ব্বস্ব অযুত নরনারীর চক্ষে এ মর্ত্ত্য লেখকের অক্ষরবৃন্দ নাও পড়িতে পারে। বাঙ্গলা দেশের অনেক দুগ্ধপোষ্যও আজিকালি থুঁথু ফেলায় এবং মাথা চুলকানয় ধর্ম্মের মহিমা দেখিতে পায়। সে কালের সাহিত্যে ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল প্রভার উল্লেখ না করিলে লেখকের যে দুর্নাম রটিবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? অনেকের মত এই যে, সে কালে যে কিছু সাহিত্য বাহির হইয়াছে, সকলই ধর্ম্মের জন্য—সকলেরই হৃদয়ে ধর্ম্মনদী অন্তঃসলিলা বহিতেছে। এ মত যে কত দূর অভ্রান্ত, বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, দুই চারিটা গণেশবন্দনা ও সরস্বতী-বন্দনার উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। এখন দেখিতে হইবে, যে ভিত্তির উপরে এই মত প্রতিষ্ঠিত, সে ভিত্তি কিরূপ দৃঢ়।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে সংযুক্ত কতকগুলি পুঁথি আছে স্বীকার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া কাব্যগ্রন্থ মাত্রই যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষ কোনও সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহা বোধ হয় না। গণেশবন্দনা বা সরস্বতীবন্দনা সে কালের ফেসান ছিল বলা যাইতে পারে। এ কালেও এ ফেসান সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। কিন্তু এই বন্দনাটুকুর জোরে কবিবিশেষকে ধর্ম্মপ্রাণ অথবা সবন্দনা কাব্যগ্রন্থগুলিকে ধর্ম্মগ্রন্থ

বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। আজকালের সাহিত্য অপেক্ষা সে কালের সাহিত্যে ধর্ম্ম বিশেষরূপ থাকিত, এরূপ কোনও প্রমাণ যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ প্রাচীন সাহিত্যকে কিছুতেই ধর্ম্মসাহিত্য বলা চলে না। ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার গ্রন্থে শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংস বর্ণনা করিয়াছেন, বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, এ কথার কোনও অর্থ নাই। যাঁহারা এ সকলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন গভীর আধ্যাত্মিক রূপক দেখিতে পান, তাঁহারা তাহাতে তৃপ্ত হউন, কিন্তু কবি যে বরাবর এক মহা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ পড়িয়া কেহ যদি বলেন, এ গ্রন্থের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়; কিন্তু প্রাচীনতা-মোহমুগ্ধের বর্ত্তমানবিদ্রূপী হাস্যের উপরে বিশ্বাস করিয়া বলা যায় না যে, সে কালের সাহিত্য ধর্ম্ম বৈ আর কিছু নয়।

তবে সে কালের সাহিত্য কি? এ কালের সাহিত্য যাহা, সে কালেরও তাই—তবে সে কালে গদ্য ছিল না, সে কালের সাহিত্য আগাগোড়া পদ্যে। সকল দেশের সাহিত্যই প্রায় প্রথমাবস্থায় পদ্য। সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে গদ্য ছিল না। গ্রীক সাহিত্যে ইলিয়াদের পূর্ব্বে কোনও বিখ্যাত গদ্য গ্রন্থের ত কৈ নাম শুনা যায় না; আর আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ত গদ্য আমদানি হয় নাই। ইংরাজ আসিবার কত পরে গদ্যে আমাদের হাতেখড়ি।

বাঙ্গলা সাহিত্যের আরম্ভ গীতিকাব্যে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের রচনা তান লয়ে গাহিবার মত ছোট ছোট কবিতা। শুধু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কেন, বসন্ত রায়, গোবিন্দদাস প্রভৃতি গীতিকাব্যরচয়িতা বাঙ্গলায় অনেক; প্রাচীন সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে নব্য বঙ্গসাহিত্যেও গীতিকাব্যের অভাব নাই। বলিতে কি, বাঙ্গলা সাহিত্য একরকম গীতিকাব্য। নব্য সাহিত্যে নাটক, উপন্যাস, অন্যান্য জিনিস মিলে, কিন্তু বাঙ্গলায় পড়িবার মত গীতিকাব্য যত আছে, এত নাটকও নাই, উপন্যাসও নাই, এত কিছুই নাই। গীতিকাব্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের আরম্ভ, গীতিকাব্যেই তাহার শ্রীবৃদ্ধি; জানি না, কালে হয় ত আরও কত সুমধুর সরস কবিতায় এই তরুণ সাহিত্য সুশোভিত হইবে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উপরে জয়দেবের কিছু বিশেষ প্রভাব অনুভব হয়। জয়দেব বাঙ্গলা সাহিত্যের কবি নহেন বটে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এবং তাঁহাকে সংস্কৃতের শেষ কবি বলা যাইতে পারে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা এক হিসাবে তাঁহারই শিষ্য—অন্ততঃ তাঁহারা তাঁহার গীতগোবিন্দে মুগ্ধ। তাঁহাদের রচনায় জয়দেবের ছায়া

দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ন্যায় জয়দেবেরও নামে একটি গান আছে। বিদ্যাপতির কথায় তিনি বলিয়াছেন, "যাক গীতে জগতচিত চোরায়ল"। আর চণ্ডীদাস "প্রেমধনেহি ধনী"। আর জয়দেব "রাধারমণ-চরিতরস বর্ণনে কবিকুলগুরু দ্বিজ দেব"। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমালোচনা আমাদের এখানে আবশ্যক নাই, কিন্তু গোবিন্দদাসের লেখা হইতে বৈষ্ণব কবিদিগের উপর জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। জয়দেব বাঙ্গলা ভাষার আদি কবি না হৌন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাবের প্রথম কবি বটে। কিন্তু যাহাই হৌক্, সে কথার আলোচনা এখন থাক্। প্রাচীন সাহিত্য আমাদের বিষয়।

প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিবার—বলা হইয়াছে। দেখা গেল, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কেবল কবিতা, তাহার প্রধান রস আদি, গীতিকাব্যেই তাহার আরম্ভ, এবং সাময়িক সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে কালের কবিদিগকে অশ্লীল বলা যায় না। পৌরাণিক অনেক মহচ্চরিত্রের বঙ্গসাহিত্যে অবনতি লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্য সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহে। তাহার কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আর পুনরুল্লেখ আবশ্যক বোধ হয় না। বাঙ্গলা সাহিত্যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে জড়িত কতকগুলি গ্রন্থ আছে, সেরূপ সকল সাহিত্যেই আছে, সে জন্য বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষরূপে ধর্ম্মসাহিত্য বলাও যাইতে পারে না। এ সম্বন্ধে মোটামুটি আর অধিক কথা না বলিয়া বিশেষ বিশেষ কবির লেখা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এখন আমাদের কপালে অমৃতই উঠুক্, চাই গরলই উঠুক্, যাহা হয় ঘটিবে।

'ভারতী ও বালক', আষাঢ় ১২৯৬

অশ্রুজল

জীবনের সুখদুঃখের স্মৃতিতে মুখ লুকাইয়া এক বারও কাঁদে নাই, সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না। সকল মনুষ্যেরই হৃদয়তন্ত্রীতে এক একটি সুর কেমন লাগিয়া থাকে, সেই সুরে যে দিন আঘাত পড়ে, সেই দিন সহসা যেন তাহার জীবনে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে কি যেন তড়িৎস্রোত ছুটিয়া বেড়ায়; আপনাকে কোথায় যেন ধরিতে পাইয়া সে এক বার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, তাহার নয়ন বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিতে থাকে। কিন্তু কোন্‌খানে কবে কি আঘাত লাগিয়া তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কি তাহা বুঝিতে পারে? সে আপনার মনে কাঁদিয়া যায়—না কাঁদিয়া সে থাকিতে পারে না—কিন্তু তাহার সেই হৃদয়মথিত অশ্রুবিন্দুতে কত দিনের

হয় ত গভীর সুখদুঃখের স্মৃতি আছে, সে তাহা জানেও না। প্রথম উচ্ছ্বাস যখন সংযত হইয়া আসে, তখন যদি সে ভাবিয়া দেখে, তবে হয় ত দেখিতে পায়, বিন্দুর মধ্যে হারাইয়া যাওয়া যায়, এমন কিছু আছে—সেখানে সকলই শূন্য নহে।

অশ্রুজল ত আর কিছু নহে, হৃদয়ের নীরব ভাষা। হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া আপনাতে আর থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং অশ্রুবিন্দুর মধ্যে হৃদয় কতখানি লুকাইয়া আছে বলিতে হইবে না। কিন্তু হৃদয়ের এই অশ্রুভাষায় কি ভাব ব্যক্ত হয়? হৃদয়ের ভাষা ত আরও আছে। নৈরাশ্যের বিজন কাননে যখন আত্মহারা দীর্ঘনিশ্বাস শিহরিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন সেও ত সেই হৃদয়ের ভাষা; আসন্ন নির্ব্বাণের বিবর্ণ অধরে যখন ক্ষীণ দীপশিখার মত একটি ম্লান অস্ফুট রজতসৌন্দর্য্য বিকশিয়া উঠে, তখন সেও ত সেই অবসন্ন হৃদয়ের নীরব ভাষা। তাই বলিয়া এ সব ভাষাই ত আর সম্পূর্ণ এক নহে—ভাবের সাদৃশ্য থাকিতে পারে মাত্র, কিন্তু এক ভাব হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। অশ্রুজলের মর্ম্মের ভাব দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অবশ্য এক নয়—বেশ একটু তফাৎ আছে।

নয়নে অশ্রু বহে কখন্? অভিমান, অনুতাপ, হৃদয়ের সুগভীর বেদনাতেই ত অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস। আনন্দেও অশ্রু ঝরে। সুখের শুধু অশ্রু নাই। দীর্ঘনিশ্বাসও হৃদয়ের বেদনা-উচ্ছ্বাস। কিন্তু দুয়ের মধ্যে ভাবের তারতম্য কি? দীর্ঘনিশ্বাসে অতৃপ্তির ভাব কিছু বিশেষরূপে অভিব্যক্ত, অশ্রুজলে শান্তির ভাব। হৃদয় যখন ব্যথিত হইয়া আপনার মধ্যেই মিলাইয়া থাকিতে চায়, একা একা আপনার মধ্যে যখন সে অজ্ঞাতবাস করে, তখন তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দীর্ঘনিশ্বাস হাহাকার করিয়া মরে। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয়ের ভয়ানক অন্তর্দ্দাহ হয়, হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। অশ্রুজলে এ দাবানলভাব নাই, হৃদয় যেন গলিয়া গিয়া অশ্রুরূপে ঝরিয়া যায়; বেদনার অনেকটা উপশম হয়। দীর্ঘনিশ্বাসে অশ্রুজলের এ তৃপ্তি কোথায়? হৃদয় গুমরিয়া গুমরিয়া প্রতি দিন অবসন্ন হইয়া আসে, প্রাণে যে শেল বিঁধিয়া থাকে, তাহার জ্বালা আরও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে শেল ঘুচে না। এই দীর্ঘনিশ্বাস যখন বুকে আসিয়া আটকাইয়া যায়, সহসা আসিতে আসিতে আর আসিতে পারে না, তখন লোকে উন্মাদ-হাসি হাসিয়া উঠে। তখন সে এক দারুণ যন্ত্রণার অবস্থা—ভাবিতে কল্পনা শিহরিয়া উঠে। সহসা উথলিত উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া গিয়া হৃদয় পাষাণের মত যেন হিম হইয়া যায়। অশ্রু যখন ঝরিতে পায় না, হৃদয়েই শুকাইয়া আসে, তখন উন্মাদ-হাসি দেখা দেয় না, অধরে হাসি মিলাইয়া যায়—ম্লান, ক্ষীণ, নিভ নিভ। সে যাতনায় শান্তি আছে,—দীর্ঘনিশ্বাসের রৌদ্রতপ্ত মরুভূমি-ভাব নাই।

অভিমান যখন চোখের জল মুছিতে থাকে, তখন নৈরাশ্যের মধ্যেও কিছু আশা আছে। তখন অভিমানকে শান্ত করা যাইতে পারে, পুরাতন স্মৃতির উপর একটা আবরণ টানিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু অভিমানের চোখে যখন জল নাই, হৃদয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন তাহাকে শান্ত করা দায়, তখন অবস্থা বড় ভাল নয়। অনুতাপ ও চোখের জল ফেলিলে ভরসা হয়, পুরাতন স্মৃতি ভুলিয়া এইবারে সে বুঝি নব উদ্যমে কাজে লাগে। আর অনুতাপের হৃদয়ে যখন কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া উঠে, তখন স্মৃতির দংশনে দংশনে সে কাতর, তাহার অবস্থা মৃত্যুর সন্নিকট।

কিন্তু দুঃখের গভীরতা কোথায়—অশ্রুজলে, কি দীর্ঘনিশ্বাসে? এ কথা বলা কিছু কঠিন। দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যেও যেমন, অশ্রুজলের হৃদয়েও সেইরূপ দুঃখ লুকাইয়া থাকিতে পারে। স্বতন্ত্র ভাবের হৃদয়ে স্বতন্ত্র ভাবের উচ্ছ্বাস। তবে রুদ্ধপ্রবাহ, রুদ্ধ-উচ্ছ্বাস যন্ত্রণাই যে অধিক কষ্টদায়ক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যেখানে হৃদয় বড়ই গভীর, সেখানে উচ্ছ্বাস ততই কম বলিয়া উপলব্ধি হয়, যন্ত্রণাও সেখানে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বাস্তবিক সেখানে যন্ত্রণার অবসান নাই। লঘু হৃদয় সহজেই ঝরিয়া যায়, যন্ত্রণা সেখানে আঁকড়িয়া থাকিতে পারে না। গভীর দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাসে বড়ই কষ্ট—চোখে জল আসিলে কষ্টের কতকটা উপশম হয়।

দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা উলট্‌পালট্‌ হয় যে, কিছুই যেন ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়া যায় না। দীর্ঘনিশ্বাস সান্ত্বনা পায় না। অশ্রুজলে কতকটা তবু সান্ত্বনা আছে—আপনাকে ব্যক্ত করিয়া তৃপ্তি হয়। সমদুঃখীর নিকট কাঁদিয়া অনেক সময় সুখ আছে, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস আপনার বাহিরে প্রায় বাহির হয় না। দীর্ঘনিশ্বাসে জীবন যেন বাহির হইতে চায়, কিন্তু পারে না, প্রতি উদ্যমে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসে।

অশ্রুজলে প্রেমের মধুর ভাবটি বড় পরিস্ফুট—নৈরাশ্য নয়, হাহাকার নয়, প্রেমের মধ্যে যে একটি পবিত্র সৌন্দর্য্য চিরবিকশিত, সেই ভাবটি। সে ভাবে উগ্র ভাবের একেবারে অভাব; তাহা বড়ই কোমল, মধুর, পবিত্র। তাহার তুলনায় দীর্ঘনিশ্বাসের কতকটা রৌদ্র ভাব বলা যাইতে পারে। অশ্রুজলের এই মধুর ভাবেই প্রধান সৌন্দর্য্য। এ ভাবে যতই ডুবা যায়, ততই তাহার গভীরতা উপলব্ধি হয়। সমস্ত জগৎকে আপনার মধ্যে আনিয়া আমরা এই ভাবে ডুবিয়া যাই; যত ডুবি, আপনাকে ততই ভুলিতে থাকি। এমন আত্মবিস্মৃতি আর কোথাও বুঝি নাই।

দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাতে আর আপনি থাকি না, কিন্তু আপনাকে পাঁচ জনের

মধ্যে হারাইয়া ফেলি না। দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা; অশ্রুজলে আত্মবিসর্জন। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে, প্রতীকারাশা বিরল; অশ্রুজলে হৃদয়ের মোহ ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয় যায় নাই। অশ্রুজলে জগৎ ডুবিতে পারে; দীর্ঘ-নিশ্বাসের কাছে জগৎ ঘেঁসিতে পারে না—তাপ বড় প্রবল।

কিন্তু এ ছলনার সংসারে স্বর্গের অশ্রুজল ত প্রায় মিলে না। এখানে সকল বিষয়েই প্রতারণা আছে, হৃদয়ের ভাষায় ভান না থাকিবে কেন? হৃদয়হীন লোকে হৃদয় লইয়া উপহাস করে, হৃদয়ের বিরুদ্ধে সারি সারি শাণিত দন্ত ও নিষ্ঠুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খাড়া করিয়া দিয়া তামাসা দেখে। এই জন্য হৃদয়ের অশ্রুজল বিজন অরণ্যের শান্তিনিকেতনেই ঝরিয়া যায়। আর লোকালয়ে তার কণ্ঠস্ফীত বদন চোখ মিটিমিটি করিয়া দু' এক ফোঁটা নীরস জল বাহির করে; তাহার চারি দিকে পরহৃদয়ছিদ্রানু-সন্ধিৎসুর আইনবদ্ধ বাহবাগুলি চাটুকারের মত ঘিরিয়া বসে, ইহাই তাহার অভিলাষ। কিন্তু যেমন লোকই হৌক, তাহার হৃদয়ে স্বর্গের অশ্রুজল একদিন না একদিন দেখা দিবেই।

অশ্রুজলের মত আমাদের বন্ধু কেহ নাই। এই অসীম সংসারসমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত যাহা উঠে—অশ্রুজল। দীর্ঘনিশ্বাসের তীব্র দংশন সেখানে নাই—সেখানে কি সুগভীর স্নেহ, শান্তিময় প্রেম! রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে আমরা যখন আপনাকে ছাড়িয়া দি, তখন অশ্রুজল যদি দেখা না দেয়, তাহা হইলে প্রাণ কি বাঁচে? আমরা পদে পদে হৃদয়ে অনন্ত নরককুণ্ড রচনা করিতে বসি, কিন্তু এ সংসারে নাকি অশ্রুজল আজিও শুকায় নাই, তাই নরকযন্ত্রণার মধ্যে স্বর্গের সোপান দেখিয়া বিস্মিত হই। অশ্রুজলে যে কি পবিত্রতা আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বুকে যাহার দীর্ঘনিশ্বাস বিঁধিয়া আছে, তাহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আশা ভরসা কিছুই নাই। অশ্রুজলে দলিত হৃদয় নবজীবন লাভ করে। অশ্রুজল সম্পদে সুখ, বিপদে বন্ধু, রোগে আরাম, শোকে শান্তি। অশ্রুধৌত হৃদয় ধ্রুবলোকের ছায়া।

হে অশ্রুজল! নিশ্বাস-শপ্ত হৃদয়ে তুমি চিরদিন শান্তি বর্ষণ কর, সেখান হইতে নির্ম্মম হাহাকার ঘুচিয়া যাক্। সংসারের শোক তাপ ভয়ে জরজর প্রাণে তুমি সেই অভয় পদের প্রতিষ্ঠা কর, ধরণীর পাপভার লঘু হৌক। তুমি এস, এই ক্ষুদ্র মানব-শিশুর মলিন হৃদয়ে একবার এস, এ মরুভূমি ঘুচিয়া যাইবে। একবার শুধু এস, তুমি এস।

'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৬

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

বঙ্গসাহিত্যের প্রথম কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। দুই জনে সমসাময়িক লোক ছিলেন, সমান বিষয় লইয়াই দুই জনের কবিতা—রাধা কৃষ্ণের মিলন বিরহ, মানাভিমান, পূর্ব্বরাগ অনুরাগ। কিন্তু বিষয় এক হইলেও দুই জন কবির ভাব অবশ্য সম্পূর্ণ এক নহে, দুই জনের বর্ণনার মধ্যে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতি আপন হৃদয়ের মধ্য দিয়া রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, আপন রুচি অনুযায়ী আঁকিয়াছেন, সাজাইয়াছেন; চণ্ডীদাসও নিজের মত করিয়া তাঁহাদিগকে গড়িয়াছেন, নিজের হৃদয়ের ভাব দিয়া তাঁহাদের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হৃদয়ের একই ভাব বর্ণনা করিতে বসিলেও উভয় কবির বর্ণনা যে বিভিন্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। বিদ্যাপতিও রাধার রূপ খুলিয়া বলিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাসও রাধার রূপের বর্ণনা করিয়াছেন; তাই বলিয়া দুই জনের রূপবর্ণনা কি একই রকম? দুই জনেই রাধার রূপের সুখ্যাতি করিয়াছেন, দুই জনেই রাধাকে সুন্দরী বলিয়াছেন, সে সুন্দরী বাঙ্গলাদেশের সুন্দরী—সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সেই মৃগলোচন, সেই চন্দ্রবদন, কিন্তু তথাপি দুই জনের বর্ণনা কি তফাৎ! এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্যাপতি, আর এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে চণ্ডীদাস। লেখার সহিত গ্রন্থকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে জড়িত।

শুধু ভাবের কথা কেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাষারও বিস্তর প্রভেদ; বিদ্যাপতি হিন্দীর ধারে ধারে ফিরিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা স্পষ্ট হিন্দী; চণ্ডীদাস বাঙ্গালী, তাঁহার লেখায় হিন্দী বড় একটা জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে প্রাচীন বাঙ্গলার হিন্দীর সহিত সম্পর্ক আছে যে, ইহা বুঝা যায়। বিদ্যাপতি বাছিয়া বাছিয়া মধ্যে মধ্যে শ্রুতিমধুর কথা সংগ্রহ করেন, তাঁহার সাজসজ্জার একটু পারিপাট্য আছে; চণ্ডীদাস সাদাসিধা, ভাব আসিতেই হুহু করিয়া লিখিয়া যান, অন্য দিকে তাঁহার বড় একটা লক্ষ্য থাকে না। বিদ্যাপতি যেন কিছু গুছাইয়া বসিয়াছেন; চণ্ডীদাসের কোন দিকে খেয়াল নাই। কিন্তু সে যাহা হৌক, পাঠকেরা ভুল না বুঝেন যে, বিদ্যাপতি ভাবের অভাবেই পরিচয়স্থল। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাবে ভাষায় তফাৎ থাকিতে পারে, কিন্তু একজনের একেবারে ভাবের অভাব নাই। আর ভাবের স্বাতন্ত্র্যই যদি না থাকিবে, তবে দুই জন কবি বলা কেন?

বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। প্রেমের সুরে চণ্ডীদাস যেমন গাহিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই। চণ্ডীদাসের কবিতায় সর্ব্বত্রই প্রেমের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। সুখের প্রতিই তাঁহার একমাত্র

টান নহে। একটা উচ্চভাবের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য আছে—প্রেম আর মোহ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, তাহা তিনি জানেন। চণ্ডীদাস ত বলিয়াছেন,

"পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা॥"

বাস্তবিক, প্রেম কি যেখানে সেখানে মিলে? প্রেমের দুয়ারে যে প্রাণ বলি দিতে পারে, সেই প্রেম পায়। আপনাকে প্রেমে ঢালিয়া দিতে হইবে, প্রেমে আর আপনায় স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। যাহারা সুখের জন্য প্রেম চাহে, তাহাদের কপালে সুখ উঠে না।

"সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥"

আমাদের বর্ত্তমান একজন কবিও তাহাই বলিয়াছেন, "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।" চণ্ডীদাস পিরীতিকে সকল রসের সার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,

"পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥"

বিদ্যাপতিও প্রেমের উপরে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের মত উচ্চ ভাবের কথা তাঁহার মন্তব্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন,

"প্রেম কারণ জীউ উপেখয়ে
জগজন কো নাহি জানে।"

প্রেমের জন্য জীবন উপেক্ষা করে, বিদ্যাপতি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি চণ্ডীদাসের উপরি উদ্ধৃত কবিতায় প্রেমের মহান্ ভাব যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির লেখায় কি এ ভাব তেমন পরিস্ফুট হইয়াছে? চণ্ডীদাসের কথার ধরণে একটা সরল সুন্দর ভাব আছে, বিদ্যাপতিতে তাহা নাই। কিন্তু পাঠকেরা একেবারে হতাশ হইবেন না, বিদ্যাপতির দুই একটি গান যাহা আছে, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ গৌরব, অন্য কোনও সাহিত্যে বোধ করি তেমনটি নাই।

চণ্ডীদাস প্রেমের জ্বালা বেশ বুঝেন, যাহারা জ্বালা সহিতে পারে না, তাহারা প্রেমের রাজ্যে বাস করিবার অযোগ্য। জ্বলনেই ত প্রেম, সুখের মাঝে কি প্রেম তেমন ফুটিতে পায়?

"দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি ॥"

চণ্ডীদাস আর এক স্থলে বলিয়াছেন,

"সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরীতি ধন।"

কিন্তু থাক্, শুধু শেষ দুই লাইনের মন্তব্যটুকু দেখিয়া দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। দুই জনের রূপবর্ণনা, দুই জনের মিলন বিরহের ভাব প্রকাশ, দুই জনের উপমা অলঙ্কার, এ সকল বিশেষ করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তবেই না দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে? চণ্ডীদাস যে প্রেমধনে ধনী, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় না থাকিতে পারে, কিন্তু আরও কিছু না বলিলে— আরও ভাল করিয়া বিদ্যাপতির রচনার সহিত তাঁহার লেখার তুলনা না করিলে আমরা দুই জন কবির প্রাণ ধরিতে পারি না।

চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সহিত তুলনায় আমরা দুঃখের কবি বলিতে পারি। চণ্ডীদাস যে তাঁহার লেখায় অনবরত দুঃখের কথা পাড়িয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার রচনায়, হয় ত অজ্ঞাতসারে, কেমন একটা দুঃখের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। লেখা দেখিয়া মনে হয়, কবির জীবনে তেমন সুখের প্রসাদলাভ ঘটে নাই। প্রাচীন কবিদিগের সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমরা কিছু বলিতে পারি না, যেখানে পণ্ডিতদিগেরই পদস্খলন সম্ভাবনার অসদ্ভাব নাই, সেখানে আমরা জোর করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করি কিরূপে? কিন্তু সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, চণ্ডীদাসের জীবনে দুঃখকষ্টের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। মোদ্দা তাহা হৌক্ বা না হৌক্, তাঁহার হৃদয় দুঃখভাবসিক্ত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাততঃ সে কথা লইয়া তর্ক করিতে বসিবার আবশ্যক দেখি না। কথাটায় তর্কের বিশেষ কিছু নাইও।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপে হৃদয় হারাইয়াছেন, রাধার সৌন্দর্য্যে কোনও পবিত্র মহান্ ভাবের বিকাশ দেখিয়া নহে, রাধার রাঙ্গা অধরে, নলিন-নয়নেই তিনি আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম— যদি ইহাকেও প্রেম বলিতে হয়!—রূপজ মোহ মাত্র। অতীন্দ্রিয় ভাবের এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এ প্রেম যৌবনের জোয়ারেই টিঁকিয়া থাকে, তাহার পর যৌবনাবসানে মরিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গুণের অথবা উচ্চ ভাবের ধার দিয়াও যান নাই। ভোগলালসাপরিতৃপ্তি বৈ তাঁহার অপর কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। এখন দেখিতে হইবে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ রাধার সৌন্দর্য্য কিরূপ দেখিয়াছেন।

বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ রাধার বাহ্য সৌন্দর্য্য বৈ কিছুই দেখেন নাই। তিনি রাধার প্রত্যেক অঙ্গ স্বতন্ত্র ভাবে দেখিয়াছেন—অধরের রাঙিমা, নয়নের চাহনি, চরণের গজেন্দ্রগমন। রাধা হাসিয়া কথা বলিতেছেন, সে হাসির সৌন্দর্য্য কিরূপ? না, শরৎ-পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার সকল বাহ্য সৌন্দর্য্য এক করিয়া মোটামুটি ভাবে প্রায় দেখেন নাই। কেবল দু'এক জায়গায় রাধাকে এক করিয়া দেখিয়াছেন মাত্র। সেখানে রাধার সহিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের তুলনা করিয়াছেন। অন্য উপমাও এক আধটি আছে। কিন্তু সকল উপমা-গুলিই রাধার বাহিরের জিনিষে—তা' চন্দ্রেই হোক্, বিদ্যুতেই হোক্, আর যাহাতেই হোক্। শ্রীকৃষ্ণের উপর সে সৌন্দর্য্যের প্রভাব একটি শ্লোকে বেশ ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সে শ্লোকটি,

"সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ মালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥" ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। তিনিও রাধার বদনকমল, হরিণ-নয়ন দেখিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বিদ্যাপতির কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে দেখিয়াছেন ভাল করিয়া। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ, রাধার তাঁহার প্রতি লক্ষ্যই অধিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, সমস্ত রাধাকে দেখিবার—তেমন বিশেষ করিয়া দেখিবার—তাঁহার সুবিধা হইয়া উঠে নাই, কিন্তু খানিকটা রাধাকে তিনি বেশ করিয়া দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ, রাধার আড়নয়নে ঈষৎ হাসি লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত রাধাকে—আপাদমস্তক—তিনি দেখিতে ভুলেন নাই। রাধাকে ভাগে ভাগে অঙ্গে অঙ্গে ছাড়া এক করিয়াও তিনি অনেকটা দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস রাধার মধ্য হইতে দেখিয়া তুলনা দিয়াছেন। যেমন,

"হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল যেন॥"

এখন এই পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কিরূপভাবের রাধাকে দেখিয়াছেন, দেখিতে হইবে। দুই জনের রাধাই হাবভাবশূন্যা নহেন। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা ফিকির কৌশলে দক্ষা অধিক। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দেখিয়াছেন, রাধার হাসির চাহনি পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ দেখিয়াছেন আরও ঢের। রাধা হাসিয়া তাঁহার পানে ফিরিয়া দেখেন, দূরে গিয়া সখীদিগকে ডাকিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া লয়েন, ইত্যাদি। শুধু ইহাই নহে, মুক্তাহার ছিঁড়িয়া

ফেলিয়া সখীদিগকে মুক্তা কুড়াইতে বলেন, এই অবসরে তাঁহার শ্যামদর্শন হয়। এ রাধা চণ্ডীদাসের রাধা অপেক্ষা পাকা। চণ্ডীদাসের রাধায় এতটা কৈ ত শুনা যায় না।

কিন্তু শুধু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উপর নির্ভর করিয়া রাধা সম্বন্ধে এত কথা বলা কি ভাল দেখায়? নায়িকার পূর্ব্বরাগটাও মনোযোগ সহকারে দেখা আবশ্যক। রাধিকা-সুন্দরীও ত শ্রীকৃষ্ণে মজগুল। বিদ্যাপতির রাধিকা, চণ্ডীদাসের রাধিকা, দুই জনেই শ্যামের রূপে মুগ্ধ, দুই জনেই বংশীধরের বাঁশীর সুরে আকুল। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার কথায় এই আকুলতা যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির রাধায় তেমন হয় নাই। বিদ্যাপতির রাধা সখীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর কথা বলিতেছেন,

"কি কহব রে সখি ইহ দুখওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মনোলাজ॥" ইত্যাদি।

আর চণ্ডীদাসের রাধিকা? এক কথায় তাঁহার সব বলা হইয়াছে—"বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা?" তাই ত, এত নাম থাকিতে বাঁশীতে রাধানামই বাজে কেন? রাধাপেক্ষা কি সংসারে আর মিষ্ট নাম নাই? তাহা ত নয়, নাম ত ঢের আছে। কিন্তু—কিন্তু মাধবের নিকট রাধা বৈ আর নাম নাই। তাই না? তাহা নয় ত কি।

বিদ্যাপতির কবিতায় অনেক কথা বলিয়া একটি ভাব প্রকাশ হইয়াছে, চণ্ডীদাস ভাবটুকু ছুঁইয়া গেছেন মাত্র। আর যেখানে অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন, সেখানে ভাবেরও প্রায় বিস্তৃতি লক্ষিত হয়। এই আকুলতার ভাবপ্রকাশক তাঁহার একটি গান আছে। তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দি। পাঠকেরা শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, এ গান মর্ম্ম বিঁধিয়া উঠিয়াছে কি না।

"সই, কে বা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু
শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?

নামপরতাপে যার
ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কি বা হয় ?
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতীধরম কৈছে রয় ?
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব, কি হবে উপায় ?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥"

এ আকুলতা, হাসি বাঁশী বাদ দিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নায়িকার পূর্ব্বরাগে নায়কের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা দেখিলেও বুঝা যায়, বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস কত উচ্চদরের কবি। বিদ্যাপতির বর্ণনায় কেমন যেন একটা ভাবের আঁটাআঁটি আছে বলিয়া বোধ হয়। সব সময়ে ভাবগুলি যেন আপনি আসে নাই—বিদ্যাপতির সংস্কৃত সাহিত্যে দখল ছিল বলিয়া আসিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসে ভাবের কি স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি! হৃদয়ের কি স্বতঃ উচ্ছ্বাস! লেখনী হস্তে কড়িকাষ্ঠের পানে চাহিয়া তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তিনি জ্যোৎস্নাকে চাহিলেন, তাঁহার সম্মুখের কাগজের উপর জ্যোৎস্না ফুটিয়া পড়িল। তিনি কৃষ্ণকে সাজাইতে কোটি যুগ চাহিলেন, তাঁহার কৃষ্ণের অঙ্গুলি-উপরে যুগযুগান্তর প্রতিবিম্বিত হইল। বিদ্যাপতি অধরের রাঙিমা, বদনের ছাঁদটি লইয়াই প্রায় সন্তুষ্ট। চণ্ডীদাস অধরের রাঙিমায় ডুবিতে চাহেন, অধরের হৃদয়ে বসিয়া তাঁহাকে চুম্বনের সুখ অনুভব করিতে হইবে। বিদ্যাপতি বলিলেন, মুখখানি ত বেশ, চাঁদই বা লাগে কোথায় ? চণ্ডীদাস বলিবেন, তাহা ত বটেই, কিন্তু শুধু তাহা দেখিয়া কি ফল, একবার চাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখ—দেখিবে, চন্দ্র নিংড়াইয়া যে সারের সার বাহির হইবে, ঐ মুখখানি তাহা দিয়া গঠিত। বিদ্যাপতি দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন ; চণ্ডীদাস আপনাকে সেই সৌন্দর্য্যে হারাইয়া বলিলেন।

পাঠকেরা এত ক্ষণ মনে করিতেছেন, চণ্ডীদাসের দিকে আমরা কিছু ঢলিয়া পড়িয়াছি, নহিলে বিদ্যাপতির বিরহবর্ণনার এখনও উল্লেখ করা হইল না কেন। আমরা একেবারে কাহারও দিকে ঢলিয়া পড়ি নাই, তবে ক্রমে ক্রমে সকল কথা বলিব, একেবারে চারি দিক্ লইয়া আলোচনার বিশেষ সুবিধা বোধ হয় না। বিদ্যাপতির বিরহ ছাড়িবার জিনিস নহে। তাঁহার বিরহের কতকগুলি গান বড়ই

চমৎকার ভাবময়। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন,

"সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।"

প্রিয়তমের পথ চাহিয়া দিন আর কাটে না। সময় ত আগেকার মতই চলিয়াছে, আগেকার মতই দিন আসে যায়, কিন্তু রাধার কত যুগ কাটিয়া গেল। পথ পানে চাহিয়া থাকিলে কি তবে যুগ যুগ কাটিয়া যায়? যায় বৈ কি। দিন হুহু করিয়া চলিয়া যায়, তবু দিন ফুরায় না। রাধারও তিলে তিলে যুগ কাটিয়া যাইতেছে, তাই তাঁহার দিন কাটিতেছে না। আর এই দিন কাটে না বলিয়াই তাঁহার সজল নয়ান। রাধার "তিল এক হয় যুগ চারি"।

রাধা যে শুধু সজল নয়নে পথ চাহিয়াই থাকেন, তাহা নহে। বিরহের মধ্যে অভিশাপ লাগিয়া আছে। কিন্তু অভিশাপ কাহাকে? কালকে বুঝি? কালকে হইলে ত রক্ষা ছিল, কিন্তু রাধা কালকেই বিরহের কারণ ঠাহরান নাই, তাঁহার লক্ষ্য সচেতন পদার্থে। রাধার অভিশাপ শুনিলেই তাহা বুঝা যায়।

"নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ
পিয়া মোর যার পাশ বৈসে।"

তাহার পাশে এই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ুক। এ কি সহজ কথা? তাহার বুকে শেল বিঁধাইয়া দিলে বুঝি প্রাণের আশ মিটে না, দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার কোমল হৃদয় খাক্ হইয়া যাক্—সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরুক্। রাধা, রাধা, তুমি তাহার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধাইয়া দাও, তাহার হৃদয়ের শোণিতে তোমার বিরহজ্বালার উপশম কর, কিন্তু এ অভিশাপ দিও না গো। এ অভিশাপ তাহাকে—কাহাকে কে জানে?—তাহাকে দিও না।

চণ্ডীদাসের রাধাও আগেভাগে অভিসম্পাত করিয়া বসেন। কিন্তু তাঁহার আবার এ রোগ কেন? কারণ অবশ্যই আছে।

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?

আমার অন্তর যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে ॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয় ॥
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে,
তেমনি হউক সে ॥"

পাঠকেরা চণ্ডীদাসের রাধার অভিশাপের সহিত বিদ্যাপতির রাধার অভিশাপের তুলনা করিয়া দেখিলে দুই জনের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। দুই জনেরই অভিশাপের মর্ম্ম কি এক নয়? মর্ম্ম একই বটে, দুই জনেই সেই "পিয়া মোর যার পাশ বৈসে," তাহাকে অভিশাপ দিতেছেন। দুই জনেরই শাপের মূল এক। কিন্তু দুই জন একভাবে অভিশাপ দিলেও দুই জনের কি তফাৎ! এক জন বলিলেন, তাহার পার্শ্বে এই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ুক, তাহার হৃদয়ে আর কিছুই বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ নাই, কেবল এই মর্ম্মভেদী অনন্ত যাতনাময় নিশ্বাস সেখানে কাঁদিয়া বেড়াক্। আর একজন বলিলেন, আমার হৃদয় যেরূপ করিতেছে, তাহার হৃদয়ও সেইরূপ হোক। তোমার হৃদয় কি করিতেছে তুমিই জান, আমরা তাহা জানিতে চাহি না, কিন্তু পরের হৃদয় তুমি ভাঙ্গিতে চাহ কেন? তোমার হৃদয়ের সুখশান্তিটুকু কি তাহাকে দিতে পার? কৈ, তাহা ত চাহ না। তাহা চাহিবে কেন? তবে আর অভিশাপ কিসের? তোমার দীর্ঘনিশ্বাস তাহার হৃদয়ে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়া মরুক, ইহাই না তোমার বাসনা? তুমি সেই রাধা—বিদ্যাপতির হাত হইতে চণ্ডীদাসের হাতে আসিয়াছ মাত্র, কিন্তু তুমি সেই।

সে যাহা হোক্, বিদ্যাপতির বিরহ-গানগুলিতে কেমন একটি ভাব আছে। তাঁহার "এ ভরা বাদর" শুনিলে বর্ষাকালের বিরহের ভাব কেমন যেন হৃদয়ে জাগিয়া

উঠে। তাঁহার "সময় বসন্ত, কান্ত রহু দূরদেশ" শুনিলে বসন্তের বিরহও তেমনি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বিরহের অথবা মিলনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিদ্যাপতির কবিতার মর্ম্মগত একটা কি ভাব আছে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে। চণ্ডীদাসের কবিতায় পিরীতি ভরপূর। তাঁহার কবিতা পিরীতিময়। তাঁহার ভাব, "পিরীতি নগরে বসতি করিব, পিরীতে বাঁধিব ঘর।" তিনি পিরীতি পিরীতি করিয়া মাতিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গানগুলিতে এত পিরীতি আছে যে, সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলে একখানি রীতিমত পুঁথি হয়। বিদ্যাপতির কবিতাকে চণ্ডীদাসের তুলনায় যৌবনাচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের কবিতায় যৌবনের অভাব দেখা যায় না বটে ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যৌবনাচ্ছন্ন নহে। আর বিদ্যাপতিতে কেমন একটা অতৃপ্তির ভাব দেখা যায়। তাঁহার এই অতৃপ্তির একটি গান একেবারে বিখ্যাত। সে গান আমাদের,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুননু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥"

এ গানটি আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি নাই, মধ্যে খানিকটা তুলিয়া দিয়াছি মাত্র। বিদ্যাপতির কবিতায় আরও স্থানে স্থানে এই ভাবের বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার একটি বাসন্তী বিরহের গানেও আছে,

"অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয় নয়ান।"

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথা বলা হইয়াছে। আর অধিক বকাবকি করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। এখন সংক্ষেপে ইহাদের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া শেষ করা যাক্। বিদ্যাপতির কবিতা দেখিলে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, তাঁহার লেখায় সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়া দেখা যায়। তাঁহার উপরে জয়দেবের বিশেষ প্রভাব। চণ্ডীদাস ঠাকুরে কাহারও বড় প্রভাব দেখা যায় না। জয়দেব তিনি পড়িয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার লেখায় জয়দেবের তেমন প্রভাব ত কৈ লক্ষিত হয় না। চণ্ডীদাসের লেখার স্থানে স্থানে

তাঁহার নাট্যরসাস্বাদন-ক্ষমতারও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। মানময়ী রাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। চণ্ডীদাসের ছন্দ প্রায়ই কিছু ছুটন্ত; বিদ্যাপতি কিছু ধীর। কিন্তু লেখা দেখিয়া চণ্ডীদাসকে যেমন সহজে চেনা যায়, বিদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধরা যায় না। চণ্ডীদাস আপনার লেখায় ফুটিয়াছেন অধিক।

'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৬

জীবন-ট্র্যাজেডি

মরণের কথা উঠিলেই লোকে সাধারণতঃ ট্র্যাজেডি ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া আসে, বাক্য সংযত করিয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকে—চিরজন্ম হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবার মত কি বুঝি ঘটনা আসিতেছে। হাসিতে ভরসা হয় না, কোথায় রসভঙ্গ হইবে, ভাব মারা যাইবে। লোকে কতকটা কাঁদিবার অবস্থায় আসিয়া অপেক্ষা করে। হাসির কথা যদি উঠে, হাসে বটে, কিন্তু নয়নের ছলছল ভাব তখনও যায় নাই। মৃত্যুর রহস্যরাজ্যে আমরা বিভীষিকার একটা করাল কাল মূর্তি খাড়া করিয়া রাখিয়াছি, দিন রাত্রি সেই মূর্তি পানে চাহিয়া বিরহের স্বপ্ন দেখিতেছি; সুতরাং মৃত্যু আমাদের নিকট ট্র্যাজেডি বৈ আর কি? আরম্ভের কথা ভাবিবার আমরা বড় একটা অবসর পাই না, জীবন পড়িয়া থাকে; উপসংহার পড়িয়া দেখি, নায়ক নায়িকার কে একজন সরিয়া গিয়াছে। আমরা কাঁদিয়া উঠি।

কিন্তু যে ঘটনা-স্রোতের মধ্য দিয়া সে উপসংহার রচিত হইয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে আমরা কখনই নিশ্চিত কিছু বলিতে পারি না। উপসংহারেই ত কাব্য বুঝা যায় না—গঠন দেখিয়াই ট্র্যাজেডি কি না বলা যায়। সুতরাং মৃত্যুকে ট্র্যাজেডি প্রমাণ করিতে হইলে জীবনের গঠনে তাহার অনুকূল ঘটনা আছে কি না—আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহার পর দেখিতে হইবে, মৃত্যুর পরিচ্ছেদটি উঠাইয়া লইলে জীবন কিরূপ প্রতিভাত হয়। বিরহমাত্রই ট্র্যাজেডি নহে, বিরহবিশেষ ট্র্যাজেডি বটে। সেইরূপ মিলনবিশেষ ট্র্যাজেডি, আবার মিলনবিশেষ ট্র্যাজেডি ছাড়িয়া সামান্য প্রহসন। একটি সূক্ষ্ম সূত্রের উপরে ট্র্যাজেডি নির্ভর করে। মিলনই হৌক, বিরহই হৌক, তাহার ভিতরে অন্তঃসলিলা নদীর মত একটি ভাব বহিয়া চলিয়াছে; ট্র্যাজেডি সেই ভাবে। এইজন্য কাঠাম দেখিয়া কিছু বুঝিবার নাই—জীবনের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে।

জীবন সম্বন্ধে আমরা হাসিয়া কথা কহি, এই হেতু তাহাকে ট্র্যাজেডি হইতে বিস্তর তফাৎ মনে হয়। জীবন যেন কিছুই নয়, কতকগুলা দিনসমষ্টি মাত্র—কোন প্রকারে কাটিয়া যাওয়া বিষয়। দৈনন্দিন ঘটনা সমূহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আমরা তাহার ট্র্যাজেডি-গাম্ভীর্য্য তেমন উপলব্ধি করিতে পারি না, নিতান্ত প্রহসন না বলিলেও মৃত্যুর তুলনায় লঘু রকম একটা কিছু বুঝি। আমরা জীবনটা উপভোগ করিয়া লই, তাহার দেহটা যত দেখি, আত্মা তত দেখি না। আর মৃত্যুর দেহের দিকে চাহিতে বড ভরসা হয় না, কল্পনায় তাহার যে ভাব আছে, সেই ভাবেই মুগ্ধ হইয়া থাকি।

জীবনের ট্র্যাজেডি কিন্তু কোথায়? সুখের গভীরতায় আমরা যে দুঃখপ্রবাহ অনুভব করি, সেইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডি। বাহিরে সারাদিন হাসিলেও আমাদের অন্তরে একটা অশ্রুসিক্ত ভাব বহিয়া যায়, আমাদের মিলনের মধ্যে এমন একটা বিরহ-বিদ্ধ ভাব থাকে, যাহাতে জীবন নিতান্ত লঘু হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের শত সহস্র অস্ফুট ভাবেই ট্র্যাজেডি বজায় থাকে—সুখের মধ্যে দুঃখ, শান্তির মধ্যে অতৃপ্তি ইত্যাদি। কাঁদিয়া ফেলিলেই অনেক স্থলে কমেডি হইয়া দাঁড়ায়, দীর্ঘনিশ্বাস আসিয়া ট্র্যাজেডি রচনা করে। আমরা অতীতে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান অনুভব করি, সেই বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দেখি, ট্র্যাজেডি ক্রমাগতই যেন ঘনাইয়া আসে।

এত বড ট্র্যাজেডি আর আছে নাকি? কোথা হইতে কোন্ হৃদয় আসিয়া অপর হৃদয়ের সহিত মিলিত হইল, সমস্ত মিলন-আনন্দের মধ্যে ভাবনা চিন্তা ভয় মাত্র জাগিয়া। যে উদ্দেশ্যের জন্য খাটিয়া যাও, উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ট্র্যাজেডি। সব যেন ফুরাইল, অবসন্ন উদ্যম এখনও সেই অতৃপ্ত। এই অতৃপ্তিতেই ট্র্যাজেডি; এবং এই জন্যই মৃত্যু উপসংহারে জীবন-ট্র্যাজেডি ভালরূপে ফুটিতে পারিয়াছে।

মৃত্যু আসিয়া জীবনের হৃদয়ে একটা ছায়া ফেলিয়া দিল। তাহার মধ্যে এমন একটা অব্যক্ত অস্ফুট রহস্য-সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠিল যে, হৃদয়ের গভীরতায় তাহা চিরদিন মুদ্রিত হইয়া থাকে। উপসংহার লঘু হইলে ত ট্র্যাজেডি মাটি হইয়া যায়। মৃত্যুর উপসংহার জীবন-ট্র্যাজেডির উপযুক্তই হইয়াছে। এমন গম্ভীর ভাবময় উপসংহার কোথায় মিলিবে? বিস্তৃত অতীত এবং আরও বিস্তৃত ভবিষ্যৎ, এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বন্ধন। ভবিষ্যতের পৃষ্ঠা আর খুলিল না, অতীতের মধ্য হইতেই ভবিষ্যৎকে অতি ক্ষীণ দেখা যাইতেছে।

জীবনবিশেষ যে ট্র্যাজেডি এবং অনেক জীবন ট্র্যাজেডি নয়, তাহা নহে। পাষাণের মধ্য দিয়াও একদিন নিভৃতে নির্জ্জনে অশ্রুস্রোত বহে, সেইখানেই তার ট্র্যাজেডি।

অশ্রুস্রোত জমিয়া গিয়া যখন কঠিন হইয়া যায়. হৃদয় উঠিতে পারে না, তখনও তাহা ট্র্যাজেডি। তবে সকল জীবন অবশ্য সমান ট্র্যাজেডি নয়, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

জীবন যদি তবে ট্র্যাজেডিই হইল, হাস্যরস কোথা হইতে আসিল? হাস্যরস যে ট্র্যাজেডিতে থাকিতেই পারে না, এমন কোন আইন নাই। তবে হাস্যরসের প্রাচুর্য্যে গাম্ভীর্য্য অনেক সময় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই তাহা ট্র্যাজেডির অনুকূল রস নহে। তাই বলিয়া প্রথম হইতে চোখ রগড়াইতে আরম্ভ করিলেও ট্র্যাজেডি হয় না। আমাদের জীবনে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য। হাস্যের অধরে অশ্রুর রেখা—হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া যাও, কিন্তু কাঁদিতে হইবে। এমন চমৎকার নিখুঁত ট্র্যাজেডি আর নাই। যত বড় আলঙ্কারিক আসুন না কেন, ইহার একটি দোষ বাহির করিতে পারিবেন না।

আর ইহা ট্র্যাজেডি নয়, এ কথা কেহ বলিতে পারে? জন্মের মধ্যে মৃত্যু বসিয়া—আরম্ভের মধ্যে অবসান। আর শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য, যতই আলোচনা করিয়া দেখ, প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডি। শৈশবের সারল্যের মধ্যেও সন্দেহের বীজ রহিয়াছে—কৈশোর যৌবনের অনুরাগ উৎসাহ উদ্যমের মধ্য দিয়া গিয়া সেই সন্দেহ বার্দ্ধক্যে ফুটিয়া উঠে। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়া নীরবে এই গম্ভীর মহাট্র্যাজেডি গঠিত হইতেছে। এই ট্র্যাজেডির আদর্শেই মহাভারত, রামায়ণ, হ্যাম্‌লেট।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কিন্তু জীবন-ট্র্যাজেডি বুঝেন নাই। জীবনের উপসংহার মৃত্যু; তাঁহাদের নিয়মানুসারে গ্রন্থের উপসংহারে মৃত্যু থাকিবার জো নাই। নায়ক নায়িকার মিলন না হইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। মিলন হইলেও ট্র্যাজেডি অবশ্য হইতে পারে, দুই চারি জনের মৃত্যুতেও ট্র্যাজেডি না হইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আইন থাকা অবশ্য ভাল নয়। স্বভাবে যাহা নাই—সাহিত্যে তাহা জোর করিয়া রাখা কেন?

স্বভাবে ট্র্যাজেডিরই অভিনয় চলিয়াছে বোধ হয়। প্রহসন দেখিয়া আমাদের এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রহসনের মধ্যে অনেক সময় ট্র্যাজেডি ঘুমাইয়া থাকে। প্রহসন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখাইয়া দেয় মাত্র। অনেকেই দেখিয়া হাসে, কিন্তু যাহাদের হৃদয় আছে, ঘরে আসিয়া কাঁদে। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্যবিহীন কতকগুলা বিদ্বেষপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি প্রহসন নহে। কিন্তু প্রহসন অবশ্য ট্র্যাজেডিও নহে, তবে অনেক সময় ট্র্যাজেডির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বটে।

জীবন-ট্র্যাজেডিকে ব্যক্ত করিবার জন্য প্রহসন-ঘটনা দুই চারিটা থাকে। কিন্তু সে প্রহসনের পরিণাম ট্র্যাজেডি। বৈচিত্র্যের জন্য তাহাতে সৌন্দর্য্য সুব্যক্ত হয়। তবে তাহাকে প্রহসন বলা কত দূর সঙ্গত সন্দেহ। জীবন কাঁদিয়া জন্মগ্রহণ করে, কাঁদিয়া হাসিয়া মরে; দর্শকেরা কিন্তু তখনই কাঁদিয়া উঠে! এইখানেই জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি।

'ভারতী ও বালক', ভাদ্র ১২৯৬

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

ভাবগত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া জাতিবিশেষের মধ্যে উন্নত ভাবের কত দূর চর্চ্চা হইয়াছিল যেমন বুঝা যায়, সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিবার তেমন সুবিধা হয় না। কবির ভাব সাধারণের অপেক্ষা চিরকালই উন্নত, এই জন্য তাহা দেখিয়া সাধারণের ভাব সম্বন্ধে অকাট্যরূপে বিশেষ কিছু বলা যায় না, তবে জাতির অবস্থা যে এমনতর উন্নত হইয়াছিল, যাহাতে তেমন কবি জন্মাইতে পারিয়াছেন—এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় বটে। সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিতে হইলে ভাবের হিমাদ্রিশিখর হইতে একটু নামিয়া আসিতে হয়, যে সাহিত্যে সমাজের বাহ্য চিত্র যথেষ্ট অঙ্কিত হইয়াছে, এইরূপ সাহিত্যের অনুশীলন আবশ্যক। কারণ, মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহা হইলে সহজেই মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইবে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থই এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরামে ভাবের হিল্লোল কোথাও বড় খেলিতে পায় নাই, কবিত্ব বিকশিয়া উঠিয়া সৌন্দর্য্যের রহস্যদ্বার খুলিয়া দেয় না। বস্তুর অতীত প্রদেশে তাঁহার তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না—চর্ম্মচক্ষুতে যাহা যেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেইরূপই বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন; উচ্চদরের কবি তিনি নহেন, কিন্তু সাজাইয়া গল্প করিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে। আর থোড় বড়ি মোচার ঘণ্টে তাঁহার অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হাটে যাইলে তিনি হাটশুদ্ধ জিনিসের দর জানিয়া আসেন, ঘরে আসিয়া পাকশালায় গিয়া পাচককে রন্ধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন, সংসারের কাজকর্ম্মে অনেক গৃহিণী তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত মুকুন্দরাম হৃদয়ের সুগভীর ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারও বিরহবেদনা আছে, মিলন-আনন্দ আছে, কিন্তু সে বেদনায় দেহই জ্বলিয়াছে অধিক, সে মিলনে দেহই বাঁচিয়া গিয়াছে। দেহকে বাঁচান তাঁহার কতকটা

আবশ্যকও হইয়াছিল—তাঁহার স্ত্রীচরিত্রগুলির কি কীলযুদ্ধে সামান্য ব্যুৎপত্তি! মুকুন্দরাম হৃদয়ের ভাষায় গান গাহিলে সপত্নীবর্গের গুম্‌গুম্ কীলশব্দে এবং সম্মার্জ্জিত তারকণ্ঠ সম্ভাষণে তাহা ডুবিয়া যাইত। যাহা হৌক্, এখন আর সে আশঙ্কা নাই, কবিকঙ্কণ বিরহবিধুরাদিগের রুদ্ধ নিশ্বাস বড় অনুভব করেন নাই; বিরহিণীদ্বয়ের কীলাকীলি দেখিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের বোধ করি হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, দূর হইতেই তাই তিনি কাজ সারিয়াছেন।

মুকুন্দরাম জীবনে কষ্ট পাইয়াছেন অনেক। জীবনী লেখা উদ্দেশ্য না হইলেও এখানে আমরা তাঁহার দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতে পারি। কারণ, চণ্ডীগ্রন্থের উৎপত্তি কারণে কবি নিজেই আপনার দুরবস্থার কথা বলিতে বসিয়াছেন। অত্যাচারী মুসলমান ডিহিদারের নিষ্ঠুরতায় তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল; অনশনে, অর্দ্ধাহারে, দয়াবানের ভিক্ষাদানে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে নরপতি রঘুনাথের আশ্রয়ে আসিয়া তিনি বাঁচিয়া যান। পথে চণ্ডীর আদেশে তিনি যে কাব্য রচনা করিতে বসেন, এইখানে আসিয়াই সম্ভবতঃ তাহা পরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণ হয়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী মোটামুটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কালকেতুর কথা বর্ণিত হইয়াছে—কালকেতুর জন্ম, বিক্রম, বিবাহ, যুদ্ধ ইত্যাদি; দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগরের কথা—লহনা খুল্লনার দ্বন্দ্ব, বিরহ অভিসার প্রভৃতি। সাময়িক সমাজের অবস্থা বুঝিবার সুবিধা অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ডে। কিন্তু প্রথম খণ্ডটিও বাদ দেওয়া যায় না, তাহাতেও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। আমরা প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল কথা আলোচনা করিব।

স্বর্গের নীলাম্বরের প্রতি কোনও বিশেষ কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দেন যে, মর্ত্ত্যভূমে ব্যাধকুলে তাহার জন্ম হইবে। মহাদেবের শাপে ধর্ম্মকেতুর গৃহে তাহার জন্ম হয়—নাম হইল কালকেতু। কালকেতু নিতান্ত দুধের ছেলে নয়—ব্যাধের ঘরে ব্যাধ হইয়াই সে জন্মিয়াছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু। কবিকঙ্কণ বর্ণনা করিয়াছেন,

"নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমান,
দুই বাহু লোহার সাবল।"

শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই—কালকেতুর প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মৃদুস্পর্শনে বীরভাব প্রকাশ করিতে তিনি পারেন নাই, কিন্তু মোটা মোটা বর্ণনা করিয়া একরকম বুঝাইয়াছেন। কালকেতুর শারীরিক বলই সম্বল, অসাধারণ হৃদয়ের বল তাহার চরিত্রে দেখা যায় না। আমাদের মুকুন্দরামও শরীরের

কবি। তাঁহার ভাবময় বর্ণনা নহে—প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি বক্ষ বর্ণনা করিতে বসিলেই কপাটের সহিত তুলনা করেন, নেত্র বর্ণনা করিতে হইলেই আকর্ণ দীর্ঘ। কালকেতুর বর্ণনা আর একটু উদ্ধৃত করিয়া দি, পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।

"কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মতি পাঁতি জিনিয়া দশন ॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি-ভাঁটা,
কাণে শোভে ফটিক কুণ্ডল।"

কালকেতুর বিক্রমও সাধারণ নহে। তাড়া দিয়া সে হরিণ ধরিতে পারে, ধনুক শরের আবশ্যক হয় না।

এমন পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাধকে সুতরাং চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। অনুরূপ কন্যা মিলে কোথায়? বিধাতা সদয় হইলেন, ফুল্লরা মিলিল। পুরোহিত সোমাই পণ্ডিতের সহিত ধর্ম্মকেতুর বিরলে একদিন কথাবার্ত্তা হয়—কথাবার্ত্তা আর কি, কালকেতুর বিবাহ। এ কথাবার্ত্তাগুলি কিন্তু পড়িয়া সুখ আছে—সব কেমন স্বাভাবিক। প্রাচীন বঙ্গের সামাজিক অবস্থা ইহাতে বেশ বুঝা যায়। তাহার পর কালকেতুর বিবাহ হইল। মুকুন্দরাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, চোখে যাহা পড়িয়াছে—কিছুই বাদ যায় নাই।

বিবাহাদি করিয়া কালকেতু স্বগৃহে ফিরিল। ধর্ম্মকেতুর পুত্রবধূটিও মিলিয়াছে ভাল। ধর্ম্মকেতুর সুখের অন্ত নাই। নিদয়াও আনন্দিতহৃদয়। ফুল্লরা রাঁধে বাড়ে, শ্বশুর শাশুড়ীকে মন দিয়া খাওয়ায়, তাঁহাদের সেবার কোনও ত্রুটি হয় না। সংসারে এখন সব সুশৃঙ্খলা, গোলযোগ ঝঞ্ঝা নাই। সংসারে শান্তি ভোগ করিয়া অবশেষে নিদয়া সহিত ধর্ম্মকেতু বারাণসীধামে মুক্তি চিন্তা করিতে চলিয়া গেল। ফুল্লরাই গৃহের গৃহিণী হইল।

কালকেতু বনে বনে প্রতি দিন শিকার করিয়া বেড়ায়। হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া সে আছাড় মারে, ব্যাঘ্রকে ফাঁদ পাতিয়া ধরে, মহিষকে তাড়া দিয়া ধরিয়া ফেলে। ফুল্লরা হাটে গিয়া গজদন্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মহিষশৃঙ্গ বিক্রয় করিয়া পয়সা আনে। এইরূপে দম্পতির দিন কাটিয়া যায়। ফুল্লরার গৃহিণীপনায় কালকেতুর বিপুল উদর পরিপূর্ণ থাকে—সে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলও পরিতৃপ্ত হয়। গৃহিণী না হইলে কালকেতুর ক্ষুধা কি যে সে নিবারণ করিতে পারে? কবিকঙ্কণ বর্ণনা করিয়াছেন,

"মুচড়িয়া গোঁপ দুটা বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।
একশ্বাসে সাত ঘড়া আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি অন্ন বীর খায় ক্ষুদ জাউ।
দালি খাইল ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খাইল আলু ওল পোড়া।
বনপুঁই ভার দুই কলমী কাঁচড়া॥"

বীরের ছোট গ্রাস মুকুন্দরাম তালসমান বলিয়াছেন। বড় গ্রাস বোধ করি, ছোটখাট লোকে আঁকড়িয়া পায় না।

কালকেতুর সহিত অরণ্যের পশুদের একবার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পশুরা তাহার তাড়নে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইয়া তাহারা বাঁচিয়া যায়। চণ্ডী গোধিকাবেশে কালকেতুকে দর্শন দেন। মৃগয়ায় বিফলমনোরথ হইয়া কালকেতু সেই গোধিকাকে জাল দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আনে। গৃহে আসিয়া ব্যাধ গোধিকাকে চুপড়ি চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। গেধিকা কিয়ৎক্ষণ পরে নিজ যথার্থ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহির হইল।

কালকেতু গৃহে নাই, ফুল্লরা আসিয়া দেখে যে, তাহার গৃহে এক ষোড়শী রূপসী নীরবে বসিয়া আছে। রূপসীর লাবণ্য দেখিয়া ফুল্লরা অবাক্ হইয়া গিয়াছে—এমনতর সুন্দরী সে বুঝি জীবনে দেখে নাই। সুন্দরী আবার এত দেশ থাকিতে ফুল্লরার কুটীরদ্বারে বসিয়া। সুতরাং ব্যাধনিতম্বিনীর আরও আশ্চর্য্য ঠেকিতেছে। ফুল্লরা বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে সাহস করিয়া যুবতীর একাকিনী এরূপভাবে পরগৃহে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফুল্লরা সন্দেহ করিতেছিল—কুলবধূ কেহ স্বামীর সহিত অথবা শাশুড়ী ননদের সহিত ঝগড়া করিয়া রাগের মাথায় চলিয়া আসিয়াছে। সেই জন্য সে খুলিয়া বলিল, যদি এরূপ কিছু হইয়া থাকে, সুন্দরীর সঙ্গে গিয়া দুই পাঁচ কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহাদিগকে সে শান্ত করিয়া আসিবে।

ফুল্লরার সান্ত্বনায় চণ্ডীর মুখ ফুটিল। তিনি বাঁধা আইনানুসারে উগ্র পতি এবং সোহাগিনী সপত্নীর বিরুদ্ধে ফুল্লরাসমীপে এক নালিস রুজু করিলেন। বীরের জন্য তিনি সে সকল কষ্ট সহিতে পারেন, সে কথারও আভাস দিতে ভুলিলেন না। ফুল্লরার কিন্তু তাহাতে মন উঠিল না; সীতা, সাবিত্রী, বেদবতীর উদাহরণ সমেত একটা লম্বা রকম বক্তৃতা ঝাড়িয়া বুঝাইল, ভালয় ভালয় দিন থাকিতে স্বামীগৃহে প্রতিগমন করাই কর্ত্তব্য। চণ্ডী ঘাড় নাড়িলেন—ফুল্লরার কুটীর হইতে সহজে তিনি নড়িতে সম্মত নহেন।

ফুল্লরা মহা বিপদে পড়িল—এ ষোড়শী রূপসীটাকে কিছুতেই যে বিদায় করা যায় না। ফুল্লরা বার মাসের দুঃখ গাহিল। কিন্তু গাহিলে হইবে কি? চণ্ডী নড়িবার কথা ভুলিয়াও বলেন না—তাঁহার ধনে এবার অবধি ফুল্লরার অংশ রহিল বলিয়া ভরসা দিলেন। ফুল্লরা বেগতিক দেখিয়া স্বামীর নিকট দৌড়িয়া গিয়া বলিল যে, কাহার ষোড়শী কন্যা ঘরে আনিয়া তিনি মরিবার উপায় করিতেছেন। কালকেতু শুনিয়াই অবাক্। ফুল্লরাকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল, মিথ্যা হইলে নাসিকা শূর্পণখার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে বুঝিয়া যেন সত্য বলা হয়। ফুল্লরা কালকেতুকে লইয়া আসিয়া দেখাইল। কালকেতু ভাবিল, তাই ত, এ ব্যক্তি এখানে কে?

কালকেতু রূপসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, ফুল্লরা সমেত গিয়া তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের নিকট পৌছাইয়া দিয়া আসিতে চাহিল। অনেক পীড়াপীড়িতে চণ্ডী মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ করিলেন। তখন কালকেতু ভয়ে মূর্চ্ছা যায়। চণ্ডী অভয় প্রদান করিলেন, এবং কালকেতুকে অনেক ধনরত্নের অধিকারী করিয়া দিলেন। সেই অবধি ব্যাধনন্দনের কপাল খুলিয়া গেল।

চণ্ডীর অনুগ্রহে কালকেতু গুজরাট দেশে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিল। বীরের নগরে অনেক হিন্দু মুসলমান প্রজা আসিয়া জুটিল। মুসলমানেরা সহরের পশ্চিমভাগে বাস করিবার অনুমতি পাইল। মুকুন্দরাম মুসলমানপাড়ার এক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি হইয়াছে ভাল। তাহা পড়িতে মজা লাগে। মোটা মোটা মুসলমানী কথায় তাহার মধ্যে যেন একটা হাস্যতরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ হইলেও আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কলিঙ্গ নগর ছাড়ি, প্রজা লয় ঘর বাড়ী,
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরের লইয়া পান বৈসে যত মুসলমান,
পশ্চিম দিক্ বীর দেয় তারে॥
আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোল্লা কাজি,
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।
পুরের পশ্চিম পটী বসাইল হাসনহাটী
এক মুদনী গৃহ বাড়ী॥
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়া লোহিত পাটী,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।

ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পগম্বরে,
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
বসাইয়া কেহ হাটে পীরের শীরিনি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান ॥
বড়ই দানিসবন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥
না ছাড়ে আপন পথে, দশ রেখা টুপি মাথে,
ইজার পরয়ে দৃঢ় নাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা,
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি ॥
আপন টবর লৈয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া,
ভুঞ্জিয়া ত গায়ে মুছে হাত!
স্থর লোহানি পানী, কুডানি বটুনি হুনি,
পাঠান বসিল নানামত ॥
বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া,
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পডায় নিকা দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥
করে ধরি খর ছুরি, কুকুড়া জবাই করি,
দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেয় মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবখান
মগদম পডায় পঠনা।"

মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণপাড়ারও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা আরও দীর্ঘ। বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইতে মূর্খ বিপ্র পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বর্ণনার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

তাহার পর ক্রমে ক্রমে কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতিরও বর্ণনা হইয়াছে। কবিত্বরস এ সকল বর্ণনায় লোকে বড় নাকি আশা করে না, তাই এগুলি পড়িতে মন্দ নয়। নহিলে স্বভাবের সৌন্দর্য্য, কিম্বা হৃদয়ের গভীর ভাব বর্ণনা করিতে মুকুন্দরাম আদবেই পারেন না। তিনি কাঠাম গড়িতে পারেন, কিন্তু কাঠামোয় প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন না। সাধারণ ভাব কথাবার্ত্তা যেমন, তেমনি তিনি বেশ বর্ণনা করেন বটে।

যাহা হউক, কালকেতুর অদৃষ্টে নিরাপদে রাজ্যভোগ অধিক দিন ঘটিল না। ভাঁড়ু দত্তের ধূর্ত্ততায় কলিঙ্গরাজের সহিত কালুর যুদ্ধ হইল। জয়লক্ষ্মী কলিঙ্গরাজের দিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। কালকেতু কারাগারে বন্দী; সে স্বাধীনতা নাই, সে রাজ্যসুখ নাই, কালকেতুর লক্ষ্মী বুঝি চঞ্চলা হইয়াছেন। চণ্ডীর অনুগ্রহে কালুর অদৃষ্ট আবার ফিরিল। কলিঙ্গাধিপতি সসম্মানে কালকেতুকে পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গুজরাটের রাজা হইয়া কালকেতু ভাঁড়ু দত্তকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়া যথেষ্ট অপমানিত করিলেন। তাহার পর কিছুদিন অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া পুত্র পুষ্পকেতুর করে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন, এবং ব্যাধজন্ম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নীলাম্বর স্বর্গধামে উপনীত হইলেন।

কবিকঙ্কণচণ্ডীর পূর্ব্বভাগ এইখানেই সমাপ্ত হইল। উত্তরভাগের সহিত এ খণ্ডের বিশেষ কিছু যোগ নাই। সে উপাখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্তের তাহাতে নাম গন্ধও নাই। তবে গ্রন্থের প্রায় শেষে চণ্ডী কালকেতুর উদ্ধারের কথা একবার বলিয়াছেন বুঝি। পূর্ব্বখণ্ডের পাত্র পাত্রী উত্তরখণ্ডে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। চণ্ডীর প্রভাব দেখান বোধ করি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, সেই জন্য দুইটি বিভিন্ন উপাখ্যান রচনা করিয়া কেবল মাত্র চণ্ডীর অনুগ্রহসূত্রে দুইটিকে একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন। সংসারের সকল সুখ দুঃখের মধ্যেই চণ্ডীর মঙ্গলহস্ত বিদ্যমান—তাঁহার অনুগ্রহ বিনা এখানে কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

কবিকঙ্কণের লেখায় বরাবর কেমন একটি ধর্ম্মের সুর আছে। লেখা পড়িলেই মনে হয়, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। মুকুন্দরাম জীবনে দুঃখ কষ্ট সহিয়াছেন অনেক, আর এই সকল দুঃখ কষ্টের মধ্যে তিনি যেন মায়ের স্নেহ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ধরণ কতকটা পৌরাণিক—অসম্ভব রকম বর্ণনা করিয়া একটা গম্ভীর মূর্ত্তি খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বুঝা যায়। জমকালো মূর্ত্তি আঁকিবার তাঁহার যতটা চেষ্টা ছিল, গম্ভীর প্রশান্ত হৃদয় গঠন করিবার তেমন ঝোঁক ছিল না। কালকেতু উপাখ্যানখণ্ডেই কি, আর ধনপতি সদাগরকথাই বা কি—তাঁহার একটি চরিত্রও গম্ভীর হয় নাই। স্বয়ং চণ্ডীই গম্ভীর নহেন।

যাহাই হৌক্, সাধারণ চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার ক্ষমতার নিতান্ত অভাব দেখা যায় না। কালকেতু, ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতির চিত্র বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। ধনপতি সদাগর, খুল্লনা, লহনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতির চরিত্রও অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু থাক্, এ সকল চরিত্র সম্বন্ধে এখন কিছু না বলাই ভাল। ধনপতি উপাখ্যান আলোচনার সময় দেখা যাইবে।

ফুল্লরার বারমাস্যা বঙ্গদেশে খুব বিখ্যাত। অনেকে কবিকঙ্কণের কবিত্বের নমুনা-স্বরূপ বারমাস্যা হইতে দু'এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান। বারমাস্যায় ফুল্লরা দুঃখ করিতেছে, আষাঢ় মাসে নিত্য ঘর পড়ে, শ্রাবণ মাসে ভগ্ন কুটীরে জল পড়িতে থাকে—গায়ে আচ্ছাদন নাই, ভাদ্র মাসে দুরন্ত বাদলে কিরাতের উপার্জ্জন করিবার তেমন সুবিধা নাই, আশ্বিনে সকলে উত্তম বসন পরিধান করে—ফুল্লরার তখন উদরচিন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ফুল্লরার বার মাসের দুঃখে কবিত্ব কোথাও ত দেখা যায় না। ফুল্লরার দুঃখ যদি কবিত্বরসসিক্ত হয়, তাহা হইলে দুয়ারে দুয়ারে দুই বেলা যে সকল অভাগিনীরা এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাঁদিয়া বেড়ায়, তাহাদের কথাই বা কবিত্ব নহে কেন? ফুল্লরা আপনার দুঃখগুলি আওড়াইয়া গিয়াছে মাত্র, এমন করিয়া কিছু বলে নাই, যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভাবে একেবারে গলিয়া যায়। তবে দুঃখের কথা শুনিলেই লোকের দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয়। ফুল্লরার দুঃখ দেখিয়া আমাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছা করে বটে। বারমাস্যা অতিদীর্ঘ না হইলে পাঠকের দেখিবার জন্য আমরা উঠাইয়া দিতাম—ফুল্লরার বারমাস্যায় কবিত্ব আছে কি না, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন। কান্না মাত্রই কবিত্ব হইলে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ছিল না, কিন্তু তাহা ত আর নয়, কবিত্ব স্বতন্ত্র জিনিস।

কালকেতুপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে আর অধিক কথা না বলিয়া এইবারে আমরা ধনপতি সদাগরের গৃহে দৃষ্টিপাত করি। ইন্দ্রাণী নীলাম্বরকে পাইয়া সুখী হইয়াছেন, সমালোচনা করিয়া তাঁহার সুখের মধ্যে আমরা একটা ভয় রাখিয়া দি কেন? আমাদের ধনপতি ত জুটিয়াছেন।

কবিকঙ্কণচণ্ডীর দ্বিতীয় খণ্ড—ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। পূর্ব্বখণ্ডের উপাখ্যান অপেক্ষা এ উপাখ্যানটি মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালীর ঘরের ব্যাপার ইহাতে বেশ চিত্রিত হইয়াছে, আলোচনা করিবার মত চরিত্রও আছে। তবে চরিত্রগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু বিশেষ প্রভাব। বিশেষতঃ খুল্লনার জীবনের দু'একটি ঘটনায়। মৃত স্বামী ক্রোড়ে লইয়া খুল্লনা যখন ক্রন্দন করিতেছে এবং হৃদয়ের কাতরতা দেখিয়া চণ্ডী ধনপতিকে বাঁচাইয়া দিলেন, তখন মহাভারতের কথা কাহার

না মনে পড়ে? তদ্ভিন্ন স্বর্গচ্যুতদিগের মর্ত্ত্যবাস, স্বর্গগমন প্রভৃতি ঘটনায়ও পুরাণের অল্পবিস্তর অনুচিকীর্ষা প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। মুকুন্দরামের নিজত্ব যথেষ্ট আছে, তাঁহার চরিত্রগুলি বাঙ্গালী বটে।

স্বর্গের নর্ত্তকী রত্নমালা তালভঙ্গ অপরাধে মর্ত্ত্যে আসিয়া খুল্লনারূপে জন্মগ্রহণ করে। ঘটনাচক্রে খুল্লনার সহিত ধনপতি সদাগরের বিবাহ হয়। ধনপতির অনুপস্থিতিতে দাসী দুর্ব্বলার পরামর্শে জ্যেষ্ঠা সপত্নী লহনার নিকট খুল্লনা অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে। ধনপতি গৃহে আসিয়া লহনার অত্যাচার সকলই জানিতে পারেন, লহনাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনাও করেন। তাহার পর বিশেষ কারণে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় খুল্লনাকে ছাড়িয়া তাঁহাকে সিংহলে যাইতে হয়। অদৃষ্টদোষে সেখানে তাঁহার কপালে কারাগার জুটে। অবশেষে বহুদিন পরে চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত গিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া এবং রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া আনে। দেশে আসিয়া আবার জয়াবতীর সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। কিয়দ্দিবস পরে খুল্লনা স্বর্গে চলিয়া গেল।

সংক্ষেপে ধনপতি-উপাখ্যানের কাঠাম এই। কিন্তু ইহার মধ্যে কথোপকথন, মান অভিমান, জাল পত্র, দ্বন্দ্ব কোলাহল, শিক্ষা দীক্ষা অনেক বিষয় অবশ্য আছে। তাহা না থাকিলে গ্রন্থ লোকে পড়িবে কেন? খুল্লনার সহিত ধনপতির বিবাহ হইল। সকলে বলিল, খুল্লনার বর মিলিয়াছে ভাল। যুবতীরা অনেকে স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে এবং পরশ্রীতে অনাসক্তি হেতু অকাতরে অনুপস্থিত স্বামিবর্গের সবিশেষণ রূপগুণের বর্ণনা করিয়া লইলেন। দিনকতকের জন্য পাড়া জমিল—গল্পের বিষয় কাহাকেও ভাবিতে হয় না, সাথী খুঁজিতে হয় না, সব কূলে কূলে পরিপূর্ণ।

লহনার একটু অভিমান হইল। শাস্ত্রে, কি চতুষ্পাঠীতে দুই বিবাহের ব্যবস্থা আছে বলিয়া স্ত্রী কি স্বামীর হৃদয় খানিকটা ছাড়িতে পারে? ধনপতি বুঝাইতে বাকি রাখিলেন না। লহনাও জবাব দিলেন। ধনপতি লহনার যথাসাধ্য মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিলেন। লহনা ঘাড় নাড়ে। ধনপতির উপর রাগের তালটা পড়িবে খুল্লনার পৃষ্ঠে।

এ দিকে গৌড়াধিপতির শুকপক্ষীর সুবর্ণপিঞ্জর নির্ম্মাণের জন্য সদাগরের ডাক পড়িল। লহনার হস্তে খুল্লনাকে সমর্পণ করিয়া ধনপতি গৌড়ে চলিলেন। দিনকতকের জন্য সতীনে সতীনে বনিল ভাল। কিন্তু চিরদিন কি এ মিল থাকে? বিধাতা সপত্নীকে সহজশত্রু করিয়া গড়িয়াছেন, মানুষে কি করিবে? ধনপতি সদাগরের গৃহে আবার দাসী আছে। যে গৃহে পরিচারিকা আছে, সেখানে সপত্নী না থাকিলেও দ্বন্দ্বের কখনও অসদ্ভাব হয় না। সেখানে প্রত্যেক ধূলিকণায় জীবন্ত নিঃস্বার্থ নিন্দা

কীটাণুর মত বিচরণ করিতেছে, সুতরাং সেখানে চির-মনান্তর। ধনপতির গৃহে দুর্ব্বলার বলে দুই সতীনের মধ্যে অল্প দিনেই বেশ বাধিয়া গেল। এত দিনে ধনপতির গৃহে লক্ষ্মীশ্রী হইল।

দুর্ব্বলা বলিল, লহনা ঠাকুরাণী ত বুঝেন না—দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিতেছেন ; তা' দাসী বাঁদীর কিছু বলা ভাল দেখায় না, মোদ্দা এই বেলা দিন থাকিতে উপায় করা ভাল। লহনার মনের কোণে দুর্ব্বলার কথা ঠাঁই পাইল। লীলাবতীর ডাক পড়িল, অনেক রকম মন্ত্র তন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা হইল, ধনপতির নামে একটা জাল-স্বাক্ষর পত্রও বাহির হইল—তাহাতে অবশ্য খুল্লনাকে নিরাভরণা করিয়া ছাগরক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিবার আদেশ আছে। খুল্লনা নিতান্ত বোকা মেয়ে নয় ; লহনাকে সে চাপিয়া ধরিল, এ ত প্রভুর অক্ষর নহে—দিদির সব উপহাস। লহনাও বুঝাইল যে, পত্র ধনপতিরই বটে। খুল্লনা পত্রবাহককে দেখিতে চাহিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে জমিয়া গেল—দন্তযুদ্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হইল। তখন পাড়াপ্রতিবাসীর কাহারও কিছু জানিতে বাকি রহিল না। ব্যাখ্যা টীকারও সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধনপতি সদাগর ! তুমিই ধন্য।

খুল্লনা ছাগল চরাইয়া বেড়ায়। যথাসময়ে বসন্ত আসিল। মুকুন্দরাম খুল্লনার মুখে এক খেদ গুঁজিয়া দিলেন। সুতরাং খুল্লনা তাহা ভালরূপ হজম করিতে পারে নাই। দুর্ব্বলা খুল্লনার কষ্টের কথা তাহার পিত্রালয়ে গিয়া সুবিধামত গল্প করিয়া আসিয়াছে। রম্ভাবতী কাঁদিতেছেন। চণ্ডী খুল্লনাকে রম্ভাবতীবেশে এক দিন ছলনা করিলেন। তাহার পর খুল্লনার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া লহনাকে স্বপ্নাদেশ করেন ; স্বপ্নাদেশের পর খুল্লনার একটু আদর যত্ন বাড়িল।

সাধুকেও স্বপ্নাদেশ হইল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাজ সারিয়া ধনপতি তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিলেন। ধনপতি এক ভোজ খাইলেন, খুল্লনার উপর রন্ধনের ভার পড়িল। দুর্ব্বলা হাট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। মুকুন্দরাম তাহার এক নিখুঁৎ হিসাব দিয়াছেন ; হাট বাজারে মুকুন্দকে কেহ ঠকাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে জাল পত্র ইত্যাদি বাহির হইল। ভোজ-পরিতৃপ্ত সাধু লহনাকে ভৎসনা করিলেন।

একদিন সাধুর বাড়িতে কুটুম্বভোজন হইল। খুল্লনা এত দিন বনে বনে হেথা সেথা ছাগল চরাইয়া বেড়াইয়াছে, এই জন্য সে যদি পরীক্ষা দেয়, তবে সকলে সাধুর আলয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন, নচেৎ নয়। অগত্যা খুল্লনাকে পরীক্ষা দিতে হইল। জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া খুল্লনা তাহার মধ্যে রহিল। অগ্নিসংযোগে গৃহ পুড়িয়া গেল, চণ্ডীর অনুগ্রহে খুল্লনা বাঁচিল ! নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হইল।

কবিকঙ্কণের এইখানকার বর্ণনাগুলি পড়িলে বঙ্গসমাজের দলাদলির অবস্থা বেশ বুঝা যায়। লোকের ছিদ্র পাইলে বাঙ্গালী জাতি যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, এমন আর কোনও জাতি নহে। খুল্লনাকে পঞ্চাশ বার পরীক্ষা দিতে হইয়াছে—জলে, স্থলে, অগ্নিতে, কিছুতেই আর বাকি নাই। আত্মীয় স্বজনেরা খুল্লনাকে সভামধ্যে পরীক্ষা করিয়া করিয়া মজা দেখিবার জন্য ব্যস্ত; পরীক্ষায় চরিত্র নির্ম্মল প্রমাণ হইলে তাঁহাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কুলবধূকে কুলকলঙ্ক প্রমাণ করিতে পারিলে আনন্দের সীমা নাই—মহৎ কার্য্য করিয়া লোকে হৃদয়ে যে তৃপ্তি অনুভব করে, ইহার নিকটে তাহা কিছুই নহে। রামচন্দ্রের প্রজারা অগ্নিপরীক্ষার পর সীতাকে সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া দুঃখিত হইয়াছিল। ধনপতির বুদ্ধিদৃপ্ত বাঙ্গালী আত্মীয়েরা খুল্লনাকে দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করিতে পারিল না বলিয়া দুঃখিত হইল।

তাহার পর ধীরে ধীরে কিছু দিন কাটিয়া গেল। নৃপতির আদেশে গর্ভবতী খুল্লনাকে ছাড়িয়া চন্দনের জন্য সদাগরকে পুনরায় সিংহলে যাইতে হইবে। খুল্লনার বড়ই দুঃখ, ধনপতিরও সুখ নাই, কিন্তু কি করিবেন—রাজাজ্ঞা পালন না করিলে নয়। ধনপতি পোতাদি সজ্জিত করিতে বলিলেন। খুল্লনা স্বামীর মঙ্গল কামনায় প্রতি দিন চণ্ডীপূজা করে। লহনার কূট মন্ত্রে ভুলিয়া ধনপতি একদিন পূজার সময় খুল্লনা সুন্দরীকে চুল ধরিয়া টানিয়া অপমান করিলেন—পূজার ঘট বারি প্রভৃতি লঙ্ঘন করিতে সাধুর কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হইল না। আর স্ত্রীর গায়ে হাত তুলিতে বীর বঙ্গসন্তানের দ্বিধা ত কোন কালেই বড় উপস্থিত হয় না। স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন বাঙ্গলা দেশে স্ত্রৈণের লক্ষণ। খুল্লনা ত অপমান সহিল। চণ্ডী কিন্তু তাহা সহিতে পারিলেন না, সদাগরকে নাকের জলে চোখের জলে করিবেন স্থির করিলেন। মগরার নিকট সদাগরের ছয়খানা পোত ডুবিয়া গেল।

ঝড় বৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশিষ্ট একখানি জাহাজ লইয়াই ধনপতি চলিলেন। মুকুন্দরাম উদার সিন্ধুর বিশেষ বর্ণনা করিতে পারেন নাই, অনেকগুলি জায়গার নাম করিয়াছেন মাত্র। কবি হইলে সিন্ধুর ভাবে তাঁহার কল্পনা উদ্দীপিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু মুকুন্দরাম ভূগোলজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট আছেন।

ধনপতি পথে কমলেকামিনী দর্শন করিলেন। সিংহলের রাজসভায় সে কথা বলিতে ভুলিলেন না। কিন্তু রাজা যখন ধনপতির সহিত কমলেকামিনী দেখিতে গেলেন, কিছুই দেখা গেল না। ফল হইল, ধনপতির কারাবাস। ধনপতি এখনও চণ্ডীকে ডাকেন না—স্ত্রী-দেবতা পূজা করিতে তিনি বড়ই নারাজ। আর ঘরে তাঁহার যে চণ্ডী আছেন, চণ্ডীকে ডাকিতে ভাল লাগিবে কেন?

এ দিকে খুল্লনার সাধভক্ষণ। লহনা জ্যেষ্ঠা, সপত্নী হইলেও খুল্লনার এ সময়ে দেখিতে হইবে। খুল্লনাকে কি খাইতে ভাল লাগে না লাগে, জিজ্ঞাসা করিতে খুল্লনা বলিল,

"আপনার মত পাই, তবে গ্রাস চারি খাই
পোড়া মাছে জামীরের রস ॥
উদরে পরম ব্যথা, শুন দিদি দুঃখ কথা,
ওদন ব্যঞ্জন নিমবারি।
যদি পাই মিঠা ঘোল, বদরী-শকুল ঝোল,
তবে খাই গ্রাস পাঁচ চারি ॥
লতা পাতা বনশাক, খর জ্বালে করি পাক,
সন্তলিবে যোয়ানী ফোড়ন দিয়া।
সন্তাল লবণ তথি দিবে হিং জিরা মেথি,
বহিন গণি যদি কর দয়া ॥
নিধান করিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই,
আমড়া সংযোগে রাঙা শাক।
যদি পাই কিছু পূপ, আমে মসুরীর সূপ
আমসিতে প্রাণ পাই, রাখ ॥
আমি যেন পাই সোণা শকুল মাছের পোনা,
পোড়া কাসুন্দি দিয়া তথি।
হরিদ্রা রঞ্জিন কাঞ্জী, উদর পূরিয়া ভুঞ্জি
বনশাকে বড়ই পিরীতি ॥"

ক্ষুধা তৃষ্ণা দিন দশ না থাকাতে খুল্লনার এই কয়টি জিনিস খাইতে সাধ হইয়াছে। সুতরাং দুর্ব্বলা চুপড়ি হস্তে পাড়ার বাড়ী বাড়ী শাক তুলিতে বাহির হইল। মুকুন্দরাম শাকের এক লম্বা ফর্দ্দ দিয়াছেন; সে ফর্দ্দ মুখস্থ করিয়া রাখিতে পারিলে গৃহিণীপনার অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ফর্দ্দানুযায়ী পঞ্চাশ রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। খুল্লনা সাধ ভক্ষণ করিল।

সাধ ভক্ষণের পর যথারীতি শ্রীমন্তের জন্ম হইল। শ্রীমন্ত রূপে গুণে অদ্বিতীয়। বিদ্যাটাও হইল বড় মন্দ নয়। গুরুর সহিত ঝগড়াটাও হইয়াছিল ভাল। আইনানুযায়ী অভিমান পালা সাঙ্গ করিয়া শ্রীমন্ত ধনপতির উদ্দেশে সিংহল যাত্রা করিল। খুল্লনার নিষেধ বড় টিকিল না। সিংহল যাত্রার বর্ণনা করিবার কিছুই নাই। মুকুন্দরাম পূর্ব্ববৎ

দেশের নাম আওড়াইয়াছেন। শ্রীমন্ত কমলেকামিনী দর্শন করিল, রাজসভায় সে গল্প বলিল, ধনপতির মত সকল অবস্থাই ঘটিল। শ্রীমন্তকে মশানে পর্য্যন্ত লইয়া গেল। তবে চণ্ডী নাকি সহায় আছেন, তাই ছিরা বাঁচিয়া গেল। শুধু বাঁচিয়া যাওয়া নয়, সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। ধনপতি সসম্মানে কারামুক্ত হইলেন।

চণ্ডী খুল্লনাবেশে একদিন শ্রীমন্তকে স্বপ্ন দিলেন। শ্রীমন্ত কাঁদিয়া উঠিল। সুশীলার প্রবোধবাক্যেও শ্রীমন্তের মন বুঝিল না। অবশেষে ধনপতি, সুশীলা, শ্রীমন্ত সাধুর আলয়ে চলিলেন। মগরায় নষ্ট ধনসম্পত্তির পুনরুদ্ধার হইল। সাধু স্বদেশে আসিয়া পঁহুছিলেন। বিক্রমকেশরীর নিকট কমলেকামিনীর কথা হইল। শ্রীমন্তের মশানবাসও হইল। চণ্ডীর কৃপায় এ যাত্রাও কোনও অনিষ্ট ঘটিল না। বিক্রমকেশরী শ্রীমন্তের করে জয়াবতীকে সমর্পণ করিলেন। সুশীলার অভিমান হইল। এখন এ দুই সতীনে কিলাকিলি আরম্ভ হইলেই জমিয়া যায়।

কিন্তু তত দূর কিছু ঘটিল না। খুল্লনা পুত্র পুত্রবধূ সমেত স্বর্গে চলিলেন। শ্রীমন্ত স্বর্গের মালাধর ছিলেন—শাপে মর্ত্ত্যে জন্ম হয়। এখন সকলেই শাপমুক্ত। এইবারে আমরাও মুক্ত হইব। ধনপতি সদাগর কাঁদিতে লাগিলেন। চণ্ডী লহনার গর্ভে সুপুত্র জন্মিবে বলিয়া ধনপতিকে বুঝাইলেন। ধনপতির বুঝিতে বেশী ক্ষণ গেল না।

কবিকঙ্কণচণ্ডীর গল্প সম্বন্ধে এত দূর যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা বোধ হয় যথেষ্ট। ইহাপেক্ষা অধিক বলিতে গেলে সমস্ত গ্রন্থটি অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া দিতে হয়। এইবারে সংক্ষেপে তাহার প্রধান চরিত্রগুলি একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্—ধনপতি, শ্রীমন্ত, লহনা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা। সুশীলা, জয়াবতীকে গ্রন্থকার অন্তঃপুর হইতে বড় বাহির করেন নাই, বিবাহ-রজনীতে এবং অন্য দু'এক দিন মাত্র দেখিয়া ইহাঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা চলে না।

ধনপতি সদাগর জাতিতে গন্ধবণিক্। ব্যবসা বাণিজ্যে তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধনী বণিক্‌সন্তানেরা যেরূপ হইয়া থাকে, তিনি তাহাই ছিলেন। অসাধারণ মহত্ত্ব অথবা বিশেষ কোনও কাজ করিবার দিকে লক্ষ্য তাঁহার ছিল না। ঘর-সংসারই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব। তাঁহার নিকট স্বর্গও বোধ হয় তুচ্ছ। তদানীন্তন সমাজের প্রথা যেরূপ ছিল, ধনপতি তাহার সহিত ঠিক মিলিয়াছিলেন। আত্মসুখের জন্য তিনি দুই বিবাহ করেন। ভাবের দিক্ দিয়াও তিনি যান না। তবে, লহনার সন্তানাদি ছিল না বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের পক্ষে দুই চারি কথা অবশ্য বলা যায়। আর ইহাও বলিতে হয় যে, খুল্লনার রূপে মুগ্ধ না হইলে তাঁহার আবার বিবাহ হইত কি না সন্দেহ। বর্ত্তমানবিদ্রূপীরা উপহাস

রসিকতায় প্রাচীন কালকে যাহাই প্রতিপন্ন করুন না কেন, রূপের আকর্ষণ তখন যে যথেষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের ধনপতি সদাগর সে সময়ের একজন সাধারণ বাঙ্গালী। আদর্শ সৃষ্টি করিবার মত কল্পনা কবিকঙ্কণের ছিল না, তিনি সেরূপ চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার ধনপতি প্রতি দিন ঘরে ঘরে দেখা যায়। রাগ হইল, স্ত্রীকে দুই ঘা বসাইয়া দিয়া ধনপতি স্থির হইলেন। তাঁহার কাপুরুষত্বও মনে হয় না, স্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন বলিলে অবাক্ হইয়া থাকেন মাত্র। সমাজযন্ত্রে প্রতি দিন যে সকল জীব বাহির হইতেছে, ধনপতি তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র নহেন।

শ্রীমন্তের ভাবও পিতার মত। স্বর্গ হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার নবীনত্ব কিছু নাই। কবিকঙ্কণের স্বর্গের ভাব যে তেমন উন্নত, তাহাও নহে। স্বর্গ পার্থিব সুখময় একটা স্বতন্ত্র দেশ মাত্র। শ্রীমন্ত সেই দেশের অধিবাসী। সুশীলাকে বিবাহ করিয়াই জয়াবতীর পাণিগ্রহণ করিতে শ্রীমন্তের বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হইল না। বিবাহের পবিত্র উচ্চ আদর্শ ছিরার মনে কোনও কালে জাগিয়াছে কি না সন্দেহ। শ্রীমন্ত একীকরণ, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিলন, এ সকলের বড় ধার ধারে না। হয় ত যাহার অর্থই বুঝে না, এমনতর কতকগুলা বড় বড় কথা উচ্চারণ করিয়া তাহাকে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। স্ত্রী সেবা করিতেই আছে। সুতরাং পঞ্চাশটা বিবাহ করিলে চব্বিশ ঘণ্টা পাখার বাতাস খাইবার সুবিধা। জঠরানলবিহীনা স্ত্রী মিলিলে খরচের হিসাবে আরও ভাল। শ্রীমন্ত, বোধ হয়, এই ভাবের অধিক উর্দ্ধে উঠে নাই।

ধনপতি ও শ্রীমন্তের চরিত্রে কবিকঙ্কণের সৃষ্টি-কল্পনার অভাব বেশ বুঝা যায়। অদ্ভুতরকম কল্পনা বাঙ্গালী জাতির চিরকালই আসে, তাহার কথা অবশ্য বলিতেছি না। কবিকঙ্কণের যে কল্পনার অভাব, তাহা উন্নত, মহান্, গম্ভীর কল্পনা। লাগাম-ছাড়া কল্পনা আলস্যের চিরসহচর। আমাদের তাহার অভাব হইতেই পারে না। কবিকঙ্কণ যে তেমন কবি ছিলেন, তাহাও নহে। লেখক তিনি একজন বটে।

কিন্তু খুল্লনা লহনার কথা আলোচনা না করিয়া সম্মানার্হ প্রাচীন কবির সৃষ্টিকল্পনার অভাব বলাটা কি ভাল দেখায়? ভাল অবশ্য দেখায় না, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা বোধ হয়, হয় না। লহনাকে কবি নিজেই বড় ভাল চক্ষে দেখেন নাই। চণ্ডীর প্রিয়পাত্রী খুল্লনাই তাঁহার প্রিয়। কিন্তু প্রিয় হইলেও খুল্লনা অসাধারণ গুণবতী নহে। লহনার সহিত দ্বন্দ্বে আঁটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই খুল্লনাকে আমাদের মায়া করে। খুল্লনাকে কবি সীতা সাবিত্রীর মত করিবার কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন—অগ্নি-পরীক্ষা, মৃত স্বামী ক্রোড়ে ক্রন্দন দেখিলেই বুঝা যায়। খুল্লনাতে সে পাতিব্রত্যতেজের

যোদ্ধা তেমন বিকাশ হয় নাই। রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া খুল্লনা যেন অভিনয় করিয়াছে। খুল্লনা, স্ত্রীমাত্রেই সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপই, তবে মুকুন্দরাম রামায়ণ মহাভারতের ছায়া দিয়া তাহার চারি দিকে একটা সৌন্দর্য্য ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র, যে কারণেই হৌক্‌, সংস্কৃত মহাকাব্যের চরিত্রগুলির মত ফুটে নাই। সে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য এখানে কোথায়? তবে খুল্লনার কুলবধূ ভাবটি রক্ষিত হইয়াছে স্বীকার্য্য। লহনারও সে ভাব আছে। খুল্লনাপেক্ষা কিন্তু লহনা ধূর্ত্তা, কঠিনা।

ভাবের চরিত্র কবিকঙ্কণে নাই। সংসারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যেই মুকুন্দরামের অবস্থিতি। দুর্ব্বলা দাসী হাট বাজার করে, কবিকঙ্কণ তাহার নিখুঁৎ হিসাব প্রস্তুত করেন। দুর্ব্বলা তাঁহার সকল কার্য্যে দক্ষা। সে চোরকে চুরির পরামর্শ দিয়া গৃহস্থকে সাবধান করিয়া দেয়। দুই সতীনে ঝগড়া লাগাইয়া দিয়া সে তামাসা দেখে। মন্থরার মত উচ্চশ্রেণীর হৃদয় তাহার নহে। পাঠকেরা মন্থরার সুখ্যাতি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন; কিন্তু বাস্তবিক আমরা যতটা মনে করি—মন্থরা তত হীনপ্রকৃতি নহে। ভরতের মঙ্গল কামনা করিয়াই সে কৈকেয়ীকে দশরথের নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিল। ভরতকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার টান হইবে না? সে যদি ভরতের প্রকৃতি বুঝিত, এমন কাজ কখনই করিত না। তাহার বুদ্ধির অভাব থাকিতে পারে, দূরদৃষ্টির অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যথার্থ ভালবাসা ছিল—তামাসা দেখার জন্য অথবা নিজের দুইখান কাপড়ের জন্য সে লাগালাগি করিয়া বেড়াইত না। তাহার যে দুর্ব্বলতা—ভদ্রগৃহেও সেরূপ দুর্ব্বলতা সাধারণ বলা যাইতে পারে। দুর্ব্বলার প্রকৃতি যথার্থই নীচ। সে লহনাকে কুপরামর্শ দিয়া খুল্লনার নিকটে আর একরকম সাজাইয়া বলে, খুল্লনার নামে লহনার কাছে আবার নিন্দা করে। মন্থরার মত ভালবাসা দুর্ব্বলায় নাই। দুর্ব্বলা টাকার ঘুঘু।

মুকুন্দরামের ভাষার কথা বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক করে না; যে দু'এক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠকেরা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার বর্ণনা স্থানে স্থানে একটু সংক্ষিপ্ত হইলে আরও ভাল হইত বোধ হয়। এক ভাব—এমন কি, প্রায় এক ভাষা লইয়া তিনি কিছু বাহুল্যরূপে মধ্যে মধ্যে বকিয়াছেনও। যাহা হৌক্‌, প্রাচীন কবি আমাদের গৌরবের স্থল। তাঁহাদের দোষ সংশোধিত হইয়াই ভবিষ্যৎ নূতন কবির রচনা ফুটিয়া উঠে।

'ভারতী ও বালক', ভাদ্র ১২৯৬

স্মৃতি ও কবিতা

বস্তুর রাজ্যে কবিতার খেলিবার প্রায় সুবিধা হয় না, কোনও প্রকারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া সে একেবারে রিক্তহস্তে ফিরে না, কাঠামর একটা আব্‌ছায়া স্মৃতি লইয়া ঘরে ফিরে। সেই স্মৃতি হইতে টানিয়া টানিয়া কবিতা আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। বস্তুর আবছায়ার মধ্য হইতে প্রাণ বাহির করাই তাহার কাজ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত তাহার বড একটা সম্বন্ধ নাই। এই জন্য কবিত্ব ভাবে। ছন্দে, কথায়, অনুপ্রাসে এবং শ্লেষপ্রয়োগে কবিত্ব নহে। ভাব প্রকাশের সহায়তা করে বলিয়াই ইহাদের যাহা কিছু মর্য্যাদা।

স্মৃতির মন্দিরেই কবিতার প্রতিষ্ঠা। প্রমাণস্বরূপ অনেক বড বড় কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহারা বস্তু দেখিয়া কবিতা লেখেন নাই, অনেক কাল পরে অবশিষ্ট স্মৃতিটুকু লইয়াই কবিতা রচনা করিয়াছেন। হিমাদ্রির উন্নত শৃঙ্গ দেখিয়া হৃদয় ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন সে ভাব কি প্রকাশ করা যায়? কবির তখন আপনার উপরে দখল নাই। ধ্যানমগ্ন যোগীর মত আপনার হৃদয়ে তিনি তখন সেই মহান্ গম্ভীর ভাব অনুভব করিয়া আকুল। তখন কবিতা লিখিতে বসিলে সে ভাব অনুভব করা যায় না, সুতরাং কবিতা বাহির হয় না। কবির হৃদয়ে কবিতা রচিত হইলে তবে তিনি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন।

চিত্রে বস্তুর ছায়া থাকে, কবিতায় ছায়াও থাকে না—যাহা থাকে, আবছায়া। তাহা ছায়া বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু ছায়ার যতটুকু বস্তুগত অস্তিত্ব, তাহাও তাহার নাই। কবিতার ছায়া-ভাব; ছায়া-বস্তু কোথায়? ভাব স্মৃতিতেই জন্মিয়া আসে, বস্তু তখন একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। এই কারণে কবিতা স্মৃতিময়ী। স্মৃতি-আচ্ছন্ন হইয়াই সে থাকে, বস্তু-আচ্ছন্ন হইয়া থাকে না। বস্তু-আচ্ছাদনে ভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত হয়। মনোরাজ্য সম্বন্ধে যাঁহারা কখনও আলোচনা করিয়া দোখয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কবিতায় বস্তু একেবারে বাদ যায় নাই, অথচ কবিতা বস্তু-আচ্ছন্ন নহে কেন? মনোরাজ্যে যাঁহাদের গতিবিধি নাই, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝান অসম্ভব।

কবিতার বিষয় অনেক সময় বস্তু। কিন্তু বস্তুর মধ্যে যে অশরীরী প্রাণ আছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া তুলাই যথার্থ কবিতার কাজ। কাঠাম গড়িতে কুম্ভকার মাত্রেই পারে, কিন্তু কাঠাম যে প্রাণে ওতপ্রোত, সেই প্রাণ প্রস্ফুটিত করা যে-সে ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। কাঠামর বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শারীর বিজ্ঞান আছে।

কবিতার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কবিতায় প্রতিভার বিকাশ, প্রাণের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি আবশ্যক। গণ্ডির মধ্যে কবিতা বাঁচে না, কবিতা বিশেষরূপে ভাবগত। তাহা যতই বস্তুর নিকটে সরিয়া আসে, ততই শ্লোকে ছড়ায় অথবা ঐ জাতীয় কোন-কিছুতে পরিণত হয়। বস্তুর আড়ালে ভাব ঢাকা পড়ে। অতি দীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর গাঁথিয়া কে কবে গৃহের শোভা ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে ?

কবির মনে স্মৃতিই প্রথম কবিতা রচনা করে। কিন্তু অপার্থিব, সুতরাং অদৃষ্ট বিষয়ে স্মৃতি রচনা করিবে কিরূপে ? বলা বাহুল্য, কল্পনারও একটা স্মৃতি আছে। কবি কল্পনায় একটা বিষয় খাড়া করিয়া তুলেন, তাহার পর তাঁহার মনে তাহার কেবল একটা অস্পষ্ট আকুলি ব্যাকুলি মাত্র থাকিয়া যায়। অদৃষ্ট বিষয়ের কবি এই স্মৃতি। একেবারে স্মৃতি-সম্পর্কশূন্য কবিতা বোধ হয় নাই। তবে স্মৃতি অবশ্য বস্তুরও আছে, ভাবেরও আছে। কিন্তু বস্তুর স্মৃতিও অনেকটা ভাবময়। স্মৃতিতে ত আর বস্তু থাকিতে পারে না।

স্মৃতিতে প্রথম উচ্ছ্বাসটা অনেক সংযত হইয়া আসে। উচ্ছ্বাসবাহুল্যে অভিভূত জড়ভাব থাকে না। উচ্ছ্বাসের যখন পূর্ণ আবেগ, তখন নীরবতা বৈ তাহার ভাষা নাই। উচ্ছ্বাসকে আপনার অধীনে আনিতে পারিলে তখনই ভাষা ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু সে ভাষাও তেমনি উচ্ছ্বাসময়ী, আবেগময়ী ; নীরস বাহবার মত তাহা কেবল মুখের ভাষা নয়—ভাবের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা, আবেগের ভাষা।

সুবৃহৎ সংযত কল্পনাই যথার্থ কবির পরিচয়। অসংযত কল্পনা শিশুরই শোভা পায়। কবি কল্পনার চালক—দাস নহেন। যথেষ্ট সংযম না থাকিলে সুসংলগ্ন ভাবের কবি হওয়া যায় না। স্মৃতি সংযমের এক প্রধান উপকরণ বলা যাইতে পারে। এই জন্য বোধ হয়, কবিতার জন্ম প্রায়ই স্মৃতিতে।

স্মৃতিতে সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে ব্যক্ত হয় কি না। অনেক জিনিসের সৌন্দর্য্য কেবল অতীতের মধ্য হইতেই বিকশিত হইয়াছে। ঝরা ফুলের সৌন্দর্য্য কেন ? তাহার মধ্যে অতীতের সৌরভ বিলীন হইয়া আছে বলিয়াই নয় ? সে যদি কলিকাবস্থা হইতে ব্যক্ত হইয়া না ঝরিয়া পড়িত, তাহা হইলে আমাদের নিকট কি তাহার বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইত ? অতীতের সৌরভ-স্মৃতি-সমাচ্ছন্ন হইয়াই সে সুন্দর। আমাদের হৃদয়ের অনেক ভাবেরও নিজস্ব সৌন্দর্য্য যত থাক না থাক, প্রাচীন স্মৃতিতে তাহা অনেক সময় বিশেষ সুন্দর হইয়া উঠে। গীতি-কবিতার যাঁহারা অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বিদ্যাপতির রাধা গাহিয়াছেন, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল"। কৃষ্ণের বস্তুগত রূপ উপভোগ করিতে করিতে রাধা কি এমন কথা বলিতে পারিতেন? কৃষ্ণ যখন চোখের আড়ালে, তাঁহার রূপ কেবল স্মৃতিতে জাগিয়া আছে, তখনই রাধা এই কথা বলিয়া উঠিলেন। বস্তু উপভোগের সময় তাঁহার এ ভাব স্ফূর্ত্তি পায় নাই। বস্তু যখন সরিয়া গেল, ভাব বিকশিত হইল। উদাহরণের অভাব নাই, ঘরের কাছেই অনেক দৃষ্টান্ত মিলে।

বস্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থাকে, ততক্ষণ তাহা হৃদয়ে তেমন মিশাইতে পারে না। নয়ন দেখিয়া দেখিয়া অবশ হইয়া আসে, নয়ন-তারাতেই বস্তুর ছায়া পড়ে। তাহার পর বস্তু যেমন দৃষ্টির অতীত হয়, ছায়া নয়ন-তারা ছাড়িয়া একেবারে হৃদয়ে মিশায়—ছায়া তখন ভাবে পর্য্যবসিত। এই ভাবময় হৃদয় যখন পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বিকশিয়া উঠে, তখনই কবিতা সৃষ্ট হয়। সে প্রবল ভাবস্রোত রোধ করা যায় না। কৃত্রিম উপায়ও সে স্রোত বহাইতে পারে না। কবিতার প্রাণ স্বাভাবিকতা।

কবিতা স্মৃতির অভিব্যক্তি। স্মৃতির অভিব্যক্তি মাত্রই কিন্তু কবিতা নহে। কবিতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের অন্ধকার গহ্বর হইতে অতি সন্তর্পণে একটি সুবৃহৎ সংজ্ঞা বাহির করিবারও আবশ্যক নাই। কবিতা কাহাকে বলে, সাধারণতঃ সকলেই বুঝে। চেষ্টা করিলেও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সর্ব্বতর্কখণ্ডনী সংজ্ঞা আমরা বাহির করিতে পারি কি না সন্দেহ।

সংস্কৃত অলঙ্কারের অনুবাদ করিয়া বলা যাইতে পারে, কাব্য রসাত্মক বাক্য। কিন্তু আমাদের নিকট এ অনুবাদিত সংজ্ঞা বিশেষ ভাবপ্রকাশক নহে। আমরা রসাত্মক বাক্য বলিতে যাহা বুঝি, কবিতা হইতে তাহা অনেক সময় বহুদূর। অতএব পাঁজি পুঁথি শাস্ত্র যথাসম্ভব বাদ দিয়া প্রবন্ধসমাপ্তির দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক্।

স্মৃতির সহিত কবিতা যে বিশেষরূপে সম্বন্ধ, ইহা দেখান গিয়াছে। সকল নিয়মেরই স্থলবিশেষে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ কবিতারচনা স্মৃতিতে। স্মৃতিকে এই জন্য কবি বলিলে বোধ করি বড় অত্যুক্তি হয় না।

'ভারতী ও বালক', কার্ত্তিক ১২৯৬

কৃত্তিবাস ও কাশীদাস

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যত গ্রন্থ দেখা যায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী কোন গ্রন্থেরই জুটে নাই। বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়ে রামায়ণের কাহিনী মুদ্রিত আছে, কৃত্তিবাসের দুই চারি ছত্র সকলেই আওড়াইতে পারে। ঐশ্বর্য্যবেষ্টিত স্বর্ণসিংহাসনের পার্শ্বে দেখ, এক খণ্ড কৃত্তিবাসের পুঁথি আছে; মধ্যবিত্তের বৈঠকখানার কোণে রামায়ণ একখানা থাকা চাই; এমন কি, সামান্য দোকানদারের চাল ডালের হাঁড়ির মধ্য হইতেও রামায়ণ উঁকি মারে। বাঙ্গলা দেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণের কথা যে জানে না, তাহার জাতি ঠাহরাইয়া উঠিতে পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। রামায়ণ না জানিলে বাঙ্গালীত্বের অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়।

কিন্তু রামায়ণ লইয়া কৃত্তিবাসের গৌরব করিবার কি আছে? তিনি ত বাল্মীকির মত নূতন রচনা করেন নাই! রাঁধা ভাতে তিনি কেবল ঘৃত ঢালিয়াছেন, লবণ মিশাইয়াছেন বৈ ত নয়। বাল্মীকির সমান তাঁহাকে কেহ বলেও না—বাস্তবিক তিনি তাহা নহেনও। কিন্তু এই অপরাধে তাঁহার সকল যশ হরণ করা যায় না। তাঁহার গ্রন্থ বাল্মীকিগ্রন্থের অনুবাদ নহে—তাঁহাকে কতকটা নিজের মস্তিষ্ক খাটাইতে হইয়াছে। শুনা যায়, কথকতা হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংগ্রহ। এই জন্য বঙ্গীয় কবি বাল্মীকি হইতে বিভিন্ন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে সকল সৌন্দর্য্য বর্ণনা আছে, তাহা অবিকল বাল্মীকির অনুরূপ নহে। তাঁহার রামায়ণের ঘটনাবিশেষও বাল্মীকি হইতে অনেক তফাৎ। প্রথমতঃ উভয়ের আরম্ভ এক নহে। কৃত্তিবাসের রত্নাকর ব্যাপার প্রাচীন ঋষি কবির গ্রন্থে নাই। অন্যান্য পুরাণের সাহায্যে কৃত্তিবাস আরও অনেক ঘটনা অম্লানবদনে রামায়ণের মধ্যে গুঁজিয়াছেন। কথকের রসিকতাও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। এই সকল কারণে বাল্মীকির রামায়ণ অপেক্ষা কৃত্তিবাসে আষাঢ়েরও কতকটা প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডি বেড়িয়া রাখিয়া যান, মূল রামায়ণে বোধ করি এ কথা নাই। বাল্মীকি কপিপুঙ্গবকে ছদ্মবেশে রাবণের মৃত্যু-বাণ হরণ করিতে দেখেন নাই। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব আদি-কবির অজ্ঞাত। এ সকলই কৃত্তিবাসের রচনা। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব পুরাণবিশেষেও অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে পুরাণ বাল্মীকিরচিত নহে।

কৃত্তিবাস যে সময়ের লোক, তাঁহার রচনায় তাহার বিশেষ প্রভাব আছে।

সময়ের প্রভাব হইতে তিনি একেবারে মুক্ত নহেন। বাল্মীকিগ্রন্থ প্রাচীন সংস্কৃত-ভারতের সম্পত্তি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুদ্ধ বাঙ্গলাদেশের। তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালীত্ব যথেষ্ট। ইহা না থাকিলে তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ মূল্য থাকিত কি না সন্দেহ। তাঁহার নাম তাহা হইলে হয় ত অনুবাদকের ফর্দ্দের এক প্রান্তে সাহিত্যানুসন্ধিৎসু কতিপয় ছাত্রের গুরুভার মস্তিষ্কপীড়নাস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিত। গ্রন্থের এরূপ বহুল প্রচার হইত বোধ হয় না।

কিন্তু বাঙ্গালীভাবে গ্রন্থের যে বিশেষ হানি হয় নাই, তাহা নিশ্চিত বলা যায়। কৃত্তিবাস বেশ স্বাভাবিক। তবে দশমুণ্ড রাবণ, ষাণ্মাসিক নিদ্রাগ্রস্ত কুম্ভকর্ণ, এ সকল অসম্ভব কল্পনার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। এগুলি বাল্মীকির নিকট হইতে শুনিয়াছেন। সে কালে জম্‌কালো অসম্ভব বর্ণনা ফেসান ছিল—অদ্ভুত ব্যাপার নহিলে লোকে সহজে আকৃষ্ট হইত না। যোজন হস্ত, দ্বিযোজন পদ তখনকার লোকের কল্পনায় অভ্যস্ত ছিল। সম্ভব অসম্ভবের প্রতি এখনকার মত লক্ষ্য থাকিলে অনেক কেত.বেরই যশঃসৌরভে চারি দিক্ আমোদিত হইতে পারিত না। মানব অপেক্ষা দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, ঘোটকবদন, লম্বোদরবর্গের সে কালে প্রভুত্ব খাটিত। এখন কল্পনা সংযত হইয়া আসিয়াছে—অসংযত অসম্ভব কল্পনার দিন কাল গিয়াছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুকুন্দরামের সমকালীন কবি। বাঙ্গলা সাহিত্যে পূর্ণ পৌরাণিক প্রভাব মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস হইতেই একরূপ আরম্ভ বলা যায়। কৃত্তিবাস কবির ভাষা পড়িয়া কিন্তু মুকুন্দরামের বাঙ্গলাপেক্ষা অনেক সময় ভাল লাগে। তাহার একটা কারণ বোধ হয়, কৃত্তিবাসে মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘশ্মশ্রুবর্গের জবাই-দক্ষা ছুরিকা-ভাষার বড় তীব্র কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের খাঁটি ভাষা পাওয়াও এখন বড় দুরূহ। সংশোধক পণ্ডিতদিগের জ্বালায় কৃত্তিবাসের শব্দচ্ছন্দ এখন অনেকটা অক্ষরচ্ছন্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভালবাসার আতিশয্যে কৃত্তিবাসকে তাঁহারা মাজিয়া ঘষিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু নগ্ন সৌন্দর্য হারাইয়া কৃত্তিবাস কৃত্তিবাসত্ব হইতে যে কতটা বঞ্চিত হইলেন, তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখেন নাই। যাঁহারা কৃত্তিবাসের ভাষার নমুনা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এ কথা বিশেষরূপে বুঝাইতে হইবে না। পরচুলায় মুখশ্রী বুঝিবার পক্ষে যে বিশেষ হানি করে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

রামায়ণের গল্পের উল্লেখ এখানে আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। সীতাহরণ, রাবণবধ, সীতার বনবাস বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহে। নব্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ হয় ত কৃত্তিবাস নাও পড়িয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রামায়ণের গল্প সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে অনুমান করা যাইতে পারে। যাত্রায়, নাট্যশালায়,

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে রামায়ণের ছিটাফোঁটা অল্পবিস্তর আছেই। তথাপি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দি,

"আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম বিবাহ সীতার।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্যভার॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীবমিলন॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে হয় সাগরবন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয় পক্ষের মহারণ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ॥
এই সুধাভাণ্ড সাতকাণ্ড রামায়ণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপন।"

কৃত্তিবাস-রামায়ণের চরিত্রগুলি মূল রামায়ণেরই অনুরূপ। না হইবেই বা কেন? কৃত্তিবাস ত আর বাল্মীকিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া আপনাকে খাড়া করিয়া তুলিতে চাহেন না। সহজ ভাবে সহজ ভাষায় দেশের সাধারণের নিকট বাল্মীকির সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, কৃত্তিবাসের আত্মপ্রকাশাভিলাষ তাহার তুলনায় নাই বলিলেও চলে। তবে ঘটনাচক্রে অজ্ঞাতসারে দু'একটি চরিত্র অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূলে বড় প্রভেদ হয় নাই। ঘটনাবিশেষের পরিবর্ত্তনে চরিত্র-পরিবর্ত্তন বোধ হয় মাত্র। বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন তাহা নহে।

যাহা হউক, কৃত্তিবাসের কথা আর অধিক বলা অনাবশ্যক। তাঁহার রামায়ণ পড়িয়া যে সুগভীর তৃপ্তি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গলা সাহিত্যের মহা-কাব্যের মুখ রক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই আমরা কৃত্তিবাসকে বড় বলিতেছি না, তাঁহার রামায়ণ আমাদের সাহিত্যের গৌরব ত বটেই, তাহা ভিন্ন আমাদের ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবারও কারণ। সীতার নিষ্কাম পবিত্রতার কাহিনী দরিদ্র-স্বামি-পীড়নী অলঙ্কারগত-প্রাণা বঙ্গরমণীকে অনেক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছে, অনেক স্বামীকে দিবানিশি গৃহিণীর সম্মার্জ্জনী সপ্‌সপানি ও কটাক্ষকুঞ্চিত তারকণ্ঠ জিহ্বা-আস্ফালনী বিদ্যার মহিমানুভব হইতে বঞ্চিত করিয়া শাস্তি দিয়াছে। রামচন্দ্রের একপত্নীনিষ্ঠা সহস্র-একীকরণ-মত্ত দারপরিগ্রহশীল পিতাকে দুর্দ্দম্য প্রণয়াবেগ ও অধীর পরিণয়াকাঙ্ক্ষা হইতে রক্ষা করিয়া অনেক সতী সাধ্বীর মর্য্যাদা এবং মাতৃহীনের সান্ত্বনা রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহিষী-সমাচ্ছন্ন দশরথের শেষ দশা অনেক বঙ্গপরিবারের বিশেষ

৫

শিক্ষার স্থল। এ সকল শিক্ষা অবশ্য কৃত্তিবাসের স্বপ্রদত্ত নহে, কিন্তু তাহাতে যায় আসে কি? বাল্মীকির উপদেশগুলি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচার করিয়াছেন তিনিই ত বটে। সে জন্য কৃত্তিবাসের নিকট আমরা বিশেষ ঋণী।

এখন কথা এই যে, কৃত্তিবাস কিরূপ ধরণের কবি? সে কালে পদ্যই একমাত্র সাহিত্য ছিল, এবং পয়ার-ত্রিপদী-দীর্ঘত্রিপদী-রচয়িতারাই কবি ছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস সে কালের হিসাবে একজন উচ্চদরের কবি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা কবির মধ্যে যে অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে চাহি, যে সুগভীর ভাবপ্রবাহ অনুসন্ধান করি, কৃত্তিবাসে তাহা কোথায়? পুরাণ-প্রভাবীকৃত কৃত্তিবাস মৌলিকতা যশাকাঙ্ক্ষাবিহীন। আমরা সে জন্য ব্যস্ত নহি। সে কালের বঙ্গসাহিত্যে ভাবের তরফে বৈষ্ণব কবিরাই যাহা আছেন। তেমন আর কৈ? পুরাণ-প্রভাবীকৃত মুকুন্দরামই বল, আর কীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠ কৃত্তিবাসই বল। মুকুন্দরামের সৌন্দর্য্য-সামঞ্জস্যজ্ঞান কমলে-কামিনীর গজাহারকল্পনাতেই ধরা দিয়াছে। আর কালকেতুর বর্ণনা ত কুম্ভকর্ণ অপেক্ষা বিশেষ স্বাভাবিক নহে। অধিকন্তু গাম্ভীর্য্যের অভাব।

কৃত্তিবাসের পর বঙ্গীয় মহাকাব্যের মুখ রক্ষা করিয়াছেন কাশীরাম দাস। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত সমসাময়িক কবি ইঁহারা নহেন, তেমন সমবৈষয়িক কবিও নহেন। কিন্তু বিষয় এক না হইলেও কাছাকাছি কতকটা বটে। একজনের রামায়ণ, আর একজনের মহাভারত। দুইখানি গ্রন্থই বঙ্গীয় পাঠকসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইবার মতনও বটে। বিষয়ের মহত্ত্ব হিসাবেই দেখ, রচনার সৌন্দর্য্য হিসাবেই দেখ, আর প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মভাবের দিকেই দেখ, দুইখানি গ্রন্থেই নিন্দনীয় বিশেষ কিছু নাই। যথার্থ ই,

"কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃতসমান।
রামনাম বিনা যার মুখে নাহি আন॥"
"মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥"

রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত বৃহৎ ব্যাপার। বাল্মীকির রামায়ণের অনেক পরে ব্যাস মহাভারত রচনা করিতে বসেন। তখন সূর্য্যবংশের দিন কাল গিয়াছে, চন্দ্রবংশ ভারতের মধ্যে প্রভাবশালী। ব্যাস বাল্মীকির অনুকরণ করিয়াছেন কি না, আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই। অনুকরণ হইলেও তাঁহার মৌলিকতা যথেষ্ট। কিন্তু মহাভারতের কাল যে রামায়ণের অনেক পরে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ বাল্মীকির রচনা ব্যাসের রচনাপেক্ষা সরল। তাহার পর মহাভারতের সময়ে যেরূপ

জটিল রাজনীতি, লেখাপড়ার চর্চ্চা, রামায়ণের সময়ে সেরূপ কিছুই নাই। বাল্মীকির রামায়ণের মধ্যে লেখার কথা আছে, এমন মনে পড়ে না ত। মহাভারতের প্রথমেই গণেশের লেখনীর কথা। রামায়ণে কৃষ্ণের মত নীতিবিদ্‌ই বা কোথায়? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মত ব্যূহরচনাদক্ষ সেনাপতিকুলই বা কোথায়? তখন সকল বিষয়েই অনেকটা সাদাসিধা ছিল। মহাভারতের আমলে উত্তরোত্তর সকল সমস্যাই জটিল হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের বাঙ্গলাদেশেও প্রথমে রামায়ণ রচিত হয়, পরে মহাভারত। কিন্তু তাহা দেখিয়া কৃত্তিবাসের সমাজের অবস্থার সহিত কাশীরাম দাসের সমাজের প্রভেদ ছিল কি না বলা দায়। কাশীরাম দাসও কৃত্তিবাসের মত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করেন নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস, কাশীদাস, উভয়েরই চরিত্রগুলি মূল গ্রন্থের অনুরূপ ত বটে। সেই জন্য কৃত্তিবাস, কাশীদাস পড়িয়াও বাল্মীকি ব্যাসের সমাজের কথা বলিবার সুবিধা।

মহাভারতের প্রধান প্রধান স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা রামায়ণের প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি উচ্চদরের। কুন্তীই বল, আর দ্রৌপদীই বল, সীতার পার্শ্বে বসিবার মত কেহই নয়। কৌশল্যা কৈকেয়ীর পার্শ্বেও কুন্তী দাঁড়াইতে পারেন না। তবে দময়ন্তী, সাবিত্রী, সীতার পার্শ্বে বসিতে পারেন বটে। কিন্তু এ দুইটি চরিত্র মহাভারতের মধ্যে উপাখ্যানমধ্যে স্থান পাইয়াছে। উঠাইয়া লইলেও মূলে বিশেষ কিছু যায় আসে না। সীতার মত শান্ত সংযত অথচ স্বাভাবিক ভাব কিন্তু কোনও চরিত্রেই নাই। সাবিত্রী দময়ন্তীকে পতিব্রতা পতিপ্রাণা অস্বীকার করিবার জো নাই, তথাপি সীতার মত ইঁহাদের চরিত্র ফুটে নাই।

রামায়ণের সহিত মহাভারতের কতকগুলি চরিত্রে বেশ মিল বুঝা যায়। অর্জ্জুনের সহিত লক্ষ্মণের চরিত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দুজনেরই প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম, দুই জনেরই বীরত্ব, দুই জনের জীবনেই প্রায় এক কারণে বনবাস। রাম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও সামান্য সাদৃশ্য অনুভব হয়, তবে লক্ষ্মণ অর্জ্জুনের মতন নয়। বিভীষণ আর বিদুর কতক একরকম। ন্যায় লইয়াই ইঁহাদের কারবার। অন্যায় দেখিলে উভয়েই জ্বলিয়া উঠেন। দুর্য্যোধনে রাবণে তেমন সাদৃশ্য নাই। দুর্য্যোধন অপেক্ষা রাবণ লোক ভাল। রাবণ গুণী, মানী, বীর, দুর্য্যোধন অপেক্ষা শতগুণে উন্নতপ্রকৃতি। তবে দোষ কাহার নাই? রাবণেরও অনেক দোষ অবশ্য ছিল—প্রধানতঃ অহঙ্কার। রামায়ণে আর যাহাই থাকুক, মহাভারতের একটি চরিত্রের অভাব আছে—ভীষ্মদেব। ভীষ্মকে মহাভারত বৈ আর কোথাও দেখা যায় না। ভীষ্ম মহাভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

ঘটনা বিষয়েও রামায়ণে মহাভারতে সাদৃশ্য বিস্তর। সীতা উদ্ধারের জন্যই রামের লঙ্কাজয়, রাবণবধ, কিন্তু সীতাকে পাইয়াও রাম উপভোগ করিতে পারিলেন না। পাণ্ডবেরাও রাজশ্রীর জন্যই কুরুকুল ধ্বংস করিলেন, কিন্তু রাজ্য লাভ করিয়া সকলই শূন্য মনে হইল—যাহার জন্য জীবনের সকল সুখ স্বচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দিলেন, হাতে পাইয়া তাহা ভোগ করিতে মন উঠে না। ইহা ভিন্ন মধ্যে মধ্যে খুঁটিনাটি ঘটনার সাদৃশ্যও বড় অল্প নহে। হরধনুর্ভঙ্গে সীতালাভ; সুদর্শন-চক্রভেদ ব্যাপারে দ্রৌপদীলাভ। মৃগভ্রমে মুনিপুত্র বধ করিয়া দশরথ শাপাক্রান্ত; মৃগরূপী মুনির নিধনে পাণ্ডু শাপাক্রান্ত। উভয়েরই মৃত্যুকারণ মুনিশাপ। বিমাতার চাতুরী বুঝিয়াও রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে বনগমন করিলেন; যুধিষ্ঠিরাদিও কপট দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়া সত্যপালনার্থে বনগমন করিলেন। কৈকেয়ী ভাবিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিতে হইলে রামচন্দ্রকে বুঝি বা ভববাস উঠাইতে হয়, ভরতের পক্ষে তাহা হইলে রাজ্যসুখ ভোগের পথ নিষ্কণ্টক; কুরুকুলও ঠাহরাইয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে কাটাইতে হইলে পাণ্ডবেরা নাও টিঁকিতে পারেন, দুর্য্যোধন তাহা হইলে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। রাজ্যবঞ্চিত হইবার জন্যই উভয়ের বনবাস। কপালগুণে উভয় পক্ষেরই নিকটে যম ঘেঁষিতে সাহস করে নাই। অরণ্যে রাবণ সীতাহরণ করেন; জয়দ্রথ দ্রৌপদী হরণ করেন। তবে জয়দ্রথকে ভীমার্জ্জুনের হস্তে পড়িয়া বাপ্ বাপ্ বলিতে হইয়াছিল, তাই আশানুরূপ ফল ফলে নাই। এইরূপে রামায়ণে মহাভারতে ঘটনাসাদৃশ্য বড় অল্প নহে। কিন্তু তাহা লইয়া আর অধিক নাড়াচাড়ায় কাজ নাই—রামায়ণ, মহাভারতের কথায় কৃত্তিবাস, কাশীদাস চাপা পড়িয়া যান বুঝি।

কৃত্তিবাসের কথা যথেষ্ট বলা হইয়াছে, নূতন বলিবার আর বিশেষ কিছু নাই। কাশীরাম দাস সম্বন্ধেই বা আর বলিব কি? উভয় কবিরই রচনা পয়ার ত্রিপদী-সমাচ্ছন্ন। ভাবপ্রবাহ তেমন নাই। আর ঘটনা ও চরিত্র, তাহাও ত নিজের নূতন সৃষ্টি নহে। সে জন্য বাল্মীকি, ব্যাস পশ্চাতে আছেন। কাশীদাসের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। আদিপর্ব্বের শেষ ভাগে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কেবল তাঁহার বাসগ্রাম ও কুলসংবাদ জানা যায়।

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নামে॥

অনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে কথা সাধুর চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥"

যাহা হৌক, কাশীদাসের জীবনী লইয়া আর মাথা না ঘামাইয়া মহাভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুই চারি কথা বলিয়া শেষ করা যাক্। কৃত্তিবাস যেমন ভাষা-রামায়ণ লিখিয়া সহজভাবে দেশের মধ্যে বাল্মীকির উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, কাশীরাম দাসও সেইরূপ বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনা করিয়া সহজে সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যাসের উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। কিরূপে জ্ঞাতিবিরোধ আরম্ভ হয় এবং তাহার ফল কিরূপ, মহাভারতের মত উজ্জ্বল বর্ণে বোধ করি তাহা কোনও পুস্তকে চিত্রিত হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায়, বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রতি দিন এই কুরুপাণ্ডবদ্বন্দ্বাভিনয় চলিয়াছে। কুণ্ডলীকৃত জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে দুর্য্যোধন শকুনির প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইলেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। শকুনি-মন্ত্রী দুর্য্যোধন পিতৃহীন পাণ্ডবদিগকে যদি লাঞ্ছনা করিবার চেষ্টায় না ফিরিয়া মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মায়ায় অভিভূত হইয়া পুত্রের ক্রূর চরণে যদি আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলি না দিতেন, তাহা হইলে ভারতের বীরকুল কি আর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত? কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? হিংসাদৃপ্ত লোভ যখন জ্ঞাতিছদ্মবেশে দেখা দেয়, তখন সেখানে কি মঙ্গল থাকিতে পারে? ক্রূরকর্ম্মা দুর্য্যোধনের উৎপীড়নে সহিষ্ণু যুধিষ্ঠিরও স্থির থাকিতে পারেন নাই। বনবাস দিয়াও দুর্য্যোধনের আশ মিটে নাই। পাণ্ডবদিগকে অপমানিত অভিশপ্ত দেখিবার জন্য সহস্র অনুষ্ঠান! কেবলই ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া পাণ্ডবেরা জয়শীল। শ্রীকৃষ্ণের মত বন্ধু না পাইলে তাঁহাদের যে কি দশা হইত. কে বলিতে পারে? ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা চিরদিন আপনার জ্বালায় জ্বলিয়া মরিয়াছেন, তাহার উপর যুদ্ধে ত পরাজয় হইলই। সিংহাসনে বসিয়াও তাঁহাদের মুহূর্ত্তের তরে শান্তি ছিল না, পাণ্ডবদিগকে হিংসা-জ্বালায় জ্বালাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইতে হইয়াছে। দুই এক বার বিপদে পড়িয়া পাণ্ডবদিগের দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাহাতে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বৈ হ্রাস হয় নাই। কিন্তু অরণ্যমধ্যেও পাণ্ডুপুত্রদিগের শান্তি ছিল। তাঁহারা ফল মূল যাহা পাইতেন, মাতা ও স্ত্রীর সহিত পরিতৃপ্তহৃদয়ে আহার করিতেন। সুখ-জ্বালায় তাঁহাদিগকে জ্বলিতে হয় নাই। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও যে তাঁহারা রাজ্যলোভ সম্বরণ করিলেন, সে কেবল এই শান্তিটুকুর জন্য।

'রামায়ণ, মহাভারত হইতে আমরা মানব-চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করি। বিশেষতঃ মহাভারতে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য দেখা যায়, এমন আর কোনও গ্রন্থে মিলে কি না সন্দেহ। খুঁটিনাটি অঙ্গ বাদ দিয়া সাধারণ ভাবের দুই একটি বেশ শিক্ষা পাওয়া যায়। উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। রামায়ণ দেখাইয়াছে, রাজা দশরথ সসাগরা ধরিত্রীর সুশৃঙ্খল শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও অন্তঃপুরের সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, এই জন্য তাঁহার নিষ্কলঙ্ক বংশের কলঙ্ক রটিয়াছে, তাঁহার রাজ্যেও বিশৃঙ্খল বাধিত, কেবল সুগভীর ভ্রাতৃপ্রেম তাহা ঘটিতে দেয় নাই। মহাভারত দেখাইয়াছে, ধৃতরাষ্ট্র বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হইয়াও অতিরিক্ত মায়াবশতঃ পুত্রবর্গের কাল হইয়াছেন, পুত্রশাসন-অক্ষমতাই তাঁহার কুলনাশের প্রধান কারণ। ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে, বহিঃশাসনক্ষমতা সকল সময়ে অন্তঃশাসন-ক্ষমতার পরিচয় নহে। রাবণ ও দুর্য্যোধনের চরিত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শাস্ত্রজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান সংযম ও জ্ঞাতি-বঞ্চন-বিদ্যা-বিহীনতার প্রমাণ নহে। একই হৃদয় একই বিষয়ে বিপরীত ব্যবহার করে। এই জন্য মানবচরিত্র বুঝা বড় দায়।

মহাভারতের অনেকগুলি উপাখ্যান অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত আকারে আমাদের আষাঢ়ে গল্পের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। সম্ভবতঃ কাশীরাম দাসই তাহার মূল কারণ। সে কালের কথক ঠাকুরেরাও তাহার কারণ হইতে পারেন। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ইহাতে ফল অবশ্য ভাল বৈ মন্দ নহে। সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের হৃদয়গঠনে আষাঢ়ে গল্প যথেষ্ট সহায়তা করে। সেই আষাঢ়ে গল্পে যদি ধর্ম্মভাব মাখান থাকে, তাহা হইলে শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবার কি কম সুবিধা? কিন্তু এখানে আর আষাঢ়ের কথা নয়। কাশীরাম দাস মহাভারত শুনিতে আহ্বান করিতেছেন, "হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে"। সজ্জন পাঠকেরা মহাভারত শুনিতে থাকুন, অমরা জনতার মধ্যে গাঢাকা হই।

'ভারতী ও বালক', কার্ত্তিক ১২৯৬

স্বভাব ও সাহিত্য

চিরবিচিত্রতাময়ী রহস্যাবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সুগভীর হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া মানব যখন তাহার প্রবহমাণ আনন্দস্রোত আপন অন্তরে অনুভব করিতে পায়, তখন প্রকৃতির ভাষা ব্যক্ত করিবার জন্য সহজেই সে ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাহার হৃদয়ের শিরায় উপশিরায় সেই সৌম্য সৌন্দর্য্য যতই মুদ্রিত হইতে থাকে, সে তাহা না ব্যক্ত করিয়া থাকিতে

পারে না। প্রকৃতিদীপ্ত হৃদয়কে জগতে বিকশিত করিয়া তুলাই তখন তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—মানবশিশুর নিকট সেই দীপ্ত রহস্যশ্রী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই রহস্যানন্দের প্রকাশেই সাহিত্য রচিত হয়। এই জন্যই সাহিত্যের আদি অন্ত মধ্য কেবলই আনন্দ। যে সাহিত্যে আনন্দের যত স্ফূর্ত্তি, সেই সাহিত্যই তত উন্নত, গভীর।

প্রকৃতির আনন্দ তাহার গভীর জীবনে। প্রকৃতি প্রাণে ওতপ্রোত। সেই প্রাণ আমরা যতই উপভোগ করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ততই বদ্ধমূল হইবে। প্রকৃতির জ্যোৎস্নায়, রৌদ্রে, শ্যামলতায়, সর্ব্বত্রই প্রাণ প্রস্ফুটিত। ছায়াময় শারদীয় নিশীথে শুভ্র-নীল গগনপ্রান্ত হইতে পূর্ণহৃদয় চন্দ্রমা যখন শ্রান্ত সুপ্ত জগৎকে জ্যোৎস্নাবরণে ছাইয়া ফেলেন, তখন আমাদের হৃদয় পুলকে শিহরিয়া উঠে কেন? ধীরে ধীরে আমাদের অন্তরে কত ভাবের সঞ্চার হয়, কত স্মৃতি বিস্মৃতির নীরব আকুলি ব্যাকুলিতে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। শত শুভ্র তাড়িতালোকে ত কৈ, হৃদয় সেরূপ উঠে না। কারণ আর কিছুই নহে, প্রাণ। নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া, দূর অস্পষ্ট তরঙ্গায়িত ছায়া-বৃক্ষাবলীর শ্যামলতার পানে চাহিয়া যুগ যুগ কাটান যায়, কিন্তু সযতনে সজ্জিত কড়ি এবং জানালাবর্গের শুভ্র ও সবুজ রঙের উপরে দুই দণ্ড দৃষ্টি স্থির রাখা যায় কি না সন্দেহ। কারণ কি আর বলিতে হইবে? কেবলই এই প্রাণ। প্রাণের যেখানে যেরূপ অভিব্যক্তি, সেখানেই সেইরূপ আনন্দ।

সাহিত্যের ক্ষেত্র কি তবে জ্যোৎস্না, আকাশ, নদী, সমুদ্র, নিবিড় বনানী, এবং রৌদ্রতপ্ত ধরণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না। প্রকৃতির প্রাণ যেখানে অভিব্যক্ত, সেখানেই সাহিত্যের সাম্রাজ্য। মানবের হৃদয়ও সাহিত্যের অধিকারের মধ্যে। মানবজীবনের মত জীবন্ত জটিল রহস্য সংসারে বিরল। সুতরাং সাহিত্যের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র মানব-জীবন। এই রহস্য-জীবনের সৌন্দর্য্য, ক্রমাভিব্যক্তি, ইহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি, মিলন বিরহ, সুখ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা অক্ষমতা, হাসি অশ্রুর মধ্যে কল্পনা হারাইয়া যায়।

ইহা ত গেল সাহিত্যের ক্ষেত্রের প্রসরের কথা। স্বভাবের সর্ব্বত্রই সাহিত্যের গতিবিধি। কিন্তু সাহিত্যে স্বভাব কিরূপ ভাবে ব্যক্ত হয়? সংক্ষেপে বলিতে গেলে সমালোচনায়। তবে সমালোচনার মধ্যে প্রকারভেদ আছে। যেমন কবিতা, উপন্যাস, বিবিধ প্রবন্ধ। ইহাদের মধ্যেও আবার নানা বিভাগ আছে, তাহার উল্লেখ এখানে বোধ করি অনাবশ্যক। তবে সকল সমালোচনের মধ্যে বিশ্লেষণ সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে। একজন সমালোচক পাঠককে খুঁটিনাটি আচ্ছন্ন না করিয়া, কিছু না বলিয়া কহিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে প্রকৃতির হৃদয়ের মধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেন,

পাঠক ভাব অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠেন। আর এক ব্যক্তি তন্ন তন্ন খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ দ্বারা ভাব পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পান। কেহ লাইন টানিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কেহ প্রতিভার প্রভাবে ছায়া ধরিয়া আনেন, ছায়া দেখিয়া মূল বুঝ।

পাশ্চাত্য গ্রন্থকার ম্যাথু আর্ণল্ড সাহিত্যকে জীবনের সমালোচনা বলিয়া গণ্য করেন। বাস্তবিকই সাহিত্য জীবনের সমালোচনা। বিশেষরূপে প্রকৃতির প্রাণ আলোচনা করাই তাহার উদ্দেশ্য। সম্যক্ আলোচনা দ্বারা সেই প্রাণ যত প্রস্ফুটিত করিতে পারিবে, ততই সাহিত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সাহিত্যে হৃদয়ে হৃদয়ে আদান প্রদান চলে, প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন হয়। জড় দেহের উপর একটা শুভ্র আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া কাঠামকে লোকে অনেক সময় সাহিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়, কিন্তু প্রাণহীন দেহবৎ সে সাহিত্যের যথার্থ কোনও মূল্য নাই। আচ্ছাদনতলে কেবলই কুঞ্চিত গলিত শবদেহ।

সুকবির রচনা পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হই কেন? কারণ বিশেষ দূর নহে, আমরা প্রাণের সাড়া পাই বলিয়া, প্রাণ অনুভব করি বলিয়া। প্রাণ অনুভব করিয়া আমরা খেলাইবার খানিকটা জমি পাই, পিঞ্জরবদ্ধ সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া মুক্ত বায়ু সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠি। জ্যোৎস্নায় ডুবিতে ডুবিতে কবি গাইলেন,—

"ডুবে যাই ডুবে যাই—
আরো আরো ডুবে যাই।"

আমরাও এই সঙ্গে ডুবিবার অবসর পাইলাম। যত ডুবি, ততই জ্যোৎস্না, ততই আনন্দ। ডুবিয়া ডুবিয়া কূল আর পাই না, আরও ডুবিতে চাহি, আরও ডুবিতে থাকি, অগাধ জ্যোৎস্না আর অগাধ আনন্দ। প্রাণ কতখানি মুক্ত হইল! তাহার রাজ্য কত দূর বিস্তৃতি লাভ করিল!

অনেক বিষয়ে যে আমরা আনন্দ পাই, তাহার মূলে প্রাণ। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ কিম্বা কি কারণে জানি না, সেই প্রাণ অনেক সময় ধরিতে পারি না। চুম্বনের মধ্যে, আলিঙ্গনের মধ্যে, মিষ্ট কথার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বই আনন্দ বিকশিত করিতেছে। চুম্বন যদি শুধু দুটি অধরের ক্ষণিক মিলন মাত্র হইত, তাহার হৃদয়ের মধ্য হইতে দুইটি আত্মহারা প্রাণ ব্যাকুল বাসনা ঢালিয়া দিয়া প্রেমের মন্দির প্রতিষ্ঠা না করিত, তাহা হইলে কি তাহার মধ্যে আনন্দের স্ফূর্তি হইত? দেহের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া প্রাণে প্রাণে মিলিতে চায় বলিয়াই না আলিঙ্গনের সুগভীর তৃপ্তি? মিষ্ট কথার অন্তরে প্রাণের আহ্বানধ্বনি শুনা যায় বলিয়াই তাহাতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। শব্দশাস্ত্রমথিত, বহু

যত্নে সংগৃহীত, সুবিন্যস্ত বাক্যাবলীও প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রাণ চাহে প্রাণ, প্রাণ জাগে প্রাণে। এই জন্যই সাহিত্যে প্রাণের আবশ্যকতা। যেখানে প্রাণের অভাব, সেখানেই নিরানন্দ।

হৃদয়কে জড় নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে তাহার মধ্যে প্রাণ শুকাইয়া আসে। ইহাই বিকারের অবস্থা। জড়তা অস্বাভাবিক। স্বভাবে সৌন্দর্য্যের চিরপ্রবাহ। আমাদের হৃদয়েও প্রবাহ যাহাতে রুদ্ধ না হয় দেখা উচিত। মুক্তপ্রাণ কবি স্বভাবের মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করেন, সে কেবল তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবলবেগে সৌন্দর্য্যপ্রবাহ বহিতেছে বলিয়া। প্রভাতে সুশীতল সমীরণান্দোলিত বৃক্ষ দেখিয়া তিনি গাহিয়া উঠিলেন, "পুলক নাচিছে গাছে গাছে"। বিদ্রূপপরায়ণ সঙ্কীর্ণহৃদয়—যে কখন প্রকৃতির মধ্যে এমন আনন্দ উপভোগ করে নাই, যে ব্যক্তি প্রকৃতির প্রাণে নিমগ্ন হয় নাই—চস্‌মার মধ্য হইতে অবিশ্বাসনেত্রে মিটিমিটি চাহিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। তাহার নিকটে প্রাণ উপহাসের সামগ্রী। প্রকৃতিকে উপভোগ করিতে হইলে তাহাতে ডুবা চাই। আত্মদৃপ্তের নিকট স্বভাব জড়, নিশ্চেষ্ট।

স্বভাবের সহিত সাহিত্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সাহিত্য স্বভাব ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না। স্বভাবের অন্তর্গত কি না? চুম্বন বল, আলিঙ্গন বল, স্নেহ বল, প্রেম বল, বাহিরে অন্তরে সর্ব্বত্রই ত স্বভাবের রাজ্য। নহিলে সাহিত্যের মধ্যে এ সকল কি ঠাঁই পাইত? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সর্ব্বত্রই সাহিত্যের গতিবিধি।

এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধহেতু স্বভাবের ন্যায় সাহিত্যেও ছায়া-আলোকের সামঞ্জস্য বিশেষ আবশ্যক। বড় বড় কবির রচনা অনেক সময় এই ছায়া-আলোকের যথোচিত সন্নিবেশেই সুন্দর। ঔজ্জ্বল্যের প্রতি সমধিক অনুরাগবশতঃ আলোকের আত্যন্তিক প্রাখর্য্যে অপরিপক্কহস্ত প্রাণ পরিস্ফুট করিতে প্রায় পারে না। স্বভাবে অন্ধকারই আলোককে উজ্জ্বলতররূপে ব্যক্ত করে। উন্নত সাহিত্যেও আলোকের দীপ্তি প্রকাশ করিতে হইলে পার্শ্বে স্থান বুঝিয়া খানিকটা অন্ধকার জড় করিয়া রাখা হয়। অন্ধকারের সান্নিকট্যে আলোকের সম্যক্ অভিব্যক্তি।

যে দিক্ দিয়াই দেখ, সাহিত্য স্বভাবজাত—স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের সহিত তাহার প্রভেদ প্রাণ লইয়া। বিজ্ঞান জড়দেহ বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া তাহার মূল উপাদান সংগ্রহ করে; সাহিত্য ভাব বিশ্লেষণ করে—জড়দেহের মধ্যস্থ প্রাণ ধরিতে চায়। বিজ্ঞান মলয়-পবনের মধ্যে অম্লজানের অংশ অন্বেষণ করে; সাহিত্য মুক্ত মলয়পবন অনুভব করিয়া তৃপ্ত হয়। সে মলয়ানিলের স্নিগ্ধ ভাবে, মৃদু মধুর সৌরভে, ছায়াময়ী

জ্যোৎস্নাময়ী কাহিনীতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সাহিত্য প্রাণব্যাপ্ত, আনন্দপূর্ণ। জড়বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি তাহার বিশ্লেষণ হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র।

কিন্তু এখন বিশ্লেষণের কথা থাক্। সাহিত্যে যে ছায়া আলোকের কথা উল্লেখ করিলাম, ঘরের নিকট হইতেই তাহার দু একটি উদাহরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি। কুন্দনন্দিনীর চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? কুন্দ একজন বালিকা, সে নগেন্দ্রকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে মাত্র। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ কোনও জ্ঞান নাই। কিন্তু তবু কুন্দকে আমাদের এত ভাল লাগে কেন? উপন্যাসে ভালবাসার কথার অভাব নাই, নায়িকাকুলের দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রুজল, ইহা ত বারো আনা উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। কুন্দ অপেক্ষা গুণবতী ত সহজেই মিলিতে পারে। কিন্তু বিষবৃক্ষের গ্রন্থকার কুন্দকে যেরূপ ভাবে ফুটাইয়াছেন, এমন অন্যান্য অনেক উপন্যাস-রচয়িতা পারেন না। কুন্দকে তিনি প্রায় ছায়ায় ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু দু এক জায়গায় তাহার মুখে চোখে এমনি ভাবে আলোক ফেলিয়াছেন যে, তাহাতেই কুন্দ ব্যক্ত হইয়াছে। কুন্দের পার্শ্বে আবার সূর্য্যমুখী থাকিতে দুইটি চরিত্রই পরস্পরের ছায়ালোকে ফুটিতে পারিয়াছে। চোখে আঙ্গুল দিয়া অবশ্য এ ছায়া আলোক দেখান যায় না, কিন্তু চোখ বুজিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝা অসম্ভব নহে।

শেষ কথা, সাহিত্যের স্বাভাবিকতা। ভাবের পূর্ণতাই বোধ করি স্বাভাবিকতার লক্ষণ। পূর্ণতার মধ্যে সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে। ভাববিশেষকে যেমন তেমনি ফুটাইতে পারিলেই সাহিত্যে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়। দুরূহ দুর্ব্বোধ্য শব্দাম্বুধিমথিত কথাসমূহে ভাব চাপা পড়িয়া না যায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পদে, প্রত্যেক কথায় বক্তব্য ভাব যেমন ফুটিয়া উঠিবে, সাহিত্য স্বাভাবিক এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। ভাবে ভাব উথলিয়া উঠে—রহস্যবিশেষ ব্যক্ত হইয়া রহস্যরাজ্যের শত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। সাহিত্য এই বিস্তৃত স্বভাবরহস্য রাজ্যের চাবীস্বরূপ।

'ভারতী ও বালক', অগ্রহায়ণ ১২৯৬

মত্ততাসুখ

সংসারের কাজ অনেকেই করে, কিন্তু কাজ যথেষ্ট করিলেও প্রকৃত মহত্ত্ব অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। কাজ করিবার জন্য এখানে অনেক প্রলোভন আছে, প্রলোভনের প্ররোচনায় বড় বড় কাজ সমাধা করিতেও বিশেষ কষ্ট হয় না। তাই বলিয়া

প্রলোভনপ্রসূত কার্য্য কি আর মহত্ত্বপ্রসূত অনুষ্ঠানের মত স্থায়ী হয়? মহত্ত্ব স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া নীরবে কাজ করিয়া যায়, মত্ততাসুখে গা ভাসাইয়া দিয়া সারাক্ষণ প্রবল আত্ম আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান হওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। মত্ততাসুখ আপনাকে অনেক সময় মহৎ কল্পনা করিয়া থাকে, এবং এই কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার নিকট হইতে আপনাকে বঞ্চিত করে। কিন্তু তাহার চাঞ্চল্যেই সে ধরা পড়ে। মহত্ত্বের মধ্যে যে সংযত শিক্ষার ভাব নিহিত আছে, মত্ততাসুখ তাহা না বুঝিয়া মত্ত হস্তীর মত দাপাদাপি করিয়া বেড়ায়, সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া একপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল দাসত্বের মোহে মগ্ন হইয়া থাকে, এবং যথেচ্ছাচারিতার আত্মসুখ পরিতৃপ্তি লক্ষ্য ক্ষণস্থায়ী নিয়মাবলীর মধ্যে স্ফীত হইয়া নিয়মলঙ্ঘনী বিদ্যাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া সেবা করে। মত্ততাসুখ অল্পেতেই নাচিয়া উঠে, হৈ-চৈ করিয়া কর্ম্মশীলতা অনুভব করিতে চায়। উচ্চ কণ্ঠকোলাহলে পলকের মধ্যেই লোক জমিয়া যায়, লোকারণ্যও মত্ততাসুখে উদ্বেলহৃদয় হইয়া উঠে। কাজের দিকে তখন লক্ষ্য থাকে না, অথচ মত্ততাশ্রান্তিতে পরিশেষে কাজ করিলাম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। স্থির সমুদ্রে যেমন জাহাজ অগ্রসর হইবার সুবিধা পায়, ঝঞ্চা ঝটিকায় কেবল গতির বিঘ্ন সম্পাদন করে, স্থির ভাবে সেইরূপ হৃদয় সেই ধ্রুব পথ পানে অগ্রসর হইতে থাকে, মত্ততা শ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে মাত্র।

মত্ততার ক্রিয়ায় একটা ভয়ানক লম্ফঝম্প হয়, জয়ঢাক বাজে, ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। তাহার পর যখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন কেবলই অবসাদ—তখন হাই উঠিতে থাকে, পা টলিতে থাকে, মাথা ঘুরিতে থাকে, অতিরিক্ত ব্যায়াম চালনা হেতু কতকটা যেন জ্বরভাব উপস্থিত হয়। মত্ততাসুখ পদে পদে নৈরাশ্যকাতর। মাতিবার জন্যই তাহার কাজ কি না, মাতামাতির ত্রুটি হইলেই নৈরাশ্য। সে কেবল ছাতা ঘাড়ে করিয়া, খাতা পকেটে পূরিয়া, পথে পথে, গলিতে গলিতে ত্বরিতগতিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। হৃদয়ের আবেগে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সুসম্পন্ন হইলেও হাঁক ডাক বড় শুনা যায় না। আর মত্ততাবেগে যে কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহা সম্পন্ন হোক না হোক, একটা কোলাহল উঠে। অলস হৃদয়সমাগমে ধীরে ধীরে যে নিন্দা চর্চ্চা ফেনাইয়া উঠে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, এই মত্ততাসুখ। বলবতী সংশোধনস্পৃহা তাহার মূল নহে, কেবলই আত্ম-অগাধ আলস্য পরিতৃপ্তি জন্য রসনার ব্যায়ামানুষ্ঠান। স্বদেশহিতৈষিতাও অনেক সময় মত্ততাসুখোদ্ভূত—তখন সে কেবল ছট্‌ফট্ করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে, বিদেশের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে; ঘন ঘন করতালির নিকট আপনাকে বিক্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সমাজসংস্কার, ধর্ম্মচর্চ্চা,

সকলেরই মধ্যে মত্ততাসুখ বিরাজমান। সংযমই কেবল ইহার একমাত্র ঔষধ। যেখানে সংযম খুব গভীর, সেইখানেই মত্ততাসুখ জোর করিতে পারে না। সংযমেই মহত্ত্ব, সংযমেই স্বাধীনতা, সংযমেই আনন্দ।

মত্ততা আর কাহাকে বলে? কেবলই সংযমাভাব বৈ ত নয়। আপনার উপরে আর দখল নাই, নৃত্যই জীবনের একমাত্র অধীশ্বর। সত্যানুসন্ধানে লক্ষ্য নাই, তর্ক উঁচাইয়া রহিয়াছে; যোগানন্দ নৃত্যানন্দাচ্ছন্ন; কর্ত্তার কর্ম্মত্ব প্রাপ্তি। মত্ততাসুখেও কাজ হয় বটে, কিন্তু সে কার্য্য মধ্যে জাগ্রত জীবন্ত আনন্দ নাই, সে কেবল মৃত দেহকে তড়িৎসাহায্যে নৃত্য করান। অসংযত মত্ততাসুখ শুনিল ধর্ম্ম, অমনি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। স্থির সংযত হৃদয় ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে ফিরিবে। মত্ততাসুখ ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে, কিন্তু দৃঢ় ভিত্তি গাঁথিয়া তুলিতে পারে না। তাহার সকল কার্য্যই সাময়িক, ক্ষণিক আন্দোলন। সংযম কার্য্যের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কাজ করে, মত্ততাসুখ একটা কিছু হৈ-চৈ আবশ্যক ভাবিয়া কাজ করে। আসল কথা, মত্ততাসুখ চিন্তা করিতে চাহে না।

২

তবে চিন্তা করাই কি মত্ততাসুখের প্রতিবন্ধক? না, তবে গভীর চিন্তাশীলতা বটে। চিন্তার মধ্যেও মত্ততাসুখ আছে। লাগামছাড়া কল্পনার অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। যোগী যেমন সংযত হৃদয়ে সেই ভূমা অজর অমরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন, তাহার মধ্যে মত্ততা নাই। তাঁহার বিমল মুখজ্যোতিতে, অধরপ্রান্তের রজতরেখায় মত্ততাসুখাভাব অভিব্যক্ত! মত্ততাসুখের হাস্য সংযত নহে। সে গড়াইয়া পড়ে, লুটাইয়া যায়, তাহার মাতালগতি। তাহার উৎসব দেহের উৎসব, আত্মার উৎসব নহে। তাহাতে আত্মার ভূমানন্দ পরিব্যাপ্ত হয় না; সাময়িক উচ্ছ্বাসে ব্যায়ামসুখ লাভ হয় মাত্র।

অনেকে হয় ত আমাদিগকে ভুল বুঝিয়া মনে করিতেছেন যে, মত্ততাসুখকে দ্বীপান্তরিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মত্ততাসুখের মন্দিরে মন্দিরে সংযমের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নহে, তখন মত্ততাসুখকে একেবারে দ্বীপান্তরিত করিয়া মন্দির শূন্য রাখিবার প্রয়োজন দেখি না। মত্ততাসুখ অনেক স্থলে মন্দের প্রতিবন্ধক। সংসারে একেবারে বৃথা কিছুই নাই, মত্ততাসুখেরও কাজ আছে।

কিন্তু কাজ আছে বলিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য। কারণ, প্রশ্রয় পাইলে

সে তোমাকে এমনি আঁকড়িয়া ধরিবে যে, তাহার নাগপাশ হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইবে না। বহুরূপীর মত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে তোমার নিকট ধর্ম্মরূপে, জ্ঞানরূপে, প্রেমরূপে, কর্ম্মরূপে আবির্ভূত হইবে, এবং মোহের আবরণ টানিয়া দিয়া তোমাকে কলুর বলদের মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কর্ম্মশীলতায় সান্ত্বনা দিবে। মত্ততা-সুখের দাসত্বে তুমি অনেক সৎকার্য্য করিতে পার স্বীকার করি, কিন্তু আবার নিমেষের মধ্যে তোমার সত্যনিষ্ঠা অন্যায়ের তরফে দাঁড়াইতে পারে। মত্ততাসুখের উপর ত আর নির্ভর করা যায় না—সে আজ খেয়ালবশতঃ সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারে, কাল আবার হয় ত অপরকে সর্ব্বস্বান্ত দেখিবার জন্য লালায়িত হইবে। মানব-জীবনের অসংলগ্নতার কারণ অনেক সময় মত্ততাসুখ।

মত্ততাসুখ আপনার স্বাধীনতা অনুভব করিবার জন্য যষ্টিহস্তে নিরীহের পৃষ্ঠ অনুসন্ধান করে; সংযম আপনার প্রভু হইয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিতে থাকে। সংযমের আস্ফালন নাই, অহঙ্কার নাই; মত্ততাসুখ আস্ফালনী-বিদ্যার উপরেই বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়াস পায়। যেমন করিয়াই হৌক্, মত্ততাসুখে যে স্বাধীনতা নাই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। উদাহরণ দিয়া একটু পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি। পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মনঃস্থিরার্থে মাদকব্যবহারকারী উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন কু-অভ্যাসবশতঃ প্রমত্তাবস্থা ভিন্ন ধর্ম্মভাব সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয় না, মত্ততাসুখগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়েও সেইরূপ মত্ততাবিহীন কোন ভাবই ঠাঁই পায় না। প্রকৃতপক্ষে মত্ততার দাসেরা যন্ত্রবৎ জড় পদার্থ—তাহাদিগকে উপায়স্বরূপ করিয়া মত্ততাই কার্য্য করে। বড়মানুষের চাকরেরা যেমন বড়মানুষীদৃপ্ত হয়, মত্ততার দাসেরাও সেইরূপ মদদৃপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বড়মানুষের চাকরের মনে যে অহঙ্কার দেখা যায়, তাহা মত্ততাপ্রসূত। পানীয় মদ ভিন্ন সংসারে বিষয়-মদ, ধর্ম্ম-মদ প্রভৃতি নানাপ্রকার মদ আছে, তাহারও পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর একটি কথা পাঠকেরা স্মরণ রাখিবেন যে, তন্ময়ভাব ও প্রমত্তভাব এক নহে। তন্ময়ত্ব মত্ততার অতীত।

মত্ততাসুখকে ধরিতে হইলে আত্মবিশ্লেষণই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। আত্মবিশ্লেষণে আপনার কার্য্যপ্রবর্ত্তক ভাবটিকে সহজেই বুঝা যায়, সুতরাং মত্ততাতিশয্য হইতে বিরত হইতে কষ্ট পাইতে হয় না। আমরা যে সত্যপ্রিয় হইয়াও অনেক সময় স্খলিতাচরণ হই, তাহার এক প্রধান কারণ, মত্ততাসুখমোহে আমাদের আত্মবিশ্লেষণাভাব। সহসা লাফাইয়া না উঠিয়া, ধীরে সুস্থে আপনাকে বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। কর্ত্তা যেন দাসত্বের বন্ধনে পড়িয়া কর্ম্মে আসিয়া না পরিণত হয়েন।

কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ হয় কিরূপে? বাস্তবিক, ইহা শুনিতে যত সহজ, কার্য্যে তেমন নহে। আপনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে আমাদের সহজে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা আপন আপন কুটিল হৃদয়দর্পণে জগৎসংসারকে কুটিল দেখি, এবং আত্মছিদ্রের প্রভাবে সংসার ছিদ্রময় ঠাহরাইয়া থাকি। পরছিদ্রানুমানতৎপরতা হেতু আত্ম-বিশ্লেষণের অবসর প্রায় হয় না। কিন্তু মানবের চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? দুই দিন অভ্যাস করিলেই আত্মবিশ্লেষণ সহজ হইয়া উঠে। আত্মবিশ্লেষণক্ষমতা জন্মিলেই যে মানুষ সকল প্রকার মত্ততা হইতে মুক্ত হয়, তাহা অবশ্য নহে; কারণ, আত্মছিদ্র বুঝিতে পারিলেও প্রবৃত্তিকে বশীভূত করা সময়সাপেক্ষ। আত্মবিশ্লেষণ চক্ষু খুলিয়া দেয়, এবং এই কারণে সংযমের যথেষ্ট সহায়তা করে।

পদে পদে আমরা যখন আপনার দোষ অনুভব করি, তখন সাধারণতঃ সাধু ব্যক্তির নিন্দা করিয়া তৃপ্ত হইতে চাই। নিন্দাপ্রিয়দিগের নিকট সাধুতার খুঁৎ যেমন তৃপ্তিকর, এমন আর কিছুই নহে। রীতিমত আত্মবিশ্লেষণ অভ্যাস করিলে এ ভাব কতকটা কমিয়া আসার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, আত্মবিশ্লেষণের মূল আত্মসংশোধন-স্পৃহা বৈ আর কিছুই নহে। বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া যখন আমরা নিজের খুঁৎগুলি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব, তখন ক্রমে ক্রমে তাহা ঘুচিবেই। কারণ, মানবসন্তানে সৎপথাবলম্বনেচ্ছা চিরকালই বলবতী। সে পঙ্কের মধ্যে থাকিতে পারে না; তাহার আনন্দ চাই, প্রাণ চাই, শান্তি চাই। আর আনন্দ সংযম ব্যতীত মিলে না। পরশ্রীকাতরতা নিজশ্রীর আনন্দ উপভোগ করিতে দেয় না, পরনিন্দা আত্মসাধু-অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করিতে দেয় না, কুটিলতা সরলতার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করে। যেখানেই সংযমাভাব, সেইখানেই অন্ধকার নিরানন্দ। মত্ততাসুখে নৃত্য-কোলাহল, শ্রান্তি, অবসাদ, অশান্তি এবং অবশেষে শূন্য।

'ভারতী ও বালক', অগ্রহায়ণ ১২৯৬

বঙ্গসাহিত্য : রামপ্রসাদের গান

পুণ্যভূমি বঙ্গের স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের প্রেম-রাগিণী শুনে নাই, সংসারে এরূপ লোক বিরল। রামপ্রসাদ সেন গানের দ্বারাই বিখ্যাত। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোনও কবি বোধ করি, সঙ্গীতে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা তান লয়ে গাহিবার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, তাহার সুর আছে, তাল আছে, বৈষ্ণবেরা আজও সে গান কতক কতক গাহিয়া থাকে, কিন্তু

তথাপি আজকালের অনেক লোক তাঁহাদিগকে সঙ্গীতরচয়িতা বলিয়া জানেন কি না সন্দেহ, বাঙ্গলা সাহিত্যে কবির স্থান লাভ করিয়াই তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেন কি তবে কবি নহেন? সে কথা পরে বিবেচ্য। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি তাঁহার সুরে অনেকটা বাঁচিয়া গিয়াছেন, কবি বলিয়া লোকে তাঁহাকে যত না জানে, সাধক ভক্তিসঙ্গীতরচয়িতা ভক্ত বলিয়া অধিক জানে। রামপ্রসাদী সুর তাঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি। বাস্তবিক, তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের নাম কয় জন শুনিয়াছে? অথচ এই বিদ্যাসুন্দরই রামপ্রসাদের কবিরঞ্জন উপাধির মূল কারণ।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দর তাঁহার উপাধির কারণ হইলেও সঙ্গীতেই তিনি বাঁচিবার যোগ্য। নবাবি বিলাসপ্লাবিত সে সময়ের বঙ্গদেশে প্রেমের সুরে গান গাহিবার লোকের বিশেষ অভাব হইয়াছিল, রামপ্রসাদ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের সুরও কিছু নূতন ধরণের। আর তাঁহার ভাষায়ও এমন কিছু নাই যে, ব্যাখ্যাকারের কুহেলিকাচ্ছন্ন টীকা টিপ্পনীর অন্ধকারের মধ্য হইতে অন্ধ হইয়া অতিপ্রচ্ছন্ন সুগভীর জটিল আধ্যাত্মিক রহস্যসমূহ বাহির করিতে হয়। সরল ভাবে, সোজা কথায়, হৃদয়ের সুরে তিনি মাকে আপনার সুখ দুঃখ জানাইয়াছেন—মায়ের উপর কখনও অভিমান করিয়াছেন, কখনও তাঁহার চিরপ্রসারিত বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছেন, মাতৃস্নেহে পূর্ণহৃদয় হইয়া মরণের বিভীষিকাকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন। সেই জগৎজননী চিরস্নেহময়ীর চরণেই রামপ্রসাদের সকল আশা ভরসা। এ বিপুল সংসারে করুণাময়ীর অপার করুণা ব্যতীত মানবের আর আছে কি? ধন মান যশ, সকলই ত মায়ার খেলা—কিছুতেই শান্তি নাই, সোয়াস্তি নাই, লালসা তিলে তিলে বৰ্দ্ধিত হইয়া মানবসন্তানকে গ্রাস করে।

রামপ্রসাদ গান রচনা করিতেন মায়ের পূজার জন্য। ফুল চন্দন নৈবেদ্যের মত সঙ্গীতই তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ ছিল। যশোলিপ্সা তাঁহার সঙ্গীতরচনার মূল কারণ হইলে প্রসাদের অনেকগুলি সঙ্গীত লোপ পাইত না। ভাবাবেশে তিনি মায়ের চরণে বসিয়া গাহিতেন। সকল গান লিখিয়া রাখিবার তাঁহার অবসর হয় নাই; বস্তুতঃ তিনি সে চেষ্টাও করেন নাই। প্রভুর হিসাবের খাতার পার্শ্বে, ভক্তিরসপিপাসু ব্যক্তিবিশেষের ভক্তিসঙ্গীতসংগ্রহে, এখানে সেখানে তাঁহার দুই দশটা গান কোনও প্রকারে ছটকাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ সেন কি তবে গান লিখিতেন না। না লিখিলে তাঁহার এত গান আমরা পাইলাম কিরূপে? তবে অলেখা গানও তাঁহার যথেষ্ট ছিল শুনা যায়। সে সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার

সুবিধা নাই। লেখা গানই সকল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সে কালে ত আর এ অধমতারণ মুদ্রাযন্ত্র ছিল না।

অনেকে বলেন, রামপ্রসাদের প্রথম গান,

"আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী॥" ইত্যাদি।

ইহা তাঁহার প্রথম রচনা কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু এই রচনাই রামপ্রসাদকে প্রকাশ করিয়া দেয়। রামপ্রসাদ একজন ধনীর গৃহে কর্ম্ম করিতেন। হিসাবের খাতার ধারে ধারে কালীনাম ও গান লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। ঘটনাক্রমে তাঁহার প্রভু একদিন খাতা দেখিতে চাহিলেন। দেখিলেন, হিসাবের শেষে "আমায় দেও মা তবিলদারী" গান লেখা রহিয়াছে। রামপ্রসাদের কপাল ফিরিল—প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া গীতরচয়িতাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন।

রামপ্রসাদ সেনের প্রধান গুণ এই যে, তাঁহার রচনায় কাপট্য নাই। ভাব বন্ধক দিয়া, হৃদয় বিক্রয় করিয়া সঙ্গীতের মধ্যে আভিধানিক জ্ঞান এবং দুরূহগুণখ্যাত তালাভিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা রামপ্রসাদে দেখা যায় না। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পায় তাঁহার কিছুই যায় আসে না—ভাব তাঁহার সুর গড়িয়া লয়। পাঠকেরা আমাদিগকে ধ্রুপদ খেয়ালের বিরোধী ঠাহরাইবেন না। ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য, খেয়ালের মাধুর্য্য পাষাণকেও মুগ্ধ করে; কিন্তু মূলে ভাব চাহি। রাগ রাগিণী আলাপ যন্ত্রে হইতে পারে—সেখানে কেবল সুরের ভাবের প্রতি লক্ষ্য। কিন্তু কথা যেখানে স্থান পাইয়াছে, সেখানে কথানুযায়ী সুরের ভাব হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞ ওস্তাদির দন্তে চাপিয়া ভাবকে হত্যা করা হৃদয়হীনতার পরিচয় বৈ আর কি? রামপ্রসাদ এ দোষে লিপ্ত নহেন। নিজের প্রাণের গানগুলিকে তিনি প্রাণের সুরে বসাইয়াছেন। ভাবের মত সুরও তাঁহার হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত।

রামপ্রসাদী সুর যে টিঁকিয়া গিয়াছে, সে কেবলই তাহা হৃদয়োত্থিত বলিয়া। বড় বড় বিখ্যাত ওস্তাদি সুরের পার্শ্বে সে অবশ্য দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু ভাববিশেষের গানের সহিত সে চমৎকার বসিয়া যায়। অনেক হিন্দী গানের যেমন কথার বিশেষ মূল্য নাই, কতকগুলা বিবর্ণ স্বর-ব্যঞ্জনের উপর দিয়া একটা সুর বহিয়া গিয়াছে, সেই সুরেই সকল মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত, রামপ্রসাদের সুর সেরূপ নহে। তাঁহার সুর গাহিতে গেলেই সেই সঙ্গে এক বিশেষ ধরণের ভাবসংযুক্ত কথা আসিয়া হাজির হয়। আমাদের হৃদয়ে রামপ্রসাদের একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ ছায়া পড়ে—মায়ের চরণে বসিয়া ভক্তিবিগলিত-

হৃদয়ে প্রেমপুলকিতান্তঃকরণে তিনি যেমন গান গাহিতেন, যেরূপ ভাবে কাঁদিতেন, হাসিতেন, অজ্ঞাতসারে অতি ধীরে ধীরে দূর বিস্মৃত অতীতের আকুলি ব্যাকুলির মত সেই ভাবগুলি ঈষৎ যেন জাগিয়া উঠে। সুরের সহিত, গানের সহিত রামপ্রসাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

নিজের গানগুলি রামপ্রসাদ খুব ভাবের সহিত গাহিতেনও। শুনা যায়, রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর বিশেষ সুমিষ্ট ছিল না, কিন্তু তাঁহার ভাবে লোকে মুগ্ধ হইত। এমন কি, নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে নাকি তিনি স্বরচিত সঙ্গীতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সিরাজ উদ্দৌলা একদিন নৌকাবিহারে বাহির হইয়াছেন, রামপ্রসাদ সেন তখন হৃদয় খুলিয়া ভাগীরথীবক্ষে কালীকীর্ত্তন করিতেছেন। কালীকীর্ত্তন শুনিয়া সিরাজের মনে কি ভাবের উদয় হইল কে জানে—তিনি প্রসাদকে আপনার নৌকায় আনাইয়া গাহিতে বলিলেন। রামপ্রসাদ গাহিলেন ধ্রুপদ; সিরাজের তৃপ্তি হইল না। রামপ্রসাদ গাহিলেন খেয়াল গজল; নবাবের ভাল লাগিল না। তখন নবাব তাঁহাকে সেই কালীর গান গাহিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ প্রাণের ভিতর হইতে গাহিলেন। মুসলমান নবাবের পাষাণ হৃদয় গলিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রামপ্রসাদের গানের আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়, তাহার ছন্দ। তাঁহার ছন্দ অবশ্য একেবারে নূতন ধরণের নহে, নূতনত্ব তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু তথাপি বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের নিকট তাহাকে একবার হাজির করা আবশ্যক বিবেচনা করি। বাঙ্গলা ভাষায় অক্ষরগণনার উপর যাঁহারা একান্ত নির্ভর করেন, রামপ্রসাদী গানের ছন্দ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্বরান্ত এবং হসন্ত উচ্চারণের উপর ছন্দ অনেক সময় যথেষ্ট নির্ভর করে। রাম-প্রসাদের বড়ই জোর কপাল যে, বড় বড় অমরকোষবিদ্ ব্যাকরণগ্রস্ত সশস্ত্র সংশোধক পণ্ডিতবর্গ তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবার অবসর পান নাই। ক্ষীণজীবী রামপ্রসাদ সেন তাহা হইলে কি আর দুই দণ্ড কাল শান্তিতে থাকিতে পারিতেন? পণ্ডিতবর্গের কৃপায় তাঁহার গানগুলি শিখাশোভিত মুণ্ডিতমস্তক হইয়া মুখস্থদক্ষ অনুর্ব্বর হৃদয়ের আনন্দ বিধান করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু গুরুতর সংশোধনভাবাচ্ছন্ন হইয়া রামপ্রসাদের মস্তক উত্তোলন করিবার সামর্থ্য থাকিত না।

ভাব, ভাষা, ছন্দ ছাড়িয়া এইবারে আমরা ক্রমে ক্রমে রামপ্রসাদের মতামতের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা দেখি। ভাব বর্জ্জন করা অবশ্য চলে না—বরঞ্চ সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে হইবে। রামপ্রসাদকে কেহ কেহ বাহ্য অনুষ্ঠানপ্রিয় বলিয়া থাকেন। এ কথা সত্য কি না, দেবতা জানেন; কিন্তু গান দেখিয়া আমাদের

ত তাহা মনে হয় না। রামপ্রসাদ বেশ বুঝিতেন, লোলরসনা নরমুণ্ডমালাশোভিতা জড় পাষাণপ্রতিমার সম্মুখে সহস্র নিরীহ মহিষ এবং ছাগশিশু বলি দিয়া মায়ের পূজা হয় না। তিনি জানিতেন, এই স্নেহময়ী বিশ্বজননী শোণিতপাতে পরিতৃপ্ত হয়েন না; স্তূপাকার ফুল চন্দন নৈবেদ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না; যিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত, তিনি ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য, নর-মহিষ-ছাগ বলিরও অতীত। রামপ্রসাদ মন্দিরবিশেষবদ্ধা প্রতিমাকে কালী বলিতেন না। গানের মধ্যেই তিনি বলিয়াছেন, "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না"। শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। নৈবেদ্য এবং বলির উপরেও তাঁহার মন্তব্য আছে। যথা,

"জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয় আলোচাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাই কি জান না।
ওরে, কেমনে দিতে চাস্ বলি তাঁয় মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।"

রামপ্রসাদ কালীর উপাসক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কালী-উপাসক বলিলে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা তিনি ছিলেন না। তাঁহার কালীও স্বতন্ত্র, পূজা-পদ্ধতিও বিভিন্ন। তাঁহার পূজায় লালে লাল ব্যাপার নাই।

চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে এইখানে রামপ্রসাদের সাকারবাদ নিরাকারবাদ লইয়া কথা উঠিতে পারে। রামপ্রসাদ সাকার-উপাসক ছিলেন, কি নিরাকার-উপাসক ছিলেন, বলা বড় কঠিন। গান দেখিয়া মনে হয়, তিনি প্রথমে যাহাই থাকুন, ইদানীং নিরাকার-উপাসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না—তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ছিল, ভক্তি ছিল, প্রাণহীন কথাসমষ্টির মধ্যে তিনি নিমগ্ন ছিলেন না। আমরা রামপ্রসাদের নিকট হইতে এই প্রেম ভক্তি শিক্ষা করিতে পারি। রামপ্রসাদ সাকারবাদীই হোন্ বা নিরাকারবাদীই হোন্, ফাজিল ছিলেন না, ইহাই তাঁহার এক প্রধান গুণ। পরবর্ত্তী নকল-নবিশেরা অনেকে বিনা ভাবে গলা জাহির করিতে চেষ্টা করিয়া বরঞ্চ ফাজিলামি দোষে দোষী হইয়াছেন। ব্যাখ্যার জোরে সটীক সমালোচকবর্গ রামপ্রসাদকে নানা রূপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু রামপ্রসাদ যে অকপট, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রেমময়ীর চরণে তাঁহার অটল নির্ভর ছিল, এই জন্যই কেবল সাহস করিয়া তিনি অনেক কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অহঙ্কার প্রকাশ পায় না—প্রাণের টান প্রমাণ হয় মাত্র।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে রামপ্রসাদের মত বর্ত্তমান কালের অনেক একেশ্বরবাদীদিগের সহিত মিলে। আত্মার নির্ব্বাণ অথবা ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি তিনি বিশ্বাস করিতে নারাজ—মায়ের

পদপ্রান্তে বসিয়া চিরদিন সেই বিমল প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে পারিলেই রামপ্রসাদ পরিতৃপ্ত। তাঁহার গানেই আছে,

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।"

উপহাসরসিক প্রচ্ছন্নার্থাবিষ্কারদক্ষ অতি দার্শনিক পণ্ডিতেরা ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করেন জানি না, কিন্তু সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে বোধ করি, ইহার অন্য বিশেষ নিগূঢ় অর্থ বাহির হইবে না। নিতান্তই যদি বাহির হয়, নাচার।

রামপ্রসাদের মতামত সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা শোভা পায় না। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে লেখনীযুদ্ধে অনেক কথা ব্যক্ত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমানে আমরা তাঁহার দু একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াই, পাঠকেরা স্ব স্ব যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়া লইবেন।

"আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে, কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।
ওরে, হৃদ্‌কমলে ধ্যানকালে আনন্দসাগরে ভাসি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা,
অনলে দহন যথা করে তুলারাশি।
গয়ায় করে পিণ্ডদান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

আর একটা গানের অংশ,

"কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাহিব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব॥"

রামপ্রসাদের তীর্থাদি দর্শন সম্বন্ধে মতামত পাঠকেরা ইহাতে যথেষ্ট বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তথাপি আমরা দু এক কথা বলিলে বোধ করি, নিতান্ত অন্যায় হইবে না। সাধারণ লোকের ন্যায় তীর্থবিশেষে মরিলে মুক্তি, তীর্থ দর্শন করিলে সর্ব্বপাপক্ষয়, এ সকল রামপ্রসাদ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু তীর্থাদি দর্শনের উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি কোন মত ব্যক্ত করেন নাই। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল দেখিলে হৃদয় প্রসারিত হয়। ইহাতে

শরীর মনের বিশেষ স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। এই জন্যই বোধ করি, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তীর্থাদি প্রতিষ্ঠার বিশেষ পক্ষপাতী। রামপ্রসাদ এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই—কেবল দেশের কুসংস্কারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই উপরি উদ্ধৃত গান গাহিয়াছেন। এত করিয়া এ কথা আমাদিগের বুঝাইবার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু রামপ্রসাদের গানের সহিত দলে দলে অন্ধ গোঁড়ামির আবির্ভাব হয়, সেই ভয়ে অনাবশ্যক হইলেও অনেক কথা বকিতে হইল। ভরসা করি, অধীর পাঠকেরা অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সঙ্গীত রচনার জন্য কেহ কেহ রামপ্রসাদকে সুবিধামত রামমোহন রায়ের পার্শ্বে আনিয়া খাড়া করিয়া থাকেন। রামপ্রসাদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হয় কি না জানি না, কিন্তু পাঠক সাধারণের তাহাতে বিশেষ জ্ঞান বৃদ্ধি হয় বলিয়া ত মনে হয় না। শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ, অবস্থা, বিদ্যা, বুদ্ধি, কোনও বিষয়েই ত উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায় না। কেবল একমাত্র ঐক্য—উভয়েই ধর্ম্মসঙ্গীতরচয়িতা। কিন্তু উভয়ের সঙ্গীতও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। রামমোহন রায়ের স্বর বরাবরই গম্ভীর। তিনি এক ভাবে লিখিয়াছেন, রামপ্রসাদের সে ভাব নহে। রামমোহন রায়ের উপরে এই বিচিত্র বিশাল সৃষ্টির এমন একটি গম্ভীর প্রভাব পড়িয়াছে যে, তিনি তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া মানবকে সেই পরম পদে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন, আর এই অচিন্ত্য বিশ্বরচয়িতার মহিমা দর্শনে আকুলহৃদয়ে গাহিয়া উঠিয়াছেন। রামপ্রসাদের মত তাঁহার সঙ্গীতে গয়া কাশী প্রভৃতির উল্লেখ নাই, তাহা বিশেষরূপে সাধারণভাবে সর্ব্ব দেশের উপযোগী হইবার মত রচিত। রামপ্রসাদ মায়ের কাছে অনেক আবদার করিয়াছেন, মায়ের উপর অভিমান করিয়াছেন, কত কি বলিয়াছেন কহিয়াছেন; রামমোহন রায় তাহা করেন নাই, জননীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি নীরব। আমরা কাহাকেও কমাইতে বাড়াইতে পারি না—কেবল বলিতে পারি, উভয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি সমালোচনার এ স্থান নহে, সুতরাং তাহা হইতে আমরা বিরত থাকি। বিশেষ কারণবশতঃ এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, গান দেখিয়া পাঠকেরা ঈশ্বরপ্রেম সম্বন্ধে কাহাকেও হীন ঠাহরাইবেন না।

রামপ্রসাদের গান সম্বন্ধে আর একটি পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইবে। রামপ্রসাদের গান বৈঠকে গাহিবার মত নহে—দশ বিশ জনে মিলিয়া গাহিবার গানও নহে। তাহাতে সে গানের প্রভাব অনুভব করা যায় না। বিজন নদীতীরে, প্রান্তরে, পথে একাকী পথিক যখন আপন মনে গাহিয়া চলে, তখনই রামপ্রসাদকে বুঝা যায়। বলিতে কি, নগরে ভিক্ষুকদিগের মুখে সে গানের যে মিষ্টতা থাকে,

গলদ্‌ঘর্ম্ম বিপুলস্ফীতি ওস্তাদি কণ্ঠে অনেক সময় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। প্রাণে না অনুভব করিয়া কেবলমাত্র সা রে গা মা-র ব্যায়াম করিলে রামপ্রসাদী গান মাটি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কথা ছাঁটিয়া ফেলিয়া কেবল সুরের জমাট্ করিতে হইলে রামপ্রসাদ পরিত্যাজ্য।

শেষ কথা, রামপ্রসাদের গান যথার্থ নিঃস্বার্থ ভক্তির পরিচয়। রামপ্রসাদের ভক্তি সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র। বাঙ্গলার কীট পতঙ্গ অবধি তাহা জানে। রামপ্রসাদের কথা হইতে তাঁহার ভক্তির গাঢ়তা দেখাইয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করি।

"মায়ের নাম লইতে অলস হইও না রসনা, যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না হয় আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হলো না ব'লে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে।
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিও রে নিও রে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতন থেক (মন রে আমার), কালী ব'লে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে।"

'ভারতী ও বালক', অগ্রহায়ণ ১২৯৬

নগ্নতার সৌন্দর্য্য

দূর হইতে সৌন্দর্য্যের নগ্নতা দেখিয়া তাহাকে অনেক সময় সম্পূর্ণ আয়ত্ত মনে হয়, কিন্তু সান্নিকট্যে তাহার মধ্যে সহস্র এমন রহস্য বিকশিত হইয়া উঠে যে, নগ্নতার লাবণ্যে হৃদয় হারাইয়া যায়। নগ্নতার চতুর্দ্দিকে একটা দীপ্ত লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই লাবণ্য-দীপ্তির মধ্যে সৌন্দর্য্যের আত্মা সন্নিবিষ্ট। নগ্ন প্রকৃতির হৃদয়ে ডুবিয়া দীর্ঘ জীবন-পথের কাতর কোলাহল আমরা যে বিস্মৃত হই, সে কেবলই এই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্য্যে। দূরদেশ হইতে নগ্নতার মধ্যে বিচরণ করিবার ক্ষেত্র আছে বলিয়া মনে হয় না, নয়নাতীত অতীন্দ্রিয় কিছু ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। তাহার সৌন্দর্য্যে বিচরণ করিবার যত অবসর পাইতে থাকি, সে অনির্ব্বচনীয় রহস্য-মাধুরীমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাই, অনন্তের মুক্ত সৌন্দর্য্য সেবনে আকুল হইয়া উঠি। জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে সেই শুভ্র বিমল জ্যোৎস্না-নগ্নতা তড়িৎকম্পনের মত স্পর্শ করিয়া যায়, চিরনবীন সৌন্দর্য্য-প্রবাহে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়। নগ্নতার সৌন্দর্য্যে প্রাণ সম্যক্ প্রস্ফুটিত।

নগ্নতা আর কাহাকে বলে? অলঙ্কারশূন্যতা বৈ ত নয়। সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যের আবরণে অবগুণ্ঠিত সর্ব্বত্রই। যেখানে কৃত্রিমতার আড়ম্বরে সৌন্দর্য্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেইখানেই নগ্নতা প্রচ্ছন্ন। চাক্‌চিক্যে সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, ব্যক্ত হইতে পারে না। শুভ্র চন্দ্রালোকে যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে সিন্দূরের আভা ফেলিলে কি সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হইবার সুবিধা পায়? এই জন্য প্রকৃতিতে নগ্নতা সৌন্দর্য্যময়ী। নগ্নতায় আত্মা পরিব্যাপ্ত। আচ্ছাদনে প্রাণের রহস্য উপভোগ করা যায় না, হৃদয় সৌন্দর্য্যে উথলিয়া উঠে না, কেবল একটা আনন্দবিহীন জড় দেহ জাগিয়া থাকে মাত্র। ম্লান অধরে অলক্তরাগ আপনাকেই ব্যক্ত করে, অধরের স্বাভাবিক সরল ভাষা মুছিয়া যায়; সুন্দরীর শুভ্র কপোলদেশে চূর্ণদ্রব্য তাহার সহজ লাবণ্য ঢাকিয়া ফেলে, সে নগ্ন-শ্রী অবসিত হয়। নগ্নতায় গভীরতা আছে, আনন্দ আছে, সেখানে শ্রী কলায় কলায়। অলঙ্কার-আবরণ চক্ষু আকর্ষণ করে; নগ্নতা হৃদয় টানিয়া আনে।

কালিদাসের শকুন্তলা সুন্দরী—কালিদাস তাহার মধ্যে কেমন একটা নগ্ন ভাব ফুটাইয়া দিয়াছেন। শকুন্তলা অলঙ্কারবিহীনা, নগ্ন প্রকৃতির সহিত সে যেন মিশিয়া আছে, প্রকৃতির শ্যামলতার সহিত তাহার যৌবন-লাবণ্য চিরসম্বদ্ধ। বল্কলবাসে যে শকুন্তলায় নগ্নতার সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে, তাহা নহে—ভাবেই শকুন্তলার মধ্যে নগ্নতা। শকুন্তলার মধ্যে এই নগ্ন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াই কালিদাস বলিয়াছেন, "দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ"। আমাদের বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলাও এই নগ্ন সৌন্দর্য্যে সুন্দরী। তাহার কোন প্রকার অবগুণ্ঠনের আবশ্যক হয় নাই, নগ্নতাতেই সে রহস্যময়ী। অরণ্যপালিতা কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে রাজা সীতারাম রায়ের অবগুণ্ঠনবতী ধর্ম্মপত্নী শ্রীকে এক বার দাঁড় করাইয়া দেখ, শ্রীমতী কে? শ্রী সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতে পারে, গাছে চড়িয়া সহজে স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারে, স্বামীকেও যে ভালবাসে না, এমন নহে; কিন্তু এত চাক্‌চিক্যেও শ্রী স্ত্রী কি পুরুষ, সহজে ঠাহরাইয়া উঠা যায় না, হাঁ করিয়া লোকের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, কে কি বলে।

নগ্নতার মধ্যে স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, এই জন্যই তাহার সৌন্দর্য্য কূলে কূলে। তাহার মধ্য হইতে নিংড়াইয়া রস বাহির করিবার চেষ্টা বিফল। নগ্ন জ্যোৎস্নাকে ছাঁকিয়া পরদার আড়ালে উপভোগ করা যায় না, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। নগ্ন সৌন্দর্য্য স্বপ্রকাশ। উষার সৌন্দর্য্য কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয়? শকুন্তলা, সূর্য্যমুখী, কুন্দ, কপালকুণ্ডলা, এ সকল চরিত্রের ব্যাখ্যা অসম্ভব। আর দেখ প্রফুল্লমুখী—ব্যাখ্যা না করিলে তাহার সৌন্দর্য্য কোথায়? প্রাচীন নিষ্কাম ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া

চৌধুরাণী স্বামীকে স্ত্রীর পদসেবায় নিযুক্ত করিলেন; দরবার, রাজত্ব, সকলই ভাগ্যে জুটাইয়াছিল, ভাবও নিষ্কাম, তথাপি সে চরিত্র তেমন ফুটিল না—যেন জাঁতায় পেষা। এই নিষ্কাম চরিত্রের পার্শ্বে অভাগিনী শৈবলিনীকে দেখ, নগ্ন সৌন্দর্য্যে তাহার মধ্যে স্বভাব কেমন বজায় আছে। নগ্নতায় সৌন্দর্য্য ফুটে অধিক। তাহার মর্ম্মে কি যেন "লাজহীনা পবিত্রতা" জাগিয়া আছে।

অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে কেন? কারণ আর কিছুই নহে—প্রাণ চাপা পড়ে বলিয়া। দেহ-জগতে সর্ব্বত্রই প্রাণ অন্তর্নিবিষ্ট; এই জন্য তাহার প্রত্যেক উত্থানপতনে হৃদয়ের উত্থানপতন অনুভব করা যায়। অলঙ্কারে দেহের মধ্যস্থ আত্মা চাপা পড়িয়া থাকে, উত্থান পতন দেখা যায় না, এই কারণে তাহাতে সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শেলীর Skylarkএ সৌন্দর্য্যের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির কারণ, নগ্ন আত্মার অভিব্যক্তি। শেলী দেহাবরণের প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গে আত্মা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। তিনি তাহার গতির মধ্যে কেবলই তাহার আত্মার আকুল গীতি শুনিয়াছেন; পক্ষী স্বর্গের দুয়ার হইতে যতই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে, শেলী তাহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যান, সমস্ত জীবন সৌন্দর্য্যপ্লাবিত হইয়া উঠে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylarkএ নগ্ন আত্মার এমন বিকাশ হয় নাই, সেই জন্য তাঁহার পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে হৃদয় সেইরূপ আকুল করে না। শেলীর বিহঙ্গ-কণ্ঠ সৌন্দর্য্যস্নাত, সে স্বরলহরীর মধ্যে জগতের ব্যবধান নাই, সে সৌন্দর্য্য অনাবৃত, সৌন্দর্য্যাচ্ছন্ন।

অবগুণ্ঠনে যে সৌন্দর্য্য নাই, আমরা এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সম্যক্ অভিব্যক্তি নগ্নতায়। যে ভাব ভালরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাকে অলঙ্কার-আবরণে আচ্ছাদিত করিলে তাহার বিকাশ হয় না। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের শোভা কি কখনও ব্যক্ত হয়? নগ্ন সৌন্দর্য্য হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রতিসৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে। রূপ ব্যক্ত করিতে হইলে লেপ মুড়ি চলে না, গুণ ব্যক্ত করিতে হইলে জগতে বাহির হইতে হইবে। অভিব্যক্তি নহিলে সৌন্দর্য্য ব্যর্থ।

একটা কথা উঠিতে পারে, অভিব্যক্তিতে রহস্য থাকে কিরূপে? নগ্নতা যদি রহস্যময়ী হয়, তবে তাহাতে অভিব্যক্তি হইবার সুবিধা কোথায়? কিন্তু প্রকৃতিতে কি দেখা যায়? কোমল কুসুমকলিকা বৃক্ষের সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাসে পূর্ণহৃদয় হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাহাতে কি রহস্য নাই? রহস্য অভিব্যক্তির হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র কলিকার মধ্যে পূর্ণযৌবনের সৌন্দর্য্য সন্নিবিষ্ট ছিল, ইহাতেই তাহার রহস্য। কলিকা যদি না ফুটিত, কুসুমরূপে ব্যক্ত না হইত, তাহা হইলেই সে সৌন্দর্য্য ব্যর্থ। বিকাশের মধ্যে অতীতের সহিত ভবিষ্যতের মায়াবন্ধন। এই বন্ধনসূত্রে ভাবের প্রণয় আবদ্ধ।

অভিব্যক্তির মধ্যে রহস্যের অবস্থিতির স্বতন্ত্র প্রমাণ আবশ্যক করে না—এই বিচিত্র বিশাল সৃষ্টিই তাহার যথেষ্ট পরিচয়। সৃষ্টির রহস্যই ত তাহার বিকাশে। দেশশূন্য কালশূন্য মহা-অন্ধকারের অন্তঃপুর হইতে এত বড় সামঞ্জস্যময় রহস্য-সৌন্দর্য্যের দীপ্ত উদ্ভাসন! অভিব্যক্তিতে রহস্য ব্যক্ত হইয়া শত রহস্য খুলিয়া দেয়, যেখানে রহস্য ছিল না, সেখানেও রহস্য বাহির হয়; অকূল রহস্যপাথারে দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্যের নগ্ন বৈচিত্র্যে মানব-হৃদয় হারাইয়া যায়। নগ্নতা রহস্যের প্রতিবন্ধক ত নহে, তাহাতেই সৌন্দর্য্যের সম্যক্ অভিব্যক্তি। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যাচ্ছন্ন, তাহার আর কোন আবরণ নাই।

সৌন্দর্য্যের কবিদিগের রচনা আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা নগ্নতার মধ্যেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ অনুভব করিয়াছেন। বাহ্য প্রকৃতিই কি, আর মন-প্রকৃতিই কি, সর্ব্বত্রই নগ্নতার সৌন্দর্য্য। হৃদয়ের উপর একটা কুটিল সন্দেহাবরণ টানিয়া দাও, তাহার সুকুমার সরল ভাব চাপা পড়িয়া যাইবে, হৃদয় বিকশিত হইতে পারিবে না। সৌন্দর্য্য সহজ ভাবেই সুব্যক্ত, তাহার উপর রঙ ফলাইয়া উজ্জ্বল করা যায় না। নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে তাহাতে ডুবিতে হইবে। কবিরা সৌন্দর্য্যের হৃদয়ে প্রবেশ করেন বলিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকেন। আপনাকে দিয়া তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করেন না, সৌন্দর্য্যের অন্তঃপুরে সৌন্দর্য্য-নিমগ্ন হইয়াই তাঁহাদের সুগভীর অতৃপ্ত তৃপ্তি।

নগ্নতায় প্রত্যেক সৌন্দর্য্য অপর সৌন্দর্য্য-ব্যক্ত। রঙ বিশেষের পর অন্য রঙ, ছায়ার পর যথাস্থানে আলোক, ছায়ালোকের তারতম্য, সমস্ত মিলিয়া একটা প্রভাব বিস্তার করে। অথচ, সকল ভাব সম্পূর্ণ খেলিবার জমি পায়, সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয় না। এই জন্যই নগ্নতায় এমন সৌম্য গাম্ভীর্য্য। সকল ভাবের সর্ব্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তির মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য—কি গভীর রহস্য! নগ্নতায় সৌন্দর্য্যের কনক-মিলন। নগ্নতা পূর্ণ-সুন্দরী।

'ভারতী ও বালক', পৌষ ১২৯৬

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর

এইবারে আমরা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের এক সমস্যাক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—আমাদের আলোচ্য বিষয় বিদ্যাসুন্দর। বঙ্গীয় পাঠকের নিকট বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাহাকে সরস কাব্য বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের কথা সকলে জানেন না, ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতেই তাহার যাহা কিছু সুনাম বা দুর্ণাম রটিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের নামের সহিত সাধারণের মনে এমন একটা বিশেষ সংস্কার জন্মাইয়া গিয়াছে যে, ইহার সহিত রামপ্রসাদ সেনের কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে, লোকে সহজে বিশ্বাস করিবে না। একদল লোক রামপ্রসাদের নাম শুনিয়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সহস্র নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য বাহির করিতে বসিবেন, বিদ্যার মধ্যে গৌরী এবং সুন্দরের মধ্যে মহাদেবের প্রেতাত্মা অনুভব করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন ; আর একদল বিদ্যাসুন্দর শুনিয়া রামপ্রসাদের ভক্তির গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে থাকিবেন, এবং সুবিধামত সঙ্গীতরচয়িতা রামপ্রসাদকে বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা রামপ্রসাদ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন। বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতাই যে বিদ্যাসুন্দররচয়িতা রামপ্রসাদ, সে বিষয়ে অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই, বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের মধ্যে রামপ্রসাদের আত্মপরিচয় দানেই তাহা জানা যায়। তবে তাঁহার গ্রন্থের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কোনও প্রমাণ পাই না। যত দূর বুঝিতে পারি, বক্রগতি বুদ্ধিমানেরা স্বীয় অসাধারণ মেধার প্রভাবে রামপ্রসাদের ছদ্মবেশে জটিল তত্ত্বসমূহ বাহির করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন বলিয়াই বোধ হয়। এরূপভাবে পার্থিবতার শত আবরণ দিয়া দুরূহ কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যার দুয়ারে একটা আধ্যাত্মিকতাকে খাড়া করিয়া রাখিবার ত কোন কারণ দেখা যায় না। তাহাতে ত ফল মন্দ বৈ ভাল হয় না।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরেরই মত আদিরসের কাব্য ; তাহাতে চঞ্চলচিত্ততা আছে, রূপতৃষ্ণা আছে, হীরা মালিনী আছে, গুপ্ত প্রণয় আছে,—সে প্রণয়ও সম্পূর্ণ রূপজ ; সুড়ঙ্গ, সখী, চোর, কোটাল, কিছুই বাদ যায় নাই, যদি কিছু বাদ গিয়া থাকে ত তাহা ভারতচন্দ্রেও বাদ গিয়াছে—তাহা ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা। ভাবের গভীরতা, সুগভীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান, প্রেমের মহান্ উচ্চ আদর্শ, এ সকল রামপ্রসাদের গ্রন্থে নাই। নানা ভাষার কথায় বিবিধ ছন্দে বিস্তর অনুপ্রাস দিয়া তিনি বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রাপেক্ষা তাঁহার ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ হইয়াছে মাত্র। নহিলে, তাঁহার বিদ্যা ভারতের বিদ্যাপেক্ষা বিশেষ কম বিলাসিনী নহে, তাঁহার সুন্দরও সেই হাল্কাস্বভাব বিলাসী বাবুচরিত্র, সমস্ত কাব্যের মধ্যে গম্ভীর চরিত্রের একেবারেই অভাব। আদিরসের কাব্য বলিয়াই যে বিদ্যাসুন্দর হাল্কামিপূর্ণ, তাহা নহে। প্রাচীন সংস্কৃত অনেক কাব্যই আদিরসপূর্ণ, অথচ গম্ভীর। রচয়িতার মধ্যে সমধিক গাম্ভীর্য্যের অভাবেই বিদ্যাসুন্দর অতি হাল্কা হইয়াছে। আর রামপ্রসাদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে সময়ে বিলাসিতাই ত

সমাজের অস্থিমজ্জা। কিন্তু রামপ্রসাদের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে একটি কথা বলা যায়, সেগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। সহস্র সখীপরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরের রুদ্ধ কবাটের মধ্যে নিশিদিন বসিয়া থাকিলে চরিত্রের দৃঢ়তা হয় কিরূপে? দুই-চারিখানা পুঁথির সাহায্যেও আর নিমেষের মধ্যে চরিত্র গঠন করা যায় না। বিদ্যার জীবন সহচরীবৃন্দের উপহাস-রসিকতার মধ্যেই গঠিত, ভোগবিলাসেই তাহার জীবনের প্রতিষ্ঠা, স্থতরাং স্বভাবতই সে বিলাসিনী। সদ্দৃষ্টান্ত ও রীতিমত ধর্ম্মশিক্ষার তাহার যথেষ্ট অভাব ছিল, আত্মসংযম এই কারণে তাহার পক্ষে অসম্ভব।

তবে বিদ্যার ধনুকভাঙ্গা পণের অর্থ কি? যাহার আত্মসংযম যথেষ্ট নাই, সে কিরূপে প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহাকে বিচারে পরাজয় করিতে না পারিলে কাহাকেও বিবাহ করিবে না? প্রতিজ্ঞাটা আসলে হইয়াছিল খেয়ালের মাথায়। স্থন্দরের পাল্লায় পড়িয়া তাহা টিঁকিল না। স্থন্দর মালাগাঁথায় নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া বিদ্যাকে আকর্ষণ করেন। তাহার পর হীরা মালিনীর সাহায্যে বিদ্যার স্থন্দরদর্শনলাভ হয়। আর কি বিদ্যা স্থির থাকিতে পারে? স্থন্দরের জন্য বিদ্যা অধীরা হইয়া উঠিল। রামপ্রসাদ অধীরা বিদ্যার মুখে একটা আইনবদ্ধ সানুপ্রাস রূপবর্ণনা বসাইয়া দিয়াছেন —তাহাতে ভাব যত থাক্ না-থাক্, বিদ্যাপ্রকাশচেষ্টা যথেষ্ট আছে। তাহার অর্থ বোধ হইতে খানিকটা সময় যায়। তবে যাহারা ভালরূপ অক্ষর চিনে না, সারি সারি কতকগুলা এক অক্ষর দেখিয়া তাহাদের কতকটা বর্ণপরিচয় হইতে পারে। কিন্তু রামপ্রসাদের স্থন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে যে কালীস্তুতি আছে, তাহাতে বর্ণপরিচয়ের আরও অধিক স্থবিধা। বিদ্যার অধীরতাব্যঞ্জক কবিতাগুলিতে আদবেই যেন জোর নাই, বসিয়া বসিয়া শান্ত মনে সে যেন অনুপ্রাসালঙ্কার বুঝাইয়াছে। ভাবের কবিতার সহিত টানাবোনা। কবিতার প্রভেদ কত দূর, অনুপ্রাসাচ্ছন্ন রামপ্রসাদকে দেখিলেই বুঝা যায়।

পাঠকেরা মনে করিতে পারেন যে, অনুপ্রাসাধিক্য দেখিয়াই রামপ্রসাদকে আমরা টানাবোনা ভাবের কবি ঠাহরাইয়াছি, অনুপ্রাস হইলেই যে সরল ভাব মাটি হয়, এমন ত কথা নাই। এরূপ মনে হওয়া সহজ বটে। সেই জন্য আমরা কেবল গুটিকতক পংক্তি মাত্র উঠাইয়া দি, পাঠকেরা নিজেই বিচার করিয়া দেখুন, আমাদের কথা সত্য কি না। বিদ্যা, স্থন্দর দর্শনে সখীকে বলিতেছে,

"তনু তনু চিন্তায় কেমনে জ্বালা সই।
জীবন জীবন মধ্যে ত্যজি মেনে সই॥"

জীবন অর্থে যে জল বুঝায়, সহসা কোন্ পাঠকের তাহা মনে আসে? এ স্থলে যে

রামপ্রসাদ অনুপ্রাস দিবার জন্যই কথা আমদানি করিয়াছেন, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? আর ইহা ত শুধু একটি উদাহরণ মাত্র। সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি সমস্তটাই এইরূপ। তাহা ছাড়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে অন্যত্রও উদাহরণের অভাব নাই।

সুন্দরকে দেখিয়া বিদ্যা যেমন অধীরা, সুন্দরও বিদ্যাকে দেখিয়া সেইরূপ মুগ্ধ। রামপ্রসাদের সুন্দর অনেকটা স্ত্রীপ্রকৃতির লোক। সুন্দর মালা গাঁথিতে, মালিনী মাসীর সহিত গল্প করিতে, আর বিদ্যার হস্তে কলের পুতুলের মত সারাক্ষণ নাচিতেই পারেন। পুরুষোচিত দৃঢ়তা সুন্দরে নাই। স্ত্রীজাতির মত বেশবিন্যাস করিতেই সুন্দর পটু অধিক। বিদ্যাকে দেখিয়া অবধি সুন্দর তাঁহার পুনর্দর্শনের জন্য লালায়িত। সুবিধা করিয়া একদিন সুন্দর বিদ্যার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আর সুন্দর রাজপুত্র নহেন—সুন্দর চোর। বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিচার হইল। এবারে পরাজয় বিদ্যার। এ অবস্থায় পরাজয় স্বীকার না করিলে ত সব মাটি হইয়া যায়। সুন্দরের বদনকমল দেখিয়া অবধিই ত বিদ্যা হারিয়া আছে, আজ কেবল প্রতিজ্ঞারক্ষা। বিদ্যার পরাজয়ের পরেই উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। গান্ধর্ব্ব বিধি, বলাই বাহুল্য। পঙ্গপাল সহচরী উপস্থিত ছিল—হুলুধ্বনি জমিয়াছিল ভাল। কিন্তু হুলুধ্বনির মত রামপ্রসাদের কবিত্ব জমে নাই। রামপ্রসাদের এইখানকার বর্ণনাগুলি অতি পার্থিব, নিতান্তই অনাধ্যাত্মিক, যাহাকে অশ্লীল বলে—তাহাই, কেবল তৎকালীন সমাজের রুচির জন্যই টিঁকিয়া গিয়াছে। সে কালের রুচি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামপ্রসাদের এ সম্বন্ধীয় কবিতা নিতান্তই বস্তুগত, তাহাতে সংসারের কোন পদার্থই বাদ পড়ে নাই। সুন্দর বর্দ্ধমান প্রবেশ করিলে রামপ্রসাদ বর্দ্ধমানের প্রত্যেক দোকানের বর্ণনা করিয়া গেলেন, সেখানে কি কি পাওয়া যায় না-যায়, সব লিখিয়া ফেলিলেন। বর্দ্ধমানে কয়জাতীয় সৈন্য আছে, কত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, দেবালয় আছে, এ সকল বিষয়ে রামপ্রসাদ যথাসম্ভব খোঁজ রাখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে কবিকঙ্কণকে মনে পড়ে। উভয়েরই বর্ণনা এক ধরণের কি না। তবে কবিকঙ্কণের লেখায় রামপ্রসাদের অপেক্ষা প্রাণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ শতগুণে স্বাভাবিক। রামপ্রসাদ সরোবর বর্ণনা করিয়াছেন—স্ফটিকনির্ম্মিত ঘাট, নির্ম্মল জল, তীরে নানাজাতীয় বৃক্ষমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, সারস-নর্ত্তন, বাঙ্গলাদেশের যাবতীয় বিহঙ্গকূজন; কিন্তু ভাবের অভাবে তাঁহার সরোবর মন প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

যাহা হোক্, এখন এ সকল কথা থাক্। রাণীর সহিত বিদ্যার ঝগড়া বাধিয়াছে,

সে চীৎকারে অন্য কথা শুনা যায় না। বিদ্যার সহিত সুন্দরের মিলনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাই মায়ে ঝিয়ে কথাকাটাকাটি। উভয় তরফই গলাবাজি-বিদ্যায় দক্ষা। কেহই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী নহেন। গলাবাজিতে কিন্তু বিদ্যার বিদ্যা প্রকাশ পায় নাই। সে সময়ে স্বাভাবিক সম্মার্জিত তারকণ্ঠ ভাষাই তাহার সম্বল। সখীদের উপরেও রাণীর বাক্যবাণ বর্ষণ ফাঁক গেল না, তাহারাও সুবিধামত দুই চারি কথা শুনাইয়া দিল। রাজা বীরসিংহের প্রাচীরবদ্ধ জেনানা—সখী, রাণী এবং বিদ্যার কণ্ঠধ্বনিতে উদ্বেল হইয়া উঠিল; ক্রমে মহারাজা বীরসিংহের আসন পর্য্যন্ত টলিল। কোটালের ডাক পড়িল, কোটালিনী অন্তঃপুরে রাণীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে বাহির হইল। প্রহরীর গুঁতায়, সিপাহীর অত্যাচারে সহরে লোক আর টিঁকে না বুঝি। রামপ্রসাদ কোটালকে সুবিধামত পাইয়া অনর্গল হিন্দী বুলি আওড়াইয়া দিলেন। একটা খুব হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বর্দ্ধমান সরগরম।

কোটাল একবার বিদু ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়া সকল কথা বলিল। বিদু আশ্বাস দিল অনেক, কিন্তু চোরের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন কোটাল মাধাই ভায়ার শরণাপন্ন হইল। মাধাই রাজকন্যার সমস্ত গৃহ সিন্দুর মাখাইয়া রাখিতে পরামর্শ দিল। কোটাল তাহাই করিল। সুন্দর বিদ্যার গৃহে আসিতে তাঁহার বসন ভূষণ সিন্দুররঞ্জিত হইয়া গেল। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সুন্দর হীরার দ্বারা কাপড়গুলি রজকালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। নিকটেই কোটালের চর লুকাইয়াছিল, সে রজককে ধরিয়া ফেলিল। ক্রমে খোঁজ করিতে করিতে চোর বাহির হইয়া পড়িল—সুন্দর। চোর বাহির হইল বটে, কিন্তু কোটাল যে নাকাল হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া, বিদ্যার গৃহে গিয়া কিছুতেই চোরকে পাওয়া যায় না। অবশেষে খন্দকলজ্ঘনে দক্ষিণ পদ এড়াইয়া সুন্দর ধরা পড়ে। কোটাল সুন্দরকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। বিদ্যা কাঁদিয়া আকুল—সুন্দরের দশা কি হইবে! কোটালকে অনেক করিয়া বিদ্যা অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, ফল হইল না। চোরকে দেখিয়া রাণীও বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন চেহারা কি কখনও চোরের হয়? নাগরিকেরাও চোরকে দেখিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। কিন্তু কোটাল ছাড়িবার পাত্র নহে। এত দিন সব বেশ নির্গোল ছিল, এই ব্যক্তি আসিয়াই ত চতুর্দ্দিক্ তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। ইহাকে ছাড়িয়া দিবে? সে আজ নহে—একেবারে শেষ দিনে।

কোটাল সুন্দরকে রাজসভায় হাজির করিল। চোর সেখানে ব্যঙ্গ পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। রাজারও সুন্দরকে পীড়ন করিতে ইচ্ছা নাই, তিনি কেবল মুখে হুকুম দিলেন যে, সুন্দরকে মশানে লইয়া যাও। কালীর কৃপায় সুন্দর মশানে বাঁচিয়া গেলেন।

তখন ভূপতি বিনয়পূর্ব্বক সুন্দরকে জামাতা বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। কিছু দিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া বিদ্যা সহ সুন্দর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সুন্দর রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎকাল প্রজাপালন করিয়া পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিলেন। তাহার পর বিদ্যাসুন্দর স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের গল্পাংশ এই। গল্পটি মন্দ নহে, তেমন যদি চরিত্রবিকাশ হইত, তাহা হইলে কাব্যখানি উচ্চদরের গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইত সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদ সে দিকে বড় লক্ষ্যই করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি প্রধানতঃ অনুপ্রাসের দিকে। গল্পের মধ্যেও মজা করিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত। চারি দিকে সামঞ্জস্য করিয়া একটা কিছু করা তাঁহার পোষায় নাই। সে সময়ের লোকের রুচির দিকে তাকাইয়া, আর সেই সঙ্গে কতকটা পাণ্ডিত্য মিশাইয়া তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন। এ রচনার মধ্যে প্রতিভার দুর্দ্দমনীয় বিকাশ লক্ষিত হয় না। নিতান্তই যেন কোন্ প্রাচীনা দিদিমার গল্প চলিয়া আসিতেছে। এ রচনা রক্তমাংসের দেহ মাত্র, ইহার মধ্যে প্রাণ নিশ্বসিত হয় নাই।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর তেমন উচ্চ অঙ্গের কাব্য হয় নাই কেন, তাহার কতকগুলি কারণ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশেই তিনি বিদ্যাসুন্দর লিখিতে বসেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রেমকাহিনীতে তাঁহার হৃদয় স্বতঃ উদ্দীপিত হয় নাই। সুতরাং ফরমাসে কাব্যের মধ্যে যেরূপ আশা করা যায়, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে তাহাপেক্ষা অধিক কবিত্ব থাকিবে কেন? তাহা ভিন্ন রামপ্রসাদের কথার দিকে যত দৃষ্টি, ভাবের দিকে তত নহে। ভাব স্বাভাবিক। তাহার ত আর ফরমাস চলে না। রামপ্রসাদের মধ্যে ভাব ছিল না, বাঁধা আইনানুসারে তিনি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে কাব্যাংশে বিদ্যাসুন্দর তেমন জমাইতে পারে নাই।

বিদ্যাসুন্দরের আধ্যাত্মিকতার দুইটি কারণ আছে—সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শবসাধন। এই দুইটি ঘটনা হইতে অনেকে বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কত দূর কি বলা যায় সন্দেহ। চিরজীবন প্রবৃত্তির পদসেবা করিয়া অনেক ধনিসন্তান শেষ দশায় দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাহাতে কি তাঁহাদের জীবনকে কেহ বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক বলে? রামপ্রসাদের গ্রন্থে ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পতন, ইহাও কোথাও দেখান হইয়াছে বোধ হয় না। তাহার আগাগোড়াই ভোগবিলাসের উপাখ্যান—তাহাও যত দূর সম্ভব পার্থিব দেহবদ্ধ, কেবল দুএকটা মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা হইতে কিরূপে বলা যায় যে, বিদ্যাসুন্দরের

অন্তঃপুরে গভীর ধর্ম্মতত্ত্বসকল নিহিত আছে, বিদ্যাসুন্দরের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক? তাহা হইলে সংসারে সকলই আধ্যাত্মিক—আধ্যাত্মিকতার বিশেষ সার্থকতা থাকে না।

কষ্টকল্পনা করিয়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্য হইতে আমাদের আধ্যাত্মিকতা বাহির করিবার আবশ্যক নাই। আমরা বিদ্যাসুন্দর পাঠে বঙ্গদেশের সে সময়ের সমাজের অবস্থা বুঝিতে পারি, তাহাই যথেষ্ট। সে সময়ের সাহিত্য হিসাবেই বিদ্যাসুন্দরের যাহা কিছু মূল্য। ইহার উপাখ্যান লইয়া বর্ত্তমান কালের কোন কবি সুন্দর কাব্য রচনা করিতে পারেন। সে সমাজে অশ্লীল রুচির জন্যই বিদ্যাসুন্দরে যাহা কিছু রুচিবিরুদ্ধ ভাব। নহিলে, তাহার মূল উপাখ্যানভাগ নিতান্তই বর্ত্তমানের রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

'ভারতী ও বালক', পৌষ ১২৯৬

ভারতচন্দ্র রায়

ভারতচন্দ্র রায় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শেষ কবি। তাঁহার পরে যে বাঙ্গলা ভাষায় কেহ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই, এমন নহে; কিন্তু পরবর্ত্তী প্রাচীন লেখকদিগের কাহারও কপালে সেরূপ খ্যাতিলাভ ঘটে নাই। খ্যাতিলাভের মূলে ক্ষমতা আবশ্যক। তাঁহাদের সকলের বোধ করি তেমন ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং ভারতচন্দ্রকে ছাড়াইয়া উঠা সম্ভব হয় কিরূপে? ভারত অশ্লীলই হোন্ বা যাহাই হোন্, তাঁহার রচনাচাতুর্য্য সম্বন্ধে বড মতভেদ দৃষ্ট হয় না; এবং সম্ভবতঃ এই রচনাকৌশলেই তিনি বঙ্গসন্তানের নিকট অল্প দিন মধ্যে বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র রায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন—সে সময়ের বঙ্গদেশে তিনি রাজকবি। সমসাময়িকদিগের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত থাকিতেন —স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, দার্শনিক—কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত কবির সে সভায় একেবারেই অভাব। সে সময়ের সাহিত্যে এক নাম দেখিতে পাওয়া যায় রামপ্রসাদের, কিন্তু রামপ্রসাদও কাব্যে তেমন জমাইতে পারেন নাই, তাঁহার আশা ভরসা সঙ্গীতে। ভারতচন্দ্রের ছন্দের পারিপাট্য, পরিহাস-রসিকতা, গল্প সাজাইবার ক্ষমতা, এই সকলে সহজেই মন আকৃষ্ট হয়। এমন কি, সাজসজ্জার প্রভাবে সময় সময় দোষগুলিকে সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক্ করা দায় হইয়া উঠে। বাস্তবিক, কথার কারিগরিতে ভারতচন্দ্রকে আঁটিয়া উঠিতে পারে কয় জন?

ভারতচন্দ্রের সময়ে কথার উপর অনেক কবিরই দৃষ্টি ছিল। তাঁহার সমসাময়িক

রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যেখান হইতে পারিয়াছেন, কথা সংগ্রহ করিয়া আনিতে ভুলেন নাই। কথার জন্য কত স্থলে অর্থবোধ দুঃসাধ্য, তথাপি কথা চাই। ভারতচন্দ্রেরও কথার প্রতি একটু বিশেষ টান দেখা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার কথা সাজাইবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার মধ্যে যে ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তিনি ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারেন। তবে ভাবের অপেক্ষা কথার ভাণ্ডার তাঁহার পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতির অন্তরে ডুবিয়া তাহার আনন্দ উপভোগ করিবার কবি ভারতচন্দ্র নহেন। তিনি ঘরকন্নার বর্ণনা করিতে পারেন, তাকিয়া তামাকের রসাস্বাদন করিতে পারেন, প্রাণ অপেক্ষা দেহকেই বুঝেন ভাল। মুকুন্দরামকে দারিদ্র্যের কবি বলিলে ভারতচন্দ্রকে বড়মানুষীর কবি বলা যায়। মুকুন্দরাম কি রাজা সদাগর লইয়া কারবার করেন নাই? তবে তাঁহাকে দারিদ্র্যের কবি বলা যায় কিরূপে? তাঁহার সুর দেখিয়া। দারিদ্র্য বর্ণনা করিলে কিম্বা বিলাসের চিত্র আঁকিলেই যে কবি ধরা পড়েন তাহা নহে, সেই বর্ণনার মধ্যে অন্তর্লীন সুরেই কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের সুরে বিলাসের মন্দিরের ছায়া—তিনি যাহাই বর্ণনা করুন না কেন, তাঁহার প্রাণ ধরা পড়িবে।

ভারতচন্দ্রের প্রধান গ্রন্থ অন্নদামঙ্গল। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর স্বতন্ত্র কাব্য নহে—অন্নদামঙ্গলের মধ্যে একটি দীর্ঘ উপাখ্যান মাত্র। অন্নদামঙ্গলে হরগৌরীর কথা আছে, ভবানন্দ, মানসিংহ, প্রতাপাদিত্য, জাহাঙ্গীর, অনেকেই আছেন, আর গ্রন্থারম্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনে রাজবাটীর টিক্‌টিকিটি অবধি বাদ পড়ে নাই। আর শ্লেষ, অনুপ্রাস, রসিকতা ভারতচন্দ্রের হাড়ে হাড়ে—অন্নদামঙ্গলে তাহা যথেষ্ট। প্রাচীন রীতি অনুসারে ভারতচন্দ্র গণেশ, শিব, বিষ্ণু, কৌষিকী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেব-দেবীগণকে বন্দনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর গ্রন্থসূচনায় কৃষ্ণচন্দ্রের কথা পাড়িয়া তাঁহার সভা বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। সভাবর্ণনার আরম্ভেই শ্লেষ প্রয়োগ। তাহাতে ভারতচন্দ্রের কথার চাতুরী বেশ বুঝা যায়। আকাশের চন্দ্রের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন। এই তুলনার মধ্যে ভারতের রসিকতা-প্রয়াসও লক্ষিত হয়। রাজসভায় হাস্যরসাবতারণার জন্য তিনি যতটুকু পারিয়াছেন, রঙ্গরস করিয়া লইতে ছাড়েন নাই। ভারতের প্রকৃতিই রঙ্গরস। আমরা সভাবর্ণন হইতে শ্লেষাংশটুকু উঠাইয়া দি, পাঠকেরা তাহার মধ্যে ভারতের কারিগরি দেখিয়া লউন।

"চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥

পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে ॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল
কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল ॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ॥”

শ্লোকগুলির শ্লেষ কোথায়, ব্যাখ্যা করিতে হইবে না ; কেবল পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুই গৃহিণী। তাই তাঁহার দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।

সভাবর্ণনের শেষে ভারতচন্দ্র নিজের স্বপ্নবিবরণ কহিয়াছেন—অন্নপূর্ণা মাতৃবেশে ভারতকে অন্নদামঙ্গল রচনা করিতে আদেশ দিলেন। সত্যই যে ভারত এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। সে কালে গ্রন্থারম্ভে স্বপ্নবিবরণ একটা ফেসান ছিল। দেবানুগ্রহ-প্রসূত শুনিলে সাধারণ লোকে সে গ্রন্থকে সহজেই সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিত, সেই জন্যই বোধ করি কবিরা স্বপ্ন আবশ্যক ঠাহরাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে স্বপ্নাদেশ ফেসান হইয়া দাঁড়ায়। ভারতচন্দ্র তাই নিজে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, এবং রায়গুণাকর উপাধির জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকেও স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। এত স্বপ্নকাণ্ডের পরে গুণাকরের গীতারম্ভ।

দক্ষ মুনি শিবের শ্বশুর, খুব ঘটা করিয়া এক যজ্ঞ করিয়াছেন—নরলোকে দেবলোকে নিমন্ত্রণ করিতে আর কাহাকেও বাকি রাখেন নাই। কিন্তু এই মহাযজ্ঞে স্বীয় জামাতাকে তিনি আহ্বান করিলেন না। জামাতা সুতরাং অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে যাইতে পারেন না। এ দিকে দক্ষকন্যা সতী পিত্রালয়ে যাইবার জন্য স্বামীকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। মহাদেব সতীকে সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, বিনা নিমন্ত্রণে গিয়া অপমানিত হইবার প্রয়োজন নাই। স্ত্রীবুদ্ধি কিছুতেই বুঝে না। সতী বলেন, কন্যা পিত্রালয়ে যাইবে, তাহার আবার নিমন্ত্রণ কি? মহাদেব তথাপি অনুমতি দিলেন না। তখন সতী নানা মূর্ত্তি ধরিয়া মায়াপ্রভাবে মহাদেবকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে মহাদেবের অনুমতি বাহির হইল। সতী পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে দক্ষ শিবনিন্দা করিতেছেন। পতিনিন্দা সহিতে না পারিয়া সতী পিতাকে অভিশাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভারতচন্দ্র রায় দক্ষমুখে শিবনিন্দাছলে শিবের স্তুতি করিয়া লইলেন।

সতীর তনুত্যাগে নন্দী মহা ক্রুদ্ধ হইল। কালবিলম্ব না করিয়া কৈলাসে গিয়া

কৃত্তিবাসের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিল। মহাদেব—ভূত প্রেত দলবল সহ দক্ষালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষালয়ে ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গেল—কেবলই ভূতের নৃত্য, পিশাচের কোলাহল, ডাকিনী যোগিনী শাখিনী পেতিনীর ভীষণ হুহুঙ্কার, আর "সতী দে সতী দে সতী দে"। ভারতচন্দ্র এই এক লাইনে সে সময়ে মহাদেবের মনের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। সমস্ত ভূত প্রেত পিশাচের কণ্ঠ হইতে কেবল এক "সতী দে সতী দে" ধ্বনি—আর কেহ কিছু চাহে না, আর কেহ কিছু বুঝে না, কেহ কিছু শুনিতে চাহেও না, কেবলই দে সতী, দে সতী। দক্ষের মুখে কথা সরে না, দেবতা ব্রাহ্মণেরা সকলেই অবাক্, কোথায় পুণ্য গম্ভীর যজ্ঞভূমি, আর কোথায় পৈশাচিক শ্মশানদৃশ্য! শিবের অনুচরেরা দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া ক্ষান্ত হইল। প্রস্তুতিস্তবে প্রসন্ন হইয়া শিব দক্ষকে বাঁচাইয়া দিলেন, কিন্তু নরমুণ্ডের পরিবর্ত্তে দক্ষের স্কন্ধে ছাগমুণ্ড বসিল। শিব তখন সতীদেহ-স্কন্ধে দেশে দেশে তাঁহার গুণগান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চক্রধর বিপদ্ বুঝিয়া চক্রধারে সতীদেহ খান খান কাটিয়া দিলেন। যেখানে যেখানে সে অঙ্গ পড়িল, সেই সেই স্থানেই এক একটি মহাপীঠ।

অনেক পাঠক হয় ত এই সকল অমানুষিক ঘটনা দেখিয়া ভারতচন্দ্রকে কবি-জগৎ হইতে দূর করিয়া দিতে চাহিবেন, কিন্তু এ সকল পৌরাণিক ব্যাপারের জন্য ভারতচন্দ্র দোষী নহেন। প্রাচীন বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া ভারতচন্দ্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার কবিত্ব কিরূপ খুলিয়াছে, তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান কালের কবিদিগের মত ভাবের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ভারতের ছিল না। বড় বড় আদর্শ সৃষ্টি করিতেও তিনি অক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার কোন গুণই ছিল না? তাঁহার কাব্যে তিনি সাময়িক সমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা হইতে সে সময়ের সামাজিক অবস্থা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র সেই সমাজেরই কবি—সাধারণের ভাবের অধিক উর্দ্ধে তিনি উঠেন নাই, তাই সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। সে সমাজের উর্দ্ধে উঠিলে সমাদরের জন্য হয় ত কতক দিন অপেক্ষা করিতে হইত। ভারত মুকুন্দরামের মত যাহা দেখিয়াছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কালিদাসের মত দুই চরণে সমগ্র ভাব ব্যক্ত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখি, মুকুন্দরামকে যেমন বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়, ভারতকে তেমন হয় না। মুকুন্দরামের মধ্যে মধ্যে কুঁকুড়া জবাই শুনা যায়, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে মুসলমানী পরিচ্ছদে দেখা যায় না। ভারত যেন কতকটা সে কালের বড়লোকের মত—তাঁহার উপরে মুসলমানত্বের ক্ষীণ প্রভাব অনুভব হয়।

এখন একবার শিবের অবস্থা কিরূপ দেখিতে হইবে। শিবের আবার বিবাহ।

নারদ ঘটক জুটিয়াছেন, কন্যার অভাব কি? কন্যা নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা। মহামায়া শিবের জন্য হিমালয়ের আলয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নারদ দুই জনকে মিলাইয়া দিবেন। বীণা কাঁধে ফেলিয়া নারদ একদিন হিমালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উমা সহচরীদিগের সহিত খেলা করিতেছেন—হরগৌরীর বিবাহ। সারি সারি মাটির পুতুল দাঁড়াইয়াছে—খেলার খুব ধুম। নারদ ত এই সকল ব্যাপার দেখিয়া উমাকে এক প্রণাম ঠুকিয়া বসিলেন। উমা বলিলেন, ব্রাহ্মণ হইয়া প্রণাম কেমন ধারা! নারদ গৌরীকে একটু ঠাট্টা করিয়া বুড়া বর জুটাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। গৌরী বিবাহের কথায় ছলে লজ্জা পাইয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া পলাইলেন, এবং নারদের নামে নালিস রুজু করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মেনকা তাড়াতাড়ি আসিয়া মুনির পাদবন্দনা করিয়া বসাইলেন। হিমালয়ও হাজির। বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

ভারতের এইখানকার বর্ণনাগুলি বেশ স্বাভাবিক। হরগৌরীকে অলৌকিক ঘটনা-সমূহ দ্বারা ঘিরিয়া রাখিলেও ভারতচন্দ্র তাঁহাদিগকে মানবধর্ম্মের অতীত মনে করেন না। বঙ্গসন্তানের নিকট সে জন্য অন্নদামঙ্গল বোধ করি কতকটা সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র মজা করিতে গিয়া শিবকে নিতান্তই অশিব করিয়া তুলিয়াছেন। শিব ধ্যানে মগ্ন। দেবতারা তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত। যথারীতি অনুষ্ঠানাদির পর শিবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। ভারত তখন তাঁহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা দেখিলে দুঃখ হয়। প্রাচীন কালে দেবদেবীদিগকে পাশব ধর্ম্মে রত করিয়া মাটি করা ফেসান না হইলেও বিরল নহে। ভারত আঁকিয়াছেন, শিব অপ্সরী কিন্নরীবর্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান। এমন সময়ে নারদ আসিয়া উপস্থিত, শিবের একটু লজ্জা বোধ হইল। ক্রমে নারদ বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। শিবের আর বিলম্ব সহে না—বিবাহের জন্য তিনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। সাজসজ্জা হইল। বলদে চড়িয়া বিয়েপাগলা শিব চলিলেন। হুলু লু-লু-লু!

শিবের রকম দেখিয়া স্ত্রীগণ সকলেই অবাক্। এমনতর বাঘছালপরা ক্ষেপা বর ত কেহ কখনও দেখে নাই। নারদ ইহাকে কোথায় পাইলেন? সুন্দরবন হইতে ধরিয়া আনেন নাই ত? এমন কথাও মুখে আনে—রাম বল। স্ত্রীজাতির রসনা নারদের বিপক্ষে ধীরে ধীরে অনেক প্রকার গুজব তুলিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তারকণ্ঠ সরস বাক্যাবলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেও ত্রুটি করিল না। নারদের বহু পুণ্যফল, তাই গালিগালাজের উপর দিয়াই গিয়াছে। নহিলে সম্মার্জ্জনী যদি গাঝাড়া দিতেন, নারদের অবস্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত, নিশ্চিত বলা যায় না।

মহিলাদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শিবনিন্দা এবং কোন্দল আরম্ভ হইল। ভারতচন্দ্র নারদের মুখে কোন্দলের মন্ত্র আওড়াইয়া দিয়াছেন। মন্ত্রটি মন্দ হয় নাই। কোন্দলে চেতনধর্ম্ম আরোপ করিয়া ভারতচন্দ্র বেশ একটু কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকদের দেখিবার জন্য আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আয় রে কোন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব ॥
বেনা-ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো স্থয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া ॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট্ এস চলে ॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥"

শিবনিন্দা শুনিতে উমার বড় ভাল লাগিল না। শুধু কোন্দল ঝগড়া হইলে তত হানি ছিল না। উমা বিপদ্ বুঝিয়া মেনকাকে দিব্যজ্ঞান দিলেন। বর দেখিয়া তখন মেনকার বড়ই আহ্লাদ। শিবের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সিদ্ধিঘোটনের মহা ঘটা পড়িয়া গেল। ভারতচন্দ্র রায় কবিকঙ্কণের মত যাবতীয় মসলার নাম করিয়া গিয়াছেন। মহাদেব সিদ্ধি পান করিয়া বিহ্বল। তাঁহার আঁখি ঢুলু ঢুলু, কথা কেমন জড়াইয়া যায়, নেশা করিলে সাধারণ লোকের যেরূপ অবস্থা হয়, শিবেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহার পর গৌরীর সহিত মহাদেবের কথোপকথন। কথাবার্ত্তা-গুলি পড়িতে নিতান্ত মন্দ নয়—তাহাতে সোহাগ আছে, কথা কাটাকাটিও আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে শিবের একেবারে চরিত্রহীনতা প্রকাশ পায়। ভারতচন্দ্র রঙ্গ-রসের অভিপ্রায়ে শিবের সহিত কুচ্‌নীর নামের সংযোগ করিয়া শিবকে তৃণ অপেক্ষা লঘু প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাস্তবিক, ভারতচন্দ্র যে পরিমাণে রঙ্গরসপ্রিয়, তেমন কবি নহেন। তাঁহার কাব্যে যেখানে যেখানে কবিত্ব ফুটিয়াছে, সেখানে প্রায়ই মূলে রঙ্গরসপ্রয়াস। এক শরীরে হরগৌরী রূপ আঁকিতে গিয়া তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িল,

"আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরাভক্ষণ আধই তাম্বূল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলুঢুলু এক লোচন কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন ॥"

রঙ্গরসের সুবিধা পাইলে ভারতের গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য বড় মনে থাকে না। স্বাভাবিক মুখশ্রী, স্বভাব-গাম্ভীর্য্য, এ সকল অপেক্ষা কজ্জল, ভাঙ্গ ধুতুরার দিকে তাঁহার সহজে নজর পড়ে।

ভারতচন্দ্র হরগৌরীর আরও অনেক কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোন্দল, ঝগড়া, ভিক্ষা, উপদেশ, কিছুই ফাঁক যায় নাই। তাঁহার গৌরীটি আনুনাসিক স্বরে চীৎকার করিতে মন্দ পারেন না। কিন্তু এখন সে কথা থাক্। অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দ মজুমদারই প্রধান চরিত্র। আমরা ধীরে ধীরে ভবানন্দের বিবরণের দিকে অগ্রসর হই। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে—শিব-ব্যাসে কথোপকথন, অন্নদার জরতী-বেশে ছলনা, বসুন্ধরের জন্ম, হরি হোড়ে বরদান, নলকুবরে অভিশাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সকলের বিস্তারিত উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিলেই চলিবে যে, নলকুবরই বাঙ্গালীর গৃহে ভবানন্দরূপে অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার দুই পত্নী—চন্দ্রমুখী এবং পদ্মমুখী। ভবানন্দ তাঁহাদের জন্য দুই দাসী সংগ্রহ করিয়াছেন —সাধী আর মাধী। দাসী না হইলে বঙ্গগৃহ অন্ধকার—সকল শ্রীর মূলে বাঙ্গলার দাসী। স্বয়ং অন্নদাও ভবানন্দের গৃহে আশ্রয় লইলেন। আর ভয় কারে? মজুন্দারের গৃহে লক্ষ্মী অচলা।

এ দিকে প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে মানসিংহ আসিয়াছেন। ভবানন্দের উপর কানগোইভার হইয়াছে। বাঙ্গলার যাহা কিছু সমাচার জানিতে হয়, মানসিংহ ভবানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন। ভবানন্দ কথায় কথায় তাঁহাকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বলেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অংশ—ভবানন্দের মুখে বর্ণিত। আমরা আপাততঃ মূল উপাখ্যান শেষ করি। বিদ্যাসুন্দর স্বতন্ত্র আলোচনা করাই সুবিধা। মূল গল্পের সহিত ত ইহার বিশেষ যোগ নাই। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসুন্দর একটি স্বতন্ত্র কাব্য। ভারতচন্দ্র কৌশলক্রমে তাহাকে অন্নদামঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়াছেন মাত্র।

মানসিংহ রায় বর্দ্ধমান হইতে যশোহরে চলিলেন—যশোহরই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী কি না। পথে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি। বিপুল সেনা লইয়া মানসিংহ ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি ভবানন্দকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বিপদে উপায় কি? ভবানন্দ অন্নপূর্ণা-পূজার কথা বলিলেন। পূজা হইল। ঝড় বৃষ্টি থামিল। ভারতচন্দ্র রায়ের কিন্তু এ ঝড় বৃষ্টিতে বড় সুবিধা হইয়াছে। তিনি ঝড় জলের মধ্যে ঘেসেড়ানীর ক্রন্দন উপভোগ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। রঙ্গরসের অবসর ভারত কি ছাড়িতে পারেন? তিনি আরম্ভ করিলেন,

"ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥" ইত্যাদি।

যশোহরে গিয়া মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বহু কষ্টে হারাইয়া দিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে লইয়া চলিলেন। পথে অনাহারে মৃত্যু হওয়ায় নিষ্ঠুর মানসিংহ বাঙ্গলার আদিত্যকে ভাজিয়া লইলেন। রাজসভায় প্রতাপাদিত্যের সেই ভর্জ্জিত দেহ প্রদর্শিত হইল। জাহাঙ্গীর বিশেষ আহ্লাদিত। ভবানন্দকে মানসিংহ পাতসাহের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর স্ফূর্ত্তির মুখে ভবানন্দের সম্মুখে হিন্দুজাতির ধর্ম কর্ম্ম, আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া অনেক কটুকাটব্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভবানন্দের অসহ্য হইল; তিনি জাহাঙ্গীরের কথায় প্রতিবাদ করিয়া স্বধর্ম্মের তরফে অনেক কথা বলিলেন, তাহাতে মুসলমানের উপর অল্পবিস্তর আক্রমণও আছে। এইখানেই ভবানন্দের সাহসের পরিচয়। দিল্লীর দরবারে দাঁড়াইয়া সম্রাটের মুখের উপর কথা বলিতে পারে কয় জন? জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হইয়া ভবানন্দকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। অবশেষে জাহাঙ্গীর বিনয়পূর্ব্বক ভবানন্দকে ঠাণ্ডা করিলেন। দিল্লীতে অন্নপূর্ণার পূজা হইল। ভূতের অত্যাচার থামিয়া গেল। ভবানন্দ বিশেষ সম্মানিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া ভবানন্দের মহা ভাবনা, দুই রাণীর কাহার নিকট প্রথম যাইবেন। সাধী মাধী আপন আপন কর্ত্রীকে ভজাইতেছে, প্রথমে যেন ভবানন্দকে নিজ ঘরে লইয়া আসা হয়। এ জন্য তাহাদের উপদেশের অন্ত নাই। সাধী বড় রাণীকে বুঝাইল যে, তুমি পুত্রবতী গুণবতী বটে, কিন্তু তোমার সপত্নী এখন যুবতী, সুতরাং রূপবতী, তাহারই গৃহে রাজধানী হইবে। উদাহরণ সমেত সাধী বলিল,

"রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥
আগে যদি ঠাকুরেরে ডেকে আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো॥
টেনেটুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥
দেহুড়ির কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো।"

মাধীও ছোট রাণীকে বড় রাণীর নিন্দা করিয়া অনেক বুঝাইল। সে বলিল,

"দরবারে জয় লয়ে, প্রভু আইলা রাজা হয়ে
আগে যদি তার ঘরে যান।

মহারাণী হবে সেই মোর মনে লয় এই
তুমি হবে দাসীর সমান ॥
একে তার তিন বেটা তাহারে আঁটিবে কেটা
আরো যদি রাণী হয় সেই।
রাজপাট সব লবে তোমার কি দশা হবে
আমার ভাবনা বড় এই ॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক আঁখিঠার দিয়া ডাক
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।
আগে তাঁরে ঘরে আনি তোমারে ত করি রাণী
তবে সে সতিনী পায় ফাঁকি ॥”

ভবানন্দ অন্তঃপুরে আসিলে সপত্নীদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। ভবানন্দ কথার চাতুরীতে উভয় পক্ষের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া প্রথমে চন্দ্রমুখীর এবং পরে পদ্মমুখীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর কিছু দিন রাজ্যভোগ করিয়া, পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, ভবানন্দ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী সমভিব্যাহারে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। স্বর্গেও সপত্নীদ্বয় তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। এইখানেই অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত।

অন্নদামঙ্গলের শেষ ভাগ দেখিলে মনে হয়, যেন ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের অনুকরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের যে মৌলিকতা নাই, এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রচিত্রণে, রন্ধনাদি-বর্ণনে সহজেই কবিকঙ্কণকে মনে পড়ে। কবিকঙ্কণের শ্রীমন্তোপাখ্যান যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, অন্নদামঙ্গলে অল্প-বিস্তর অনুচিকীর্ষা উপলব্ধি করা যায় কি না। কবিকঙ্কণের মধ্যে ভারত অপেক্ষা গাম্ভীর্য্য আছে। মুকুন্দরাম উন্নত চরিত্রচিত্রণে ভারত অপেক্ষা সমধিক দক্ষ। কিন্তু ভারত রঙ্গরসের প্রভাবে বঙ্গসন্তানকে সহজেই আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার অনেকগুলি শ্লোক বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রবাদবাক্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতচন্দ্র নিজের ভাব বেশ প্রকাশ করিতে পারেন।

অন্নদামঙ্গল শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যস্থ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা হয় নাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রামপ্রসাদ সেনের অপেক্ষা সরস। তাঁহার ভাষা সহজ, ভাব স্পষ্ট, গল্পেরও কারিগরি আছে। তবে গল্পটি আসলে উভয়েরই এক। বীরসিংহ নরপতির কন্যা বিদুষী বিদ্যা পণ করিয়াছেন যে, বিচারে তাঁহাকে হারাইতে না পারিলে কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। সুন্দর কাঞ্চীদেশের রাজপুত্র। বিদ্যার কথা শুনিয়া তিনি বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন। হীরা

মালিনীর কৌশলে বিদ্যার সহিত সুন্দরের দেখাসাক্ষাৎ হয়। তাহার পর উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্মায়। সুন্দর সুড়ঙ্গপথ দিয়া গৃহে যান আসেন। ক্রমে ক্রমে সে কথা প্রচার হইল। সুন্দর কোটালের নিকট ধরা পড়েন; অবশেষে বিদ্যা-সুন্দরের বিবাহ হয়।

এই গল্প অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহাতে প্রধান ঘটনা যাহা, উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র স্বীয় গল্পরচনাক্ষমতায় ইহার উপর অনেক সাজসজ্জা দিয়াছেন। আর দেশ বিদেশের বর্ণনা, নারীগণের খেদ, পতিনিন্দা, এ সকল ত আছেই। নহিলে কাব্যের আদর হইবে কেন? ভাটের মুখে বিদ্যার সমাচার শুনিয়া অবধি সুন্দর অধীর। বিদ্যাকে না পাইলে তাঁহার আর কিছুতেই মন স্থির হয় না। এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া তিনি বর্দ্ধমান উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কেহই নাই—কেবল একটি শুকপক্ষী। সপ্তাহ পরে সুন্দর বর্দ্ধমানে পঁহুছিলেন। ভারতচন্দ্র রায় প্রাচীন প্রথানুসারে বর্দ্ধমানের দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে পঁহুছিয়া এক বকুলতলে সুন্দর একেলা বসিয়া রহিলেন। বকুলবৃক্ষের নিকটেই সরোবর। বর্দ্ধমানের নাগরীরা কলসীকক্ষে স্নান করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সুন্দরকে দেখিয়া নারীসমাজে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। নিজ গৃহপানে কাহারও বড় পা চলে না। স্নান সারিয়া রামাগণ গৃহে চলিলেন—আঁখি থাকিয়া থাকিয়া ফিরিয়া দেখে। ভারতচন্দ্র যেরূপভাবে এখানে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে কাহারও বোধ করি, বিশেষ ভাল অবস্থা মনে আসে না। স্ত্রীজাতিকে তিনি একেবারে রূপের ক্রীতদাসী করিয়া আঁকিয়াছেন—রূপের নিকটে পাতিব্রত্য নাই, শান্তভাব নাই, রূপ দেখিলেই তাহারা অধীর। সুন্দরকে দেখিয়া বর্দ্ধমানের স্ত্রীবর্গ অকাতরে স্বামী আত্মীয় পরিজনদিগের নিন্দা করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের চরিত্রে উন্নত ভাব আদবেই নাই।

হীরা মালিনীর সহিত বকুলতলাতেই সুন্দরের আলাপ পরিচয় হয়। মালিনী সুন্দরকে আপন আলয়ে আশ্রয় দেয়। সুন্দর মালিনী মাসীকে বলিলেন, দাস দাসী ত কেহ নাই, কে তাঁহার হাট বাজার করিবে? মালিনী নিজ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া সুন্দরকে আশ্বস্ত করিল। মালিনীর এইখানকার কথাবার্ত্তাতেই তাহার চরিত্র অভিব্যক্ত। মালিনী যে উন্নতচরিত্রের লোক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাজার করিয়া আনিয়া মালিনী তাহার এক দীর্ঘ হিসাব দেয়। সে হিসাব না দিলেও চলে—তাহা নিতান্তই অনুগ্রহ। সুন্দর হিসাবের জন্য বড় ব্যস্ত নহেন—তাঁহার কার্য্য উদ্ধার হইলেই হয়। তিনি বিদ্যার জন্য মালিনীর হস্তে মালা গাঁথিয়া দেন। তাহাতে

শ্লোক লেখা। বিদ্যা মালা দেখিয়া অধীর। মালিনীকে অনেক বিনয় করিয়া সুন্দর দর্শনের কথা বলিল। মালিনী কৌশল করিয়া একদিন পরস্পরকে দেখাইয়া দিল। ফল হইল,

"দু'হার নয়ন ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥"

ইতিমধ্যে ভারতচন্দ্র একবার বিদ্যার রূপবর্ণনা করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে তরঙ্গে তরঙ্গে অনুপ্রাস। কিন্তু অনুপ্রাস হইলেও এ বর্ণনা রামপ্রসাদের মত নির্জীব নহে। ভারত আগাগোড়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সমষ্টিভাবে বর্ণনা করা সে কালের কবিদিগের অজ্ঞাত। ভারতচন্দ্র বিদ্যার বেণীর শোভা হইতে আরম্ভ করিয়া পদনখ পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। আর এই বর্ণনার জন্য যেখান হইতে পারিয়াছেন, উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। বোধ করি, ভবিষ্যৎ কবিদিগের কি দশা হইবে, ভাবিলে ভারতচন্দ্র কিছু রাখিয়া দিতেন।

এখন বিদ্যার সহিত সুন্দরের মিলন হয় কিরূপে? রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে ত আর যে-সে ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। বিদ্যার ইচ্ছা যে, চুপিচাপি বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। মালিনী বিদ্যাকে বুঝাইল যে, গোপনে বিবাহ ন্যায়সঙ্গত নহে, পরে বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু মালিনীর কথা শুনে কে? কালীর অনুগ্রহে সুন্দরের বাসস্থান হইতে বিদ্যার গৃহ অবধি সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইল। এই সুড়ঙ্গপথ দিয়া সুন্দর গোপনে বিদ্যার গৃহে যাতায়াত করেন। সুন্দর আবার সন্ন্যাসিবেশে রাজসভায় গিয়া বিদ্যা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন। যাহা হৌক্, গুপ্তপ্রণয় অল্প দিন মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাণী বিদ্যাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। তবুও কি বিদ্যা স্বীকার করে? কিন্তু রামপ্রসাদের বিদ্যার মত ভারতের বিদ্যার গলার জোর নাই। সে বিদ্যাপেক্ষা এ বিদ্যার প্রকৃতি কোমল। বীরসিংহ রায় কোটালকে চোর ধরিতে আদেশ দিলেন। স্ত্রীবেশে কোটাল সুন্দরকে বঞ্চনা করিল। সুন্দর ধরা পড়িলেন। নারীগণের পতিনিন্দা আরম্ভ হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কল্যাণে ইহাকেও পাতিব্রত্যের আত্যন্তিকতা না বলিলে নয়। কারণ, বঙ্গদেশের ধমনীতে ধমনীতে তীব্রবেগে আধ্যাত্মিক তড়িৎস্রোত. প্রবাহিত। আমরা কিছুই না বলিয়া এক আধটি শ্লোক উঠাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াই। পাঠকেরা ধর্ম্মপ্রধান ইংরাজশাসনের পূর্ব্বকালের অধ্যাত্মযোগ উপভোগ করিতে থাকুন।

"বিদ্যাকে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥"

শুধু এইখানেই শেষ নয়। ক্রমে ক্রমে পতিবর্গের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার আবশ্যক হয়, দেখিয়া লইবেন।

সুন্দর রাজসভায় আনীত হইলেন। ভারতচন্দ্র রাজসভা বর্ণনা করিয়াছেন—আলস্যের আধার। সেখানে তাকিয়া আছে, বালিশ আছে, সুতরাং ছারপোকাও আছে। কিন্তু এ ছারপোকাগুলাও আলস্যের সন্তান সন্ততি। সভামধ্যে রাজা সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। সুন্দর বলেন, তিনি বিদ্যাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন—বিদ্যা তাঁহারই, সভামধ্যে আত্মপরিচয় দিতে তিনি বাধ্য নহেন। সুন্দরকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল। ইতিমধ্যে শুকসারীর কথায় গঙ্গা ভাটকে আনাইয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে রাজা সুন্দরের পরিচয় জানিতে পারিলেন। তখন সুন্দরকে জামাতা বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহার আর কোন আপত্তিই রহিল না। কিছু দিন পরে বিদ্যা সহ সুন্দর স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদের মত ভারতচন্দ্রও সুন্দরের স্বদেশগমনের পূর্ব্বে একবার বারমাস বর্ণনা করিয়া লইয়াছেন। মুকুন্দরাম হইতে বারমাস বর্ণন এক ফেসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে ফুল্লরার বারমাস বর্ণন আর বিদ্যার বারমাস বর্ণনে তফাৎ বিস্তর। ফুল্লরার বারমাস দুঃখের ; আর বিদ্যার বারমাস বিলাসের। ফুল্লরার উদরচিন্তা, গৃহাভাব ; বিদ্যার কোকিল-মলয়-সম্মিলন। রামপ্রসাদ অপেক্ষা ভারতচন্দ্র কিন্তু ভাল বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কতকগুলি ছোট ছোট নানাবিষয়িণী কবিতা আছে—নায়ক নায়িকা, বসন্ত বর্ষা, সত্যপীরের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলির বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু ভারতের সকল লেখা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার মধ্যে নাট্যরস কতকটা ছিল। প্রহসন লিখিলে ভারত বোধ করি, তাহাতে বেশ সফল হইতেন। তাঁহার হাড়ে হাড়ে যে রঙ্গরস প্রচ্ছন্ন, তাহা প্রহসনে খুব জমিতে পারিত মনে হয়। তবে গম্ভীর রসে নাটক রচনা করিতে গেলে ভারত কত দূর সফল হইতেন সন্দেহ। তাঁহার ভাবের তেমন গভীরতা নাই, সেই জন্য গাম্ভীর্য্যের তাঁহার বিশেষ অভাব আছে।

ভারতচন্দ্রই প্রাচীন বঙ্গের শেষ কবি। বঙ্গসাহিত্যকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তিনি আজ সরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সে জন্য তাঁহার সকল গুণ আমরা বিস্মৃত না হই। কালের অবস্থা বুঝিয়া প্রাচীন কবিদিগের দোষ অনেকটা মার্জ্জনীয়। ভারতচন্দ্রে এ কালের মত সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, অসাধারণ কবিত্বও হয় ত নাই, আমাদের রুচিবিরুদ্ধ—বর্ত্তমান সমাজে অপাঠ্য অনেক জিনিস আছে, কিন্তু তথাপি ভারত বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান লেখক। বঙ্গসাহিত্য তাঁহাকে অনেক দিন বাঁচাইয়া রাখিবে।

'ভারতী ও বালক', ফাল্গুন ১২৯৬

ক্ষণিক শূন্যতা

জীবনের এক একটা দীর্ঘ পরিচ্ছেদের উপসংহারে আসিয়া আমরা খানিক ক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকি—অতীত খুঁজিয়া পাই না, ভবিষ্যৎ প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়—হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুর হইতে অজ্ঞাত অতৃপ্তির মত একটি দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া যায়। কি যেন অনির্দ্দেশ্য রহস্যভাবের মধ্যে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে—তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেমন অবশ ঔদাস্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে; আমরা কিছুই ঠাহরাইয়া উঠিতে পারি না। ক্রমে সে নিস্তব্ধ শূন্যতা শান্ত হইয়া আসে, ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের কুজ্ঝটিকার মধ্যে নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। তখন দূর অতীতের পানে চাহিয়া দেখি, যৌবনের বন্যায় সেখানে নৈরাশ্য নিরুদ্যম মুহূর্ত্তের অধিক টিঁকিতে পারে নাই, প্রবলবেগে কোন্ উত্তুঙ্গ গিরিশিখর হইতে আশার স্রোত বহিয়া আসিয়া জীবনের মরুভূমি প্লাবিত করিয়াছে, সেখানে কেবলই স্বাধীন বিহঙ্গের আনন্দগীতি, কনককান্তি কুসুমের তরঙ্গায়িত সৌরভ, বিকশায়মান জীবনের দুর্দ্দম্য স্ফূর্ত্তি। সে কল্পনাময় ছায়া-দৃশ্য আমাদের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসে; সম্মুখে চাহিয়া আমরা তেমন আনন্দ উপভোগ করিতে পারি না। যে সকল পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়া জীবন চলিয়া গিয়াছে, সেইগুলিই চক্ষের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে থাকে—ভবিষ্যৎ পরিচ্ছেদে যথেষ্ট আলোকাভাবে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু জীবনের এই অতীত এবং ভবিষ্যৎ পরিচ্ছেদের সন্ধিস্থলে আমাদের জন্য গোটাকতক শূন্য মুহূর্ত্ত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কেন? কয় মুহূর্ত্ত আমরা আপনাকে আপনার মধ্যে অনুভব করি না, জীবনের উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে ভুলিয়া থাকি। বোধ হয়, সেই কয় মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে সমস্ত অতীত আসিয়া আমাদের নিকট জড় হয়—সমস্ত পরিচ্ছেদের ঘটনাবৈচিত্র্য ছায়ালোকের সামঞ্জস্যে ফুটিয়া উঠে। যতক্ষণ আমরা কোন বিশেষ পরিচ্ছেদে ব্যস্ত থাকি, তাহার মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পরিচ্ছেদ-শেষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার তাহার প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গ অনুভব করা আবশ্যক। এই অবস্থায় কয় মুহূর্ত্ত যেন ঘুমঘোরে কাটিয়া যায়। তাই কেমন শূন্য শূন্য ঠেকিতে থাকে।

এই ক্ষণিক শূন্যতা নহিলে কিন্তু চলে না। ইহার মধ্যে জীবনের ধারাবাহিকতা প্রচ্ছন্ন। সমগ্র জীবনের ঘটনার শৃঙ্খলা অনুভব করিতে হইলে কয়েক মুহূর্ত্ত ত অবসর চাই। নহিলে গুছাইয়া লওয়া বড় দুরূহ। আমরা উপসংহারে পঁহুছিয়া পরিচ্ছেদ

বুঝিয়া দেখি—আমাদের সকল কল্পনা, আশা, উদ্যম, নৈরাশ্য পরে পরে সাজাইয়া লই। কিন্তু ইহা এমনি নীরবে সম্পন্ন হয় যে, কয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সমগ্র পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণ ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। সহস্র ঘটনার মিলন বিরহে আচ্ছন্ন হইয়া খানিক ক্ষণ আমরা অকূল পাথারে ধ্রুবতারাহীনের ন্যায় চারি দিকে চাহিয়া দেখি, ক্রমে সকল ঘটনা থিতাইয়া আসিলে আমাদেরও শূন্যভাব ঘুচে।

মানব-জীবনের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক শূন্যতায় তাহার অতৃপ্তির ভাবের বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের জীবনে তৃপ্তি কোথায়? তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া অতীতের সান্ত্বনা, পদতলে ভবিষ্যতের কি-জানি-কি। পশ্চাতে কেবল একটা দূর—অতিদূর দূর মাত্র; সম্মুখেও তাই—ধূ ধূ, কেবলই একটা সীমাহীন মহাদূর। চতুর্দ্দিকের এই অসীম বিস্তৃতির মধ্যে আপনার ক্ষণভঙ্গুরত্ব লইয়া কে পরিতৃপ্ত হইবে? আমরা সমস্ত জগতের সহিত জীবনের প্রবাহ অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠি, স্তম্ভিত হইয়া থাকি; কখনও আশায়, কখনও নৈরাশ্যে আমাদের অতৃপ্তি।

শূন্যতায় জীবনের দুই পরিচ্ছেদের মধ্যে মিলন সঙ্ঘটিত হয়। শূন্যতা ত আর কিছুই নহে—পরিচ্ছেদান্তে বিরাম মাত্র। সময় সময় পরিচ্ছেদবিশেষের মধ্যে কমা সেমিকোলনে আসিয়াও সব কেমন শূন্য শূন্য ঠেকে। এক একটা পদ সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না, কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে থাকে, সেই পদগুলি আয়ত্ত হইতে একটু সময় যায়। কমা সেমিকোলনের পর সেই সময়টুকুই শূন্য। এইরূপ শূন্যতায় পদের অথবা পরিচ্ছেদের অর্থবোধ বেশ পরিষ্কার হয়। অনেক সময় আমাদের অন্যমনস্কতার ফলেও শূন্যতার আবির্ভাব। হয় ত পদবিশেষে সম্পূর্ণ মনোযোগ করা হইল না; সে পদটি সুতরাং পূর্ব্বের সহিত পরপদের সম্বন্ধ ব্যক্ত কবিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বের সহিত পরের যোগ দেখিতে পাই না। তখন একটু চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইতে হয়। স্থির হইতে না পারায় এই কয় মুহূর্ত্ত শূন্যের মত চলিয়া যায়। কিন্তু এই শূন্যতার মধ্যে ভাব আয়ত্ত হইয়া আসে। সেই জন্যই ত শূন্যতা পূর্ব্বের সহিত পরের যোগ রক্ষা করে।

ভাব আয়ত্ত হইলেই আমাদের শূন্যতা ঘুচিয়া যায়। আয়ত্ত হইবার অবস্থাতেই হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা অন্তর্লীন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহাতেই শূন্যতা। এই অবস্থায় হৃদয় যেন অবশ হইয়া আসে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা চেষ্টাভাব আছে। তাহা ঠিক ধরা যায় না। শূন্যতায় তীব্র আকুলতার ভাব।

কিন্তু এই শূন্যতার পশ্চাতে যেরূপ আনন্দ, সম্মুখে সেরূপ নহে কেন? শূন্যতা শান্ত হইয়া আসিলে আমরা অতীতের পানে চাহিয়াই সুখ লাভ করি। কারণ বোধ হয়,

সেখানে জীবনের সহস্র বিপ্লবের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাই। সেখানে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত উদ্যম, কত কাতরতা জাগিয়া আছে, তাহার উপরে কল্পনার বিচরণ করিবার ক্ষেত্র প্রশস্ত। ক্ষণিক শূন্যতায় সেখানকার ঘটনাগুলি বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতের রাজ্যে সকলই অস্থির—কল্পনার সঙ্গে আশা, নয় নৈরাশ্য। পশ্চাতে কেবলমাত্র স্মৃতির আনন্দ।

ক্ষণিক শূন্যতায় জীবন-কাব্যের মধ্যে উপসংহারের প্রধান ভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক, দীর্ঘজীবনে মধ্যে মধ্যে শূন্যতাই তাহার ভাবের একতা বজায় রাখিয়াছে। শূন্যতার জন্য আমরা জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করিতে সমর্থ হই। নহিলে সমগ্র জীবন হয় ত আমাদের নিকট জড়বৎ অনুপভোগ্য হইয়া থাকিত। অন্ততঃ আমরা এমন ভাবে তাহার সামঞ্জস্যময় বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতাম না। মাঝে মাঝে দাঁড়ি পাইয়া আমাদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। শূন্যতায় এক একটা ছেদ।

'ভারতী ও বালক', ফাল্গুন ১২৯৬

কেতকা-ক্ষেমানন্দ

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীরচনার কিছু কাল পরেই কেতকাদাস এবং ক্ষেমানন্দদাস নামে দুই জন কবি এক গ্রন্থ রচনা করেন—মনসার ভাসান। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের মত তাঁহাদের ভাষার জোর নাই, কল্পনাও খেলে না। বর্ণনা বিষয়ে তাঁহারা মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস অপেক্ষা শতগুণে হীন। মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস যে প্রকৃতির অন্তঃপুরে গিয়া তাহার প্রাণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা নহে—সে কালের কোন কবিই তাহা করেন নাই—কিন্তু যাহা দেখিয়াছেন, তাহার যতটুকু বস্তুগত, তাহা তাঁহারা কেতকা এবং ক্ষেমানন্দ অপেক্ষা ভালরূপে বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। মনসার ভাসান-রচয়িতারা স্থানে স্থানে মুকুন্দরামকে অনুকরণ করিয়াছেন—শুধু ভাবে নহে, ভাষায় পর্য্যন্ত কবিকঙ্কণের সহিত অনেক ঐক্য দেখা যায়। কবিকঙ্কণের মত লেখার ধরণটা কিন্তু তাঁহাদের পাকা নহে। তাঁহারা যে উপাখ্যান লিখিয়াছেন, তাহাতে কবিত্বরস বা ঘটনাবৈচিত্র্য বড় নাই, কেবল দুই চারিটা বাঁধা উপমা এবং অলৌকিক ঘটনায় যত দূর হয়। ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহারা গ্রন্থ লিখিতে বসেন নাই—লিখিতে হইবে বলিয়া দুই জনে ভাগাভাগি কাজ সারিয়াছেন। কেতকাদাস খানিক লিখিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন, ক্ষেমানন্দ লেখনী চালাইয়াছেন; আবার ক্ষেমানন্দ থামিতে কেতকা কলম ধরিয়াছেন। উভয় কবিই নিজ নিজ রচনার শেষে ভণিতায় স্বনাম উল্লেখ

করিতে ভুলেন নাই। তাহাতে আমাদের কতকটা সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কাল নিরূপণপক্ষে তাহাতে কোন সাহায্য হইবে না। কারণ, সে সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই নীরব। ভাষাই তাহার একমাত্র উপায়। ভাষা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র রায়ের বহু পূর্ব্বে যে তাঁহাদের অভ্যুদয়, তাহা স্থির।

মনসার ভাসানে গ্রাম্য কথার কিছু প্রাদুর্ভাব। অর্থবোধ সে জন্য অনেক স্থলে কষ্টসাধ্য। সকল কথা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়াও দায়। অন্যান্য প্রাচীন কাব্যে সে সকল কথা প্রায় দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় ভাসানের ভাষা বাঙ্গলাদেশের কোনও বিশেষ অঞ্চলঘেঁষা। সে কোন্ অঞ্চল, আমরা বলিতে অক্ষম। তবে গ্রন্থের মধ্যে যে সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকে ভাসানরচয়িতাদের নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় ঠাহরাইয়া থাকেন। আমরাও তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাই না। সুতরাং মনসার ভাসানের গ্রাম্য কথাগুলি বর্দ্ধমান অঞ্চলেরই বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের কথার উপর কেতকাদাসের একটু তীব্র কটাক্ষ আছে। ঝড়ের সময় বাঙ্গালদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিয়াছেন। মনসার ভাসানের গ্রাম্য শব্দগুলি যে পূর্ব্বাঞ্চলের নহে, তাহার প্রমাণ এইখানেই একরূপ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এখন সে কথা লইয়া বিশেষ আন্দোলনের আবশ্যক নাই। চম্পকনগরে চাঁদ সওদাগরের সহিত মনসার বাদ ছিল। চাঁদ হেতাল লইয়া মনসাকে মারিবার জন্য ব্যস্ত। মনসাও যে উপায়ে পারিয়াছেন, চাঁদকে জব্দ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি চাঁদের সাতখানি ডিঙ্গা ডুবাইয়া দেন, সাতটি পুত্রের প্রাণ হরণ করেন, চাঁদকে প্রত্যেক কার্য্যে বাধা দিয়া দিয়া জ্বালাতন করিয়া মারেন। তবুও কি হয়? চাঁদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ— মনসার মাথা পাইলে হেতাল নিশ্চিন্ত রহিবে না। যেমন করিয়াই হোক্, মাথার সহিত দেহের বিচ্ছেদ ঘটাইবেই। পুত্রবধূ বেহুলা কিন্তু হাতে হাতে মনসাপূজার ফল দেখাইয়া চাঁদকে মনসার দিকে লওয়ায়। বাসরে সর্পদংশনে নখীন্দরের মৃত্যু হইলে বেহুলা মৃতদেহক্রোড়ে ভেলায় করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়, এবং নেতা ধোপানীর সাহায্যে সুরপুরে গিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া মনসার কৃপায় স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া পায়। মনসার বরে বেহুলার ভাসুরেরাও বাঁচিয়া উঠেন, চাঁদের সাতখানি ডিঙ্গার স্থলে চৌদ্দখানি ডিঙ্গা লাভ হয়। সুতরাং চাঁদ আর মনসাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। খুব ধুমধাম করিয়া সাধু দেবীর পূজা করিলেন। কিছু দিন সুখে ঘরকন্না করিয়া নখীন্দর বেহুলা স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

কেতকা-ক্ষেমানন্দের মনসা কতকটা কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকরণ করিতে ভালবাসেন। চণ্ডী যেরূপ ব্যবহার করিয়া ধনপতির গৃহে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, মনসাও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া চাঁদবেণের গৃহে পূজিত হয়েন। ধনপতি চণ্ডীকে কিছুতে সহিতে পারিতেন না, সেই জন্য চণ্ডী মগরার নিকটে তাঁহার অনেকগুলি নৌকা ডুবাইয়া দেন; মনসাও দুর্ব্বিনীত চাঁদের ডিঙ্গাগুলি ডুবাইয়া দিলেন কালীদহে। চণ্ডী অনেক কষ্ট দিয়া পরিশেষে ধনপতির মঙ্গল করেন; মনসাও নাস্তানাবুদ্ করিয়া চাঁদের প্রতি সদয় হয়েন। তফাতের মধ্যে ধনপতির জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের ছায়া, আর চাঁদের কপালে কাঠুরিয়া, ব্যাধ, ধোপানী। মনসা যেন চণ্ডীর চেলা। চণ্ডী অপেক্ষা তাঁহার সাহস কিছু কম। কিন্তু স্বপূজা প্রচারার্থে উপায় অবলম্বন করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। চাঁদ সদাগরও ধনপতির দ্বিতীয় সংস্করণ—কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য শেষ হইলে বুঝি কেতকা-ক্ষেমানন্দের আহ্বানে মনসার ভাসানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। চণ্ডীর সহিত বিবাদে ধনপতির অস্ত্র শস্ত্র আবশ্যক হয় নাই, কিন্তু মনসার সহিত বাদে চাঁদ হেতাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। চণ্ডী ও মনসার আর পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। পাঠকেরা যাঁহার সহিত ইচ্ছা বাদ সাধিতে পারেন। আমরা যথেষ্ট দূরে রহিলাম।

এই দূর হইতে একবার ভাসানরচয়িতাদিগের বর্ণনা-সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্। চাঁদবেণের পুত্র নখীন্দরের জন্মের কিছু কাল পরেই সায়বেণের গৃহে নখীন্দরের ভাবী অর্দ্ধাঙ্গ বেহুলার জন্ম হইল। কবি সুতরাং লেখনীহস্তে বেহুলাকে দর্শন করিতে বাহির হইলেন। দর্শনানন্তর সাধারণের সম্মুখে তাহার বর্ণনা করিতে বসিলেন,

"চন্দ্রমুখী খঞ্জননয়নী কলাবতী।
অধর অরুণ জিনি বিদ্যুতের দ্যুতি॥
শ্রবণে কুণ্ডল তার খোঁপায় বকুল।
বেহুলার রূপেতে মোহিত অলিকুল॥
দশন নিন্দিয়া কুন্দ কোরক সমান।
কোদণ্ড জিনিয়া যেন ভ্রূযুগ সন্ধান॥" ইত্যাদি।

এখন কথা এই যে, এ বর্ণনা কিরূপ হইয়াছে? চন্দ্রবদন এবং খঞ্জননয়ন প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে রূপসীর লক্ষণ বটে। কেতকা ক্ষেমানন্দের বেহুলা সুন্দরীর সুতরাং এই দুই সৌন্দর্য্য না থাকিলে চলিবে কেন? কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। বেহুলা আবার কলাবতী। সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এ কথাটা

না বলিলে বোধ হয় হইত ভাল। কারণ, খানিক পরেই আবার আমাদের শুনিতে হইবে যে, বেহুলা এখনও বড় হয় নাই—পিতৃগৃহেই নৃত্যগীতবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। ভাসানরচয়িতা যে তাড়াতাড়ি খোঁপা এবং দন্তপংক্তির বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, শুনিলে বোধ হয় যেন বেহুলা জন্মাইতে না জন্মাইতেই যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা মনে করিয়াছিল যে, বেহুলার দাঁত উঠে নাই শুনিবে, তাহারা বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

বেহুলা নখীন্দর ত দিনে দিনে বাড়িতেছেন। এ দিকে চাঁদ সদাগর নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া পদাঘাতে জর্জ্জর। মনসা গণকবেশে সনকার নিকটে গিয়া বলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার গৃহে আজ রাত্রিকালে চুরি হইবে। চাঁদ কলাবনে খুস্থর খুস্থর নড়িতেছিলেন। স্থতরাং চোরের দণ্ড ভোগ তাঁহাকেই করিতে হয়। চাঁদ ত দণ্ড ভোগ করিলেন, কিন্তু মিথ্যাবাদিনী মনসা দেবীর কি কোনও দণ্ড নাই? বাঙ্গলাদেশে মিথ্যা কথার জন্য কেহ দণ্ডিত হয় না। আর মনসা ত স্বয়ং দেবী—তিনি যখন অকারণে অনর্গল মিথ্যা বলিয়া যাইতেছেন, তখন দুর্ব্বল মানব ভক্ত ত মিথ্যাচরণ শিখিবেই। দেবীর দণ্ড নাই দেখিয়া ভক্তেরা আশ্বস্ত। মিথ্যাচরণের এমন দণ্ডহীন স্থবিধা আর কোথায়? প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অপাত্রে অন্ধভক্তি সংস্থাপনের যতটা চেষ্টা করা হইয়াছে, দেবচরিত্র গঠনের দিকে তাহার আংশিক মনোনিবেশ করিলে দেশের অনেক উপকার হইত। মিথ্যা দেবতার ভূষণ হইলে মানবে কি করিবে?

চাঁদ অম্লানবদনে লাথিগুলি হজম করিয়া ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। আঃ! ভাবনা চিন্তা অনেক দূর হইল। এইবারে নখীন্দরের বিবাহ। একটি কন্যা মিলিলেই হয়। বেহুলার সন্ধান মিলিল। সব স্থির। বেহুলাকে কেবল পাতিব্রত্যের পরিচয়স্বরূপ লোহার কলাই রন্ধন করিতে হইবে। মনসা সহায়। নিমেষে রন্ধন হইয়া গেল। মনসার ভয়ে সাধু সাতালি পর্ব্বতোপরি এক লৌহের বাসরঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মনসা এ দিকে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া সেই লৌহবাসরে একটি ছিদ্র করাইয়া লইয়াছেন। বিবাহের পর নখীন্দর বেহুলা সেই ঘরে শয়ন করিয়া আছেন, দুই তিনটি সর্পের উদ্যম বেহুলার কৌশলে ব্যর্থ হইল, অবশেষে একটি সর্প গিয়া নখীন্দরকে দংশন করিল। নখীন্দর মরিলেন। ক্রন্দনের রোল উঠিল। বেহুলা স্বামীকে বাঁচাইবেই। সে এক কলার মান্দাসে চড়িয়া মৃতস্বামীক্রোড়ে ভাসিয়া চলিল।

পথে বেহুলাকে পরীক্ষা করিতে অনেক প্রলোভন। সে সকল প্রলোভন কাটাইয়া বেহুলা ত নেতা ধোপানীর নিকট উপস্থিত হইল। বেহুলা একদিন ধোপানীর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া একটি কাপড় কাচিয়া দিল। দেবতারা সে কাপড়ের বর্ণ দেখিয়া

অবাক্। তখন ধীরে ধীরে নেতা ধোপানীর দ্বারা বেহুলা দেবসভায় পরিচিত হইল। নৃত্যে সে দেবতাদিগকে মুগ্ধ করিল। ক্রমে কথায় কথায় সকল প্রকাশ হইলে দেবতারা বেহুলার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। মনসা আসিলেন। বেহুলা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কার্য্য উদ্ধার করিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্বশুরকে মনসার ক্ষমতা বুঝাইয়া বেহুলা তাঁহাকে মনসার পূজা করাইল। বাঁধা নিয়মানুসারে দম্পতির যথাসময়ে স্বর্গগমনও হইল।

এইবারে আমরা বেহুলার চরিত্র আলোচনা করিতে পারি। বেহুলা যে রীতিমত পতিব্রতা ছিল, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। পতিব্রতা না হইলে এত কষ্ট করিয়া সেই স্ফীত গলিত শবদেহ লইয়া একাকিনী অসহায় অবস্থায় সে কি আর অমন করিয়া বেড়াইত? বেহুলার ঐকান্তিক পতিভক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তবে ছিল না কি? লোহার কলাই পর্য্যন্ত যখন সে রন্ধন করিতে পারে, তখন রন্ধনবিদ্যায়ও বেহুলা পারদর্শিনী বলিয়া বোধ হয়। কলাবিদ্যায়ও তাহার নৈপুণ্য। কিন্তু কেবলমাত্র গ্রন্থকারগণের মুখে বেহুলার গুণের ফর্দ্দ শুনিয়া তাহার সমস্ত চরিত্র বুঝা যায় না। তাহার প্রত্যেক কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। নহিলে সীতা সাবিত্রীর সহিত তুলনা করা অসম্ভব।

সীতার সহিত বেহুলার তুলনা করিতে যাওয়া নিতান্তই বাড়াবাড়ি। সে কোমল গম্ভীর সমুন্নত মাতৃপ্রকৃতির সহিত বেহুলার কি তুলনা সম্ভব? পাতিব্রত্য এবং অলৌকিক ঘটনার সংযোগ হইলেই যদি সকল চরিত্রকে সীতার পার্শ্বে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে সীতার আর মর্য্যাদা থাকে না। মনসার ভাসানের গ্রন্থকারগণ বেহুলার চরিত্রে সেরূপ সমুন্নত গাম্ভীর্য্য আদবেই ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, কেবল পুরাণের অনুকরণ করিয়া একটা অসম্ভব কাহিনী লিখিয়াছেন মাত্র। সে জন্য বেহুলাকে পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্য ঠাহরান যায় না। খুল্লনা তাহা হইলে কি দোষ করিল? সেও ত মৃত স্বামী ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছিল, চণ্ডী ধনপতিকে বাঁচাইয়া দিলেন। এইরূপ মৃত স্বামী ক্রোড়ে ক্রন্দন আর দেবতাবিশেষের সাহায্যে মৃত দেহের পুনর্জীবন লাভ প্রাচীন সাহিত্যে একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপার। তাহা দিয়া সীতাকে ঘিরিলে সীতা অদৃশ্য হইয়া যাইবেন।

বেহুলা স্বামীর জন্য যাহা করিয়াছে, সাবিত্রী অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু সাবিত্রী-উপাখ্যানরচয়িতা সেই ভীষণা রজনীর অন্ধকার দিয়া যে কবিত্ব প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, কলার মান্দাসের সাহায্যে কেতকা-ক্ষেমানন্দ তাহা পারেন নাই। মহাভারতের চিত্রটি যথোচিত ছায়ালোকে বড়ই গম্ভীর। কেবলই উপাখ্যান হিসাবে তাহা দেখিলে

চলিবে না ; চিত্র হিসাবে, কাব্য হিসাবে, সৌন্দর্য্য হিসাবে তাহা দ্রষ্টব্য। ভাসানের গ্রন্থকারকের এরূপ সৌন্দর্য্যরসজ্ঞান একেবারেই নাই। প্রাণে কবিত্ব থাকিলে ভাগীরথী-বক্ষে ভাসিয়া যাইতে যাইতে কতকগুলি গ্রামের নাম সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় কে? চক্ষে পড়িয়াছে এত দেশ থাকিতে কেবল গোদ আর গোদা—যাহাতে রঙ্গরসের সুবিধা হয়।

বেহুলা ভিন্ন মনসার ভাসানে আর চরিত্র নাই। নখীন্দরই বল, চাঁদই বল, আর সনকাই বল, একটি চরিত্রও ভালরূপ ফুটে নাই। বেহুলা কেবল যাহা অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছে—তাহাও কেবল এক বিশেষ অবস্থায়। দেবচরিত্রের মধ্যে আছেন মনসা—যথেচ্ছাচারিণী, চাটুতৃপ্তা, সদসদুপায়ে কার্য্য-উদ্ধারদক্ষা।

মনসার ভাসান হইতে সামাজিক কতকগুলি প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে কালে ভদ্র-পরিবারমধ্যে নৃত্য গীত শিক্ষা কি প্রচলিত ছিল? বেহুলা ত নৃত্যে খুব নিপুণা। সতীদাহ-প্রথা তখন ছিল কি না? চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূদিগের একটিও ত সহমরণে যায় নাই। সে জন্য কোন নিন্দাও ত কৈ, শুনা যায় না। ভাসানের কবিরা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সহমরণকে দূরে রাখিতেও পারেন। কিন্তু বেহুলার নৃত্যনৈপুণ্যে তাঁহারা যেরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সে সময়ে কুলস্ত্রীর নৃত্যাদিশিক্ষা দোষের বলিয়া গণ্য হইত বোধ হয় না। তবে বেহুলার দেবসভায় নৃত্য অবশ্য দায়ে পড়িয়া। নহিলে, কুলস্ত্রীরা যে সভামধ্যে নৃত্য করিতেন, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

ভাসান সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই। প্রাচীন সাহিত্যেও ভাসান বিশেষ উচ্চশ্রেণীর কাব্য নহে। ক্ষেমানন্দ কেতকা মনসার পূজা প্রচার করিতে কত দূর সফল হইয়াছেন, বলিতে পারি না। বেহুলা নখীন্দর সুরপুরে মনের আনন্দে কালযাপন করিতেছেন—দেবলোকে পার্থিব সুখের চূড়ান্ত উপভোগ। মনসাও চম্পক-নগরের পূজা পাইয়া অবধি আছেন ভাল। কেবল আমরাই রোষদীপ্ত পাঠকের তীব্র কটাক্ষের সম্মুখে পড়িয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া আছি। ভরসা করি, তাহাতে কাহারও হৃদয় দুঃখে প্লাবিত হইয়া উঠিবে না।

'ভারতী ও বালক', ফাল্গুন ১২৯৬

প্রেম : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আমাদের দেশীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ যে সকল কাব্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই প্রেমের কথা লইয়া। প্রেমের বৈচিত্র্য, তরঙ্গভঙ্গ এ দেশের কবিরা যেরূপ সুন্দররূপে বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য কবিরা বোধ করি সেরূপ বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের কাব্যের বিরহ, অভিসার, মানাভিমান ব্যাপার পাশ্চাত্য কাব্যে কোথায়? পাশ্চাত্য দেশে কি প্রণয়-বন্ধনের মধ্যে বিরহ দেখা দেয় না? প্রণয়িনী কি ভুলিয়াও মান করিয়া বসিয়া থাকেন না? তবে সে দেশের কাব্য বিরহ-বিলাপ-ধ্বনিময় নহে কেন? মান-ভঞ্জনের গুরুতর ব্যাপার লইয়া পাশ্চাত্য কবি গীত রচনা করেন নাই কেন? প্রকৃতি, শিক্ষা, স্বাধীনতা, এবং অন্যান্য নানা অবস্থাভেদে পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয়, বিরহের এরূপ জ্বালাময়ী দারুণতা নাই। ইংরাজদিগের মধ্যে ভালবাসার অভিনয় খেলা প্রচলিত আছে, তাহাই হয় ত আমাদের মানভঞ্জনের কতকটা অনুরূপ। কিন্তু মানভঞ্জন অনুষ্ঠানের মধ্যে হৃদয়ের যথার্থ অনুরাগ প্রচ্ছন্ন, আর ইংরাজ জাতির flirtation প্রেমের অভিনয় মাত্র—তাহাতে সত্যের সম্পর্ক নাই। সুতরাং মানভঞ্জনে স্বভাবতই কবিতার প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে পারে।

ইংরাজী সাহিত্যে বিরহের ভাবপ্রকাশক একটিও কথা শুনা যায় না। বিচ্ছেদের ইংরাজী প্রতিশব্দ খুঁজিয়া মিলে, কিন্তু বিরহের প্রতিশব্দ নাই। বিরহের অভাবে সুতরাং মিলনেরও অবিকল প্রতিশব্দের ইংরাজী ভাষায় অভাব আছে। আমাদের মিলনের হৃদয়ে কতদিনকার বিরহের অশ্রুজল প্রচ্ছন্ন, কত দীর্ঘ নৈরাশ্যের রুদ্ধ নিশ্বাস সমাহিত। পাশ্চাত্য মিলন কেবল মিলন মাত্র—তাহার মধ্যে বিরহের কাব্য রচিত হয় নাই, পথ পানে চাহিয়া কাহার প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা জাগিয়া নাই, আমাদের মিলনের মত সে মিলন অতীতের অগাধ সমুদ্রমথিত নহে। আমাদের বিরহ মিলনে এ দেশের প্রকৃতির প্রভাব অনুভব হয়। অপর দেশে সুতরাং ঠিক সেইরূপ কিছু আশা করা যায় না।

প্রেমবাচক শব্দও আমাদের ভাষায় অধিক মিলে। স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি বিশেষ ভাবসকল বাদ দিয়াও কত কথা—প্রেম, প্রণয়, অনুরাগ, ভালবাসা, প্রীতি, পিরীতি। ইহারা সব যে সম্পূর্ণ এক ভাবই ব্যক্ত করে, তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজীতে একমাত্র প্রতিশব্দ—Love। প্রেম, ঈশ্বর বিষয়ে প্রয়োগ না হইলেও, প্রণয় অপেক্ষা নিষ্কাম। প্রেম ইংরাজী Love শব্দের মত বিস্তৃত এবং সঙ্কীর্ণ, উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। প্রণয়ের প্রেমের মত বিস্তৃতি নাই। প্রণয় মানবের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। প্রেমের

বিলাইয়াই সুখ ; প্রণয় প্রতিদান চাহে। অনুরাগ প্রণয়ের মূলে। প্রণয় অনুরাগাপেক্ষা গাঢ়। প্রীতি হইতে পিরীতির উৎপত্তি বটে, কিন্তু কালক্রমে উভয়ের ভাবে বিস্তর প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে পিরীতির প্রীতির মত গাম্ভীর্য্য নাই। প্রেমের প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভাবগুলি আমাদের ভাষায় সমধিক পরিস্ফুট। ইংরাজী Love শব্দ কোথাও অনুরাগ, কোথাও প্রণয়, এমন স্পষ্ট নহে।

কেহ না মনে করেন যে পাশ্চাত্য ভাষায় প্রেমের ভাল কবিতা নাই। প্রেমের কবিতা সকল ভাষাতেই আছে। বিশেষতঃ ইংরাজ কবিরা প্রেমিকের হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু প্রেমের কবিতা যথেষ্ট থাকিলেও ইংরাজীতে আমাদের মত বিচিত্র প্রেমকাব্যের অভাব আছে বোধ হয়। এ দেশের কবিরা প্রেমকে সমগ্রভাবে এক করিয়া এবং স্বতন্ত্রভাবে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ভাগ করিয়া বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবিরা প্রেমের প্রত্যেক অধ্যায় সেরূপ ভাবে দেখেন নাই। আমাদের বৈষ্ণব কবিদিগের সঙ্গীতে প্রেমের অতৃপ্তি, আকুলতা, আকাঙ্ক্ষার ভাব সুন্দর পরিস্ফুট। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতির সহিত প্রেমের সম্বন্ধ, প্রেমের উপর প্রকৃতির প্রভাব তাঁহারা সুন্দর বুঝিতেন। তাঁহারা প্রেমের সুর ধরিয়াছিলেন ; সেরূপ ভাবে কোনও পাশ্চাত্য কবি বোধ করি প্রেমের সুর ধরিতে পারেন নাই। প্রেমকে তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গীণ আয়ত্ত করিয়াছেন। সেই জন্যই ত বংশীধ্বনির সহিত প্রেমভাবের নীরব সম্বন্ধ এমন দক্ষতার সহিত গাঁথিয়া দিতে পারিয়াছেন। এ দেশে প্রেমের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ হইয়াছে। প্রেমেই আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেমের কাহিনীবৈচিত্র্য বিস্তর—নানা ঘটনার সমাবেশে। কিন্তু তাহাতে প্রেমভাবের সাধারণ বৈচিত্র্য তেমন ব্যক্ত হয় নাই। মানবচরিত্রের বিভিন্নতায় প্রেমের প্রগাঢ়তার তারতম্যই তাহাতে ভাল বুঝা যায়। পাশ্চাত্য প্রেমেও অধীরতা, উৎকণ্ঠা দেখা যায় ; কিন্তু প্রাচ্য কবির মত সে ভাব পাশ্চাত্য কবি ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয়, অধীরতা উৎকণ্ঠার সহিত বিরহেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। বিরহ বিষয়ে আমাদের কবি অদ্বিতীয়। বিরহবেদনা সকল দেশেই আছে—প্রণয়িবিরহে প্রণয়িনী অধীরা। না থাকিবে কেন ? অন্য দেশেও ত এই মানবেরই বাস, তাহাদের হৃদয়ও ত মানবেরই মত। কিন্তু আমাদের কাব্য বিরহাচ্ছন্ন। বিরহকে বিশ্লেষণ করিয়া দেশীয় কবি তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা পর্য্যন্ত বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রেমের মূলে সৌন্দর্য্য উভয় সাহিত্যেই। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা এই সৌন্দর্য্যে

তন্ময়। সেই জন্যই ত তাঁহাদের প্রেমসঙ্গীতে তরঙ্গে তরঙ্গে সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের হৃদয়ে ডুবিতে ডুবিতে তাঁহাদের আর আশ মিটে নাই—যত ডুবিয়াছেন, ততই আরও আরও। তাঁহারা কিছুতেই জুড়াইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য কাব্যে সৌন্দর্য্যের গভীর অগাধে এরূপ নিমজ্জন দেখা যায় কি না সন্দেহ। বৈষ্ণব কবির ভাষা কেবলই সৌন্দর্য্যময়ী, আকুলতাময়ী। পাশ্চাত্য কবি সৌন্দর্য্যে আকুল হইয়া গাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে আকুলতা আর এ আকুলতা বিস্তর তফাৎ। সৌন্দর্য্য-প্রেমে বৈষ্ণব কবি তুলনারহিত। সে গভীরতা এবং বিস্তৃতি অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য।

বৈষ্ণব কবির প্রেম জগন্ময়। প্রেমে তাঁহাদের স্থিতি, গতি, জীবন। প্রেম জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি। তাঁহাদের প্রেমচর্চ্চায় প্রেমের সকল রস ধরা দিয়াছে। তাহা কেবলই সুখপ্রধান নহে। বৈষ্ণব কবির সঙ্গীতে প্রেমের সহিত দুঃখ, জ্বালা, সহিষ্ণুতা। প্রাচ্য সাহিত্যের এই প্রেমজ্বালা পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিরল। আমাদের কবি প্রেমের সহিত জ্বালার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন। যত তীব্র জ্বালা, তত গভীর প্রেম। প্রেমকে সহিতে হয়। সে সুখ চাহে না, বিনিময় নহিলে মরিয়া যায় না, কেবল ভালবাসে। তাহার আইন আদালত নাই, কুলমর্য্যাদা নাই; যেখানে তাহার আবির্ভাব হয়, অনিবার্য্য বলিয়া—না হইলে নয় বলিয়া। পাশ্চাত্য কবিও এ ভাব অবশ্য বুঝেন। কিন্তু আমাদের কাব্যে ইহা কি পরিস্ফুট!

পাশ্চাত্য কাব্যে প্রেমের একটা অনির্দ্দেশ্যতা অনুভব করা যায়। এই অনির্দ্দেশ্য অনুভবনীয় ছায়া-ভাব আমাদের সাহিত্যেও বিরল নহে। আমাদের বংশীধ্বনিময়ী আকুলতায় এ ভাব তরঙ্গায়িত। শুধু তাহাই নহে, মিলনের পূর্ণতার মধ্যেও আমাদের কবিরা একটা আকুল অনির্দ্দেশ্য কি-জানি কি ভাব ধরিতে পারিয়াছেন। প্রাচ্য কবিতায় এ ভাব অনেক স্থলে দেখা যায়। ভারতের কবিই ত প্রথম মিলনের মধ্যে সুখ কি দুঃখ ঠাহরাইয়া উঠিতে না পারিয়া আকুল হৃদয়ে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন। সে ভাবের প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যেই খুঁজিলে মিলিতে পারে। অন্যত্র মিলে কি না জানি না।

প্রেমের একটি ভাব আমাদের ভাষায় সুন্দর ব্যক্ত। সে ভাব আধ-আধ চাহনি, আধ হাসি, আধ চরণে আধ চলন। কটাক্ষের তীব্রতা এখানে বিলুপ্ত, হাস্যের ভঙ্গী নাই, গমনে হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়ার ভাব নাই, অথচ ইহার মধ্যে প্রেমের ঢল ঢল সৌন্দর্য্য পূর্ণ অভিব্যক্ত। আড়নয়নের অপেক্ষা আধ-চাহনিতে যেন শ্রী আছে, কোমলতা আছে। আভিধানিক সংজ্ঞায় তাহা স্পষ্ট বুঝান যায় না। আধ হাসির হৃদয়ে তীব্র বিদ্যুচ্চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না, তাহাতে কেবলই একটি মাধুরীর সন্নিবেশ।

পাশ্চাত্য ভাষায় এই ভাবের অবিকল অনুবাদ মিলে কি না, বলা সহজ নহে। তবে প্রেমের চাহনি, প্রেমের হাসি, প্রেমের চলন পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক আছে। নহিলে অতবড় সাহিত্য টিঁকে ?

প্রেমের বাঁশী কিন্তু আমাদের মত আছে কাহার ? বাঁশীর প্রেম পাশ্চাত্য কবি আমাদের মত বুঝেন না। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির রাধাময়ী কাতরতা তাঁহারা বুঝিবেন কিরূপে ? বৈষ্ণব কবিই সে বাঁশীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন—কারণ, তাঁহার হৃদয়ে সে বাঁশী বাজিত। বৈষ্ণব কবি বাঁশীর স্বরে বিষামৃতের একত্রীকরণ অনুভব করিয়াছেন, তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ভাব ধ্বনিত হয়, তাহার সন্ধান লইয়াছেন, স্বভাবের সহিত তাহার মধুর সামঞ্জস্য বুঝিয়াছেন। প্রকৃতির স্বর সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি লতাকুঞ্জের শিরায় শিরায় কেমন একটা কম্পিত অধীরতা বিকশিত করিত, যমুনার ঘন নীল তরঙ্গে তরঙ্গে কি প্রবাহময় চাঞ্চল্য স্পর্শ দিয়া যাইত, বৈষ্ণব কবিই তাহা ধরিয়াছেন। আর রাধার হৃদয়ের উপর সে বাঁশীর প্রভাব ? তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। প্রেমের শব্দ, স্পর্শ, সৌন্দর্য্য, রস, সকলই বৈষ্ণব কবি বুঝেন। প্রেমের অতীন্দ্রিয়তাও তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। বৈষ্ণব কবির কাব্যই প্রেম।

প্রাচ্য সাহিত্যে প্রেমের সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে। কোকিল মলয় বসন্ত, মেঘ বৃষ্টি বর্ষা ইত্যাদি উদাহরণ। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও প্রণয়কাল May। May আমাদের বসন্তের সহিত কতকটা মিলে। আমাদের বর্ষার ব্যাপার পাশ্চাত্য সাহিত্যে না মিলিবারই কথা। এ দেশের কবিরা ঋতুতে ঋতুতে প্রেমের ভাব আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে এত ঋতুভেদ বোধ করি নাই, সুতরাং ভাবেরও প্রতি দিন পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যে কয় ঋতু আছে, তাহার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে প্রেমের ভাবের পরিবর্ত্তন কি সে দেশে এরূপ আলোচিত হইয়াছে ? জানি না ত। এ দেশে বসন্ত বর্ষার বিরহের প্রভেদ অনেক দিন হইতেই আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কোন কোন বৈষ্ণব কবি সকল ঋতুরই ভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

কালিদাসের মেঘদূতের অত সৌন্দর্য্য—বাহ্য প্রকৃতির সহিত হৃদয়ের ভাবের সম্মিলনে। অত কথায় কাজ কি, মেঘকে বিরহের দূত না করিলে তাঁহার সকলই ব্যর্থ হইত। কালিদাসের মেঘদূতে মধ্যে মধ্যে বহিঃপ্রকৃতিতে প্রেমের অভিব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও এ ভাব অনেক স্থলেই দেখা যায়। শেলীর প্রেমতত্ত্ব ত এই ভাব লইয়া রীতিমত তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাশ্চাত্য কাব্যে আরও উদাহরণ মিলিতে পারে। বাহুল্যভয়ে এইখানেই নিবৃত্ত হইলাম।

প্রেমের স্বাধীন মুক্ত ভাব পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেরূপ মিলে, আমাদেরও কি সেইরূপ? বৈষ্ণব কবিদিগকে ছাড়িয়া দিলে আমাদের মুক্তভাব অল্পই। সংস্কৃত কবিরাও দাম্পত্য প্রণয়ের সঙ্গে অনেক সময় মুক্তভাব যোগ করিয়া দিয়াছেন। মুক্তভাবে বৈচিত্র্য সুব্যক্ত। ইদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের কবিরা প্রেমকে বদ্ধ করিয়া পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রেমের শিক্ষা হয় নাই, অথচ তৃষ্ণা প্রবলা; সুতরাং স্বভাবতই উচ্ছৃঙ্খলতার আবির্ভাব। উদাহরণ—বিদ্যাসুন্দর। মুক্ত ভাবে যে সুগভীর সংযত শিক্ষা হয়, প্রাচীরবেষ্টিত বিলাসের মধ্যে তাহা হয় না। বৈষ্ণব সাহিত্যই আমাদিগের মুখ রক্ষা করিয়াছে। নহিলে, কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের দুই-চারিখানি প্রেমকাব্য লইয়াই আমাদের নাড়াচাড়া করিতে হইত। কৃষ্ণনগরের রাজসভা-বর্দ্ধিত সাহিত্যের ত আর উল্লেখ করিয়া আমাদের গৌরব করা চলিত না।

প্রাচ্য সাহিত্যে প্রেমের সহিত একটা বিশেষ লজ্জার ভাব জড়িত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেম নির্লজ্জ নহে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের মত তাহা একেবারে লজ্জা-আচ্ছন্ন কি না, জানি না ত। হয় ত উভয় দেশে লজ্জার প্রকৃতি ভিন্ন। সেই জন্য আমাদের প্রেমকে যেরূপ সলজ্জ মনে হয়, পাশ্চাত্য প্রেমকে সেরূপ মনে হয় না। Blush করা কিন্তু উভয় দেশেরই সাধারণ প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়।

পাশ্চাত্য প্রণয়াপেক্ষা আমাদের প্রণয়ে সহচরী-সান্ত্বনার যেন কিছু আধিক্য দেখা যায়। বিরলবাস উভয় সাহিত্যেই। সখীসমাগমে আমাদের সাহিত্যে কণ্ঠধ্বনিটা অনেক সময় জমে ভাল। সখীরা থাকায় অনুরাগ ব্যক্ত করিবার সুবিধা মন্দ নয়। তাই বলিয়া সকল সময়ে সখীসঙ্গ অসহ্য। আমাদের কবিরা কোন্ অবস্থায় সখীকে রাখিতে হইবে, কোন্ অবস্থায় বা বিদায় দিতে হইবে বুঝেন। মানসিক অবস্থার উপরেই তাহা নির্ভর করে। পাশ্চাত্য সাহিত্য যে একেবারে সখীবিবর্জ্জিত, তাহা বোধ হয় না, তবে আমাদের সখীসমাগমে কিছু জমাট্ অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এতটা নহে।

প্রাচ্য সাহিত্যের কে-জানে-কাহাকে অভিশাপ ভাব কি পাশ্চাত্য সাহিত্যে আছে? বোধ হয় না। আমাদের রাধার এ অনির্দ্দেশ্য অথচ সুস্পষ্ট অভিশাপ অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেমের কতকগুলি সূক্ষ্ম শিরার তাড়িত স্পর্শ অনুভব করা যায়। তাহাতে প্রেমের মৃদু অব্যক্ত সৌন্দর্য্য অনেকটা প্রকাশ পায়। তাহা হইতে অবশ্য এমন প্রমাণ হয় না যে, প্রেমের সূক্ষ্ম ভাবগুলি এ দেশের কবিরা

আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তবে ভাববিশেষ পাশ্চাত্য সাহিত্যেই সমধিক ব্যক্ত।

যে তরুণ সাহিত্যে এই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রেমবৈচিত্র্যের শুভ সম্মিলন, সে সাগরসঙ্গম সাহিত্যের ভবিষ্যৎ না জানি কি উজ্জ্বল! সে সাহিত্য হইতে যে প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইয়া জগতের হৃদয় সিক্ত করিবে, তাহাতে ধরণীর সমস্ত রক্তচিহ্ন মুছিয়া গিয়া এক শান্ত আনন্দের আবির্ভাব হইবে। প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর নব্য সাহিত্যের অভ্যুদয় সম্ভাবনা নাই। এখন কেবলই সেই প্রেম চাহি—প্রেম আর প্রেম।

২

বৈষ্ণব কবিদিগের কল্যাণে আমাদের প্রেম-সাহিত্য বজায় রহিয়া গেল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে প্রেমের যেরূপ স্বাধীন চর্চ্চা হইয়াছে, আমাদের সেরূপ কোন কালে হয় নাই। আমাদের সামাজিক রীতিনীতি সকলই স্বাধীন প্রেমচর্চ্চার বিরোধী। প্রেমের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির পূর্ব্বেই আমাদের দাম্পত্য-বন্ধন; সুতরাং স্বাধীন প্রেমচর্চ্চার আবশ্যকই থাকে না। প্রাচীন কালে এ দেশে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অভিলষিত ব্যক্তির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যাইত; কিন্তু তাহাতে যে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রেমবৃত্তির এ দেশে সম্যক্ অনুশীলন হইয়াছে, তাহা নহে। স্বয়ম্বর প্রথায় রূপ এবং গুণ মাত্র নির্ব্বাচনের সহায়তা করে। পাশ্চাত্য প্রেমেও রূপ এবং গুণ মূল উপাদান। কিন্তু পরস্পরের হৃদয়ে স্ব স্ব প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে কত যত্ন এবং অনুষ্ঠান! এই সকল আশা নৈরাশ্য উদ্যম অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেমচর্চ্চা না হইয়া থাকিবার জো নাই। স্বয়ম্বরে গুণের সহিত, হৃদয়বৃত্তির সহিত সংঘর্ষে আসিতে হয় না, তাহা কেবল শ্রুত মাত্র। পাশ্চাত্য দেশের সমাজ-গঠন স্ত্রী এবং পুরুষের স্বাস্থ্যজনক সম্মিলনের অনুকূল, বিশেষতঃ প্রেমের উপরেই সেখানে দাম্পত্য-বন্ধন অনেকটা নির্ভর করে, প্রেমের স্বাধীন চর্চ্চা এই কারণে অপরিহার্য্য। আর প্রেমের স্বাধীন চর্চ্চায় বাধা দিতে না পারিলেই হিন্দু সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যায়। প্রেম ত আর জাতি কুল বিচার করিয়া আসে না। তবে দৃঢ় সমাজবন্ধনে বাঁধিয়াও নাকি মানব-প্রকৃতিকে একেবারে চাপিয়া রাখা যায় না, সেইজন্য শৃঙ্খলজর্জ্জর বদ্ধ সমাজ-হৃদয়ের মধ্য হইতেও প্রেমের মুক্ত ভাবের সঙ্গীত উঠিয়াছে। এই মুক্ত ভাব আমাদের বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায়। প্রেমপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দু সমাজের নিগড়বদ্ধ সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাপ্রয়াসী উদার হৃদয়ের প্রবল বিদ্রোহ। যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রস্পর্শে আপনাকে কলঙ্কিত বোধ করিতেন, সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম চিররুদ্ধদ্বার মুসলমানকে পর্য্যন্ত প্রেমালিঙ্গন দিতে

কুণ্ঠিত হইল না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে মুক্ত প্রেমের আধার হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রেমানুশীলনেই ত সে হিন্দু সমাজের অন্তরে অন্তরে আঘাত দিয়াছিল। ভাগবতের কবি বোধ করি প্রেমের মুক্ত ভাবের আবশ্যকতা প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা তাঁহার কার্য্য অগ্রসর করিয়া দেন, চৈতন্যে আসিয়া সেই মুক্ত ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইল—সে ভাব আকার প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার অবসর পাইল। পূর্ব্বে যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় বীজভাবে লুক্কায়িত ছিল, চৈতন্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ। আমাদের সমাজে বা সাহিত্যে আদিরসের প্রাবল্য সত্ত্বেও প্রেমের বৈষ্ণব অনুশীলন কোথায়? ইদানীন্তন কবিরা মধ্যে মধ্যে সমাজ-নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুক্ত ভাবের অনভ্যাসে কেবল একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর হীন ভাব রহিয়া গিয়াছে মাত্র। আর বৈষ্ণব প্রেমচর্চ্চাও ত চলিল না। এখানে সেই যন্ত্র-নিয়ম। সুতরাং প্রেমের গঠন-কার্য্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতির মত অভিজ্ঞতা আমাদের সম্ভব নহে। সে সমাজের গঠনপ্রণালীই প্রেমচর্চ্চার অনুকূল।

কিন্তু তথাপি পাশ্চাত্য সাহিত্যকে আমরা কিছু দিয়া যদি ধরিতে পারি ত সে প্রেম। এমন কি, সময়ে সময়ে মনে হয় যে, বৈষ্ণব কবিদিগের সাহায্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে আমরা ছাড়াইয়া উঠিতে পারি বা। ইহা দুরাশা এবং শূন্যগর্ভ কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু এমন দুরাশাও মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে জাগে। বোধ করি, এক দিক্ দিয়া দেখিলে আমাদের এ কল্পনাও কতকটা সত্য হইয়া দাঁড়ায়। সে দিক্ প্রেম-ভাবের সাধারণ বৈচিত্র্য। সাধারণ বৈচিত্র্য কাহাকে বলে, বুঝান কিন্তু সুকঠিন। বৈষ্ণব কবির প্রেমচর্চ্চায় স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ব্যতীত প্রেমের সখ্য এবং বাৎসল্য রস আলোচিত হইয়াছে; এমন কি, পশুজগৎও সে প্রেম হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এ হিসাবে অবশ্য প্রেমের সাধারণ বৈচিত্র্য কতকটা বুঝান যায়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের প্রেমের সাধারণ বৈচিত্র্য কিছু স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব কাব্যে বিশেষ বিশেষ সাধারণ অবস্থার স্বতন্ত্র ভাব লইয়া যে আলোচনা আছে, তাহাতেই সাধারণ বৈচিত্র্য সমধিক ব্যক্ত বলিয়া বোধ হয়। শুধু অবস্থাভেদ অবশ্য সর্ব্বস্ব নহে, প্রেমের একটা সাধারণ ভাবও ইহার মধ্যে থাকা চাই। প্রেমের এই সাধারণ ভাব—সাধারণ বৈচিত্র্য নহে—পাশ্চাত্য কাব্যে বহুল। বৈষ্ণব কাব্যেও ইহার অভাব নাই। সাধারণ বৈচিত্র্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও আমরা তাহার উদাহরণ দেখাইতেছি। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমালোচনায় বিরহ, ভূত-বিরহ, ভাব-বিরহ, মান, অভিসার, এই সকলই প্রেমের সাধারণ বৈচিত্র্যের অন্তর্ভূত। এই গেল প্রেমের এক দিক্। এবং এই

দিকে আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমকক্ষতা স্পর্দ্ধা করি। কিন্তু প্রেমের আর এক দিকে আমরা বড় অগ্রসর নহি। মোটামুটি তাহাকে কাহিনী-বৈচিত্র্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাহিনী-বৈচিত্র্য সে দিকের গভীরতা এবং বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম। পাশ্চাত্য কবিরা বিবিধ চরিত্রগঠনে প্রেমের নানা দিক্ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমের সহিত সংসারের নানাবিধ জটিল সম্পর্ক, মানব-চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য। অনেক সময়ে যৌবনের একটা ব্যক্তিবিশেষবদ্ধ নহে, এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষ পরিস্ফুট দেখা যায়। বৈষ্ণব কবিদিগের এরূপ ব্যক্তিসম্পর্কশূন্য অথচ মানবপ্রেম বোধ করি নাই। ইহা ভিন্ন প্রেমের আরম্ভের বিবিধ জটিল রহস্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেরূপ সুব্যক্ত, আমাদের সেরূপ বোধ হয় না। কিন্তু এ সকল কথার দুই চারি কথায় মীমাংসা অসম্ভব। বর্ত্তমান লেখকের এ বিষয়ে মীমাংসার ক্ষমতা নাই। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, ব্যুৎপত্তি অভাবে বিষয়টি তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে পদে পদে ভ্রম সম্ভাবনা।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, পাশ্চাত্য দেশে মানবপ্রকৃতিগত বিরহ, অভিমান প্রভৃতি থাকিলেও এ দেশের সাহিত্যের মত পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ সকল বিষয় তেমন প্রাধান্য লাভ করে নাই। বিরহ সে দেশেও আছে, এবং অবিকল প্রতিশব্দের অভাব থাকিলেও কাব্যে বিরহভাব পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মত বিরহ-কাব্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে দুর্লভ। তাহার কারণ, সামাজিক অবস্থার প্রভেদ। অন্যান্য বিবিধ বিভিন্ন কারণও হয় ত ইহার মূলে অল্পবিস্তর কার্য্য করে; যেমন, প্রকৃতির প্রভাব, জাতির চরিত্রগত বিশেষত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। বিরহজ্বালা কিন্তু মানবপ্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ। প্রিয় জনকে আমরা কাছে কাছে রাখিতে চাই। যখন তাহার দর্শন স্পর্শন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হই, তখন স্বভাবতই কাতর হইয়া পড়ি। প্রাচ্য হৃদয়ের সহিত পাশ্চাত্য হৃদয়ের এখানে প্রভেদ হইতে পারে না। তবে নানা অবস্থাভেদে আমাদের বিরহ পাশ্চাত্য বিরহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দারুণ। কেহ কেহ বলেন, পাশ্চাত্য হৃদয় অবিশ্রান্ত উদ্যমে প্রকৃতিকে দমন করিয়া রাখে—সম্পূর্ণ জোর করিতে দেয় না, আর আমরা তাহার প্রভাবে অনেকটা ভাসিয়া যাই, এই কারণে আমাদের সহিত পশ্চিমের বিরহ বিষয়ে এত প্রভেদ। এ কথা অভ্রান্ত কি না জানি না, কিন্তু নিতান্ত অশ্রাব্য নহে।

মানাভিমানের ব্যাপার আলোচনা করিয়া দেখিলে বিভিন্ন সমাজের প্রভাব আরও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া কৃত্রিম অভিমান সকল দেশেই আছে।

কিন্তু অভিমানের গুরুতর কারণ, প্রেমের মূল নিয়ম লঙ্ঘন। আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির কোন বিষয়ে হাত নাই। স্বামী ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন, সুতরাং অন্যার প্রতি তিনি অনুরক্ত জানিলেও স্ত্রীর কিছু বলিবার অধিকার নাই। দুই দিন গৃহকোণে নয়নজলে তাহার অভিমান সমাপন করিতে হয়। অধিক দূর গড়াইলে হয় ত দুইটি মিষ্ট বচন এবং স্বামিদর্শনসুখলাভ হইতেও বঞ্চিত হইয়া সধবাবস্থায় বৈধব্যযন্ত্রণা বহন করিতে হইবে। অগত্যা দুই দিনের সাধনাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ ভাব অবলম্বন না করিলে চলে না। অভ্যাসবশতঃ পুরুষের অন্যানুরক্তি স্ত্রীর নিকট তেমন গুরুতর কিছুই নহে। ইংরাজ স্ত্রীর আমাদের স্ত্রী অপেক্ষা স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা আছে। তাঁহাদের প্রেমের সহিত বিশেষরূপে সম্মানের ভাব জড়িত। প্রেমের মূল নিয়মে আঘাত এই জন্য ইংরাজ স্ত্রীর অসহ্য। সেখানে আঘাত পড়িলে তাঁহার সমস্ত সম্মানে আঘাত পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে অবরোধপ্রথা ত সম্মান-প্রমাণ নহে, প্রেমের একনিষ্ঠতা পুরুষের পক্ষেও নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে দম্পতির দৃঢ় বন্ধনও ছিঁড়িয়া যায়। সুতরাং আমাদের অভিমানে চোখের জলের যেটুকু রস থাকে, পাশ্চাত্য অভিমানে সকল সময়ে তাহা না থাকিতেও পারে। এ দেশে ভাঙ্গা মান দুই চারিটি মিষ্ট কথায় জোড়া লাগে। পাশ্চাত্য দেশে ভাঙ্গিলে গড়া তত সহজ নহে। স্ত্রী পুরুষ কাহার পক্ষে কোন্‌টা কত দূর সুবিধা অসুবিধা, স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু ইহা হইতে সামাজিক অবস্থাভেদে প্রেম-ভাবের বিভিন্নতা সহজেই উপলব্ধি হয়। বিভিন্ন সমাজের কাব্যও তাই স্বতন্ত্র ভাবের।

পাশ্চাত্য সমাজের সহিত আমাদের সমাজের খুঁটিনাটি কোথায় কিরূপ প্রভেদ জানি না, কিন্তু প্রধানতঃ মুক্ত ভাবেই বোধ করি, এ দেশের সহিত পশ্চিমের অনৈক্য। আমাদের বদ্ধ অবরোধ এবং নিশ্চেষ্ট সুখই জীবনের প্রধান উপভোগ। পাশ্চাত্য দেশে অবিশ্রান্ত স্বাধীন উদ্যম। সুতরাং সহজেই বিলাসের দিকে আমাদের গতি। স্বাধীনতা-প্রিয় পাশ্চাত্য জাতির প্রেমে সুগভীর সম্মানের প্রতিষ্ঠা—প্রেমকে সে জাতি লঘুভাবে দেখিতে পারে না। আমরা প্রেমকে ততটা সম্মান দিই না। তবে বৈষ্ণব কবির নিকট প্রেমের মর্য্যাদা আছে।

তাহা হইলে বৈষ্ণব কবির রাধাকৃষ্ণের প্রেম আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। দাম্পত্য-প্রণয় না হইলেও প্রেমের সম্মানের তারতম্য কতকটা বুঝা যায়। রাধিকা কৃষ্ণের প্রতি একান্ত অনুরক্তা, কৃষ্ণের জন্য তাঁহাকে কুলে শীলে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ ত সেরূপ একনিষ্ঠ নহেন। বার বার প্রেমের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তিনি রাধার নিকট অপরাধী হইয়াছেন, তবুও রাধা ক্ষণিক অভিমানের পর কথা না

কহিয়া থাকিতে পারেন না। রাধার কথাবার্ত্তায় বা ভাবভঙ্গীতে মর্ম্মাহতা পাশ্চাত্য রমণীর তেজভাব বড় নাই। তবে বৈষ্ণব কবির প্রেমে সম্মানের গভীরতা কোথায়? কিন্তু এইখানে একটি কথা আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বৈষ্ণব কবি কি ভাবে দেখিতেন? বৈষ্ণব কবির কৃষ্ণ এই বিপুল সংসারের পালনকর্ত্তা। রাধা তাঁহার সৃষ্টি। অসীমের প্রেম পরিমিত আত্মার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে না, বিপুল সংসারের সর্ব্বত্রই ত তাঁহাকে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে। রাধার কিন্তু কৃষ্ণে সম্পূর্ণ তৃপ্তি। রাধার অভিমান কেবল কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিয়া। কিন্তু এ আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে কিছুই বুঝা যায় না। একটু নামাইয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে আবার বৈষ্ণব কবির উদ্দেশ্যের অবমাননা করা হয়। সকল বৈষ্ণব কবিই যে আধ্যাত্মিক ভাবে তন্ময় হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা হয় ত পূর্ব্বকবিদিগের পদানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু উচ্চ ভাবেও প্রেমের সম্মানভাব কতকটা বুঝা যায়। সসীমের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অসীমও বাঁধা পড়িয়াছে; ইহা কি সামান্য মর্য্যাদা? তবে প্রেমের ত্রুটি করিয়া কৃষ্ণ সমস্ত জগৎ উপেক্ষা করিয়া রাধার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে পারেন না। রাধার তাহাতে তৃপ্তি না হইতে পারে, নাচার।

কিন্তু অসীমে না গিয়াও বৈষ্ণব কবির প্রেমের সম্মানভাব দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে। সম্মানভাব এ সাহিত্যে যদি না থাকিবে, তবে এত প্রেমের গান কেন? আমরা চণ্ডীদাসের একটি গান হইতে বৈষ্ণব প্রেমসম্মান দেখাইতেছি। রজকিনীকে তিনি যখন প্রেম জানাইয়াছেন, তখন বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, কামগন্ধ নাহি তায়। এইখানেই প্রেমের সম্মানভাব পরিস্ফুট। যেখানে আধ্যাত্মিকতা এমন প্রবল, সেখানে একনিষ্ঠতার অভাব হইতেই পারে না। সুতরাং বৈষ্ণব কবি প্রেমের একনিষ্ঠ সম্মান বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। একনিষ্ঠতাই তাঁহার লক্ষ্য।

রাধাকৃষ্ণের কাহিনী সমাজক্ষেত্রে কতকটা হয় ত লাগান যাইতে পারে। রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া সংসারের সকল কাজকর্ম্মে পুরুষ উদাসীন হইতে পারে না। বাস্তবিক প্রেমের ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতা নহে। কিন্তু সে কথা অস্বীকার করিতেছে কে? পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সহিত এ কথার যোগই বা কোথায়? একনিষ্ঠতা আবশ্যক। তাহা ত সঙ্কীর্ণতা নহে। প্রেম বিতরণে একনিষ্ঠতার হানি হয় না। প্রেমের ছলনা করিয়া যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বনই একনিষ্ঠতার হানিকর। এইখানেই প্রেমের সম্মান লোপ। আমাদের সামাজিক নিয়মে ইহার বাধা নাই।

কিন্তু সমাজ-নিয়মের বাধা না থাকিলেও প্রাচীন ভারতে পুরুষের একনিষ্ঠতার মহত্ত্ব উজ্জ্বল চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি-কবির রামচন্দ্রের চরিত্রই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। রামচন্দ্র দায়ে পড়িয়া সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাধ্বী পতিব্রতার অকপট প্রেমের প্রতি ভুলিয়াও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। তিনি যজ্ঞ করিলেন—সুবর্ণের সীতা নির্ম্মাণ করাইয়া। তপোবনের বিজন নীরবতার মধ্যে এই সংবাদ জানকীর নিরাশ হৃদয়ে কি সান্ত্বনা দিয়াছিল! রামায়ণে প্রেমের অন্যান্য দিক্‌ও প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন—স্নেহ, ভক্তি, সোহার্দ্দ। সে সকল দিক্ আলোচনার আমাদের এখন তেমন আবশ্যক নাই। আমরা কেবল বলিতে চাহি যে, মহৎভাবের প্রতি সম্মান সর্ব্বত্রই। প্রাচ্য বলিয়াই মানবচরিত্র অধঃপতিত নহে।

স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভাব হইতেই বোধ করি প্রেমের সম্মানভাবের উৎপত্তি। পাশ্চাত্যদেশে রমণীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন বহুদিন হইতে বিবিধ উপায়ে অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা স্ত্রীজাতিকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া দেখি, পাশ্চাত্য-জাতি উত্তমার্দ্ধ বলিয়া গণ্য করেন। মধ্য যুগে chivalryর প্রসাদে পাশ্চাত্যেরা রমণীকে যে উর্দ্ধে উঠাইয়াছেন, শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে পাশ্চাত্য-জাতির হৃদয়ের আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্যদেশে সেই অবধি রমণীর সম্মান বাড়িয়া উঠিয়াছে। তবে মধ্যযুগের অনেক বাহ্য অনুষ্ঠান এখন সরিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে অন্ধকূপে অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রাখার উপরেই রমণীর সম্মান নির্ভর করে। পুরুষজাতির সহিত মুখদেখাদেখি না থাকায় সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের সম্মান বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত! পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীপুরুষে মিশামিশি আছে, উভয়েরই তাহাতে সংযত হইয়া চলিতে হয়। বলবান্ পুরুষ রমণীকে সমধিক সম্মান করিতে শিখে, স্ত্রীজাতিও পুরুষের সহিত আলাপাদিতে অনেক উন্নত শিক্ষা লাভ করে। স্ত্রীর প্রতি বিশেষ সম্মান পাশ্চাত্য সমাজের শিরায় শিরায় না প্রবেশ করিলে সেখানে প্রেমের সংযত স্বাধীন চর্চ্চা এত দিন চলিত না। আমাদের সমাজে শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত রূপ, গুণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলই ত পরের মুখে। পূর্ব্বরাগমূলক দাম্পত্যবন্ধন যে সমাজের অস্থি-মজ্জায়, সে সমাজে স্ত্রীপুরুষের স্বাস্থ্যকর সম্মিলন অপরিহার্য্য। ভাল-মন্দের কথা হইতেছে না—ইহা আবশ্যক, না হইলে নয়।

পূর্ব্বরাগ মানব-প্রকৃতির অস্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। বোধ করি, অসূর্য্যম্পশ্যারও প্রেম-বিষয়ে স্বাধীনতা ভাল লাগে। এই প্রাচ্যদেশেও ত কাব্যে পূর্ব্বরাগবাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক অবস্থাভেদে পূর্ব্বরাগের ভাবভঙ্গী পাশ্চাত্য হইতে আমাদের স্বতন্ত্র। স্ত্রীপুরুষের মেলামেশার উপর এ সকল খুঁটিনাটি প্রভেদ অনেকটা নির্ভর

করে। বৈষ্ণব কবির কতকগুলি পূর্ব্বরাগের গান আছে—বড়ই সুন্দর, ভাবময়। ইদানীন্তন বঙ্গ-কবিরাও পূর্ব্বরাগ বর্ণন করিয়াছেন। তাহা যেমনই হোক, মানব-প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে। দাম্পত্য-বন্ধন পূর্ব্বরাগমূলক না হইলেও প্রেম গভীর হইতে পারে দেখাইয়া যাঁহারা পূর্ব্বরাগকে সামাজিক শিক্ষার ফল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, দৃঢ় সমাজবন্ধনের বহিঃক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই পূর্ব্বরাগের স্বাভাবিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে বাহুল্য প্রমাণের আবশ্যক নাই।

প্রাচ্য সাহিত্যের সম্পূর্ণ নিজ-সৃষ্টি অভিসার। পাশ্চাত্য দেশে অভিসার নাই। সঙ্কেতস্থানে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মিলন পাশ্চাত্য সাহিত্যে মিলিতে পারে, কিন্তু আমাদের অভিসার এ শুষ্ক সম্মিলন নহে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ধরণী অন্ধকার, ক্ষণে ক্ষণে বিজলী হানিতেছে, একাকিনী রাধা বিজন বনের মধ্য দিয়া চঞ্চলচরণে চলিয়াছেন। আমাদের কবির অভিসারে সমস্ত প্রকৃতি ঘনাইয়া আসে; অন্তরের উপর বহিঃ-প্রকৃতির ঘন নিবিড় ছায়া পড়ে। এ কবিত্ব প্রস্ফুটিত করিতে প্রাচ্য কবিই পারদর্শী। এ শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারা, মেঘের উপর মেঘ, অন্ধকারের উপর অন্ধকার, প্রবল বর্ষা অন্য দেশের কবি বুঝিবেন কিরূপে? আমাদের বর্ষায় আকুলতাময় কদম্ব-সৌরভ, সচকিত হরিণ-দৃষ্টি, মধুর কেকাধ্বনি; তাহার আনন্দ আমাদের প্রাচ্য কবিই বুঝেন। এমনটি কি আর অন্য দেশে আছে? সেই জন্যই ত আমাদের বিরহ, আমাদের অভিসার পাশ্চাত্য সাহিত্যে দুর্লভ।

কিন্তু কেবল মাত্র প্রকৃতিই কি আমাদের অভিসারের কারণ? সমাজের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই? এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা সুকঠিন। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। আমাদের জাতীয় ভাব এবং সামাজিক অবস্থাও হয় ত অভিসার ভাবের কতকটা অনুকূল। নহিলে, শুদ্ধ মাত্র প্রকৃতির প্রভাবে যে এই বিষয় দেশীয় কাব্যে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে একটু সময় লাগে এবং সন্দেহ বোধ হয়। বিরহের মত অভিসার ত সার্ব্বজনীন নহে। জানি না, অভিসারের মধ্যে সমাজ-নিয়মের ব্যতিক্রম-প্রয়াস লক্ষিত হয় কি না। কিন্তু ইহাতে ত স্বাধীন প্রণয় কতকটা মনে হয়। আর অভিসারে রমণীর প্রাধান্য দিয়া কবিত্ব অনেকটা ফুটিয়াছে। বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের মধ্যে অন্ধকার পথে একাকিনী রমণীর ভীত চকিত ভাব বড়ই সুন্দর। পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থায় এ ভাব কিরূপ খুলে না খুলে, বলা সহজ নহে।

এখন সে কথা থাক্। কাব্যে যে দেশের যাহা যত থাকুক না থাকুক, বিরহ অভিমান প্রভৃতি বিবিধ ভাব অল্পবিস্তর আছে সকল দেশেই। প্রেমের এ সকল অবস্থা

আলোচনা কিন্তু পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্য দেশে ভালরূপ হইয়াছে। পাশ্চাত্য কাব্যে প্রেমের অপর কতকগুলি অবস্থা সমালোচিত হইয়াছে। সে অবস্থাগুলি সাধারণতঃ কাহিনী-বৈচিত্র্যের দিকে। প্রেমের দিক্ দিয়া মানব-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনচেষ্টা এ দেশে যে হয় নাই, এমন নহে; সংস্কৃত কাব্য এবং নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিন্তু তাহার সমধিক বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে ভারতের প্রাচীন কবিরা প্রেমের যে গুটিকত আদর্শ চরিত্র গড়িয়াছেন, তাহা কোনও দেশের কোনও চরিত্র অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিবিধ বৈচিত্র্য আমাদের সাহিত্যে নাই স্বীকার্য্য। কত বিভিন্ন অবস্থায় মানবের মনে কত বিভিন্ন ভাব হইতে প্রেম জন্মায়, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাহা সুচিত্রিত। এই প্রেম-সংঘটনের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীপ্রকৃতি নীরবে কি ভাবে কার্য্য করে, উভয় জাতির নিজের মধ্যেও কত প্রকৃতিগত শিক্ষাগত বৈষম্য নানা দিক্ হইতে আসিয়া নানা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অপর জাতির সহিত সম্মিলিত হয়, এ সকল পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিচিত্র বর্ণে পরিস্ফুট। স্ত্রীপুরুষের শিক্ষাগত এবং স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সেখানে তন্ন তন্ন বিশ্লেষিত। আমাদের এ বিশ্লেষণ পাশ্চাত্য অপেক্ষা বিশেষ অসম্পূর্ণ।

পাশ্চাত্য প্রেমচর্চ্চার সহিত আমাদের কোথায় যেন মূল প্রণালীগত প্রভেদ আছে মনে হয়। নিশ্চিত বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য প্রেমচর্চ্চা অনেকটা ইংরাজীতে যাহাকে Ideal বলে। আমাদের প্রেমচর্চ্চাকে সে হিসাবে কতকটা অনুভূতিমূলক বলা যাইতে পারে বোধ করি। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও অনুভূতির অভাব নাই, তবে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য তুলনা করিলে প্রাচ্যকেই বিশেষরূপে অনুভূতিমূলক বলা যায়। এ সম্বন্ধে সকল খুঁটিনাটি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই; মোটামুটি বাহিরে বাহিরে যাহা মনে হয়, বলিয়াছি মাত্র। বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনা করিলে আরও দেখা যায়, পাশ্চাত্য প্রেমে এ দেশের মত সাধনার কথা বড় নাই। আমাদের বৈষ্ণব কবির প্রেমের বিশেষ সাধনা আছে, তাহাতে অনেকটা ধর্ম্ম। পাশ্চাত্য প্রেমের কবিতা আর এক ধরণের। তাহা ধর্ম্ম নহে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে আমাদের শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির কাহার সহিত প্রেমের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা যেরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যে তাহা হয় নাই। পাশ্চাত্য সমালোচনপ্রণালীর সূক্ষ্মদর্শিতা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। প্রেমের এই বিশ্লেষণ ব্যাপারের মধ্যে বিজ্ঞান দর্শনের কতটুকু কি সংস্রব আছে না-আছে জানি না, কিন্তু বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও প্রেমের এ জটিল সম্বন্ধ সাদাসিধা একরূপ বুঝা যায়। প্রেম সম্পূর্ণ একই

বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ নহে। তাহা কতকাংশে অনুভূতিমূলক, কতক বা অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত জড়িত, আধ্যাত্মিক দিক্‌ও একটা আছে। ব্যক্তিবিশেষের প্রেমে আবার প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ বৃত্তির সমধিক প্রাধান্য দেখা যায়। কাহারও প্রেম হয় ত অনেকটা ইংরাজীতে যাহাকে emotional বলে, কাহারও বা intellectual। অবিকল ভাবপ্রকাশক বাঙ্গলা প্রতিশব্দ অভাবে ইংরাজী কথাই আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হইল।

প্রাচীন ভারতে প্রেমের intellectual অনুশীলন অনেকটা হইয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু এ দেশে প্রেমানুশীলন ঈশ্বর সম্বন্ধে। সেই জন্যই বহু পূর্ব্বে অন্যান্য দেশ যখন অরণ্যের স্তব্ধ অন্ধকারমধ্যে বিলীন হইয়া ছিল, তখন ভারতের কবি নিষ্কাম ধর্ম্মের নাম লইয়া অমর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যে প্রেমের বিশ্বজনীনতা দেখা যায়, তাহাও ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত বলিয়াই। দেবতাবর্জ্জিত অথচ দেবভাবময় প্রেম পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপরিস্ফুট। পাশ্চাত্য প্রেম মানব-সন্তানকে মনুষ্যত্বে টানিয়া তুলে। ঈশ্বরপ্রেম আমাদিগকে অনন্তের দিকে ত টানেই। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের প্রাচ্য সাহিত্যে এমন প্রেমানুশীলন। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেম আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে। সেই জন্য তাহার চর্চ্চা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে পারি না। আমরা প্রধানতঃ স্ত্রীপুরুষগত প্রেম লইয়াই আলোচনা করিয়া আসিতেছি।

মানবপ্রেমের মধ্যেও স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি নানা বিভাগ উপবিভাগ আছে। সে সকল আমরা এ প্রবন্ধে বাদ দিয়াছি। বৈচিত্র্য এবং রহস্য স্ত্রীপুরুষের প্রেমের মধ্যেই সমধিক ব্যক্ত। সেই জন্যই সম্ভবতঃ এ প্রেম সম্বন্ধে যত কাব্য রচিত হইয়াছে, স্নেহ ভক্তি বিষয়ে তত হয় নাই। বাস্তবিক, স্ত্রীপুরুষ-প্রেমের প্রগাঢ়তা, সুখদুঃখ, জ্বালা, ভয়, ভ্রান্তি, সকলই চূড়ান্ত। মনোবৃত্তির এরূপ অনুশীলন প্রেমের অন্যান্য বিভাগে বোধ করি নাই। এই এক প্রেমাকর্ষণে অতি ক্ষুদ্রভাবের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে যেরূপে সুবৃহৎ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হইয়াছে, দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সমগ্র মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সে সকল বিস্তারিত আলোচনার স্থান অবশ্য এ নহে।

প্রেমের ঐতিহাসিক বিকাশ আলোচনা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য। মানবজাতির বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া প্রেমের আদর্শ ক্রমে ক্রমে কত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং এই ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে অন্তর্নিহিত কি ভাবের ক্রমাভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা প্রাচ্য সাহিত্যে কোথাও পরিস্ফুট নহে। পাশ্চাত্য জগতে ক্ষুদ্রতম কীটাণুর

প্রেম পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়া মানবপ্রেমের ভাব বিশ্লেষিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞানের সংস্পর্শ থাকিতে পারে, কিন্তু ভাব আলোচনার পক্ষে সুবিধা বৈ অসুবিধা হয় না।

সেখানে এখন প্রতি দিন নানা দিক্ হইতে প্রেমভাবের নূতন নূতন বিশ্লেষণ হইতেছে। আমরা হয় ত এক দিক্ দিয়া মাত্র দেখিয়াছি ; আরও কত দিক্ আছে। আমরা ত আর প্রেমকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বসিয়া নাই। প্রেমের রহস্য নিঃশেষ করা অসম্ভব। পুরাতনের মধ্য হইতে দিন দিন নব নব বৈচিত্র্য বিকশিত হইয়া তাহাকে চিরনবীন করিয়া রাখিয়াছে। বৈজ্ঞানিক এক দিক্ দিয়া তাহার অনুশীলন করিতেছেন, দার্শনিক আর এক পথে, কবির আবার স্বতন্ত্র পথ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেরূপ কোন পথই হয় ত অবলম্বিত হয় নাই। কতকটা সমাজ এবং কতকটা সাহিত্য মিলাইয়া প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রেমালোচনার তুলনা এবং চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। নানা কারণে বিস্তর অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ দার্শনিক আলোচনার এ প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অভাব। সুধী পাঠকেরা নিজগুণে সম্পূর্ণ করিয়া লইবেন ভরসায় এইখানেই উপসংহার করি।

'ভারতী ও বালক', চৈত্র ১২৯৬ ও আষাঢ় ১২৯৭

রাধা

আমাদের দেশের প্রেমচর্চ্চায় যে সকল চরিত্র বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাহার মধ্যে রাধিকাই বোধ করি প্রধান। সীতা সাবিত্রী কাহিনী এ দেশে স্ত্রীজাতির চরিত্র উন্নত আদর্শে গঠন করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্ম্মের সহিত উৎসবের সহিত একীভূত হইয়া রাধিকার মত সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কোনও চরিত্রই পারে নাই। সীতা সাবিত্রীও কাব্য হইতে ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত, কিন্তু তাহাতে দেশব্যাপী আন্দোলনও হয় নাই, তেমন সাহিত্যও জন্মে নাই। এ সকল চরিত্র নীরবে দেশের চরিত্রগঠনে আংশিক স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে মাত্র। রাধিকার চরিত্র, চরিত্র হিসাবে সকল দিকেই হীন। পাতিব্রত্যও নাই, সে তেজও নাই, সে শিক্ষা দীক্ষা ভাব কিছুই নাই। কিন্তু এত হীন হইয়াও রাধিকা বঙ্গসাহিত্যের জননী, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কেন্দ্রস্থল, এবং বোধ করি, অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক ইত্যাদি ইত্যাদি বাহির হয়। কারণ অবশ্যই আছে। নহিলে কত শত মহৎ চরিত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রাধাই সমধিক ফুটিয়া উঠিবে কেন ? রাধা রূপসী বটে, তেমন আরও অনেক আছে। রূপসীর চিত্র আঁকিতে বিশেষরূপে রাধার আবশ্যক করে না। আর গুণের কথা ত

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—সংস্কৃত সাহিত্যের গুণবতীদিগের পার্শ্বে রাধা দাঁড়াইতে অক্ষম। তবে রাধা শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা বটে। কিন্তু কেবল মাত্র এই কারণে রাধার প্রভাব সম্ভব নহে। প্রেমের গভীরতা সীতার চরিত্রে যেমন, এমন আর কোথায়? রাধাকে ছাড়িয়া দিলে প্রেমচরিত্রের আমাদের অভাব হয় না।

কিন্তু তথাপি রাধাকে বিদায় দেওয়া চলে না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-সঙ্গীতেই মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার অনেকটা বিকাশ হইয়াছে। রমণীর প্রেম আমরা মাতৃভাবে, পত্নীভাবে, কন্যাভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কেবল রমণীভাবে বড় দেখি নাই। রাধার চরিত্রে এই ভাব কতকটা ফুটিবার অবসর পাইয়াছে। বড় বড় চরিত্রের আদর্শ-প্রেমের সহিত কলঙ্কিনী রাধিকার প্রেমের বিস্তর তফাত। সীতা সাবিত্রীর প্রেম দাম্পত্য প্রণয়ের চরম উৎকর্ষ। রাধার প্রণয় সমাজ-নিয়মের ব্যভিচার। রাধা আদর্শ সহধর্ম্মিণী নহে, গৃহিণীও নহে। মাতৃভাব রাধায় বিকশিত হয় নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে রমণীহৃদয়ের একটা আকাঙ্ক্ষার ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয়, এ দেশের সাহিত্যে রাধার এত প্রভাব। আরও এক কথা। অন্যান্য চরিত্র আমাদের ধর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নীরবে গঠনকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, রাধার চরিত্র ভাঙ্গনের সহায়তা করিতেও ত্রুটি করে নাই। রাধা আসিয়া হিন্দু-সমাজে এক বিপ্লব বাধিয়া যায়। ভাঙ্গন কার্য্যে একটা প্রবল মত্ততা আছে। সুতরাং তাহাতেও লোকের সহজে আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা ভিন্ন সে সময়ের সামাজিক অবস্থা হয় ত রাধার প্রভাব প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিল। বোধ করি, আমাদের সমাজে প্রেমচর্চ্চা তখন অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মানবহৃদয় কিছু আর সকল সময়ে সমাজ-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে না। রাধার আবির্ভাবে সে আপনার অন্তর-তন্ত্রীতে আঘাত অনুভব করিল। দেখিল, তাহার হৃদয়ের সহজ আকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনীতে ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ নানা কারণে আমাদের প্রেমচর্চ্চায় রাধার বিশেষ প্রভাব। কিন্তু তাই বলিয়া উন্নত আদর্শ সৃজনে বা চরিত্রগঠনে নহে।

তবে আধ্যাত্মিক ভাবে রাধাকে আদর্শ ভক্ত বলিয়া অনেকে গণ্য করেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধা। সে রূপ তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে বিঁধিয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর। এ হিসাবে রাধার প্রেম বড় সামান্য নহে। কিন্তু সাধারণের নিকট, মুখে যে যাহা বলুক, কৃষ্ণ দেবতা হইয়াও মানবসন্তান। কৃষ্ণের কল্পনা, হাসি, বাঁশী, যমুনা, গোপিনীবৃন্দা, এবং প্রণয়িনী রূপসী রাধিকার সহিত অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতায় সম্বদ্ধ। কাব্য-পাঠকালে অপার্থিব হিসাবে রূপক ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বড় কেহ অর্থ করে না। এবং তাহা

না করিলেও রাধিকার চরিত্র উচ্চ আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। গূঢ়ার্থ যাহা কিছু থাকে, বাদ দিলে রাধিকা কৃষ্ণের দেহে মুগ্ধ, যৌবনে আচ্ছন্ন, ভোগলালসায় অধীর। তবে এ দেহজ অনুরাগের মধ্যে অন্তরের একেবারে অভাব স্বীকার করা যায় না।

এখন কথা হইতেছে, রাধাকে কি ভাবে দেখা যায়? আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে, না কবির সৃষ্টি হিসাবে? আমাদের দেশে কাব্যের সহিত ধর্ম্ম অনেক স্থলে এরূপ মিশিয়া গিয়াছে যে, পরিণতি দেখিয়া মূল ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। উমা এখন ধর্ম্মের সহিত একীভূত, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, কাব্যেই উমার প্রথম আবির্ভাব। কাব্য ধর্ম্মে পরিণত হইয়া আমাদের মধ্যে প্রেমের কতকগুলি ভাব অনুশীলনের সহায়তা করে। উমার কল্পনাতে স্নেহভাবের সুন্দর বিকাশ হইয়াছে। এ প্রেমচর্চ্চা অনেকটা গার্হস্থ্য। যশোদাতেও মাতৃভাবের সুন্দর বিকাশ লক্ষিত হয়। রাধায় প্রেমের একেবারে স্বতন্ত্র অন্য এক দিক্ আলোচিত হইয়াছে। তাহার মূল কাব্য, কি ধর্ম্ম, নিশ্চিত বলা সহজ নহে। তবে কবিদিগের হস্তে কাব্যসৌন্দর্য্য যে রাধার মধ্যে সমধিক প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং বোধ করি, সেইটুকু মাত্র আলোচনা করিলেও রাধার শ্রীহানি হইবে না।

প্রথমতঃ রাধার রূপ। রাধা রূপসী—গৌরবর্ণা। এ দেশে রূপবর্ণনায় সাধারণতঃ গৌর অথবা শ্যামবর্ণের প্রাধান্য। গৌরবর্ণ অবশ্য শ্রেষ্ঠ। শ্যামবর্ণও নিতান্ত হেয় নহে। তবে বর্ণের মধ্যে গৌরেরই মর্য্যাদা অধিক। তাহা বহু দূর হইতে নয়ন আকর্ষণ করে। নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণা দ্রৌপদীর রূপাকর্ষণে স্বয়ম্বরসভা উথলিয়া উঠিয়াছিল। রাধা গৌরী, তাহাতে অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পূর্ণ। সুতরাং কৃষ্ণ সহজেই রাধার রূপে আকৃষ্ট। বৈষ্ণব কবিদিগের এ বর্ণনার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব বড় পরিস্ফুট নহে। তাঁহারা সকল সময়ে সম্মুখে একটা আধ্যাত্মিক প্রতিমা খাড়া রাখিয়া রচনা করিতেন কি না বলা যায় না। তবে শ্রীকৃষ্ণত্বে ঈশ্বরত্ব তাঁহারা হয় ত জানিতেন। কবিতা-রচনাকালে মানবভাবই সম্ভবতঃ তাঁহাদের অন্তরে আধিপত্য করিত। নহিলে, তাঁহাদের সঙ্গীতে দেহের গঠনসৌন্দর্য্য এমন সুব্যক্ত হইবে কেন? রাধার প্রতি অঙ্গ তাঁহাদের তুলিকাস্পর্শে সু-অভিব্যক্ত। আর গঠনের দিকে তাঁহাদের স্বাভাবিক একটু অনুরাগও দেখা যায়। রাধার দেহে যখন প্রথম যৌবন বিকাশ হইল, বৈষ্ণব কবি সে বয়ঃসন্ধির রূপমাধুরী একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তাহার পর যখনই অবসর পাইয়াছেন, রাধার যৌবনসম্বদ্ধ অঙ্গসৌন্দর্য্য দেখিয়া লইতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। রাধার প্রত্যেক অপাঙ্গদৃষ্টি, লঘু হাস্য, হৃদয়-বিকাশ তাঁহাদের নখদর্পণে। রাধার সহিত

তাঁহাদের যখন তখন সাক্ষাৎ—স্নানসময়ে, বনপথে, নিভৃতে কুঞ্জমাঝে, গৃহে সখীসমাগমে। এবং যখন যে ভাবে দেখিয়াছেন, সেই ভাবেই তাঁহারা সুন্দরী রাধিকার চিত্র আঁকিয়াছেন। কখনও কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই।

সেই জন্য বৈষ্ণব কবিদিগের চিত্র হইতে আমরা রাধার রূপ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি। রাধার অঙ্গসৌষ্ঠব পূর্ণ, গৌর বর্ণ, যৌবন ঢল ঢল। কিন্তু রাধার সমগ্র মুখে কি ভাব পরিব্যাপ্ত, বৈষ্ণব সঙ্গীত হইতে তাহার একেবারে স্পষ্ট পরিচয় সামান্যই পাওয়া যায়। তবে নানা বর্ণনার মধ্য হইতে বুঝা যায় যে, রাধার মুখে একটি কোমল ভাব আছে। চঞ্চল লোচনের বর্ণনার মধ্য হইতেও মুখের ভাব বুঝিবার কতকটা সুবিধা হয়। রাধার রূপে বিলাসভাবের উদ্রেক করে—শান্ত ভাব অপেক্ষা চাঞ্চল্যেরই তাহাতে প্রাদুর্ভাব। একপ্রকার সৌন্দর্য্য আছে, যাহা আপনার মধ্যে স্থির থাকিয়া জগৎকে টানিয়া আনে। এ সৌন্দর্য্যে অধীরতাও অনেকটা চাপা। রাধার সৌন্দর্য্য এ জাতীয় নহে। রমণীসুলভ তেজ ভাবেরও রাধার সৌন্দর্য্যে বিশেষ অভাব। সতীর মুখে কোমলতার সহিত দৃঢ় তেজস্বিতা দেখা যায়। ম্লানভাবেও সীতা তেজস্বিনী। রাধার কোমলতা বিলাসস্ফূর্ত্ত—তেজদীপ্ত নহে।

শকুন্তলা প্রভৃতির রূপের ন্যায় রাধার রূপের সহিত প্রকৃতির সেরূপ ঘনিষ্ঠতা নাই। সে রূপ অনেকটা সহরঘেঁষা। বন, কি উদ্যানলতার সহিত তাহার উপমা খাটে না। রাধার কোমলতা নবনীতের সহিত উপমেয়। রূপেও আঁটাআঁটি কিছু অধিক—তাহাতে অনেকটা হিসাব করা ভাব আছে। নির্ঝরিণীর স্বতঃউচ্ছ্বসিত মুক্ত প্রাচুর্য্য তাহাতে তেমন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা রাধার রূপের নিন্দা করিতেছি না। রাধা ইহাতেই রূপসী। নাকে মুখে চোখে রাধা পৃথিবীর যাবতীয় রূপসীর সমকক্ষ। তবে চরিত্রগত মহত্ত্বের মুখে যে সৌম্য ছায়া পড়ে, তাহা রাধায় বড পরিস্ফুট নহে। রাধার রূপ দিল্লীর রাজপ্রাসাদে সাজাইয়া রাখিবারই বিশেষ উপযোগী। সীতার মত অরণ্যে তপোবনে সে রূপ খুলে না। সে গঠন কুঁদিয়া নির্ম্মাণ করাই বটে।

কৃষ্ণ যুবতী রাধিকার এই রূপে মশগুল! তিনি যাহা খুঁজেন, রাধায় তাহা মিলিয়াছে। দেহ-উপভোগ-স্পৃহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম। রাধিকার দৈহিক রূপ যথেষ্ট আছে। অন্তরের সহিত রূপের যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে কৃষ্ণের বড় দৃষ্টি নাই। এই কারণে রাধার বদনকমলে এবং খঞ্জননয়নে মানসিক সৌন্দর্য্যের কিরূপ বিকাশ হইয়াছে না হইয়াছে, আমরা শুনিতে পাই না। আমরা যত দূর জানিয়াছি, রাধার ভ্রূভঙ্গে হৃদয় ভাঙ্গে গড়ে, অধরে অধর আকর্ষণ করে, কোমল কপোলে শ্রীকৃষ্ণের চুম্বনভার মাত্র সহে।

নিজ রূপের প্রতি রাধার স্ত্রীজাতিসুলভ অনুরাগও আছে। সুন্দরী আপনাকে রূপসী বলিয়া জানেন। সুতরাং ঘন ঘন দর্পণে মুখ দেখিয়া অরুচি জন্মে না। রূপ-চর্চ্চাই ত রাধার আজন্ম হইয়া আসিতেছে। আর এই রূপের ফাঁদেই ত শ্যামসুন্দরের মন ধরা পড়িয়াছে। নহিলে, কাণায় কাণায় যাহার প্রণয়িনী, তাহাকে দুই দণ্ড চোখে চোখে রাখা যায়? রূপের কোনও অনুষ্ঠানেরই রাধার ত্রুটি নাই—গন্ধদ্রব্য, অলক্তক, বেশভূষা, দর্পণ, সমজদার সহমর্ম্মী সহচরী, এবং আবশ্যকীয় দুই-চারিটা নয়নের কটাক্ষ, গ্রীবার বঙ্কিম ভঙ্গী, মৃণালবাহুর অনাবশ্যক ভ্রমরতাড়ন ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবনের অন্যান্য গুরুতর কার্য্যের এই জন্য রাধার অবসর হইয়া উঠে না। রাধার দুই চিন্তা—নিজের রূপ এবং মাধবের রূপ। নিজের রূপে শ্যামকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, আর শ্যামের রূপে নিজে বাঁধা। রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধই রূপজ।

শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দেখিয়া রাধা অধীর, সে রূপ অনেকটা রাধারই মতন। রাধার মত কৃষ্ণ অবশ্য গৌরবর্ণ নহেন, সমস্ত দেহের গঠনও তাঁহার অবিকল রাধার অনুরূপ নহে, তবে উভয়ের গঠন কতকটা একজাতীয় বটে। ভ্রমক্রমে বিধাতা বুঝি একজনকে পুরুষ করিয়া গড়িয়াছেন। কৃষ্ণের রূপে উন্নত পুরুষভাব কদাচ দেখা যায়। কৃষ্ণ পুরুষরূপে স্ত্রীরই এক বিশেষ সংস্করণ। তবে রাধা এ রূপে মুগ্ধা। বৈষ্ণব কবিরাও এই রূপেরই বিশেষ পক্ষপাতী। আমাদের তাহাতে আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু পুরুষ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের তেমন সুপুরুষ বলিয়া মনে হয় না। এবং বোধ করি, মহাদেবের পার্শ্বে, কিম্বা রামচন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া উমাকে অথবা সীতাকে একজনের গলদেশে বরমাল্য দিতে বলিলে শ্রীকৃষ্ণকে কেহই তাহা দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের রূপে গোপীকুলই মুগ্ধ। রাধার মানসিক অবস্থা নিতান্তই তেজহীন, অলস, সেই জন্য চূড়ার ঠাম, ভ্রূর ভঙ্গীতেই সে মন আত্মহারা। স্বভাবতঃ রমণীহৃদয় পুরুষ-সৌন্দর্য্যে সমুন্নত তেজগাম্ভীর্য্যই ভালবাসে বোধ হয়। তবে ভিন্ন রুচিও ত সংসারে আছে। আমাদের অন্তঃপুরচারিণীগণ কিরূপ সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী বলা যায় না। বাঙ্গালা দেশেই ত বীর সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সৌখিন বাবু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এ সকল কতকটা অপ্রাসঙ্গিক কথার এইখানেই শেষ হোক্। রূপের সহিত রাধিকার এই অবধি বিশেষ সম্পর্ক। আমরা রাধার রূপ দেখিয়াছি, রাধা যে রূপে মুগ্ধা, সে রূপও দেখিলাম। মোটামুটি উভয়ের রূপেরই প্রধান উপাদান ভোগবিলাস। গুণের ব্যাপার রাধার চরিত্রে বড় বেশী শুনা যায় না। সুতরাং রাধাকে দেখিবার আমাদের বড় বাকি নাই। এখন কেবল তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেখা যাইতে

পারে। যেমন, রাধা প্রণয়িনী, রাধা বিরহিণী, রাধা মানিনী, রাধা অভিসারিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাতে রাধার রূপের সহিত ভাবের সাদৃশ্য অনেকটা পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। আর রাধার জীবনে ইহা ভিন্ন ত বিশেষ কোন ঘটনাও দেখা যায় না। হাস্য পরিহাস, সাজসজ্জা, বিরহ, অভিসার, মানাভিমান এবং হাবভাবের সমষ্টিই রাধিকা।

প্রথমে দেখা যাক, কৃষ্ণের সহিত রাধিকার প্রণয়ের আরম্ভ কোথায়। বলা বাহুল্য, রূপেই উভয়ের প্রণয় আরম্ভ। রাধিকা কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। কৃষ্ণও রূপ দেখিয়াই রাধিকায় অনুরক্ত। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। রূপের আকর্ষণ মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ। দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়, রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়, এ সকলই রূপ-মূলক। এবং রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের মত দর্শনেই ইঁহাদের প্রেমারম্ভ। সুতরাং রূপমূলক প্রেম বলিয়াই রাধাকৃষ্ণের প্রেম দূষ্য নহে। কিন্তু রূপমূলক প্রেম মোটামুটি দুই প্রকার। এক, চকিতের মধ্যে রূপের মধ্য দিয়া আন্তরিক প্রেম সঞ্চার হয়। আর, রূপেতেই প্রেম গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকে। এখন দেখিতে হইবে, রাধার প্রেম কোন্ শ্রেণীর। কৃষ্ণের প্রেম শেষোক্ত শ্রেণীর বলিয়াই বোধ হয়। প্রমাণের অভাব নাই—তাঁহার প্রণয়িনীর সংখ্যা গণনা করিলেই অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে। বৈষ্ণব কবিদিগের খণ্ডিতার বর্ণনাগুলি দেখিলেই মনে হয়, কৃষ্ণ নিতান্তই হৃদয়হীন, প্রেমহীন, লজ্জাহীন, চরিত্রহীন চরিত্র। কিন্তু তাহা হইতে রাধার প্রেম বুঝা যায় কিরূপে ? কৃষ্ণের এরূপ ব্যবহারেও রাধা তাঁহার প্রতি অনুরক্তা। কৃষ্ণকে দেখিলেই রাধার অর্দ্ধেক মান ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে ত রাধার চরিত্রে ক্ষমাশীলতাই সমধিক প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহা নাও হইতে পারে। রাধার চরিত্রে গভীরতার অভাবই হয় ত কৃষ্ণের দুর্ব্ব্যবহার সহনের কারণ। প্রেমের নিয়মভঙ্গ অপরাধ রাধার নিকট অতি লঘু, কিছুই না। প্রেমের ভিত্তিতে যে দৃঢ়তা দেখা যায়, রাধার তাহা নাই। সুগভীর প্রেম অপমান বড়ই অনুভব করে। শারীরিক ভোগলালসা অতিক্রম করিবার শক্তি তাহার আছে। রাধার এ শক্তির অভাব। ভোগলালসা তাঁহার হাড়ে হাড়ে। কিন্তু তথাপি রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট কখনও অবিশ্বাসিনী হয়েন নাই। সুন্দরীর কৃষ্ণের প্রতি বেশ একটু টানও লক্ষিত হয়। ইহাতে মনে হয়, রাধার প্রেম ভোগলালসায় গঠিত হইলেও তাহাতে অন্তরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অপেক্ষা রাধিকার প্রেম গাঢ়। তবে তাহাও অনেকাংশে রূপবদ্ধ। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে মদিরমত্ততা অধিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে যৌবনে যৌবনে যেরূপ সম্মিলন হয়, জীবনে জীবনে সেরূপ একীকরণ হয় না।

এতক্ষণ আমরা যে ভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম আলোচনা করিলাম, তাহা যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপকাদিবর্জ্জিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রণয়কাহিনীর মধ্যে আধ্যাত্মিক রূপকের প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব বোধ হয় না। চণ্ডীদাস প্রভৃতি দুই চারি জন বৈষ্ণব কবির রচনা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা এ রূপক বুঝিতেন। তবে রূপক বুঝিলেও কথায় কথায় রূপক মিলাইয়া কবিতা রচনা করিতেন না। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও আধ্যাত্মিকতা হইতে স্বতন্ত্র পথে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিবিধ অবস্থা আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। তাহাতে রূপকভক্তেরা ভরসা করি, দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমাদের ত রাধা অথবা কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা নাই যে, দোষ বাহির করিয়া তৃপ্ত হইব। তবে গূঢ়ার্থ অপেক্ষা সহজে যাহা চোখে পড়ে, তাহার আলোচনাই সুবিধা বোধ করি।

রাধা বিরহিণী। কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়াছেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাধার দিন আর ফুরায় না। বাস্তবিক, বিরহে কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ প্রকাশ পায়। সকল কবির রাধা অবশ্য সম্পূর্ণ একভাবে ব্যথিত নহেন, তবে মোটামুটি একটা ঐক্য আছে। কৃষ্ণের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়াই রাধার ব্যথা। কোন কোন কবিতায় ফুলশর প্রভৃতিরও উল্লেখবাহুল্য দেখা যায়। রাধার চরিত্রের সহিত অবশ্য অসামঞ্জস্য কিছু ঘটে না। বিরহে রাধার কৃষ্ণের কথাই মনে পড়ে—সেই পুরাতন দিন, হাসি, বাঁশী, নিকুঞ্জ, মানভঞ্জন, এমন অনেক কথা। আবার একটু ভয়ও হয়, পাছে আর কেহ কৃষ্ণকে দখল করিয়া থাকে। সেই আর কেহ-র উদ্দেশে অনেক প্রকার হিতাকাঙ্ক্ষাজড়িত মধুর সম্ভাষণ এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। যৌবনটাকে লইয়াও রাধা যে নাড়াচাড়া না করেন, এমন নহে। সহচরীর নিকট দুঃখ করা হয় যে, এই নবযৌবনই যদি বিরহে কাটাইতে হইল, তবে আর প্রিয়ের অনুরাগে ফল কি? এইরূপ বিরহের মধ্যে রাধার অনেক মনের কথা বাহির হইয়া পড়ে। সকল কথা আমরা তুলিতে পারি না; কারণ, সখীদিগের সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা ত আর সমালোচনার জন্য নহে। গোপনীয় কথার উপর আমরা যেটুকু হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট।

রাধার বিরহ প্রধানতঃ দুই ঋতুতে জাগিয়া উঠে—বসন্তে ও বর্ষায়। এ দেশে এই দুই ঋতুই বিরহকাল। বসন্তে যত বিরহিণী বড় বড় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকেন। সেই উষ্ণ নিশ্বাস টানিয়া লইয়া দীর্ঘ শীতরজনীর পরে বৃক্ষকুল শ্যামল যৌবনে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। রাধা কৃষ্ণ অভাবে বসন্তের সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। অনেক হা-হুতাশ করেন, সহচরীদিগকে অনেক কথা বলেন।

তাহার পর বসন্ত চলিয়া যায়। বসন্তাবসানে কিছু দিন বিরহ একটু চাপা থাকে। আবার আষাঢ়ের নূতন মেঘে বিরহ ঘনাইয়া আসে। কিছু দিন গুমরিয়া গুমরিয়া বর্ষাও ফুরাইয়া যায়। তাহার পর বিরহ অনেক দিন ছাড়া পায়। মধ্যে মধ্যে বারো মাসই একটু আধটু বিরহকান্না শুনা যায়। সকল কবি বোধ করি, বারো মাস একঘেয়ে ক্রন্দন সহিতে পারেন না, সেই জন্য বারো মাসের বিরহ অধিক শুনা যায় না। পাঠক এবং লেখক, উভয়ের পক্ষেই তাহাতে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে বলিতে হইবে।

বিরহের পর মিলন। তখন আর কি নূপুর রুণুঝুনু, বেণী আন্দোলন, যৌবন বন্যা অপেক্ষা প্রবল; বাক্য এবং হাবভাব দুই তরফেই পূর্ণ মাত্রায়। মিলন আলোচনা করিয়া দেখিলে রাধিকার চরিত্রে লজ্জার কত দূর প্রভাব, বুঝিবার সুবিধা হয়। লজ্জাই রমণীর শ্রী। সুতরাং রাধিকার অন্তরের শ্রী এইখানে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। প্রথমে কৃষ্ণের সহিত রাধার প্রথম মিলন আলোচ্য। কারণ, লজ্জা সেইখানেই সমধিক ব্যক্ত। প্রথম মিলনের পূর্ব্বে কৃষ্ণের সহিত রাধার সাক্ষাৎ হইয়াছে, রাধা বাঁশী শুনিয়াছেন। কিন্তু তখন কিছু আর আলাপ হয় নাই। আড়নয়নের উপরেই তখন সকল নির্ভর করিত। তাহার পর নিকুঞ্জে সম্মিলন। সহজ বুদ্ধিতে যত দূর বুঝা যায়, নিকুঞ্জে রাধিকার ভাব এবং ব্যবহার বড় লজ্জাবৃত নহে। তবে অভ্যস্ত লজ্জাভিনয় কতকটা হইয়াছিল। যেমন, এ দেশের রঙ্গমঞ্চে ক্রন্দনের আবশ্যক হইলেই চোখে রুমাল উঠে, প্রেমের কথা উঠিলেই স্বর নাসিকায় আসিয়া আশ্রয় লয়, বীরচরিত্র দেখাইতে হইলেই দেহের মধ্যে উনপঞ্চাশ ছট্‌ফটানি এবং কণ্ঠস্বরে উনপঞ্চাশ বায়ু সহসা প্রাবল্য লাভ করে। যথার্থ লজ্জার যে শ্রী, তাহা রাধিকায় দৃষ্ট হয় না। রাধার লজ্জা নিতান্ত কৃত্রিম—নিতান্তই যেন কৃষ্ণকে ধরিবার ফাঁদ পাতা। রাধা বড় লজ্জাবতী নহে। অসংযত চরিত্রে লজ্জা প্রবল হইতে প্রায় পারে না। লজ্জা সংযমের সুশীলা সহচরী।

রাধার মানাভিমানের ব্যাপার মিলনেরই সহিত সম্বদ্ধ। কৃষ্ণ রাধার প্রেমের অপমান করিয়াছেন, রাধা তাই মান করিয়া বসিয়া আছেন। কৃষ্ণ যত সাধ্য সাধনা করিতেছেন, সুন্দরী নীরব—মুখে কথাটি নাই। কৃষ্ণ ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, রাধার মন বুঝিয়া তিনি অনেক কথা বলিলেন। রাধা শুনিয়াও শুনেন না, অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন। অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গিল। তখন আবার পূর্ব্ববৎ। মানভঞ্জনের পরিচ্ছেদ এইখানেই সমাপ্ত।

রাধা প্রণয়িনী, রাধা বিরহিণী, রাধা মানিনীকে আমরা দেখিলাম। এখন

অভিসারিকা রাধাকে দেখিলেই আমাদের রাধার চিত্র একরূপ সম্পূর্ণ হয়। অন্যান্য খুঁটিনাটি না দেখিলেও চলে। কারণ, এই কয় ভাবেই রাধা অনেকটা ফুটিয়াছেন।

মেঘের উপর মেঘ করিয়া বহু দিন পরে আবার সেই পুরাতন বর্ষা ফিরিয়া আসিয়াছে। পুরাতন গগনতলে তেমনি করিয়া ধরণী সিক্ত যৌবনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরহকাতরা রাধিকাসুন্দরী কাতর দৃষ্টিতে সম্মুখের রজনীবিদ্ধ সূচিভেদ্য অন্ধকার পানে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে শূন্য মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া—বর্ষার অন্ধকার আকাশ ঝরঝর ঝরিয়া যায়, চঞ্চল তড়িল্লতাবিদীর্ণ হৃদয়ে শ্যাম বিষাদছায়া ঘনাইয়া আসে, দীর্ঘ মেঘগর্জ্জনে দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত মেদিনীর অন্তর শিহরিয়া উঠে—এ দুর্দ্দিনে এ দীর্ঘ বনপথ বাহিয়া একাকিনী রমণী তৃষিত প্রিয়সন্দর্শনে যায় কিরূপে? কিন্তু না যাইলে নয়। সেখানে প্রিয়জন আশাপথ চাহিয়া বসিয়া যে। পথ চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার হৃদয় জরজর। রাধাও গৃহে থাকিতে পারেন না—তাঁহার মন সেখানে। কিন্তু দুর্য্যোগ যে থামে না। বিজন অন্ধকারের মধ্য হইতে দূরে দূরে মক্‌মক্‌ ভেককণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইতেছে, আর ঝম্‌ঝম্‌ ঝম্‌ঝম্‌ অবিশ্রান্ত ধারাপতনশব্দ।

এই দুর্য্যোগে রাধা ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পিচ্ছিল পথে পুঞ্জীকৃত অন্ধকার জমিয়া। ঘন বনশ্রেণীর মধ্য দিয়া পথ—কোথাও ঈষৎ স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। পথের কষ্ট প্রিয়াভিমুখগামিনী মনের আবেগে বড় অনুভব করিতে পারিলেন না। এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্মিলন। সে সুখের জন্য সকল কষ্টই সহ্য করা যায়।

অভিসার যে কেবলই মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার রাত্রে, তাহা নহে। সকল ঋতুতেই অভিসার আছে। তবে বর্ষার অভিসারই রীতিমত গুরুতর ব্যাপার। আমাদের মনে অভিসারের সহিত সাধারণতঃ বর্ষাই ঘনাইয়া আসে। নহিলে, হিমক্লিষ্ট পৌষরজনীতেও অভিসারিকা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের রাধাই এরূপ সময়ে কত বার অভিসারে বাহির হইয়াছেন। চিত্র হিসাবে তাহার সৌন্দর্য্য ন্যূন নহে।

এই গেল অভিসারের কথা। এখন আমরা রাধার চিত্র সম্পূর্ণ দেখিলাম বলিতে পারি। সুতরাং রাধার চরিত্র আলোচনা করিবার সুবিধা হইল। রাধিকা গীতিকাব্যে স্থান পাইবারই বিশেষ উপযুক্ত। কারণ, তাঁহার চরিত্রে চিত্রসৌন্দর্য্য যেরূপ ব্যক্ত, ঘটনাসৌন্দর্য্য সেরূপ প্রস্ফুটিত নহে। রাধিকা যে ভাবেই চিত্রিত হইয়াছেন, তাঁহার রূপই সমধিক ফুটিয়াছে। ঘটনাবৈচিত্র্যে জীবনের মহত্ত্ব বিকাশ হয় নাই। অবস্থার সহিত গুরুতর দ্বন্দ্ব রাধার কখনও উপস্থিত হইয়াছে শুনা যায় না। গীতিকাব্যে এক একটি ভাবই সম্পূর্ণ হয়। রাধার জীবনের ঘটনাগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র—

একেকটি আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ। বিরহের সহিত অভিসার অনিবার্য্য নহে, রাধার জীবনে প্রেমের বিবিধ অবস্থা ধারাবাহিক উপন্যাসে বিন্যস্ত নহে। ধারাবাহিকতা উপন্যাসে বিশেষ আবশ্যক। অর্থাৎ ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে সেখানে মানবজীবন গঠিত হয়। রাধার সেই বৃন্দাবন, সেই বাঁশীর স্বর, সেই অভিমান, সেই যমুনার জল, সেই বিরহবিলাপ এবং সেই নিকুঞ্জমিলন। ইহাতে ঔপন্যাসিক উপাদান কোথায়? আর নাট্যরস এই অবস্থার মধ্যেই যতটুকু। মেঘদূতের যক্ষে রাধার চরিত্র অপেক্ষা নাট্যরস স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে বোধ হয়। তবে সমাজনিয়মের ব্যতিক্রমে কতকটা যদি নাট্যরস থাকে, বলিতে পারি না।

'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৭

দুষ্মন্ত

কালিদাসের শকুন্তলা দুই কারণে বিখ্যাত।

১ম। এরূপ নাটক সচরাচর দেখা যায় না। এ দেশে ত নহেই, পাশ্চাত্য দেশেও বিরল।

২য়। নাটক হিসাবে না দেখিলেও, কাব্য হিসাবে ইহার সৌন্দর্য্য ন্যূন নহে। শকুন্তলার কাব্যও অতুলনীয়।

নাটকীয় সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের চরিত্র চিত্রণে এবং ঘটনার বৈচিত্র্য সম্পাদনে প্রকাশ পায়। উপাখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও বৈচিত্র্যে কালিদাসের শকুন্তলা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কালিদাসের চরিত্রগুলিও অবিকল মহাভারতের অনুরূপ নহে। তাহারা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ও শিক্ষাসম্পন্ন। তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের সমধিক বিকাশ লক্ষিত হয়। সেগুলি যথোচিত ফুটিয়াছে। চরিত্রগত সামঞ্জস্য নাটকের প্রধান উপাদান। কালিদাসে তাহা যথেষ্ট। তাঁহার দুষ্মন্ত রাজ-চরিত্র। কালিদাস সর্ব্বত্রই রাজার রাজভাব বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু রাজা হইলেও দুষ্মন্ত মানুষ ত বটে। সুতরাং কেবল রাজরূপে দেখাইলে দুষ্মন্তের চরিত্র চিত্রণে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটে। কালিদাস সেই জন্য রাজভাবের সহিত মানবভাব এমনি গাঁথিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে দুষ্মন্ত-চরিত্র কিছু মাত্র অসংলগ্ন ঠেকে না। শকুন্তলাও এক দিকে তপোবনপালিতা ঋষিকন্যা, অন্য দিকে রমণী মাত্র। এই উভয় ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন যে-সে কবির কাজ নহে। কালিদাস শকুন্তলায় দুই ভাব এক করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কোনও ভাবটিই চাপা পড়ে নাই।

কাব্য-সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের বর্ণনাগুলিতে বিশেষ পরিস্ফুট। শকুন্তলার রূপবর্ণনায়, প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনে, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বিকাশনে কালিদাসের অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের ভাবগত একীকরণ অল্পসংখ্যক কবিই তাঁহার মত অনুভব করিতে পারেন। তাঁহার ভাব যেমন গভীর, ব্যক্ত করিবার ধরণও তেমনি সুন্দর। রূপ বর্ণনায় অন্যান্য অনেক কবির মত কালিদাস-নখশোভায় চন্দ্রকে ম্লান করিয়া, নয়নে খঞ্জনকে গঞ্জনা দিয়া, প্রত্যঙ্গ অপ্রত্যঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের নিকট চরাচরের যাবতীয় সুন্দর পদার্থকে হার মানাইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন না। কালিদাস সুনিপুণ চিত্রকর। যেমন করিয়া ফুটাইলে শকুন্তলার রূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে ফুটে, তিনি সেইরূপ করিয়া ফুটাইয়াছেন। স্বভাবেও দূর নিকট তাঁহার বর্ণনায় সুব্যক্ত। দূর অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম, রেখাবৎ; নিকট স্পষ্ট, স্থূল, যেমন-তেমনি। অসঙ্গতিদোষ কালিদাসে কোথাও দৃষ্ট হয় না। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে যেরূপ, কাব্য-সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটনেও কালিদাস সেইরূপ সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। এই কারণে নাট্যাংশে না ধরিলে কাব্যাংশেও শকুন্তলা অসাধারণ রচনা। অভিজ্ঞানশকুন্তলে নাট্য এবং কাব্য, দুই সৌন্দর্য্য মিশিয়াছে।

দুষ্মন্ত এই সৌন্দর্য্যময় কাব্যনাটকের প্রধান চরিত্র—নায়ক। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, দুষ্মন্ত এ নাটকের উপযুক্ত চরিত্র কি না এবং তাঁহার যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা কোথায়। দুষ্মন্ত ভারতের অধিপতি, সৎকুলোদ্ভব, শীলবান্। তিনি রাজার মত রাজা—প্রজাবৎসল, দুষ্টের দমনকারী, শিষ্টপ্রতিপালক, বিদ্বৎসেবী। এ সকল গুণই নাটকের নায়কোপযোগী; এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের নায়কের বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং দুষ্মন্তকে শকুন্তলা নাটকের নায়ক-অযোগ্য বলা যায় না। তবে কেবলমাত্র এই কয় গুণই শকুন্তলা-নায়কের পক্ষে যথেষ্ট কি না সন্দেহ। শকুন্তলা শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটক। সংস্কৃত অলঙ্কারের নিয়মানুসারে নাটকে শৃঙ্গার অথবা বীররসের প্রাধান্য, অন্যান্য রস কেবল সহায় স্বরূপে। এখন শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটকে কেবল মাত্র প্রখ্যাতবংশীয় প্রতাপশালী নায়ক হইলে চলিবে কিরূপে? স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ব্যাপার লইয়াই শৃঙ্গার রসের কারবার। সুতরাং শৃঙ্গারপ্রধান নাটকের নায়ক তদুপযোগী হওয়া চাই। দুষ্মন্ত এ বিষয়েও হীন নহেন। প্রণয়-ব্যাপারেই ত শকুন্তলা নাটকে তিনি ফুটিয়াছেন।

দুষ্মন্তের চরিত্র সর্ব্বথা নায়কোপযোগী—বিশেষতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের। সাহিত্যদর্পণে ধীরোদাত্ত নায়কের যে সকল গুণের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দুষ্মন্তে অনেকটা মিলে বোধ করি। আত্মশ্লাঘা তাঁহার অভ্যাস নহে, হর্ষ বা শোকে তিনি

একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন না, বিনয়ে তাঁহার গর্ব্ব প্রচ্ছন্ন, অঙ্গীকার প্রতিপালন তাঁহার ধর্ম্ম। ধীরোদাত্ত নায়কের প্রধান উদাহরণ—রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির। দুষ্মন্ত অবশ্য ঐ দুই চরিত্রের সম্পূর্ণ সমকক্ষ নহেন, কিন্তু উঁহাদের কতকগুলি প্রধান গুণ তাঁহাতে লক্ষিত হয়। দুষ্মন্ত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা। তবে সংযম বিষয়ে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। একপত্নীনিষ্ঠ রামচন্দ্র স্বভাবতই সংযমী। রূপ তাঁহাকে টলাইতে পারে না। দুষ্মন্ত কিছু অধিক মাত্রায় রূপসীপ্রিয়। রূপের মায়া কাটান তাঁহার পক্ষে তত সহজ নহে। দুষ্মন্তের সংযম অনেকটা অবস্থা এবং শিক্ষাগত। রূপসী লইয়া এই জন্য তাঁহার স্বভাবের সহিত অবস্থা এবং শিক্ষার মধ্যে মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। শকুন্তলাকে লইয়াও হইয়াছিল। তাই প্রবল রূপতৃষ্ণার মধ্যেও শকুন্তলার বর্ণ এবং গোত্র জানিবার ঔৎসুক্য। এটুকু না থাকিলে তাঁহার রাজসম্মান দুই দিনে ভাঙ্গিয়া যাইত।

এখন দেখা গেল, দুষ্মন্ত নায়কোচিত গুণযুক্ত। এবং দুষ্মন্তকে শকুন্তলার নায়কপদে বরণ করিয়া কালিদাস অবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। তবে দুষ্মন্ত সম্পূর্ণ চরিত্র নহেন বটে। কিন্তু মানবজীবন লাভ করিয়া অসম্পূর্ণতা কাহার না নাই? আর নাটকে মানব-প্রকৃতিই চিত্রিত হয়। সুতরাং নাটককার সম্পূর্ণ চরিত্র ভিন্ন আঁকিবেন না, এমন কিছু নিয়ম নাই। অসম্পূর্ণতা রামচন্দ্রেরও আছে, যুধিষ্ঠিরেরও আছে, সেক্সপীয়রের চরিত্রগুলিরও আছে, কালিদাসের চরিত্রেরও আছে। তবে অসংলগ্নতা নাটকে বিশেষ দোষ। অর্থাৎ রাজা রাজার মত না হইলে, দুষ্মন্ত দুষ্মন্তের মত না হইলে, চরিত্র চরিত্রোপযোগী না হইলে নাটক ব্যর্থ। দুষ্মন্তকে রাজার মুকুট পরাইয়া কথাপ্রসঙ্গে নীবারধান্যাপহরণে নিযুক্ত করিলে এ দোষ ঘটিত। কিন্তু মানবজাতির উপর চরিত্র-ব্যভিচারের প্রভাব নাটককারের সীমা-বহির্ভূত নহে। এক দিকে নাটককার যেমন বিবিধ অবস্থার মধ্যে মানবচরিত্রের অটলতা দেখাইবেন, অন্য দিকে সেইরূপ চরিত্রের উপরে অবস্থার গুরুতর প্রভাবও দেখাইতে ত্রুটি করিবেন না। এই অবস্থার প্রভাবেই চরিত্র অনেক সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই চরিত্র-ব্যভিচার।

দুষ্মন্তে বড় গুরুতর চরিত্র-ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। তিনি এক জায়গায় বেশ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নড়ন চড়ন অনেকটা নির্দ্দিষ্ট স্থানবদ্ধ। এইবারে দেখা যাক, অভিজ্ঞানশকুন্তলে তিনি ফুটিয়াছেন কিরূপে। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপারই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মূল উপাদান। দুষ্মন্ত রাজা, দুষ্মন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, কিন্তু প্রণয় বিনা দুষ্মন্ত শকুন্তলার কেহ নহেন। কালিদাস দেখাইয়াছেন, এই ধর্ম্মপরায়ণ রাজহৃদয়ে ধীরে ধীরে কিরূপে তাপসবালার রূপ অধিকার বিস্তার করিল,

কিরূপে সুশীল শিক্ষাসংযত দুষ্মন্ত পূর্ণ অন্তঃপুরে পরিতৃপ্ত না হইয়া রূপসীর রূপমোহে আপনাকে ধরা দিলেন। ইহা অস্বাভাবিক অথবা অনন্যপূর্ব্ব নহে। ভোগবিলাসের মধ্যে গঠিত হৃদয় স্বভাবতই রূপসীপ্রিয় একটু অধিক হয়। বিশেষতঃ সে কালে রাজপরিবারে বহুদারপরিগ্রহ প্রচলিত ছিল। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ধর্ম্মপত্নীরূপেই অঙ্গীকার করেন। রূপসীপ্রিয় বলিয়া তিনি রমণীহৃদয় লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেন না। হাজার হৌক্, দুষ্মন্ত হিন্দু রাজা। তাঁহার হৃদয় মুসলমান বাদশাহের ন্যায় নির্ম্মম পাষাণ নহে।

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের যে প্রণয়, তাহা কতকটা দৈবঘটিত। রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন—শকুন্তলার কথা তিনি আদৌ জানিতেন না—ঋষিদিগের অনুরোধে মৃগবধ হইতে বিরত হইয়া কণ্বাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কণ্ব সোমতীর্থে গিয়াছেন। অতিথিসৎকারের ভার শকুন্তলার উপরে। দুষ্মন্ত শকুন্তলার শুদ্ধান্তদুর্লভ যৌবনবিকশিত অতুলনীয় রূপমাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। রাজা বলিয়া তিনি ত মানবধর্ম্মের অতীত নহেন। শকুন্তলাও দুষ্মন্তমুগ্ধা। উভয়েই পরস্পরের রূপে মজিয়াছেন। শকুন্তলা লতা—রমণী-সুন্দরী। দুষ্মন্ত সুবৃহৎ শালতরু—পুরুষশ্রেষ্ঠ। লতা স্বভাবতই তরুস্নেহে আশ্রয় চায়, তরুও লতাকে আশ্রয় দিয়া পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয় যথোপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু শকুন্তলাকে রাজা কিরূপে লাভ করিবেন? জাতি কুল না জানিয়া ত আর বিবাহ হয় না। শকুন্তলা কণ্বপালিতা—সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণকন্যা। দুষ্মন্তের পক্ষে তাহা হইলে শকুন্তলালাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু মন যখন টানিয়াছে, তখন সহসা ব্রাহ্মণকন্যা স্থির করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। দেখা যাক্, ভাগ্যে কি উঠে।

দুষ্মন্ত কৌশলপূর্ব্বক সখীদিগের নিকট হইতে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইলেন। কণ্ব মুনি যে শকুন্তলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক, তাহা জানিতেও তাঁহার বাকি রহিল না। আশার কথা বটে। নহিলে, এই অতুল সৌন্দর্য্য হইতে রাজধানীতে তিনি কেবল জ্বালাটুকু মাত্র লইয়া যাইতেন। আশায় আশায় রাজধানীতে যাইতে তাঁহার বিলম্ব পড়িয়া গেল; কিন্তু যখন ফিরিলেন, তখন শকুন্তলা তাঁহার। আশ্রম হইতে গিয়া মাধব্যের সহিত সে দিবস তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কি ছলে পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইবেন, তাহারও পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময় কয়েকজন তপস্বী গিয়া উপস্থিত হইলেন—দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণের অত্যাচার হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। দুষ্মন্তের সুবিধাই হইল। কর্ত্তব্য সম্পাদনের সহিত স্বকার্য্য উদ্ধারের অবসর পাইলেন। শকুন্তলার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইল।

এবার একটু ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছে। কণ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা দুষ্মন্তের পোষাইল না। শকুন্তলাকে বুঝাইয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহে সম্মত করিলেন। অবশেষে বিবাহের নিদর্শনস্বরূপ স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিয়া গেলেন। রাজধানী হইতে শীঘ্রই শকুন্তলাকে লইতে লোকজন পাঠাইবেন।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়ের ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদ। রূপমূলক অনুরাগে দুই জনে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। তাহার পর শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। দুর্ব্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি আর খোঁজখবর লয়েন নাই। কণ্ব মুনি ইতিমধ্যে সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার পরিণয়ে তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এবং বিবাহের পর দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস অকর্ত্তব্য বলিয়া সসত্ত্বা শকুন্তলাকে বিশ্বস্ত শিষ্যসঙ্গে স্বামীর আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যটি বড় চমৎকার। কালিদাসের স্বভাবানুরাগ এইখানে বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আপাততঃ বাহুল্যভয়ে তাহার আলোচনা হইতে আমরা নিবৃত্ত হইলাম। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শকুন্তলার স্মৃতি তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। শকুন্তলাও নিদর্শন-অঙ্গুরীয়কটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং দুষ্মন্ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। 'স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ' আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। কিছু কাল পরে আবার উভয়ের মিলন হইল।

কিন্তু এ ত গেল দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়ের মোটামুটি কথা। ইহাতে দুষ্মন্তের চরিত্র বুঝা যায় কিরূপে? সুতরাং আর একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখা যাক্, রূপ হইতে কিরূপে ধীরে ধীরে দুষ্মন্তের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হইল। বিনীতবেশে দুষ্মন্ত তপোবনে প্রবেশ করিয়াছেন। অলঙ্কার, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি রাজসজ্জা সারথির নিকটে। তপোবনে এ সকল শোভা পায় না। কালিদাসের নায়কের সামঞ্জস্য-জ্ঞান বেশ আছে। তপোবনে প্রবেশ করিয়া দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। দক্ষিণ বাহু স্পন্দন পরিণয়সূচক। দুষ্মন্ত ভাবিলেন, এই শান্তিনিকেতনে তাঁহার বাহুস্পন্দন হয় কেন? আবার মনকে প্রবোধ দিলেন, ভবিতব্য অনিবার্য্য—যাহা হইবার হইবেই। সংস্কারের সহিত লোকের মনে যে ভাব আন্দোলিত হয়, দুষ্মন্তেরও তাহাই হইয়াছিল; দুষ্মন্তের মন প্রচলিত সংস্কারের অতীত নহে। স্ত্রীলাভসূচক বাহুস্পন্দনে তাঁহার আনন্দ হইয়াছে। কিন্তু তপোবনে স্ত্রীলাভের তাদৃশ সম্ভাবনা না থাকায় ভবিতব্যতার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইল। এ নির্ভরও কিন্তু সন্দেহজড়িত।

এমন সময়ে নেপথ্যে রমণীকণ্ঠ শুনা গেল—"ইদো ইদো সহীও।" দুষ্মন্ত দেখিলেন, ঋষিকন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘট হস্তে বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতেছেন। এ দৃশ্য দুষ্মন্তের বড়ই ভাল লাগিল। স্বভাবতই তাঁহার মনে হইল,

"অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।
শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥"

এবারে উদ্যানলতা বনলতার নিকট হার মানিয়াছে। আশ্রমবাসিনীর এমন রূপ! রাজ-অন্তঃপুরেও যে এ রূপমাধুরী দুর্লভ। দুষ্মন্ত বিস্ময়মুগ্ধ।

এই প্রথম শকুন্তলার রূপ দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত করিল। কিন্তু এ আঘাত তেমন কিছু নহে। রূপ মানবহৃদয়ে অল্পবিস্তর আঘাত করেই। তাহার কারণ, আমাদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা। সুন্দর পদার্থ সহজেই নয়ন আকর্ষণ করে, মন মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মই এই। দুষ্মন্তও শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এ অবস্থা প্রেম নহে। তবে ইহা হইতেই প্রেম অনেক সময়ে জন্মে বটে। দুষ্মন্তের এখন বিস্ময়ের ভাব। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার একটু দয়ার উদ্রেক হইল। শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে সখীদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। দুষ্মন্ত ঠাহরাইলেন, শকুন্তলাকে আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করা কণ্বের অসাধুদর্শিতা। এ স্বভাবসুন্দর অতুল রূপরাশি তপঃসাধনে ক্ষয় করিবার চেষ্টা নীলোৎপলপত্রধারে শমীবৃক্ষ ছেদনের ন্যায়। কিন্তু কি করিবেন? এ বিষয়ে তাঁহার ত হাত নাই। অগত্যা গাছের আড়ালেই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সেখান হইতে তিনি শকুন্তলার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। বল্কলেও তন্বী মনোহারিণী। স্বভাবসুন্দরীর অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? মলিন কলঙ্কেও চন্দ্রের সৌন্দর্য্য। রাজা শকুন্তলার এই অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট। এ সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথা?

এতক্ষণ দুষ্মন্ত মোটামুটি শকুন্তলার রূপ দেখিলেন। শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে ভাবের প্রাধান্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এ ভাবপ্রধান সৌন্দর্য্যে কে না মুগ্ধ হয়? অলঙ্কারে নয়ন আকর্ষণ করিতে পারে মাত্র। অতুল ঐশ্বর্য্য রাজার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। তাঁহার নয়নও সে দিকে ফিরিয়া দেখে না। রূপসীপ্রিয় রূপ খুঁজেন। সুতরাং দুষ্মন্তের পক্ষে স্বভাবসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক অথবা দুষ্মন্তের চরিত্রগত অসাধারণ বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। সেলিম নুরজাহানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন নুরজাহান দরিদ্রের কন্যা। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল বোধ করি। কালিদাসের হাতে পড়িলে তিনিও বলিতেন, সৌন্দর্য্য

স্বভাবতই সুন্দর—অলঙ্কারে তাহার আর কি হইবে! ইহা হইতে চরিত্রগত বিশেষত্ব কিছুই প্রমাণ হয় না। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, দুষ্মন্তের রুচি বিকৃত নহে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে মোটামুটি দেখিয়াছেন; এইবারে একটু খুঁটিনাটি। শকুন্তলার অধর কিরূপ? বাহু কেমন সুন্দর? ইত্যাদি। ভাবিয়া চিন্তিয়া মোটামুটি হইতে দুষ্মন্ত খুঁটিনাটিতে নামেন নাই। যেমন চোখে পড়ে, তিনি দেখিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া থাকিবার জো নাই। শকুন্তলার

"অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধং॥

কিন্তু এমন সুন্দরীকে পাওয়া যায় কিরূপে? দুষ্মন্ত যতই দেখিতেছেন, শকুন্তলা-লাভস্পৃহা তাঁহার ততই বলবতী হইয়া উঠিতেছে। শকুন্তলা যদি কণ্বের অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা হয়। হইতেও পারে। "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ"। সন্দেহস্থলে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই প্রমাণ। কিন্তু তাহা বলিয়া ত আর শকুন্তলা লাভ হয় না। শকুন্তলার বৃত্তান্ত যথার্থ জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণকন্যা হইলে ত আর বিবাহ হইবে না। দুষ্মন্ত বড় সমস্যায় পড়িয়াছেন। এইখানেই তাঁহার সংযম যাহা কিছু প্রকাশ পায়। তেমন অসংযতচরিত্র হইলে তিনি জাতি বিচার করিতে বসিতেন না। দুষ্মন্তের সংযমের পরিচয় প্রথম—বিবাহের বাসনায়, দ্বিতীয়—শকুন্তলার জাতিবিচারে। আত্মসুখের দুয়ারে শকুন্তলাকে তিনি বলি দিতে চাহেন না। ইহাতেই তাঁহার প্রেম বুঝা যায়। এবং এই অবধিই দুষ্মন্তের সংযম। আর অসংযম তাঁহার ভোগ-অধীরতায়। পূর্ণ অন্তঃপুরেও অপরিতৃপ্তিই তাহার প্রমাণ। রূপসী দেখিলে দুষ্মন্তের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি সহজে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারেন না।

এখন দেখিতে হইবে, দুষ্মন্তের সংযম কত দূর স্বাভাবিক এবং কিরূপ প্রবল। আমরা দেখিলাম, রূপের বশ হইয়াও তিনি শকুন্তলার জাতি বিচার করিতেছেন। কিন্তু এইখানে কথা আছে। দুষ্মন্ত ভারতের রাজা। প্রজাদিগের নিকট তাঁহার যথেষ্ট সম্মান আছে। প্রতাপশালী হইয়াও এই সম্মানটুকু রাখিবার জন্য তাঁহাকে সাবধানে চলিতে হয়। যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে প্রজা অসন্তুষ্ট হইবে, সম্মান ত থাকিবেই না। এই কারণেই দুষ্মন্ত অনেকটা সংযত। রাজা না হইলে বোধ করি, তাঁহার এতটা সম্মান চাহিয়া থাকিতে হইত না। সুতরাং সংযমও থাকিত না। রাজ-সম্মানই তাঁহার ইন্দ্রিয়শাসক। তবে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া পরিণীতা শকুন্তলাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কেন? ঋষিদের কথায় পর্য্যন্ত তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন নাই।

তেমন রূপসীপ্রিয় হইলে এ অবসর কি ছাড়িতেন? শকুন্তলাকে তখন গ্রহণ না করিবার দুই কারণ। এক, শকুন্তলা সসত্ত্বা। কাহার পুত্রকে দুষ্মন্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন? দ্বিতীয়, রাজ-সম্মানের সহিত শকুন্তলা-গ্রহণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার সম্মান বজায় রহিল।

সুতরাং দেখা গেল, দুষ্মন্তের সংযম অবস্থা এবং শিক্ষাগত। শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহে সম্মত করাইবার সময়ে বুঝা যায়, স্বভাবতঃ তিনি বড় সংযতচরিত্র নহেন। শকুন্তলার সখীরা দূরে গিয়াছেন। শকুন্তলা তাঁহাদের নিকটে যাইতে চাহেন। দুষ্মন্ত ছাড়িতে চাহেন না। শিক্ষা এবং অবস্থার সহিত তাঁহার স্বভাবের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। স্বভাবের জয়। তবে একটা কথা। ইহা হইতে দুষ্মন্তকে কেহ নিতান্তই ইন্দ্রিয়ের ভক্ত সেবক না ঠাহরাইয়া বসেন। ইন্দ্রিয়জয়ে তিনি যত্নশীল এবং কতকটা সক্ষমও। তথাপি রূপ তাঁহাকে কিছু অস্থির করে। দুষ্মন্ত রামচন্দ্র নহেন বলিয়াই কিন্তু তাঁহার নিন্দা করা চলে না। প্রবল রূপাকর্ষণের মধ্যেও যে তাঁহার জ্ঞান কার্য্য করিতে থাকে, ইহাই যথেষ্ট। দুষ্মন্ত যাহাই হউন, অসম্পূর্ণ মানবসন্তান। ক্রটি একটু আধটু মার্জ্জনা করিতে হইবে। তবে রোমিও-র সহিত তুলনা করিয়া আমরা তাঁহাকে বাড়াইতে চাহি না। কারণ, দুষ্মন্ত একজন গণ্যমান্য বিজ্ঞ রাজা, আর রোমিও বড় ঘরের ছেলে মাত্র। উভয়ের তুলনা নিতান্তই অসঙ্গত হয়।

আমরা দুষ্মন্তকে সন্দেহের অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ভাবিতেছেন, শকুন্তলা ব্রাহ্মণী কি না! এ দিকে শকুন্তলাকে একটা ভ্রমর বড় বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সখীদিগকে সেই দুর্ব্বিনীত মধুকর হইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে বলিতেছেন। সখীরা বলিলেন, তাঁহারা কে? তপোবনরক্ষা রাজার কার্য্য—শকুন্তলা দুষ্মন্তকে আহ্বান করুন। দুষ্মন্ত এইবার অবসর বুঝিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, দুষ্মন্ত রাজা থাকিতে তাপস-বালার প্রতি অবিনয় আচরণ করে কে? তাহার পর যথারীতি তপোবনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনসূয়া শকুন্তলাকে পর্ণশালা হইতে পাদোদক প্রভৃতি আনিতে বলিলেন। দুষ্মন্ত কহিলেন, তাঁহাদের মধুর বাক্যেই আতিথ্য করা হইয়াছে। দুষ্মন্ত বাক্যালাপে বিলক্ষণ পটু। মধুরালাপচ্ছলে অল্পক্ষণমধ্যেই শকুন্তলার বৃত্তান্ত জানিতে তাঁহার বাকি রহিল না। যতই জানিতেছেন—শকুন্তলা দুষ্প্রাপ্য নহে, শকুন্তলাকে পাইবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইতেছে। এমন কি, শকুন্তলা যখন উঠিয়া যান, দুষ্মন্তের হৃদয় তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেও অগ্রসর হইয়াছিল। কেবল "বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ"।

দুষ্মন্ত শকুন্তলায় মজিয়াছেন। শকুন্তলার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি। শকুন্তলার প্রত্যেক

ভাবভঙ্গী তিনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। সুন্দরী দুষ্মন্তে অনুরক্তা। কিন্তু সে অনুরাগ ত মুখে প্রকাশ পায় না। সে অনুরাগের প্রমাণ,

"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীনা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥"

শকুন্তলা দুষ্মন্তের কথায় যদিও কিছু বলেন না, দুষ্মন্ত কথা কহিলে কাণ খাড়া করিয়া থাকেন। দুষ্মন্তের পানে তিনি যথেষ্ট চাহিয়া থাকেন না, কিন্তু অন্য দিকেও বড় দৃষ্টি নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা-হৃদয় বুঝিতে বাকি নাই। তাঁহার পূর্ণ অন্তঃপুর—সরলা আশ্রমবাসিনীর ভাব বুঝিতে কতক্ষণ লাগে।

বহু ক্ষণ মধুরালাপানন্তর আশ্রমবাসিনীরা পর্ণশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। দুষ্মন্তও বিদায় লইলেন। বিদায়কালে দুষ্মন্তকে সখীরা বেশ গুছাইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা অতিথির যথাযোগ্য সৎকার করিতে পারিলেন না বলিয়া বড় লজ্জিত আছেন, কোন্ মুখে আর তাঁহাকে পুনরায় আসিতে বলেন, ইত্যাদি। দুষ্মন্তও আপ্যায়িত করিতে কম নহেন। তিনি বিনয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তাঁহাদের দর্শনেই তিনি পুরস্কৃত। শকুন্তলা বল্কল কুরবকশাখালগ্ন হইয়াছে ছল করিয়া যতক্ষণ পারেন, রাজাকে দেখিয়া লইলেন। দুষ্মন্ত ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। নগরগমনে তাঁহার বড় ইচ্ছা নাই। শকুন্তলা হইতে তিনি মনকে ফিরাইতে অক্ষম। তপোবনের অনতিদূরেই তাই আপাততঃ থাকিবেন স্থির করিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অঙ্ক এইখানেই সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক মাধব্যের সহিত দুষ্মন্তের কথাবার্ত্তা। সে সকল কথাবার্ত্তার বিশেষ বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। তবে শকুন্তলা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বটে। বিদূষকের সহিতই সে কালে রাজাদের মন-খোলাখুলি। যে সকল কথা অপরকে বলা যায় না, বিদূষক তাহা জানিতে পারেন। দুষ্মন্ত ব্রাহ্মণকে শকুন্তলার রূপ নানারূপে বুঝাইয়াছেন। রূপবর্ণনাগুলি কালিদাসেরই যোগ্য। তাহার আর সমালোচনা কি করিব! দুষ্মন্তই ত বলিয়াছেন, সে রূপ যে দেখে নাই, তাহার নয়ন বৃথা। বিধাতা তাহাকে সৌন্দর্য্য মন্থন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সে দেহ স্রষ্টার সামর্থ্যের চূড়ান্ত পরিচয়।

সুতরাং এ রূপ দেখিয়া অবধি দুষ্মন্তের আর তৃপ্তি নাই। দুষ্মন্ত শকুন্তলার দর্শনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। কি ছলে পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইবেন, মাধব্যের সহিত

তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। এই সময়ে রাক্ষসপীড়িত ঋষিগণের আগমনে তাঁহার সুবিধাই হইল। অত্যাচার প্রতিকারের ছলে তিনি সহজেই তপোবনে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু এক বিঘ্ন উপস্থিত। রাজমাতা ব্রত করিবেন। দুষ্মন্তকে রাজধানীতে যাইতে হইবে। দুষ্মন্ত বড় সমস্যায় পাড়লেন। দুই দিক্ রক্ষা করা সহজ নহে। অগত্যা স্থির করিলেন যে, মাধব্যকে রাজমাতা সন্নিধানে পাঠাইয়া নিজে ঋষিদিগের কার্য্যে তপোবনে যাইবেন। মাধব্যকে রাজমাতা পুত্রের মত স্নেহ করেন। সুতরাং তাহাকে পাইলে তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইবেন। আর নিজে তপোবন রক্ষা দ্বারা ঋষিদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। অধিকন্তু তপোবনে শকুন্তলা-দর্শনলাভ সম্ভাবনা। কিন্তু মাধব্য যদি রাজ-অন্তঃপুরে শকুন্তলার কথা বলিয়া বসেন! সেই জন্য দুষ্মন্ত মাধব্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সত্য নহে—এতক্ষণ পরিহাস করিতেছিলেন মাত্র। ঋষিদিগের অনুরোধেই তাঁহাকে তপোবনে যাইতে হইতেছে। ইচ্ছা তেমন নয়।

এইরূপ বুঝাইয়া মাধব্যকে রাজা রাজধানীতে পাঠাইলেন। নিজে তপোবনে চলিলেন। দুষ্মন্ত বুঝেন, শকুন্তলা পরাধীনা, কণ্বের অনুজ্ঞা ভিন্ন তাঁহার সহিত শকুন্তলার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু বুঝিলে কি হয়? মন যে বুঝিয়াও বুঝে না। মানব দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। মালিনীতীরে শকুন্তলা সখীদিগের সহিত বিশ্রাম করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া উপস্থিত। দুষ্মন্ত এবারেও বৃক্ষান্তরালে। শকুন্তলা কৃশ হইয়া পডিয়াছেন, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। দুষ্মন্ত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন আতপতাপ। আবার ভাবিলেন, হয় ত শকুন্তলারও মনের অবস্থা তাঁহারই মত। সখীরাও তাহাই ঠাহরাইয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলার মুখ হইতে একবার না শুনিলে তাঁহাদের হৃদয় তৃপ্তি মানে না। সখীরা নানা উপায়ে শকুন্তলার মনের কথা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। শকুন্তলা মুখ ফুটিয়া বড় কিছু বলেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বলিয়াও ফেলিলেন। দুষ্মন্ত গাছের আড়াল হইতে সকল শুনিতেছেন। তিনি শকুন্তলার ভাব বুঝিলেন। শকুন্তলা রাজার জন্যই ব্যাকুল। রাজা বিহনে তাঁহার প্রাণ সংশয়। দুষ্মন্তের একটু আনন্দ হইল। ভালবাসার প্রতিদানে যথার্থই আনন্দ হয়। দুষ্মন্তও শকুন্তলা-সম্মিলনের জন্য অধীর। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইলেন। প্রেমালাপ আরম্ভ হইল। দুষ্মন্তই অনেক কথা বলেন। পাশ্চাত্য রমণীর মত শকুন্তলা প্রেমালাপে দক্ষা নহেন। লজ্জা-নীরবতাই তাঁহার প্রেমভাষা। সখীরাই এ প্রেমের ঘটক। বলিতে কি, তাঁহারই অর্দ্ধেক ভাষা।

অনসূয়া কথায় কথায় বলিলেন—শুনা যায়, রাজারা বহু দার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, শকুন্তলার অবস্থা যাহাতে শোচনীয় না হয়, দুষ্মন্তকে এরূপ করিতে হইবে। দুষ্মন্ত উত্তর দিলেন, রাজাদের পত্নীসংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক বটে, কিন্তু সকলগুলি ত আর সমান নয়,

"পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥"

প্রিয়সখী শকুন্তলার বিষয় ভাবিতে হইবে না। শকুন্তলা প্রধানা মহিষী হইবেন।

সখীরা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইয়া বসিলেন। শকুন্তলা উঠিয়া যাইতে চাহেন। দুষ্মন্ত বলপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করেন। শকুন্তলা তখন বলিলেন, "পোরব রক্‌খ অবিণঅং মঅণসন্তত্তা বি ণহু অত্তণো পভবামি।" পৌরব! অবিনয় আচরণ করিও না। মদনসন্তপ্তা হইলেও আমার নিজের উপর আমার ক্ষমতা নাই। শকুন্তলা এ অবস্থায়ও একেবারে জ্ঞানহারা হয়েন নাই। লজ্জাশীলার কর্ত্তব্যজ্ঞান এখনও প্রবল। কিন্তু দুষ্মন্ত সংযম হারাইয়াছেন। শকুন্তলা পরাধীনা জানিয়াও তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চাহেন। শকুন্তলা তথাপি বুঝেন না। দুষ্মন্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি কখন্ ছাড়িয়া দিবেন? না— যখন শকুন্তলার অধর পানে তাঁহার পিপাসা নিবৃত্ত হইবে ;

"অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য॥"

এই কারণেই আমরা বলি, দুষ্মন্তের চরিত্র সংযমপ্রধান নহে। রূপমোহের প্রথমাবস্থায় জ্ঞানক্রিয়া অল্পবিস্তর সকলেরই প্রবল থাকে। ক্রমে ক্রমেই লোকে জ্ঞানহারা হয়। দুষ্মন্তও তাহাই হইয়াছেন। ভোগাবসর তিনি ছাড়িতে চাহেন না। তবে পদমর্য্যাদা তাঁহাকে সমাজ-নিয়মের গুরুতর অবমাননা হইতে রক্ষা করে। দুষ্মন্ত রূপমুগ্ধ হইয়াও দেখেন যে, সমাজের প্রচলিত নিয়মানুসারে এরূপ মিলন অসঙ্গত হইবে কি না। সমাজ-নিয়ম উল্লঙ্ঘন তাঁহার স্বভাব নহে। তবে রিপু তাঁহার কিছু প্রবল। চেষ্টা করিয়াও সকল সময়ে তিনি তাহাকে দমন রাখিতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য নানা গুণে তাঁহার এ দোষ অনেকটা ঢাকিয়া গিয়াছে।

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারেই বিবাহ করিলেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তের

ইচ্ছা অতিক্রম করিতে অক্ষম। বিবাহানন্তর রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া চলিলেন। শকুন্তলাকে স্বনামাঙ্কিত একটি নিদর্শন-অঙ্গুরীয়ক দিয়া গেলেন। শকুন্তলা আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহাকে লইতে কবে লোক আসে!

ইতিমধ্যে এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া উপস্থিত। শকুন্তলা একমনে দুষ্মন্তকে চিন্তা করিতেছেন। দুর্ব্বাসা আসিয়া দূর হইতেই বলিলেন,—"অয়মহং ভোঃ।" অন্যমনস্ক থাকায় শকুন্তলা শুনিতে পাইলেন না। দুষ্মন্তই তখন তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া। দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন, শকুন্তলা যাঁহার ধ্যানে মগ্ন, তিনি শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন। সখীরা অভিশাপ শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঋষিবরের চরণে পতিত হইলেন। অনেক কষ্টে দুর্ব্বাসার ক্রোধের উপশম হইল। তখন তিনি কহিলেন, শাপ ত ব্যর্থ হইবার নহে, তবে অভিজ্ঞানাভরণ দর্শনে দুষ্মন্তের স্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। এই দুর্ব্বাসার শাপ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এখন হইতে অভিজ্ঞানশকুন্তলের যাহা কিছু ঘটনা, এই শাপপ্রভাবে।

এই শাপপ্রভাবে দুষ্মন্ত রাজধানীতে গিয়া শকুন্তলার কথা ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং শকুন্তলাকে লইতে লোকজন কেহই আসিল না। কণ্ব মুনি সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পরিণয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। শিষ্যসঙ্গে তিনি শকুন্তলাকে স্বামীর আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ, বিবাহের পর স্ত্রীলোকের দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস বাঞ্ছনীয় নহে। শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেম এইখানে বিশেষ প্রকাশ পায়। প্রকৃতির সহিত শকুন্তলা এক। শকুন্তলা প্রকৃতিরই কন্যা। বিদায়কালে প্রত্যেক তরুলতার জন্য শকুন্তলার মন ব্যাকুল। এ সকল কি আর কখনও দেখা ভাগ্যে ঘটিবে! কণ্ব যথাসাধ্য শকুন্তলাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কণ্বের কথাগুলি শুনিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। শকুন্তলাকে তিনি আশীর্ব্বাদের সহিত যে উপদেশ দিলেন, তাহাপেক্ষা অল্প কথায় ঐরূপ সুন্দর উপদেশ বোধ করি, কেহই দিতে পারেন না। তিনি কহিলেন,

"সা ত্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য
শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

তুমি এখান হইতে পতিকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় আচরণ করিবে, অপমানিতা হইলেও ক্রোধবশে স্বামীর প্রতিকূলচারিণী

হইবে না, সৌভাগ্যে অগর্ব্বিতা থাকিবে, পরিজনে অনুকূলা হইবে। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হয়েন। বিপরীতচারিণীরা কুলের যাতনাস্বরূপ।

শকুন্তলা এ উপদেশ কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

শকুন্তলা রাজধানীতে চলিলেন। সঙ্গে গৌতমী, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত। দুষ্মন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না। শকুন্তলার রূপ কেবল তাঁহার চক্ষু আকর্ষণ করিল। শকুন্তলাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পাণ্ডুপত্রমধ্যে কিসলয়ের ন্যায় তপোধনদিগের মধ্যে নাতিস্ফুটশরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতী ঐ রমণী কে? প্রতিহারী বলিল, ইঁহার আকৃতি দর্শনীয় বটে। রাজা বলিলেন, কিন্তু পরস্ত্রী দর্শনার্হা নহে। শকুন্তলার হৃৎকম্প হইতেছে। এ অবস্থায় কাহার না হয়? শার্ঙ্গরব ধীরে ধীরে শকুন্তলার কথা বলিলেন। দুষ্মন্ত কিছুই বুঝিতে পারেন না। তিনি আবার তপোবনে বিবাহ করিয়া আসিলেন কবে? গৌতমীও শকুন্তলা-পরিণয়ের বৃত্তান্ত বলিলেন। দুষ্মন্ত অবাক্। এখন গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। দুষ্মন্ত তাহাতেও চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই রূপরাশি দেখিয়া তিনি কি ভাবিলেন? তিনি যাহা ভাবিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্র ব্যক্ত।

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্॥"

এই অম্লানশোভা রূপরাশি এখানে আসিয়া উপস্থিত। পূর্ব্বে ইহাকে বরণ করিয়াছি কি না, কে জানে! ভ্রমর যেমন প্রভাতে হিমাচ্ছন্ন কুন্দকুসুমকে ভোগ করিতেও পারে না, ছাড়িতেও পারে না, আমিও সেইরূপ এই রূপরাশি ভোগ করিতেও পারিতেছি না, ছাড়িতেও পারিতেছি না।

ক্রমে ক্রমে শকুন্তলাকেও মুখ খুলিতে হইল। তিনি অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু স্মৃতিভ্রষ্ট রাজার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল না। তখন শকুন্তলা অভিজ্ঞানের উল্লেখ করিলেন। দুষ্মন্ত বলিলেন, বেশ কথা, অভিজ্ঞান দেখিলে সকল সংশয় ঘুচিবে। শকুন্তলা অঙ্গুলীতে হাত দিয়া দেখেন—অঙ্গুরীয়ক নাই। বুঝিলেন, নিতান্তই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। শকুন্তলা আপনাকে দুষ্মন্তপত্নী বলিয়া কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধে অপমানে লজ্জায় এবং তদুপরি বন্ধুজনের কঠোর বচনে শকুন্তলা মর্ম্মে মরিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভঅবই বসুহে

দেহি মে বিঅরং।” বসুধা স্থান দিলেন না। শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেলেন। “স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ” আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। দুষ্মন্ত পুরোহিতের মুখে এ ঘটনা শুনিলেন। তাঁহার হৃদয় বড়ই কাতর। শকুন্তলার বিবাহের কথাও মনে পড়িতেছে না, হৃদয়ও শান্ত হইতেছে না। এমন সংশয়ে দুষ্মন্ত কখনও পড়েন নাই।

কিছু দিন পরে সেই অঙ্গুরীয়ক পাওয়া গেল। এক ধীবর মৎস্যের উদর হইতে অঙ্গুরীয়ক পায়। রাজকর্ম্মচারীরা ধীবরকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনে। দুষ্মন্ত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। ধীবর পুরস্কার পাইল। রাজা শকুন্তলার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু নিরুপায়। হাতের লক্ষ্মী তিনি পায়ে ঠেলিয়াছেন। এখন আর দুঃখ করিয়া ফল কি? শকুন্তলা কি আর মিলিবে? দুষ্মন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া শুকাইয়া যাইতেছেন। সে দুষ্মন্ত আর নাই। রাজা এখন স্ফূর্ত্তিহীন, কোন প্রকারে জীবনভার বহন করিতেছেন মাত্র।

কিন্তু শকুন্তলা মিলিল। দেবকার্য্যে রাজা দ্যুলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময়ে শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ। শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমনকে দেখিয়া রাজা একটু বিস্মিত হয়েন। শকুন্তলার পুত্র বলিয়া এ বিস্ময় নহে—রাজা তাহা জানিতেন না—এই তপস্বিপরিবৃত স্থানে চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত বালক দেখিয়াই তাঁহার বিস্ময়। তাহার পর সর্ব্বদমনের পরিচয় শুনিয়া এবং তাহার মাতাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের আনন্দের সীমা রহিল না। শকুন্তলা প্রথমে অনুতাপে জীর্ণ শীর্ণ রাজাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে যখন পরস্পর পরস্পরকে জানিলেন, তখন বহুদিনের শোক তাপ ঘুচিয়া গেল। দুষ্মন্ত পুত্র সহ শকুন্তলাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন। সকল দুঃখ অবসান হইল।

এত ক্ষণে আমরা প্রণয়ী দুষ্মন্তের চিত্র সম্পূর্ণ করিলাম। দুষ্মন্তের প্রণয়ব্যাপার জানিতে আমাদের আর বাকি নাই। এখন এক বার এত ক্ষণ দুষ্মন্তের চরিত্র আলোচনা করিয়া যাহা দেখিলাম, এইখানেই সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করি।

১। দুষ্মন্ত কিছু অধিকমাত্রায় রূপসীপ্রিয়। রূপ দেখিলেই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। শকুন্তলাকে তিনি যখন যেখানে দেখিয়াছেন, তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। এমন কি শকুন্তলাকে পরের স্ত্রী মনে করিয়াও দুষ্মন্ত তাঁহার রূপে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই।

২। কিন্তু রূপসীপ্রিয় বলিয়া দুষ্মন্ত দুরাচার নহেন। অর্থাৎ রূপসীর রূপরাশি

কলঙ্কিত করিয়া তিনি মজা দেখেন না। রূপসীকে তিনি ধর্ম্মপত্নীরূপে বরণ করিয়া আনিয়া স্বীয় অন্তঃপুরের শোভা বর্দ্ধন করিতে চাহেন। কিন্তু বলপূর্ব্বক নহে।

৩। স্বভাবতঃ দুষ্মন্তের সংযমশক্তি বিশেষ প্রবল বলা যায় না। অধিক রূপসী-প্রিয়তা সংযমের বিপক্ষেই প্রমাণ দেয়। কিন্তু অবস্থা এবং শিক্ষাগুণে তিনি কতকটা সংযত। রাজসম্মান তাঁহাকে অনেক সময়ে বাঁচাইয়া দেয়। সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া এবং প্রজাদিগের বিরাগভাজন না হইয়া রূপ উপভোগের অবসর তিনি সহজে পরিত্যাগ করেন না। অন্তঃপুরের অভিমান তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না।

৪। রাজসম্মানই যে সকল সময়ে দুষ্মন্তের সংযমের কারণ, তাহা নহে। ধর্ম্মও অনেক সময়ে। রূপের প্রলোভনে তাঁহার যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে হয়, এরূপ কার্য্য বোধ করি তিনি করেন না। যেমন, বলপ্রকাশ। তবে রূপসীর বিবাহে অসম্মতি তাঁহার ভাল না লাগিতে পারে। দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর নহেন।

৫। প্রেমের সম্মানভাব দুষ্মন্ত বুঝেন। সেই জন্যই অনসূয়ার কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলা বহু পত্নীর মধ্যে প্রধানা হইবেন। তবে সম্মানভাব বুঝিলেও রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহার কত দূর বলা যায় না। কারণ, রূপসীপ্রিয়তা এবং ভোগতৃষ্ণার প্রাবল্য নূতন পাইলে কি করে বলা দায়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে রূপসীপ্রিয়তাই দুষ্মন্তের চরিত্রের লক্ষণ। অন্যান্য অনেক গুণ ইহারই ফল মাত্র।

প্রণয়ী দুষ্মন্তের বিষয় আলোচনা করিবার আর বড় আবশ্যক নাই। এইবারে দুষ্মন্তকে অন্যান্য ভাবে দেখা যাক্। প্রথমতঃ দুষ্মন্ত রাজা। আসমুদ্র ভারতবর্ষ তাঁহার প্রতাপে থরহরিকম্প। না হইবে কেন? দুষ্মন্ত পরিশ্রমকাতর নহেন। রাজকার্য্য সকলই তিনি নিজে দেখেন। রাজা বলিয়া তিনি বাবু নহেন। তাঁহার শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের প্রথমেই তাহার পরিচয়। মৃগয়া দুষ্মন্তের প্রিয় ব্যায়াম; ধনুর্ব্বাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। শারীরিক বলে তিনি কাহাপেক্ষা হীন নহেন। শারীরিক বলে যেমন, মানসিক শক্তিতেও দুষ্মন্ত সেইরূপ। নহিলে এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিতে পারেন? তাঁহার প্রহরী আছে, কোতোয়াল আছে, সেনাপতি আছে, অমাত্য আছে; সকলেই তাঁহার প্রবল রাজ-শক্তি অনুভব করিয়া থাকে। তিনি সকলকে চালাইয়া বেড়ান। কিন্তু কেহ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বশ করিতে পারে নাই। এই কারণেই তাঁহার শাসনের সুশৃঙ্খলা। তাঁহার প্রবল প্রতাপ দেবলোকেও মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হয়।

কিন্তু এই প্রবলপ্রতাপ নরপতি গর্ব্বিত নহেন—তাঁহার স্বভাব বিনয়নম্র। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদান দ্বারা সংকৃত করেন। জ্ঞানী ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিদিগকে তিনি দেবতার মত দেখেন, সাধারণ প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, যাহার যাহা অভাব, যথাসাধ্য মোচন করিয়া ধন্য হয়েন। বিচারকার্য্যেও তিনি সুপণ্ডিত। মৃত বণিকের বিষয়ব্যবস্থায় তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রজার ধন অপহরণ করিয়া তিনি ধনী হইতে চাহেন না। বৈতালিক তাঁহাকে যথার্থই বলিয়াছে,

"স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥
নিয়ময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম
ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্॥"

বাস্তবিকই দুষ্মন্ত রাজার মত রাজা—প্রজারঞ্জক। দুষ্মন্ত আত্মসুখসর্ব্বস্ব নহেন।

এহেন সংযত রাজচরিত্র রূপমোহ অতিক্রম করিতে পারেন না কেন? তাহার কারণ, রাজচরিত্রও মানব। দুষ্মন্ত আর সকল বিষয়েই সংযত। রূপসীই কেবল তাঁহাকে বশ করিতে পারেন। এইখানেই দুষ্মন্ত-চরিত্রের দুই ভাব। কিন্তু ইহার কোথাও অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয় না। বহিঃশাসনে দুষ্মন্তের প্রতাপ দুর্দ্দম্য। অন্তঃশাসন-ক্ষমতা তাঁহার তাদৃশ প্রবল নহে। বোধ করি, অন্তর অপেক্ষা বাহিরের দ্বারা দুষ্মন্তও শাসিত হয়েন। রাজারও ত শাসন আছে! দুষ্মন্ত সভ্য ভব্য ভদ্র বিনয়ী! প্রচলিত সমাজ-নিয়মের দ্বারাই তিনি চালিত হয়েন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহার প্রকৃতি নহে। রাজা-রাজড়ারা স্বাধীন চিন্তাশীল অল্পই। স্বাধীন চিন্তা ব্রাহ্মণের স্বভাব। দুষ্মন্ত ক্ষত্রিয় রাজা। ব্রাহ্মণের বিধানই তাঁহার কার্য্যের মেরুদণ্ড। শুধু তাঁহার বলিয়া নহে, প্রাচীন সমাজ ব্রাহ্মণের বেদবাক্য অবলম্বন করিয়াই উন্নতিশিখরে উঠিয়াছিল। দুষ্মন্ত এই বিধানানুসারেই রূপসীপ্রিয়তা চরিতার্থ করিতে পারিয়াছিলেন। এবং এই বিধানের গুণেই তাঁহার যতটুকু সংযম। সে বিধান আর কিছু নহে—বহুবিবাহ এবং ব্রাহ্মণকন্যাবিবাহ-নিষেধ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে রাজা দুষ্মন্ত মানব দুষ্মন্তের সহিত মিশিয়া সম্পূর্ণ। কালিদাস এক প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে দুষ্মন্ত-চরিত্রের সকল দিক্ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দুষ্মন্ত-

চরিত্র তিন ভাবে ফুটিয়াছে। দুষ্মন্ত রাজা, দুষ্মন্ত সমাজের এক জন ব্যক্তি মাত্র, দুষ্মন্ত প্রণয়ী। আরও এক ভাবে দুষ্মন্তকে দেখা যাইতে পারে। দুষ্মন্ত পুরুষ। শকুন্তলায় দুষ্মন্ত-চরিত্রে পুরুষ-জাতির ভাব বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। দুষ্মন্ত শারীরিক বলে বলীয়ান্ বলিয়া নহে, তাঁহার মানসিক গঠন আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাব অনেকটা পরিস্ফুট হয়। শকুন্তলার সহিত তাঁহার ভাব মিলাইয়া দেখিলে এ বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না। শকুন্তলাও দুষ্মন্তের প্রেমে পড়িয়াছেন, দুষ্মন্তও শকুন্তলায় মুগ্ধ; কিন্তু স্ত্রী এবং পুরুষের স্বাভাবিক ভাব অনুসারে উভয়ের প্রেম কত বিভিন্ন। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়া অবধি তাঁহাতেই তন্ময়। অতিথি দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া যায়, শকুন্তলা তাহা জানেনও না; অভিশাপ উচ্চৈঃস্বরে শকুন্তলার সর্ব্বনাশ সাধন করে, শকুন্তলা তাহা শুনিতে পান না। ভালবাসার পাত্রের সহিত মিশিয়া শকুন্তলা আপনার অস্তিত্ব হারাইয়াছেন। শকুন্তলাপ্রেমে দুষ্মন্তের অস্তিত্ব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহির্জগতের সহিত তাঁহার সহস্র কর্ত্তব্য-সম্বন্ধ এই প্রেমের মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট। বাস্তবিক, রমণী-হৃদয় একজনের প্রেমে যেরূপ অগাধ পরিতৃপ্তি অনুভব করে, পুরুষ-হৃদয় কিছুতেই তাহা পারে না। এই গভীর পরিতৃপ্তিতেই রমণীর অস্তিত্ব অনেকটা মিশাইয়া যায়। পুরুষের স্বভাবই অতৃপ্তি। এই জন্যই তাহার অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বে মিশিয়া এক হইয়া যায় না। অপরের অস্তিত্বই তাহাতে মিশিয়া থাকে।

দুষ্মন্ত রীতিমত পুরুষ-চরিত্র। তাঁহার হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। হৃদয় তাঁহার বুদ্ধির হাত ধরিয়া চলে। রমণীর হৃদয় অনেকটা স্বতন্ত্র। মস্তকের সহিত তাহার বড় সম্বন্ধ নাই। এই কারণেই রমণীর চরিত্রে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতার প্রাবল্য। আমরা রমণীর এই সঙ্কীর্ণতাটুকুর জন্য বড দুঃখিতও নহি। রমণীর অর্দ্ধেক শ্রীই এইখানে। কিন্তু বিস্তৃতিপ্রধান পুরুষচরিত্রে উদারতা বিশেষ আবশ্যক। দুষ্মন্তের এ উদারতা না থাকিলে তাঁহার বিচারের প্রশংসা বোধ করি শুনা যাইত না। এই গুণেই তিনি রাজা। দুষ্মন্ত-চরিত্রের পুরুষভাব তাঁহার রাজভাবের মধ্য দিয়া বরাবর প্রবাহিত। কালিদাস স্ত্রী এবং পুরুষের ভাবের স্বাতন্ত্র্য বেশ বুঝিতেন। সেই জন্য তাঁহার নাটকের কোনও চরিত্রে এই ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দুষ্মন্ত এই ভাবেই রাজা এবং এই ভাবেই শকুন্তলার সহিত তাঁহার প্রণয় সম্বন্ধ। দুষ্মন্তকে পুরুষ করিয়াই কালিদাস তাঁহার চরিত্রগত সংলগ্নতা বজায় রাখিয়াছেন।

'ভারতী ও বালক'; আশ্বিন ১২৯৭

যশোদা

বৈষ্ণব সাহিত্যের আর একটি প্রেমের চরিত্র যশোদা। রাধার সহিত যশোদার প্রেম অবশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন—একজনের প্রেম স্ত্রীপুরুষঘটিত যৌবনের প্রণয়, অপরের সুগভীর সন্তানস্নেহ—কিন্তু আমাদের প্রেমানুশীলনে যশোদার প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে। যশোদা গোপকন্যা, গোপপত্নী, কৃষ্ণকে জন্মাবধি আপন পুত্র জানিয়া লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং স্বভাবতই কৃষ্ণের উপরে তাঁহার মায়া পড়িয়াছে—তিনিই কৃষ্ণের জননী। যশোদার প্রেম এই ভাবেই আলোচিত হইয়া আসিতেছে। যশোদা কন্যাও বটে, সহধর্ম্মিণীও বটে, কিন্তু ফুটিয়াছেন মাতৃরূপে। স্নেহবৃত্তিই তাঁহার সমধিক বলবতী। কৃষ্ণকে দুই দণ্ড না দেখিলে তিনি অধীর হইয়া পড়েন। কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণাধিক। কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে ধেনু চরাইতে যান, যশোদা প্রহর গণিতে থাকেন; কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে প্রাঙ্গণের বাহির হইলে যশোদা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া দেখিতে আসেন; কৃষ্ণের পাছে কোনও কষ্ট হয়, এই ভয়ে নন্দরাণী সর্ব্বদাই ব্যাকুল। যশোদার এই স্নেহভাবে এমন একটি সরল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। আমাদের চক্ষের সম্মুখে সেই আভীরপল্লীর ছায়াসুপ্ত গ্রাম্য ছবি ফুটিয়া উঠে। সেখানে গিয়া হৃদয় যেন মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া আসে। যশোদার স্নেহ বড়ই মধুর। সে স্নেহ পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয় হইতে নিঃসৃত।

যশোদায় আধ্যাত্মিকতার বড় গোলযোগ নাই। এই কারণে যশোদার চরিত্র আলোচনার কতকটা সুবিধা হইয়াছে। রূপক হিসাবে না দেখিলেও সে সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ। রাধার চরিত্রের মত যশোদাচরিত্র জটিল নহে। রাধার এক দিকে প্রবল আধ্যাত্মিকতা, আর একদিকে সুশৃঙ্খল সমাজ-নিয়মের গুরুতর ব্যভিচার। কৃষ্ণের সহিত রাধিকার সম্বন্ধ বিশেষ জটিল। একে ত দাম্পত্য সম্বন্ধই সহজে রহস্যময়, তাহাতে আবার রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ সম্পর্ক এবং নীতিবিরুদ্ধ। এই কারণেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যারও রাধাকৃষ্ণের প্রয়োজন অধিক। কারণ, রাধাকৃষ্ণের সাধারণ্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা, তাহাতে এরূপভাবে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে দেশের নৈতিক অবস্থায় শোচনীয় পরিণাম সম্ভাবনা। রাধাকৃষ্ণভক্ত কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনই নৈতিক বন্ধন যথেষ্ট শ্লথ। এই দেবলীলাকে অনেকে অনেক ভাবে দেখেন। সম্প্রদায়-বিশেষে ইহা পার্থিব জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ মাত্র। সুতরাং এই সকল সম্প্রদায়ে নীতিবিগর্হিত অনুষ্ঠান কিরূপে প্রশ্রয় পায় বলা বাহুল্য। যশোদার প্রেম মাতৃহৃদয়ের অগাধ স্নেহ। ইহাতে যৌবন নাই, পূর্ব্বরাগ নাই, জ্বালা নাই, জঞ্জাল নাই।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কর বা না কর, যশোদা যেমন তেমনি—তাঁহার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। সে শুভ্র সরল প্রকৃতি স্নেহময় সৌন্দর্য্যে সর্ব্বদাই সুপরিস্ফুট। তাহা বুঝিবার জন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য বা প্রতিভার আবশ্যক করে না।

কিন্তু এইখানে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে দু'একটা কথা সারিয়া যাওয়া ভাল। যশোদারও রূপকে ব্যাখ্যা হয় কি না। তবে জটিলতা-অভাবে রাধার মত ব্যাখ্যাবাহুল্য কাহারও বোধ করি নাই। প্রথমতঃ দেখা যাক্, যশোদার অভ্যুত্থান কিসের মধ্য হইতে? রূপক-ধর্ম্ম, না লোক-কথা? এ বিষয়ে রীতিমত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যত দূর বুঝা যায়, যশোদা রাধার পন্থানুসারিণী। অর্থাৎ রাধা যেরূপে ধীরে ধীরে বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছেন, যশোদারও সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান পরিণতি। সম্ভবতঃ সাধারণের মধ্যে প্রাচীন কালে পিতৃপিতামহাগত কতকগুলি সরস কাহিনী প্রচলিত ছিল। রাধা এবং যশোদা, উভয়েই এই সকল গ্রাম্য কাহিনীর অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন। ক্রমে কবি এবং সংস্কারকদিগের হস্তে পড়িয়া, হয় কাব্য হইতে আধ্যাত্মিক রূপকে, নয় আধ্যাত্মিক রূপক হইতে কাব্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শুধু রাধা এবং যশোদা বলিয়া নহে, শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি অনেকেরই বোধ করি, সে কালের বিবিধ প্রচলিত গল্পের মধ্য হইতে আবির্ভাব। কৃষ্ণ এই সকল গল্পের কেন্দ্রস্থল। বন্ধুরূপে, প্রণয়িনীরূপে, জননীরূপে তাঁহার চারি পার্শ্বে বিবিধ চরিত্র জড় হইয়া একটা সুশৃঙ্খল বৃহৎ আধ্যাত্মিক রূপক রচিত হইয়াছে। রূপক-ব্যাখ্যা প্রথমে কে করেন জানি না, কিন্তু ইহা অতি প্রাচীন —বঙ্গসাহিত্যের বীজ বপনেরও বহু পূর্ব্বে। এবং এই আধ্যাত্মিক রূপকই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি।

এখন আধ্যাত্মিকতা অস্বীকার না করিলেও এই সকল চরিত্রের মধ্যে কাব্য যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কাব্যসৌন্দর্য্য হিসাবে সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাদিগের সৌন্দর্য্যহানি অথবা আধ্যাত্মিকতার প্রতি অবিচার করা বোধ করি হয় না। কাব্যে আমরা যে সৌন্দর্য্যটুকু দেখিতে পাই, তাহার আলোচনায় দোষ কি? কাব্যসৌন্দর্য্য প্রস্ফুটনে বঙ্গসাহিত্যের বৈষ্ণব কবিরাই প্রধান। তাঁহারা যে আধ্যাত্মিক রূপক সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, এমন নয়; কিন্তু কবিস্বভাববশতঃ কাব্যই সমধিক পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই—এরূপ হইয়াই থাকে। তবে এক কথা, আধ্যাত্মিকতাকে সর্ব্বত্র বর্জ্জন করা যুক্তিসঙ্গত না হইতে পারে। তাই বলিয়া সর্ব্বত্র তাহাকে খাড়া করিয়া রাখাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যেখানে মূল উদ্দেশ্য লইয়া টানাটানি, সেখানেই আধ্যাত্মিকতা বিচার্য্য। কাব্যসৌন্দর্য্য-

অভিব্যক্ত চরিত্রগত রসভাব আলোচনাকালে কথায় কথায় আধ্যাত্মিক রূপক-চাতুর্য্যের উল্লেখ-বাহুল্য কেবল মাত্র অনাবশ্যক নহে, অনেক সময়ে সৌন্দর্য্য উপভোগের বিশেষ ব্যাঘাতক। বলা বাহুল্য, ধৈর্য্যচ্যুত পাঠকেরা এখানেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছেন। আর অধিক দূর গড়াইলে যশোদা তাঁহাদের মন হইতে অনেকটা মুছিয়া আসিবার সম্ভাবনা। এইবারে দেখা যাক্, বৈষ্ণব কবির যশোদার অবস্থা কিরূপ।

যশোদা আমাদের দেশের স্নেহময়ী জননীর চিত্র। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে—যশোদায় বাৎসল্য রসের অনুশীলন। বৈষ্ণব কাব্যে উমার স্থান তিনি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু উমার সহিত যশোদার প্রভেদ বিস্তর। নগেন্দ্রনন্দিনী শক্তিরূপিণী—শক্তির পরিচয়স্থল। যশোদা শক্তির বড় ধার ধারেন না। তিনি বৈষ্ণব ভক্তের স্নেহময়ী জননী মাত্র। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গেই কোমলতা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম কোমল ভাবে পূর্ণ। এই জন্যই বোধ করি, সমতল ক্ষেত্রে তাহার সমধিক প্রাদুর্ভাব। নগেন্দ্রনন্দিনীর চরিত্র পাষাণের তুষারস্নেহে গঠিত। কোমলতার মধ্যেও তাহাতে একটা দৃঢ় বল প্রকাশ পায়। পার্ব্বতী তেজস্বিনী। শিবের সহধর্ম্মিণী এরূপ হইবারই কথা। যশোদা গোপবধূ, গোপগৃহিণী—ত্রিশূলও নাই, নন্দীও নাই, ভৃঙ্গীও নাই, নাই সুরাসুরসম্পর্ক, নাই কোনও গণ্ডগোল—আভীরপল্লীর শ্যামল সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণের মুখখানি দেখিয়া পরিতৃপ্ত। অহিংসার ধর্ম্ম শক্তি লইয়া কি করিবে? বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেম চাহে। এই জন্য বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাষা, ভাব, গঠন, বৃত্তি, সকলই কোমল। এমন কি, অনেক স্থলে কঠিন ভাবকেও কোমল ভাষায় গলিয়া যাইতে দেখা যায়। কঠিনতা বুঝি বৈষ্ণবের মর্ম্মে আঘাত করে। তাই হিরণ্যকশিপুবধও তরল ভাষায়, ললিত ছন্দে, কুসুম উপমায় সভ্রূভঙ্গ নদীর মত বিলাসে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। বৈষ্ণব হৃদয় কোমল রসে ভরপূর।

এই কোমল বৈষ্ণব হৃদয়ের কোমলাঙ্গিনী সৃষ্টি—যশোদা। উপরে আমরা বলিয়াছি, যশোদায় বাৎসল্যের স্ফূর্ত্তি। আরও বলি, যশোদায় কেবলমাত্র বাৎসল্য—অন্যান্য রসের বিকাশ হয় নাই। নগেন্দ্রনন্দিনী বিবিধ অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে সুন্দরী। তিনি কন্যারূপে, সহধর্ম্মিণীরূপে, মাতৃরূপে ফুটিয়াছেন। যশোদা বরাবর এক। সেই কৃষ্ণগতপ্রাণা নন্দগৃহিণী। বৈষ্ণব সাহিত্যে এক একটি বিভিন্ন চরিত্রে প্রেমের এক একটি বিশেষ ভাব আলোচিত হইয়াছে। একই চরিত্রে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ বড় দেখা যায় না। আমার বোধ হয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের গীতিকাব্যে শ্রেষ্ঠতার কারণই এই। বৈষ্ণব চরিত্রগুলি বিশেষরূপে গীতিকাব্যোপযোগী। তাহারা যেন তরল ভাববিশেষকে জমাইয়া গঠিত। এবং সে ভাবগুলি কেবলই কোমল প্রেমজ। কোমল

প্রকৃতি, কোমল হৃদয়, কোমল সৌন্দর্য্যে বৈষ্ণব কাব্য রচনা। বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রেম এবং কোমলতা। তাহাতে কেমন একটা বিশেষ তরল lyrical ভাব। এ ভাব তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত। বাঙ্গালার প্রকৃতিও ইহার অনুকূল।

প্রকৃতির সহিত মানব-ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায় পরিস্ফুট। তাঁহাদের চরিত্রগুলি অনুকূল প্রকৃতির মধ্যে গঠিত। যমুনা, নিকুঞ্জ, পল্লবিত শ্যামলতায় কাঠিন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। এ সৌন্দর্য্যে বরং কেমন যেন ঢলঢল আলস ভাব। বৈষ্ণব কাব্যেও এই তরল আলস। রাধার রূপবর্ণনা দেখ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর স্বর শুন, যশোদার পুলক-স্নেহ অনুভব কর, এ ভাবের ব্যতিক্রম কদাচ দৃষ্ট হইবে। অলস মধ্যাহ্ন, দূর বনপ্রান্তে বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। সে উদাস বাঁশীর স্বরে মন যেন কেমন করে। রাধিকার হৃদয় আকুল—ঢলঢল যৌবন যেন বাহিরিতে চায়। শুধু ইহাই নহে, কৃষ্ণের দাঁড়াইবার ভঙ্গীতেও এই আলস ভাব—কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কৃষ্ণের বাঁশী যে হৃদয়ে বাজিয়াছে, সেখানেও এই ভাবানুকূলতা। রাধা প্রাচ্য সুন্দরী। প্রাচ্য রূপসীর গঠনে বর্ণে ভাবে তরলতা। তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তরল ভাবে ঢলঢল। গজেন্দ্রগমনে, আধ চাহনিতে তাহা অভিব্যক্ত। এই সুগোল গঠন, তরল সৌন্দর্য্য বাঁশীর উদাস স্বরে শিথিল। সমস্ত ভাবের মধ্যে কেমন সামঞ্জস্য।

যশোদাও বৈষ্ণব হৃদয়ের এই কোমল ভাবে গঠিত। তাঁহার ভাবের সহিত প্রকৃতির মিলন না হইবে কেন? তিনিও ত এই প্রাচ্য রূপসী। তবে প্রেয়সীরূপে তিনি ফুটেন নাই বলিয়া রাধার মত তাঁহার রূপ লইয়া এত নাড়াচাড়া হয় নাই। যশোদার সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহার স্নেহভাবে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই যশোদাকে বেশ বুঝা যায়। অন্ততঃ বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। আভীরপল্লীর সহিত যশোদার কল্পনা অবিচ্ছেদ্য—দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের সহিত তাঁহার বুঝি কি যোগ আছে। কিন্তু যশোদায় শিথিল আলস-ভাব কোথায়? বৈষ্ণব কাব্যে তাঁহার স্নেহের মধ্যেই এ ভাব সুপরিস্ফুট। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত বুঝি এ ভাব জড়িত। তাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেখান দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সেখানে সমাজবন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল, বৈষ্ণব সাহিত্য যে জাতির হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, সে জাতির বসন-ভূষণেও আঁটসাঁটা ভাবের অভাব। এমন বলি না যে, ধুতি চাদরের দোধূয়মান শোভা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ফল, কিন্তু ইহা যে বাঙ্গালী জাতির বৈষ্ণব ভাবের ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ বড় নাই। বাস্তবিক, আমাদের বসনেও একটা আলস ভাব, একটা বিশেষ lyrical কিছু আছে। আমরা বৈষ্ণবই বটে।

আমার বোধ হয়, বৈষ্ণব কল্পনা শাক্তের মত জম্‌কালো সৌন্দর্য্যপ্রিয় নহে। সরল সৌন্দর্য্যই বৈষ্ণবের বিশেষ প্রিয়। শাক্ত কল্পনা দুর্গার জন্য বাহন সিংহ আনিল, একই সঙ্গে দশটি বাহু যোজনা করিল, চারি পার্শ্বে অসম্ভব অমানুষিক অনেক ব্যাপার না জুড়িয়া পরিতৃপ্ত হইল না। বৈষ্ণব-হৃদয় বাহন সিংহ ছাড়িয়া ধেনু চরাইয়া পরিতৃপ্ত, সিংহাসন ছাড়িয়া গোপগৃহে আশ্রয় খুঁজে। যশোদার সৌন্দর্য্যে একটি কেমন সরল দীনভাব আছে। সে ভাব জননীতেই সম্ভবে, শক্তিতে সম্ভবে না। তাঁহার স্নেহে বিশেষ সুকুমারতা। বৈষ্ণবেরাই এ সৌকুমার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। নগেন্দ্রনন্দিনীর সৌন্দর্য্যে তাই বলিয়া সরল স্নেহের অভাব প্রমাণ হয় না। কিন্তু তিনি যেমন কখনও অন্নপূর্ণা, কখনও বা পাষাণী, যশোদা সেরূপ নহেন। পাষাণ তাঁহার মধ্যে আদবে নাই। যশোদার বোধ করি, গুমরিয়া থাকার ভাবের বিশেষ অভাব। তাঁহার অশ্রু মর্ম্মের মধ্যে সহজে জমাট বাঁধে না। কৃষ্ণকে সাজাইয়া দিয়া তাঁহার সুখ, কৃষ্ণকে দুধটুকু ক্ষীরটুকু খাওয়াইতে পারিলেই পরিতৃপ্তি। যশোদার জীবনে আর কোনও সাধ আহ্লাদ নাই।

যশোদার স্নেহে সর্ব্বদাই যেন কি হারাই হারাই ভয়। হইবারই কথা—কত কষ্টে কৃষ্ণ বাঁচিয়াছেন। তাঁহার পাঁচটি সন্তান নাই—সবে ধন নীলমণি। যশোদার সমস্ত হৃদয় কৃষ্ণে কেন্দ্রীভূত। হয় ত এই জন্যই সহধর্ম্মিণী এবং কন্যারূপে তিনি ফুটিতে পারেন নাই। যশোদা জননী এবং স্নেহময়ী। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলে বিশেষ কিছু বলা হয় না। যশোদার স্নেহের প্রকৃতি আলোচ্য। মাতা স্নেহময়ী কে নহেন? আপন সন্তানের প্রতি পরিপূর্ণ স্নেহ থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষের মানসিক অবস্থানুসারে স্নেহের বিকাশ স্বতন্ত্রভাবে। স্নেহে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ছায়া পড়ে। যশোদার চরিত্র হইতেই আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব। যশোদার সহিত অপর কতকগুলি মাতৃহৃদয়ের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে।

প্রথমতঃ কৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত নহেন। তাঁহার জননী দেবকী। কিন্তু আশৈশব যশোদার স্নেহেই কৃষ্ণ লালিত পালিত হইয়াছেন। সুতরাং যশোদাই তাঁহার মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন। এখন যশোদাকেই কৃষ্ণের জননী বলা যায়। জনয়িত্রী নহেন বলিয়া যশোদার স্নেহ মাতৃস্নেহ অপেক্ষা এক তিল ন্যূন নহে। বাস্তবিক, তিনি কৃষ্ণকে যেরূপ অগাধ স্নেহে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, সেরূপ স্নেহ পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয় ব্যতীত কোথাও মিলে না। যশোদার নিকট কৃষ্ণ ত আর পরের পুত্র নহেন। যশোদার কৃষ্ণস্নেহে তাঁহার প্রকৃতিগত সন্তানস্নেহ প্রকাশ পায়। আপন সন্তানকে প্রাণাধিক ভাল বাসিলেও সকল রমণীর প্রকৃতি এরূপ স্নেহগঠিত নহে। মহিলারা

মার্জ্জনা করিবেন, আমার বোধ হয়, স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রমণীহৃদয় অনেক সময়ে পরের সন্তানের প্রতি অল্পবিস্তর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকে। আপন সন্তানকে ভালবাসা এবং সন্তানমাত্রকে ভালবাসা স্বতন্ত্র বৃত্তি। রমণী স্নেহময়ী হইলেও তাই বুঝি তাহার হিংসার তীব্রতা।

যশোদার স্নেহে হিংসা কোথাও নাই। তাঁহার চারি পার্শ্বে শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণের সখাগণ। আভীরপল্লীর বালকেরা বোধ করি যশোদাকে বিশেষ ভালবাসিত। ইহাতেই তাঁহার কোমল স্নেহ পরিস্ফুট। বিরক্তি শিশুহৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। হাসি হাসি মুখ, মৃদু মধুর সম্ভাষণ, স্নেহপ্রফুল্ল চিত্ত সরল শৈশবের চুম্বক। যশোদার এ সকল ছিল। স্নেহগঠিত হৃদয় এইরূপই হইয়া থাকে। সন্তানস্নেহ তাঁহার বিশেষ প্রবল। তাই তাঁহার চারি দিকে এতগুলি বাল-চরিত্র। যশোদা সকলগুলিকেই স্নেহ করেন। তাই বলিয়া কি কৃষ্ণের মত? তাহা অবশ্য নয়। কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণাধিক। কৃষ্ণের মত অপরকে ভালবাসিবেন কি করিয়া? তাহা যে নিতান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে ধেনু চরাইতে বাহির হইলে যশোদা সকলকে বলিয়া দেন যে, কৃষ্ণকে লইয়া সকাল সকাল যেন তাহারা ফিরিয়া আসে। তিনি কি সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িতে চাহেন? বলরামকে এমন কত বার বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণ দুধের ছেলে, মায়ের বসন ধরিয়া ফিরে, দণ্ডে দণ্ডে খায়, তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিয়া জননীহৃদয় কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? বলরাম অনেক আশ্বাস দিয়া বলেন, তাহা বলিলে কি হয়, গোপকুলে থাকিয়া গোচারণ না শিখিলে নিরুপায়। যশোদা দায়ে পড়িয়া কৃষ্ণকে সাজাইতে বসেন। কিন্তু হাত সরে না। কেবলই—

"স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে, বেশ বানাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদগদ কহে, আজি রাখি যাহ সবে শূন্য না করিয়ে মোর ঘর ॥"

কৃষ্ণের বেশভূষা আর শেষ হয় না। যশোদা চুম্বনে চুম্বনে গোপালকে ছাইয়া ফেলিলেন। অবশেষে বলাই চূড়া বাঁধিয়া দেয়, শ্রীদাম ললাটে তিলক। যশোদা তখন রক্ষামন্ত্র পড়িয়া কৃষ্ণকে সাবধান করিয়া দিলেন যে,

"আমার শপতি লাগে, না ধাইহ ধেনুর আগে, পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু, পূরিহ মোহন বেণু, ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে, শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গছাড়া না হইও, মাঠে যাদু নানা ভয় আছে ॥
ক্ষুধা হৈলে চাহিয়া খাইও, পথ পানে চাহিয়া যাইও, অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাইতে না যাইহ কানু, হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥

থাকিহ তরুর ছায়ে, মিনতি করিছে মায়ে, রবি যেন না লাগয়ে গায়ে।”

ক্রোড়ে থাকিতেই যশোদা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠেন, চোখের আড়াল হইলে ত ভাবিবারই কথা। “এ বয়সে গোষ্ঠে গেলে প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ?”

যশোদার স্নেহের প্রকৃতি ইহাতে অনেকটা বুঝা গেল। গর্ভধারিণী না হইলেও কৃষ্ণজননী বলিয়াই তিনি গণ্য। যশোদার কখনও এমন মনে হইত না যে, তাঁহার গর্ভে নন্দের একটি পুত্র জন্মিলে ইহাপেক্ষা কত সুখ হইত। এরূপ মনে হইবার কারণও ছিল না। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার গর্ভজাত নন্দনন্দন বলিয়াই জানিতেন। দেবকীতনয় জানিলেও কৃষ্ণের উপর রাগ করিয়া তিনি কখনও ক্ষণিকের জন্য কৃষ্ণকে পরের ছেলে ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহার স্নেহ অগাধ এবং অকপট। অকপট এই জন্য যে, এ স্নেহে কোথাও আত্মপ্রবঞ্চনা নাই। অর্থাৎ কল্পনায় তিনি আপনার স্নেহকে বাড়াইয়া দেখিতেন না। কৃষ্ণকে ভালবাসা তাঁহার প্রকৃতি—ভাল না বাসিয়া থাকিবার জো নাই। তাই বলিয়া কৃষ্ণকে স্নেহ জানাইতে তিনি ব্যস্ত নহেন। অথবা কৃষ্ণ তাঁহার স্নেহের মর্য্যাদা কত দূর বুঝেন না বুঝেন, হিসাব করিয়া দেখেন না। যশোদার স্নেহ-উৎস চির-উৎসারিত। কৃষ্ণকে ভালবাসিতেন বলিয়াই আমরা যশোদার স্নেহভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না। তাঁহার কথাবার্ত্তায়, ধরণধারণে, পরের সন্তানের প্রতি সরল দৃষ্টিতে এ ভাব ধরা দেয়। কৈকেয়ীপ্রকৃতির সহিত তাঁহার ভালবাসার বিস্তর তফাৎ। রাজ-অন্তঃপুরের প্রাচীররক্ষিত জটিলতা যশোদাচরিত্রে দেখা যায় না। যশোদার স্নেহ মধুর। তিনি কাহাকেও ব্যথা দিতে পারেন না। সন্তানটিকে বুকে করিয়া রাখিয়াই তাঁহার চূড়ান্ত শান্তি। এবং এই অবস্থাতেই তিনি পরিতুষ্ট। পরের সন্তানে তাঁহার দৃষ্টি কখনও তীব্র নহে। যশোদার অন্তর নির্ব্বিবাদী, অসূয়াশূন্য, স্নেহগঠিত। কোমলতা তাঁহার প্রকৃতি, স্নেহ তাঁহার প্রাণ।

যশোদার শাসন হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে পড়ে, কৃষ্ণ যে দিন নবনী চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন, যশোদা তাঁহাকে ধরিতে যান। কৃষ্ণ এ-ঘর ও-ঘর দিয়া ছুটিয়া পলাইলেন। যশোদা তখন গোপালকে না দেখিয়া ব্যাকুল। শাসন ঘুরিয়া গেল—কৃষ্ণ আসিলে হয়। যশোদা কাঁদিতে বসিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে আমরা শিক্ষিতা জননীর মধ্যে সন্তানের চরিত্রগঠনসমর্থ যে সকল গুণ দেখিতে চাহি, তাহা যশোদায় বোধ করি মিলে না। কিরূপেই বা মিলিবে ? গোপগৃহিণীতে তাহা আশা করাই অন্যায়। শিক্ষা ত যশোদার চরিত্রে কোথাও অভিব্যক্ত নহে। যশোদার যাহা কিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গোপগৃহিণীর আত্মবিস্মৃত পরিপূর্ণ স্নেহ মাতৃস্নেহের আদর্শ

বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যশোদাকে জননীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ বলিতে পারি না। অর্থাৎ সন্তানগঠনের জন্য স্নেহময়ী জননীর চরিত্রে যে সংযত দৃঢ়তা আবশ্যক, যশোদার তাহা অভাব আছে বোধ হয়। বলা বাহুল্য, সংযত দৃঢ়তার সহিত লগুড় তাড়নার কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রেম লগুড়ের একান্ত বিরোধী। এক দিনের একটু মুখভারই তাহার প্রবল শাসন। যশোদার স্নেহ কৃষ্ণের শিক্ষার জন্যও কাঠিন্য অবলম্বন করিয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। শাসন করিতে গিয়া তিনি চুম্বন করিয়া বসেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব হৃদয় কঠিনতা সহিতে পারে না। কাঠিন্যে বৈষ্ণবেরা কোমলতা মিশাইয়া দেয়।

বৈষ্ণবের সহিত শাক্ত হৃদয়ের প্রভেদই এইখানে। বৈষ্ণবেরা কাঠিন্যকে কোমল রসে গলাইয়া ফেলিতে চায়; শাক্ত কোমলতার অন্তরে কঠিনতার প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য কোমলাঙ্গিনী রমণীর অন্তরেই শক্তি। উমাও গৃহিণী, যশোদাও গৃহিণী; উমাও জননী স্নেহময়ী, যশোদাও স্নেহময়ী মাতা; এক শক্তিতে উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ ঘটিয়াছে। যশোদা গৃহিণী। গৃহকার্য্যে নিপুণতাই তাঁহার গৃহিণী নামের একমাত্র কারণ। উমাও সুনিপুণা গৃহিণী। কিন্তু উমা শক্তিমতী। স্বামীর উপরে তাঁহার যেরূপ প্রভাব, যশোদার তাদৃশ নহে। অন্ততঃ এ সম্বন্ধে কাহারও বড় কিছু জানা নাই। উমা অন্নপূর্ণা। এখানেও সেই শক্তির পরিচয়। উমার সহিত যশোদার প্রভেদ হইবারই কথা। অবস্থাভেদই তাহার প্রধান কারণ। উমা কৈলাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যশোদা গোয়ালিনী অবলা। বৈষ্ণব-কল্পনা সৌন্দর্য্যের মধুরতাতেই তৃপ্ত। মধুরতাই তাহার উপভোগ্য। এই কারণেই গোপবধূ যশোদা চণ্ডীও নহেন, মহিষীও নহেন; যশোদার কোন জাঁকজমক নাই—তিনি নিছক কোমল রসে কোমলহৃদয় বৈষ্ণবের স্নেহময়ী জননী।

বৈষ্ণব সাহিত্যে শক্তির যে নামগন্ধ নাই, এমন বলা চলে না। মথুরাপতি কৃষ্ণে শক্তিভাব আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সে অতি সামান্য। বৈষ্ণব হৃদয় প্রেমে বিগলিত। শক্তি সেও অনুভব করে। কিন্তু প্রেমেই সে ডুবিবার স্থান পায়। তাই বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকে মথুরাপতিরূপে অধিক ক্ষণ দেখিতে পারেন না। মথুরার কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহারা যশোদার কৃষ্ণকে দেখিতে চাহেন, যশোদার কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার কৃষ্ণকে প্রাণের মধ্যে উপভোগ করেন। মধুর রসেই বৈষ্ণব প্রেমের চূড়ান্ত অনুশীলন। মথুরাপতি ক্ষমতাশালী—তাঁহার যান আছে, বাহন আছে, সেনা আছে, সেনাপতি আছে। রাধিকারঞ্জনের মধুর নিকুঞ্জ, মধুর বংশীধ্বনি, মধুর জ্যোৎস্না, আর এই মধুরতার মধ্যে সুন্দরী প্রেয়সীর সহিত মধুর মিলন। বৈষ্ণব হৃদয় এই মধুর মিলনে

ভোর হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডধর প্রচণ্ড রাজভাব এই মধুরতায় বিলুপ্ত। কায়ক্লেশে তিনি কেবল রাজা। নহিলে তাঁহার সর্ব্বত্রই কোমল রস। অত কথায় কাজ কি, শ্রীকৃষ্ণের দেহবর্ণনায়ও কঠিন পুরুষভাবের অভাব মনে হয়। তবে মধ্যে মধ্যে দৈবাৎ এক-আধ বার শুনা যায় বটে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বক্ষ, তমাল-দেহ। দায়ে পড়িয়া যেন এ কথার উল্লেখ করিতে হইয়াছে, পাছে লোকে কৃষ্ণকে পুরুষ অথবা স্ত্রী ঠাহরাইয়া উঠিতে না পারে।

কৃষ্ণ যখন রাজরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মধ্যে মধ্যে যশোদা তাঁহাকে দেখিতে যান শুনিতে পাই। দ্বারী যশোদাকে চিনে না; সুতরাং সহজে দ্বার খুলে না। যশোদা বাপু বাছা করিয়া দ্বারীকে বুঝাইতে থাকেন। দ্বারীর সহিত কথাবার্ত্তায়ও যশোদার সেই সরল স্নেহভাব অভিব্যক্ত। শিবগৃহিণী হইলে দ্বারী তাঁহার প্রভাব অনুভব করিত। বৈষ্ণব-জননী যশোদার ত শক্তি নাই তাঁহার স্নেহে কেমন দীনভাব। তাই বলিয়া পাষাণতনয়া কি স্নেহময়ী নহেন? স্নেহবিষয়ে উমা যশোদাপেক্ষা হীন অথবা যশোদা উমাপেক্ষা হীন, এরূপ বলা যায় না। দুই জনের স্নেহের প্রকৃতি কেবল কতকটা বিভিন্ন। স্নেহ সেইই। প্রভেদ কেবল অবস্থা এবং চরিত্রগত বিশেষত্ব লইয়া। দ্বারীর সহিত কথাবার্ত্তায় স্নেহের তারতম্য তেমন বুঝা যায় না। তবে এখানে কোমলতার তারতম্যে এইটুকু বুঝা যাইতে পারে যে, চরিত্র স্নেহগঠিত কি না এবং তাহাতে কি ভাবের প্রাধান্য। যশোদার কথাবার্ত্তায় বুঝা যায়, তাঁহার হৃদয় দুঃখসিক্ত এবং সহজে ক্রোধোদ্রেক হয় না। শিবগৃহিণী যশোদার মত নীরবে সহিবার পাত্রী নহেন। বৈষ্ণব প্রেম সহিতেই আসিয়াছে।

উমার সহিত যশোদার স্নেহ তুলনা করিলে বোধ হয়, উমায় উষার কনকভাবের আভাস পাওয়া যায়। যশোদার মত তাঁহার স্নেহে সর্ব্বদাই হারাই হারাই ভয় প্রবল নহে। যশোদার স্নেহে ভয়, উমার স্নেহে সাহস। নগেন্দ্রনন্দিনীর ক্রোড় হইতে তাঁহার শিশুকে লইতে আসিয়া বোধ করি, কেহ সহজে ফিরিতে পারে না। সম্ভবতঃ এ অবস্থায় তিনি উন্মাদিনী হইয়া উঠেন। এবং বোধ করি, নিকটে শিবের ত্রিশূল থাকিলে তাহার ত্রিজিহ্বা শোণিততৃষা মিটাইতে কুণ্ঠিত হয়েন না। যশোদা হইলে শিশুকে বুকের মধ্যে করিয়া হিম হইয়া যান। মিনতিই তাঁহার স্বভাব। তবে স্নেহে যে বল আসে, সে কেবলমাত্র বুকের মধ্যে সবলে ধরিয়া রাখিবার। বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে গেলে হয় ত যশোদার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। উমার স্নেহে বালিকা-ভাবে বল আছে। যশোদার স্নেহ শীতল। ভূমিই তাহার

প্রধান কারণ। যশোদার বাস সমতলক্ষেত্র। নগেন্দ্রনন্দিনী পার্ব্বতীয়া। তাই বোধ করি, বর্ষার দিনে যশোদার স্নেহই আমার মনে পড়ে। উমার স্নেহ বর্ষাপেক্ষা বসন্তে ফুটে। আমাদের দেশে বসন্ত ত অধিকক্ষণ থাকে না।

এখন যশোদা-চরিত্র আলোচনার একরূপ শেষ হইল বলা যাইতে পারে। কারণ, স্নেহ ব্যতীত যশোদায় আলোচনার আর বড কিছু নাই। স্নেহেই তিনি ফুটিয়াছেন। তাঁহার প্রণয়ে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যশোদা সতা সাধ্বী পতিব্রতা। নন্দ ঘোষের সহিত তাঁহার বনিত ভাল। পতি-পত্নীর মধ্যে অনৈক্য, অবিশ্বাস, বিবাদ কলহ শুনা যায় না। নন্দ ঘোষের পরিবার প্রেমপূর্ণ। ইহা ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বড় কিছু জানিতে পারি না। জননীর সহিত তাঁহার যেখানে যতটুকু সম্বন্ধ, বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে তাহাই পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, যশোদা কন্যাও বটে, সহধর্ম্মিণীও বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রবিকাশ মাতৃরূপে। নাই ভ্রূভঙ্গ, নাই মর্ম্মভেদী দারুণ চাহনি, নাই অন্তরের যৌবনতৃষা, নাই হৃদয়হরণী মুচকি হাসি। সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার রূপের তরঙ্গ উঠে নাই, বিরহ ধ্বনিত হয় নাই। মান এবং ভঞ্জন লইয়া টানাটানি পড়ে নাই।

কিন্তু তথাপি যশোদার রূপ সম্বন্ধে আমরা দুই চারি কথা বলিতে পারি। তাঁহার নয়ন খঞ্জনের সহিত উপমেয় অথবা মৃগাক্ষির সহিত জানি না, কিন্তু ভাবে দৃষ্টি খুব স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়। এবং সম্ভবতঃ হরিণনয়নে প্রশান্ত স্নিগ্ধভাব অধিক। খঞ্জনলোচন চাঞ্চল্যেরই পরিচায়ক। খঞ্জনের গতির সহিত নয়নের সাদৃশ্য কি না। আর হরিণ-আঁখির সহিতই নয়নের তুলনা হয়। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার নয়ন-বর্ণনায় খঞ্জন এবং মৃগনয়ন উভয়ের সহিতই উপমা দেখা যায়। দুইই সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বটে। কিন্তু রাধার বোধ করি খঞ্জননয়নই ঠিক। যত দূর মনে পড়ে, বৈষ্ণব কবিদিগের রাধার রূপবর্ণনায় খঞ্জননয়নেরই উল্লেখ অধিক। যশোদার নয়ন খঞ্জনগতি জিনিয়া নহে। উপমাপ্রিয় পাঠকেরা অলঙ্কারশাস্ত্র খুঁজিয়া উপমা গড়িয়া লইবেন। আমরা যথাসাধ্য ভাবটুকু ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

যশোদার অধরও সুরঙ্গ। বর্ণও বোধ করি গৌর। তবে রাধার সহিত তুলনায় তাঁহার বর্ণ হয় ত ঈষৎ ম্লান। যশোদা সুন্দরী—তাঁহার গঠন-পারিপাট্য বেশ আছে। উমার সহিত মিলাইয়া দেখিলেও তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিন্দা করা চলে না। তবে উমা যশোদাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি বলিয়া বোধ হয়। যশোদা কিন্তু খর্ব্বকায়া নহেন। যশোদার গঠন সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা চলে না। কারণ, তাঁহার রূপ লইয়া বড় আন্দোলন কখনও হয় নাই। আমরা সকল খুঁটিনাটি জানিব কোথা হইতে? মনে হয়, তাঁহার

সৌন্দর্য্যে সন্ধ্যার ঈষৎ আভা আছে। কিন্তু তথাপি সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ সান্ধ্য নহে। আমরা গুণ হইতে টানিয়া টানিয়া যশোদার সৌন্দর্য্য যত দূর পারিয়াছি, ফুটাইতে ক্রটি করি নাই। এখন কবি পাঠকেরা আমাদের চিত্রের দোষ বর্জ্জন এবং অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া লউন।

'ভারতী ও বালক', অগ্রহায়ণ, ১২৯৭

কৈফিয়ৎ *

বৈষ্ণব কবির রচনা যে আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, আমরা তাহা কোথাও অস্বীকার করি নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখা যায় বলিয়া সাহিত্যের হিসাবে বৈষ্ণব কাব্য আলোচনা করিলে যে কোনও দোষ ঘটে, আমাদের এরূপ বিশ্বাস নহে। ভারতীতে কিছু দিন হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইতেছে, এবং বৈষ্ণব কাব্যের চরিত্র সমালোচনায় আমরা আধ্যাত্মিকতাকে বর্জ্জন করিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপও শুনা যাইতেছে। দোষ ক্ষালনার্থে আমরা সম্পাদকীয় নোটের উপর দুই চারি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

১। বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ মানব-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি অঙ্গের যৌবনসন্নদ্ধ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ রূপবর্ণনা কোথাও আধ্যাত্মিক নহে—কেবলই দেহজ ভাবভঙ্গী এবং গঠনের পারিপাট্য লইয়া। টানিয়া বুনিয়া ইহার মধ্য হইতে যে আধ্যাত্মিক রূপক বাহির করা না যায়, এমন নহে; কিন্তু কাব্য অক্ষুন্ন রাখিয়া সহজে বোধ করি কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, বৈষ্ণব কবি কবিতারচনা-কালে সর্ব্বদা প্রবল আধ্যাত্মিকতায় পরিচালিত হয়েন নাই। হয় ত মূলে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য, কিন্তু লিখিবার সময়ে মানব-ভাবে ভোর হইয়াই লিখিয়াছেন। সুতরাং কাব্যে মানব ভাবই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এখন কবির হৃদয় ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্যগত আধ্যাত্মিকতাকে টানিয়া আনিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইবার প্রয়োজন কি? সাহিত্যে ইহা নিষ্ফল। আমরা তাহাই বলি। যেখানে উদ্দেশ্য লইয়া টানাটানি,

* 'ভারতী ও বালক' পত্রে বলেন্দ্রনাথের 'রাধা' (শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ. ২১৬-২৪) ও 'যশোদা' (অগ্রহায়ণ ১২৯৭, পৃ. ৪২১-৩১) উভয় প্রবন্ধ সম্বন্ধেই সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী কিছু বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন। তাহারই জবাবস্বরূপ 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধ উক্ত পত্রের ১২৯৭ অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় ৪৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

সেখানেই আধ্যাত্মিকতা বিচার্য্য। নহিলে, কথায় কথায় আধ্যাত্মিক খোঁচা দিয়া কাব্যকে অস্থির করিয়া তুলিবার কোনও আবশ্যক নাই। আমরা কেবল আধ্যাত্মিক সমালোচনা না করিয়া কাব্যের সমালোচনা করিয়াছি মাত্র, ইহাতে দোষ কি বুঝা গেল না।

২। কাব্যের সমালোচনা কি করা চলে না? তাহা হইলে বিদ্যাপতির রাধিকার সহিত চণ্ডীদাসের রাধার তুলনা হয় কিরূপে? আধ্যাত্মিক হিসাবে দুই জনেই সমান ভক্ত। দুই জনেই প্রেমে তন্ময়—সুতরাং ছোট বড় করা যায় না। কিন্তু দুই বিভিন্ন কবির হস্তে পড়িয়া দুই জনের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে; তাহা দেখিতে হইলে সাহিত্যের দিক্ দিয়া কাব্য হিসাবেই দেখিতে হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিকতাকে খাড়া করিয়া পাঠককে অন্যমনস্ক করা চলে না। আমরা বরাবরই তাই বলিতেছি যে, আধ্যাত্মিকতার বিশেষ স্থান আছে। যখন তখন তাহাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিলে সেও অধিক দিন সসম্মানে টিঁকিবে না, কাব্যও সঙ্কোচে বড় একটা স্ফূর্ত্তি পাইবে না—সর্ব্বদাই ভয়, কখন্ আধ্যাত্মিকতার সহিত ধাক্কা লাগে।

৩। পূজনীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া বলেন, কাব্য রচনার পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক রূপক রচিত হইয়াছে। বেশ কথা। কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণব কাব্যের সাহিত্য হিসাবে আলোচনায় বাধা কি? আমরা রূপকের উল্লেখ করিয়াছি, সমালোচনা করি নাই। কারণ আমাদের তাহা আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু সে জন্য যে সমালোচনার অঙ্গহীনতা হইয়াছে, তাহার কোনও পরিচয় পাই না। লেখকের অক্ষমতার জন্য ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই হোমরের ইলিয়াদ্ নামক কাব্যকে রূপকে আলোক এবং অন্ধকারের যুদ্ধ-বর্ণনা বলিয়া থাকেন। তাহা সত্য কি না জানি না। কিন্তু যদি হোমরের এই ভাব সত্য হয়, তাই বলিয়া একিলিসের চরিত্রবিশ্লেষণ বন্ধ করিতে হইবে, হেলেনের রূপ-বর্ণনা আলোচনা করা যাইবে না, গ্রীস এবং ট্রয়ের যুদ্ধবর্ণনায় রণসজ্জা প্রভৃতি রূপক বলিয়া বাদ দিতে হইবে, এরূপ কোনও কথা নাই। কবি আমাদের সম্মুখে যে চিত্র ধরিয়াছেন, তাহাকে নগণ্য করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। তিনি মূলে যাহাই ঠাহরাইয়া থাকুন, যেরূপ ভাবে চিত্রটিকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, সেরূপ ভাবে আমরা দেখিতে পারি। প্যারাডাইজ লষ্টের সয়তানকে যে তাহার স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্য আমাদের অনেক স্থলে ভাল লাগে। তখন কিছু আর আমরা তাহাকে পাপের রূপক-প্রতিমা বলিয়া ধরি না। আমরা তাহার নরক-যন্ত্রণার মধ্যেও অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হই। এ ভাব ব্যক্ত করিলে যে কোনও হানি হয়, তাহা বোধ

হয় না। তবে সয়তানকে নাকি কবি নিতান্তই পাপমতি দেখাইয়াছেন, তাই তাহার জন্য অনেক স্থলে অনুকম্পা উপস্থিত হইলেও তাহাকে পাপী বলিতে হয়। তথাপি রূপক হিসাবে তাহার সয়তানী যত অধিক, কাব্যের চরিত্র হিসাবে তত নহে। এবং শেষোক্ত হিসাবে ধরিয়া তাহার সমালোচনা করিলে স্থানে স্থানে প্রশংসা করিতে হয় বলিয়া সমালোচনার দোষ দেওয়া চলে না। বোধ করি, এ স্থলে সয়তানের এক আধটু প্রশংসা করার জন্য পাপের প্রশংসা গাহাও হয় না। ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের যোগ থাকিলেই যে সাহিত্য-সমালোচনা বন্ধ করিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই।

৪। দুগ্ধকে আমরা কোথাও জল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহি নাই। সম্পাদিকা মহাশয়া আমাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন। আমরা জলেরই বিশ্লেষণ করিয়াছি। সে জল কেবল মন্ত্রপূত। আমরা তাহা অস্বীকার না করিয়া জলজান এবং অম্লজান নামক রাসায়নিক পদার্থের নাম উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। ইহাতে মন্ত্রের অবমাননা করা হইয়াছে অথবা জল বিশ্লেষণে দোষ ঘটিয়াছে বলা যায় না।

বোল্‌তা

আমি বোল্‌তা—আপনার ক্ষুদ্র বিজন চাকটির মধ্যে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ সমাহিত করিয়া নিরিবিলি কাল যাপন করি। আমার চাকের বাহিরে তোমাদের বিপুল সংসার—জীবনসংগ্রাম, প্রবল উদ্যম, বৃহৎ অনুষ্ঠান। আমার এ সকল তেমন পোষায় না, সুতরাং চাকের মধ্যে বসিয়া বিরলে এই কনক-লাবণ্যের নশ্বরতায় কোনও প্রকারে ডুবিয়া থাকি। তোমাদের কাজকর্ম্ম আছে, তোমরা হাস খেল, আপন বিবশ আনন্দে অধীর হইয়া উঠ, নিভৃত চাকপ্রান্ত হইতে এক বার উঁকি মারিয়াই আমি সরিয়া যাই। আমার এ জীবনে ত আর সংসারের কোনও উপকার নাই। কিন্তু জীবনসংগ্রাম আমাকেও ছাড়ে না—আমাকেও চাক ছাড়িয়া এক এক বার বাহির হইতে হয়। তোমাদের সাসীবদ্ধ হাস্যালাপের বাহিরে তৃণভূমি হইতে আমি রস সংগ্রহ করিতে আসি, এক এক বার সাসীর নিকটে আসিয়া হৃদয়ের বিজন বেদনা জানাইয়া তোমাদের ঐ চির-আনন্দের মধ্যে এইটুকু স্থান প্রার্থনা করি, কিন্তু আমার বেদনা কেহ বুঝে না, আমার কথা কেহ শুনে না, আমি আবার যেমন তেমনি ম্লানমুখে আপনার চাকে ফিরিয়া যাই। তোমরা কেবল আমার বাহিরের কনককান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হও, অন্তরের গভীর জ্বালা বুঝ না। তাই আপনার দারুণ অন্তরজ্বালা লইয়া একা একা চাকের মধ্যেই আমি থাকি ভাল। এ সজন সংসার আমার জন্য নহে।

এ সংসারে আমি কেবল উপমা খাটাইতেই আসিয়াছি। ক্ষীণমধ্যার তনুসৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতে হইলে আমার গঠন লইয়াই টানাটানি পড়ে, গৌরাঙ্গী আমার বর্ণের আভা লইয়া আপনার রূপ বিস্তার করেন, আর আমার হুলের সহিত কোন্ রমণী-রসনার না উপমা খাটে? কিন্তু ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নাই। এত করিয়াও মহিলাসমাজে আমার প্রতিপত্তির মধ্যে অঞ্চলতাড়না। এক বুঝিতাম, ভ্রমরের মত বসন্তের কাব্য-কুঞ্জে আমারও একটু স্থান হইবে, তাহা হইলে না হয় মরমের অশ্রু মরমে রুধিয়া নীরবে এ বেদনা সহিয়া যাইতাম। আমাকে নহিলে চলিবে না, তাই আমার প্রতি বুঝি এই ব্যবহার! এবার অবধি তবে রূপসীরা ভ্রমরের সহিত তাঁহাদের রূপের উপমা দিবেন। আমি চাকের মধ্যে নিরুপদ্রবে বাস করিব, আর বড় বাহির হইবার সাধ নাই।

এ পোড়া অদৃষ্টে বাহির হইলে লাঞ্ছনা বৈ আর ত কিছু মিলে না। তোমাদের মধ্যে আমার হুলের দংশনজ্বালার কথাই শুনিতে পাই—যেন দংশন ভিন্ন ধরণীতে হুলের আর কাজ নাই—কিন্তু এই হুলের দংশনজ্বালায় অন্তরের কি দারুণ জ্বালা ব্যক্ত হয় জান কি? যখন এই বিজন মরুজীবনে কাহারও স্নেহ অনুভব করিতে পারি না, একা একা বড়ই শূন্য মনে হয়, তোমাদের সজল হৃদয়ের আনন্দস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি। তখন এই উন্মাদাবস্থায় এক এক বার আর থাকিতে না পারিয়া কোমল হৃদয়ে কঠিন হুল বিঁধাইয়া দি—হুল বিঁধাইয়া আমার প্রেম জানাই, তোমাদের প্রেম চাহি। কিন্তু আমার হুলের দংশন বোধ করি এ সংসারে সকলে বড় মধুর অনুভব করে না। তাই তোমাদের নিকটে যাইলে তোমরা সরিয়া যাও, নয় তাড়াইয়া দাও। ভ্রমরের সুখদংশনেই তোমাদের বড় আনন্দ। সে গুণ্ গুণ্ করিয়া ভুলাইয়া রাখিতে পারে কি না। তাই তাহার কালো রূপে, হে কবি, তুমিও মজিয়াছ। কিন্তু ক্ষুদ্র বোল্‌তার এই কথাটি মনে রাখিও, ঐ কালো হুল যে দিন তোমার হৃদয়ে বিঁধিবে, সে দিন হইতে ওখানে আর কাব্যরস উথলিবে না।

আমার এত সৌন্দর্য্য কি তবে ব্যর্থ? কালো রূপ লইয়া ভ্রমর জগতে অমর হইয়া থাকিবে, আর আমি আপনার জ্বালায় অন্তরে অন্তরে চিরদিন জ্বলিয়া মরিব? সেই ভাল—তাহাই হোক্। বিধাতা যাহাকে কালো রূপ দিয়াও মনোমোহন করিয়া গড়িয়াছেন, সে কেন না আমার সৌন্দর্য্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইবে? আমি জগতে বাহির হইয়া এ লজ্জায়-রাঙ্গা মুখ আর দেখাইব না। ভ্রমর পদ্মে পদ্মে বিচরণ করে, ফুলে ফুলে মধু লুটিয়া বেড়ায়, মলয় তাহার প্রিয়বারতা বহিয়া আনে, তাহাকে তাড়াইতে হইলেও লীলাকমল চাহি, তাহার কথা স্বতন্ত্র। আমার ত এত আয়োজন

নাই, প্রয়োজনও নাই, কেবল এক নীরব কনকরূপেই আমার যথাসর্ব্বস্ব। সে সৌন্দর্য্য যে বুঝে, সেই বুঝে, যে না বুঝে, নাই বা বুঝিল।

আমি চাকের জীব—চাকেই থাকিব। বিজন হৃদয়েই আমার সুখ—চিরদিন ত এই হৃদয়ে আপনার মনে গান গাহিয়াই আসিয়াছি। এখন তোমাদের নিকট কিসের সহানুভূতি পাইব বল? যাচিয়া অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাপেক্ষা আজীবন নিগ্রহ ভাল। তোমরা আমার প্রতি বড় একটা নজর না রাখিলেই যথেষ্ট। কেবল আমার চাকটি ভাঙ্গিয়া দিও না—এই নিবেদন। দুর্দ্দিনে বিপদে ইহাই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। এই আশ্রয়ের মধ্যে আমি যেন কাহার প্রিয় সঙ্গ লাভ করি—তাহার জন্যই বুঝি এত দিন ধরিয়া নীরবে চাক বাঁধিয়া আসিতেছি।

কিন্তু সারা দিন চাকের মধ্যে বসিয়া করিব কি? কর্ম্মস্রোতে গা ঢালিয়া না দিলেও মন তৃপ্তি মানে না। অভিমানভরে যাহাই বলি না কেন, বিজন সুখে হৃদয়ের সাধ কিছুতেই মিটে না মিটে না। কিন্তু কি লইয়া এ প্রবল কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া চলিব? কাজ করিবার মত গুণ আমার নাই, আমি গান গাহিতে জানি না, প্রেম বিলাইতেও পারি না, শুধু এক রূপের কনকগৌরব লইয়া অকূল সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সাহস হয় না। সৌন্দর্য্যেও কাজ হয় বৈ কি। নহিলে, প্রজাপতির দশা কি হইত? সেও ত মুখ খুলে না, গান গাহে না। কিন্তু সে যে আপনার সৌন্দর্য্যে নীরবে প্রাণ দেয়—প্রাণ দিয়া তোমাদের সাধ মিটায়। আমি হুল লইয়া জন্মিয়াছি, আমি ত তোমাদের এ নিষ্ঠুর ভালবাসা এমন নীরবে সহিতে পারি না। প্রজাপতির সৌন্দর্য্য প্রেমে মধুর। আমার সৌন্দর্য্য তীব্র—আমার হুলেরই মত তাহা মর্ম্মবেধী। আমার প্রেম জ্বালাময়—শুধু জ্বলিতে এবং জ্বালাইতে আসিয়াছে।

আমারও হৃদয় কিন্তু ভালবাসা চাহে, ভালবাসিয়া সুখী হয়। কিন্তু এ হুলবিদ্ধ দারুণ প্রেম সহিবে কে? ইহাতে মধু নাই, অমৃত নাই, আছে শুধু এক তীব্র জ্বালা আর তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন কঠিন হৃদয়ের নিষ্ঠুর অনুরাগ। বিধাতা আমাকে এত সৌন্দর্য্য দিলেন, কেবল এক হুল দিয়াই এ সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক ব্যর্থ। হুল না বিঁধিয়া ত আমি ভালবাসিতে পারি না। নহিলে, আমার প্রেম কাহাপেক্ষাও হীন নহে। ভ্রমর লঘুহৃদয়, তাই গুণ্ গুণ্ করিয়া মন রাখে। আমার প্রেম বাহিরে নিস্তরঙ্গ, কিন্তু অন্তরে গভীর। তাই আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন হুল বিঁধাই। আমাকে হুল দিয়া হইয়াছে ভাল—হুলেই আমার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ;

কিন্তু আপনার সৌন্দর্য্যে যে মন উঠে না। আপনাকে ত আর তেমন করিয়া উপভোগ করিতে পারি না। নহিলে, এই তপ্তকাঞ্চন রূপে যদি মজিয়া থাকিতে

পারিতাম, এই সুন্দর গঠন, এই উজ্জ্বল বর্ণের মধ্যে গাঢ় ঘনীভূত হইয়া আপনাতে আপনি ভোর হইয়া রহিতাম, তাহা হইলে কি আর বাহির হইতে হইত? ক্ষীণ-কম্পিত সরসীহৃদয়ের উপর দিয়া যখন বায়ুহিল্লোলে বহিয়া যাই, আপনার গঠন দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইয়া থাকি। সাধ হয়, ঐ চঞ্চল ছায়ার সহিত আজীবন কনকবন্ধনে আবদ্ধ হই। এত রূপ নহিলে কি আমার রূপে রূপসীর রূপ বুঝান হয়? তাহা হইলে ভ্রমরের জ্বালায় বোল্‌তা এ জগতে তিষ্ঠিতে পারিত না। ইহাতেই রক্ষা নাই।

আর এই দারুণ হুল—ইহাকে লইয়া আপন অন্তরে কি কেহ নিশিদিন রুদ্ধ থাকিতে পারে? শূন্য হৃদয়ে হুল বিঁধাইয়া আশ মিটিবে কেন? তবুও আপনার অন্তরে হুল বিঁধাইয়া পড়িয়া থাকি—হৃদয়ে যতই জ্বালা ধরে, আপনাকে আপন গাঢ় আলিঙ্গনে অনুভব করিয়া সহিয়া যাই। কিন্তু আমাকে বাহির হইতে হয়। আমার চাকের বাহির দিয়া যখন চিরচঞ্চল সৌন্দর্যস্রোত বহিয়া যায়, মন আপনার মধ্যেই চঞ্চল হইয়া উঠে। সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া আমি স্থির থাকিতে পারি না—এই অগাধ সৌন্দর্য্যে তীব্র হুল ফুটাইয়া ইহাকে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যেথানেই হুল বিঁধি, জ্বালা সংগ্রহ করি, সৌন্দর্য্যকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। তাই নশ্বর জগতের পরে এক এক বার অভিমান করিয়া চাকের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া বসি। তাহাও অধিক ক্ষণ নয়, দুই দণ্ড পরেই আবার সৌন্দর্য্যের জন্য মন পাগল হইয়া উঠে।

বাহিরে বসন্ত আসে, আমি চাক হইতে প্রকৃতির মুক্ত ক্ষেত্রে বাহির হইয়া ধরণীর ফুল্ল ফুলযৌবন উপভোগ করি। রবিকিরণপ্লাবিত প্রকৃতির আনন্দে মগ্ন হইয়া আপনাকে ভুলিতে চাহি, এ কনকজ্বালার অবসান কামনা করি। কিন্তু বাসনা পূরে না। অবশেষে বাহির হইতে কেবল জ্বালা লইয়া চাকে ফিরি। অন্তরে চিরদিন জ্বলিব না কেন?

আমি অন্তরে জ্বলিতেছি, তাই তোমাদিগকে জ্বালাইয়া সুখ পাই। মানবের হৃদয় ভিন্ন আমার হৃদয় আর কে বুঝিবে? কিন্তু আমার হুলের জ্বালায় তোমরা এত কাতর এবং বিরক্ত কেন? শুনিয়াছি, কোকিলের কুহু স্বরে অন্তরের স্তরে স্তরে তোমরা জ্বালা অনুভব কর, কোকিলের প্রতি কাহারও ত কৈ, তেমন বিরক্তি দেখি না। বরং জ্বালার জন্যই তাহার প্রতি তোমাদের সমধিক অনুরাগ। ভ্রমরের দংশনের কথা দূরে থাক্‌, গুঞ্জনেও নাকি অন্তরে জ্বালা ধরে। তবে আমার হুল কি দোষ করিল? আমার হুলের জ্বালা কি ইহাদের অপেক্ষা কম? এক বলিতে পার, কোকিল ভ্রমর বসন্তের সঙ্গে আসে। আমিও কি বসন্তের সঙ্গেই আসি না? জানি

না, ইহারা তোমাদের কি হৃদয়ের কথা জানে। কিন্তু যদি বলিয়া দাও, আমিও এবার অবধি সেই কথা গাহিতে পারি। সুকণ্ঠ আমি নহি বটে, কিন্তু ইহারা কণ্ঠে যাহা করে, আমি হুলে তাহাই করিব। শুধু তোমাদের হৃদয়ের কথা আমাকে একবার বলিয়া দাও।

থাক্। আমি বোল্‌তা—চাক বাঁধি, উপমা খাটাই, হুল বিঁধাই। তোমাদের হৃদয় জানিয়া কি করিব? আমি নীরবে আমার কাজ করিয়া যাই। কোকিল গান গাহে, ভ্রমর গুঞ্জরে, আমি সৌন্দর্য্য ফুটাই। সৌন্দর্য্যেই আমার আনন্দ। আমার মত সুন্দর চাক বাঁধিতে কেহ পারে? আমার চাকের মর্য্যাদা কেবল সৌন্দর্য্যে। অল্পের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমি সব গুছাইয়া বসিয়াছি—এই চাকের মধ্যে আমার যাহা কিছু আবশ্যক, সকলই আছে। আমার চাকটি যথার্থই পরম উপভোগ্য। তোমাদের পক্ষে ইহা উপভোগ্য কি না জানি না; কিন্তু তোমরাও বল, আমার চাকরচনায় নৈপুণ্য আছে। এই চাকেই আমার প্রতিষ্ঠা।

তবুও জীবনসংগ্রামে এক এক বার বাহির হইতে হয়। তখনই তোমাদের সংস্পর্শে আমাকে আসিতেই হয়। কিন্তু আসিলেও নিস্তার নাই। এই হুল লইয়া যে কত বিভ্রাট ঘটে, কিরূপে বলিব? হয় ত আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অসংযত মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে কাহাকেও হুল বিঁধাইয়া বসি, পরে অনুতাপ করিতে হয়। তোমরা ত আর তাহা জানিতে পাও না, কেবলি আমার হুলময় কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া মনে কর, বোল্‌তা হুল বিঁধাইয়া বড় সুখে আছে। কিন্তু বোল্‌তা গাহে শুধু বিলাপ। এই তপ্তকাঞ্চন বাহিরের ঔজ্জ্বল্যে বেদনা কল্পনা করিতে পার না; তাই মনে কর, আমি যেন সর্ব্বদাই হাস্যপ্রফুল্ল; আমার অন্তরে হয় ত তখন দারুণ মর্ম্মদহন হইতেছে। তোমাদের অশ্রু ঝরিয়া হৃদয়ভার লঘু হয়, আমার হৃদয় ঝরে না, নীরবে অন্তরে অন্তরে শুকাইয়া আসে। তাই বাহিরে আমি হাসি—প্রবল অন্তর্দ্দাহে না হাসিয়া থাকিতে পারি না, অন্তরে চিরদিন জ্বলিয়া জ্বলিয়া কাঁদি।

কিন্তু কাঁদি কেন? তাই যদি জানিব, তবে বৃথা এ ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি তুলিব কেন? কে জানে, আমি আপনাকে আপনি বুঝিতে পারি না। সেই জন্যই ত ধরণীর এই বিজন প্রান্তে চাক বাঁধিয়া নিরিবিলি থাকিতে চাহি যে, আমার কথা কেহ না জিজ্ঞাসা করে, আমাকে কেহ কিছু না বলে। কিন্তু তাহা ত থাকিবার জো নাই। জীবন-সংগ্রাম আমাকেও যে ছাড়ে না। আর বাহিরে অগাধ সৌন্দর্য্য—একবার এ সৌন্দর্য্যে বাহির হইলে চাকের মধ্যে হৃদয় পরিতৃপ্তি মানে কাহার? এই নশ্বর জীবনে সৌন্দর্য্য-রহস্যে হুল ফুটাইয়া যেরূপ আনন্দ, এমন ত আর কিছুতে নয়। তাই এক এক বার

মনে হয়, এত যদি দিলে, হে বিধি, আমার মধ্যে সমস্ত সৌন্দর্য্য কেন্দ্রীভূত করিলে না কেন? এই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর মধ্যে তুমি মনে করিলে কি জগতের সৌন্দর্য্য বাঁধিয়া রাখিতে পারিতে না? আমাকে যেমন কারয়া জগতের সৌন্দর্য্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, তেমনি করিয়া যদি জগৎকে আমার সৌন্দর্য্যে বাঁধিতে! না হয় ক্ষুদ্রই হইলাম, সুন্দর ত বটে। সৌন্দর্য্য যে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ অপেক্ষা মহত্ত্ব প্রদান করে।

কিন্তু আর না। এ বয়সে আর চাহিতে পারি না। আমার চাহিবার প্রয়োজনও নাই। তুমি আমাকে যতই দাও, আমার ভাগ্যে সেই হুলাপবাদ, সেই অঞ্চলতাড়না। তাই ঠাহরাইয়াছি, আর বাহির হইব না। আমাকে বাদ দিয়াও ত বেশ চলিতে পারে। আমার চাকে মধু নাই, প্রেমে গুঞ্জন নাই, হুলে তোমরা যাহা চাও, তাহা নাই; তোমাদের ভ্রমর আছে, এ আছে, সে আছে, রূপের উপমা অনেক মিলিবে; আমার অভাবে তোমাদের দুঃখ কিসের? আমাকে লইয়া কাব্য রচিত হয় না, সুতরাং কবিকে আমার জন্য বিলাপ গাহিতে হইবে না; বিজ্ঞেরা সৌন্দর্য্যে নারাজ, আমি সরিয়া গেলে তাঁহারা সুখী বৈ দুঃখিত হইবেন না; আমার জন্য কাহারও অশ্রু ঝরিবে না। তবে আমি ধীরে ধীরে সরিয়া যাই। হে ভ্রমর, কালো রূপ লইয়া তুমি জগতে চিরদিন অমর হইয়া থাক।

'ভারতী ও বালক', চৈত্র ১২৯১

সখ্য

সখ্যরসে আমাদের বৈষ্ণব প্রেমচরিত্রের আলোচনা সম্পূর্ণ। বৈষ্ণব সাহিত্যে বাৎসল্যের নীচেই সখ্যের স্থান। সখ্যের সহিত বাৎসল্যের সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ। অন্য কারণে বলিতেছি না, কৃষ্ণের সখাগণকে নানা অবস্থায় অল্পবিস্তর যশোদার সংস্পর্শে আসিতেই হয়, তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, সুতরাং কৃষ্ণের সহিত যেমন, যশোদার সহিতও সেইরূপ সখাগণের একরূপ সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কেই সখ্য বাৎসল্যে ঘনিষ্ঠতা। মধুর রসে রাধার প্রেমে যখন বৈষ্ণব কবি ভোর, তখন ত আর বড় যশোদারও নাম শুনা যায় না, সখাগণের কথাও কেহ বলে না। তখন মধ্যে মধ্যে কেবল অনামিকা এবং সনামিকা সহচরী, বৃন্দা দূতী, বাহিরে সহস্র গোপিনী, আর গৃহে মুখরা ননদিনী, এই বৈ ত নয়। রাধার প্রণয়-ব্যাপারের সহিত জননীর স্নেহ অথবা বন্ধুর প্রীতির সম্বন্ধ থাকিবে কেন? বয়স হিসাবে বিচার করিলেও প্রণয়—সখ্য বাৎসল্য হইতে দূরে পড়ে। প্রণয়ের আরম্ভ যৌবনে, সখ্য বাল্যেই,

আর বাৎসল্যের ত কথাই নাই—সন্তান জন্মিতে না জন্মিতে জননীহৃদয়ে স্নেহ। বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাহাই। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাবধি যশোদার স্নেহে লালিত পালিত, বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সখাগণের আবির্ভাব, পরে যৌবনসঞ্চারে রাধার সহিত প্রণয় এবং গোপিনীদের হৃদয়হরণ। এখন মাতৃস্নেহে শৈশবের সে সরল নির্ভর আর নাই, আপনার মধ্যে আশ্রয়দানের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্বভাবতই একটু স্বাতন্ত্র্য আসিয়া পড়ে। আর রূপসীর প্রেমে মজিয়া সখার জন্য কাহার মন উদ্বিগ্ন হয়? সুতরাং মধুর রস, বাৎসল্য এবং সখ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিতি না করিয়াও নিশ্চিন্তে থাকে। সখ্যের বাৎসল্যের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা। এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক সময়ে এ আত্মীয়তা অনিবার্য্য।

বৈষ্ণব কাব্যে এই জন্য অনেক স্থলে একই কবিতায় সখ্য এবং বাৎসল্যরসের বিকাশ অনুভব হয়। সখারা আসিয়া কৃষ্ণকে মাঠে লইয়া যাইতে চাহে, নন্দরাণী অনেক মাথার দিব্য দিয়া তবে ছাড়িয়া দেন, তিনি কৃষ্ণকে সাজাইতে বসিলে সখারা আসিয়া সহায়তা করে; কৃষ্ণকে না দেখিলে নন্দরাণীও ব্যাকুল, সখারাও অধীর, সকলে মিলিয়া চারি দিকে খুঁজিতে বাহির হয়। এইরূপে সখ্যরস বাৎসল্যের সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্ফূর্ত্তিও পায়। বোধ করি, স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনে ইহার এমন সুন্দর বিকাশ হইত না। বাৎসল্যের মধ্যে একটি আশ্রয়ের ভাব আছে—শৈশবে জননীর স্নেহে সন্তানের কি একান্ত নির্ভর! এই জন্যই রমণীর পূর্ণতা মাতৃরূপে। এবং এই ভাবেই কেবল রমণীর স্থান দেবতার উর্দ্ধে। এই পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহের প্রশান্ত অন্তরে বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই বৈষ্ণব সাহিত্যে সখ্যের যেরূপ মধুরতা, এমন আর অন্যত্র দেখা যায় না। সবশুদ্ধ, বৈষ্ণব সখ্যে এমন একটি পারিবারিক ভাব, সুকুমার সরল অনুরাগ ব্যক্ত হয়। এ প্রেমের মূলে কোথাও কোনও প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নাই—বৈষ্ণব প্রেম চিরদিনই উদ্দেশ্যের অপেক্ষা রাখে না। অনিবার্য্য বলিয়াই তাহার আবির্ভাব। সখারা কৃষ্ণকে সরল-হৃদয়ে ভালবাসে, যশোদার স্নেহে তাহারা কৃষ্ণের সহিত একপরিবারভুক্ত। এইখানেই সখ্যের চরম উৎকর্ষ। উদ্দেশ্যগত ঐক্যনিবন্ধন সখ্য এরূপ সরল সুন্দর নির্ব্ব্যবধান হৃদয়মিলন নহে। বিশেষত্ব বাদ দিলে মাধুর্য্যের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য আছে। তবে সখ্যে অবশ্য আশ্রয়-ভাব তেমন নাই। মধুর রসে রমণীকে আশ্রয় দিয়া পুরুষ-হৃদয় পরিতৃপ্ত। এই জন্য পুরুষের পূর্ণতা প্রেমে। সখ্যে মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভের দিকে সেরূপ বিকাশ অনুভব হয় না। আমার বোধ হয়, যে সম্বন্ধেই হৌক্, স্ত্রী এবং পুরুষপ্রকৃতির সম্মিলনে মানসিক পূর্ণতার যেরূপ সহায়তা করে, কেবল-মাত্র একজাতীয় প্রকৃতির বহুসংখ্যক একত্র সন্নিবেশে তাদৃশ সম্ভব নয়।

কিন্তু সখ্যরস যে আমাদের হৃদয়বিকাশে সহায়তা না করে, এমন নহে। তাহা না হইলে সখ্যের জন্য হৃদয় ব্যাকুল কেন? আমরা জননীর স্নেহ চাহি, রমণীর প্রেম চাহি, তথাপি হৃদয়ের সম্যক্ পরিতৃপ্তি জন্মে না—সখার প্রেম নহিলে আমাদের হৃদয়ের এক অংশ শূন্য রহিয়া যায়। তবে, যে ভাবমূলক অনুরাগের উপরে সখ্যের প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক বিবিধ বন্ধনে তাহার অল্পবিস্তর পরিতৃপ্তি আছে। এই কারণে এ অভাব বোধ করি সকল সময়ে তাদৃশ গুরুতর নহে। তথাপি জীবনের সহমর্ম্মী সহচর লোকে যাচিয়া পায় না। শ্রীকৃষ্ণের কপালে কিন্তু সখাগুলি মিলিয়াছে ভাল। পরস্পরের প্রতি এমন গাঢ় অনুরাগ—দেখিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে বনে বনে ধেনু চরাইয়া বেড়ান, ছুটাছুটি খেলা করেন, যশোদাকে ঘিরিয়া আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। বৈষ্ণব কাব্যে শৈশবের এই সরল ভালবাসা সুন্দর সরল বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, বাঙ্গালার কবি ভিন্ন প্রেমের সৌন্দর্য্য কি অপরে এমন করিয়া অনুভব করিতে পারে? সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি না, এই প্রখর পাশ্চাত্য প্রভাবের দিনে এ কথা বলিয়া হয় ত উপহাসাস্পদ হইব, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মত ভালবাসায় গঠিত পৃথিবীতে আর কোনও জাতি আছে বিশ্বাস হয় না। এই কোমলা প্রকৃতির শ্যামল স্নেহে বর্দ্ধিত না হইলে এমন করিয়া ভালবাসিবে কিরূপে? কেবল ভালবাসি বলিয়াই সকলে মিলিয়া এক জায়গায় জড়সড় হইয়া আমরা কোনও প্রকারে টিঁকিয়া আছি—কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে চাহি না, পাছে আর ফিরিয়া না আসে, পাছে আর দেখা নাহি হয়।

আমাদের প্রেমে হারাইবার ভয় বিশেষ প্রবল। প্রেমের ধর্ম্মই বুঝি এই। তাই ভায়ের কপালে ফোঁটা দিয়া প্রাণাধিকা ভগিনী যমের দুয়ারে কাঁটা অর্পণ করেন। উদ্দেশ্য কত দূর সাধিত হয় স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু হৃদয়ের ভাব ত প্রকাশ পায়। কৃষ্ণের সখাগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। মৃদু কোমল প্রকৃতি, ঔদ্ধত্য আদবেই নাই, কেবল সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিতে পারে আর ভালবাসা পাইলে সুখী হয়। তাহাদের প্রেমেও এই ভয়ের ভাব দেখা যায়। বোধ করি, এ দেশের প্রকৃতির সহিত ইহার বিশেষ যোগ আছে। সেই জন্যই হয় ত আমাদের কাব্যে এত বিরহকাতরতা, বিচ্ছেদে এত ভয়। সখ্য-সম্বন্ধে মধুর রসের সে দারুণ বিরহ না থাক্, কিন্তু সখাগণ কৃষ্ণের বিরহ যেরূপ অনুভব করে, তাহাও বড় কম নয়। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তাহাদের খেলাধূলা বন্ধ। ভয় হয়, কৃষ্ণ যদি আর না আসে, যদি তাহার কোনও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে! বৈষ্ণব কবি সখ্যরসে ঋতুর প্রভাব দেখান আবশ্যক বোধ করেন নাই, নহিলে সখাগণকেও হয় ত আমরা বর্ষার দিনে রুদ্ধ গৃহে উৎকণ্ঠিতহৃদয় দেখিতাম। সখার জন্য শৈশবের এত

ব্যাকুলতা আর কোথায় দেখা যায়? প্রেমের উপরেই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং বৈষ্ণব কবির রাখাল বালকেরা স্বভাবতই প্রেমে গঠিত। তাহাদের বালসুলভ ক্রীড়াশীলতার মধ্যে এমন একটি মধুর ভাব। হইবারই কথা। অনুকূল প্রকৃতি এবং অবস্থার মধ্যে অল্প বয়স হইতেই তাহাদের প্রেমবৃত্তির অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। তরুচ্ছায়ে, গোচারণে, বংশীধ্বনিতে মনের কোমলা বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তির বোধ করি বিশেষ সহায়তা করে। নহিলে, অন্যান্য দেশেও ত সখ্যরসের আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু এমনটি হয় না কেন?

খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে আর্থরের নাইট্‌দলের কাহিনীতে এই সখ্যভাবেরই আলোচনা। আর্থর রাজা—তাঁহার অধীনে নাইটেরা একসূত্রে বদ্ধ। কিন্তু বৈষ্ণব সখাদলের মত ইঁহারা বাস্তবিক প্রেমসূত্রে তেমন একীকৃত নহেন। সম্মুখে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এই প্রবল উদ্দেশ্যমত্ততায় য়ুরোপের অশ্রান্ত উদ্যম বাইবেলের প্রেম অবলম্বনে একবার এক জায়গায় জড় হইয়া গাঝাড়া দিল মাত্র। আমাদের গৃহস্থ প্রকৃতি উদ্দেশ্যের ধার ধারে না—শৈশবের সরল ভালবাসায় সখ্যের পরিবার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পরিতৃপ্তি। সেইজন্য য়ুরোপীয় সখ্যে বলের আবশ্যক—বৃহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কারবার, বল নহিলে চলিবে কেন? আমাদের সখ্যে ত আর বিস্তৃত উদ্দেশ্য নাই, ভাল না বাসিয়া আমরা থাকিতে পারি না বলিয়াই ভালবাসি। আমাদের স্বভাবতই প্রেম—উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না। য়ুরোপে উদ্দেশ্য মুখ্য, প্রেম গৌণ। সুতরাং আবশ্যক বলিয়া ভালবাসিতে হয়। রাজা আর্থর দুর্জ্জয় বাহুবলে প্রবলপরাক্রম—প্রেমের উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে বলিয়া সশস্ত্র নাইট্‌দলে সর্ব্বদা পরিবৃত। আমাদের সখারা রাখাল-বালক। কৃষ্ণ এই সখাদলের রাজা। বৈষ্ণব কবির বর্ণনা হইতে যত দূর বুঝা যায়, দৈহিক পশুবলে কৃষ্ণকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। তবে বালকেরা সকলেই কৃষ্ণকে ভালবাসে। আর বোধ করি, কৃষ্ণের কতকটা কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাও আছে। তাঁহার মৃদু মোহন ভাবে সকল বালকই মুগ্ধ। তাহারা প্রেমে কৃষ্ণকে রাজা করে, প্রেমে কৃষ্ণকে ঘিরিয়া রাখে, প্রেম বিনা বৈষ্ণব জগতে আর কিছুই নাই। বৈষ্ণব কাব্যে বলের জয় কবে? বল কেবলমাত্র রাজদণ্ড ধারণ করে, প্রেম জয় করে, পালন করে, শাসন করে, অভয় দেয়। আর প্রেমের মত বল কোথায়? প্রেম যে অসঙ্কোচে নিঃশব্দে চিরদিন সহিয়া যায়।

বৈষ্ণব কবির সখ্য বাল্যে। এই ত সখ্যের সময়। বিবিধ বন্ধনে মন এখনও বিভক্ত হইয়া পড়ে নাই। সরল হৃদয়ে রাখালবালকেরা পরস্পরকে ভালবাসে মাত্র। বৈষ্ণব কবি একটুকু দূরে দাঁড়াইয়া আপন অন্তরে সেই সরল অকপট অনুরাগ অনুভব

করেন। যশোদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বালকেরা দল বাঁধিয়া ধেনু চরাইতে বাহির হইল। ধবলি সাঙলি পিউলি আগে আগে ধূলি উড়াইয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে রাখালবালকেরা বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত—কাহারও গলে বনমালা, কাহারও পায়ে মঞ্জীর রুণুঝুণু রুণুঝুণু। শ্যামকে যশোদা সাজাইয়া দিয়াছেন—মাথায় মোহনচূড়া, করে স্বর্ণবলয়, অঙ্গে আভরণ, চরণে নূপুর। এইরূপ সাজসজ্জা করিয়া ব্রজবালকেরা মাঠে যায়। সেখানে যমুনাতীরে তরুতলে তাহাদের খেলিবার স্থান। গোধন ছাড়িয়া দিয়া সখারা খেলায় মত্ত হয়। কত রকম খেলা—কখনও দুই দলে কপাটি, কখনও এ উহার কাঁধে চড়ে, সে তাহাকে তুলিয়া লইয়া ছুটে; বালসুলভ চপলতার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। বৈষ্ণব কবি বৃক্ষান্তরাল হইতে খেলা দেখিতে থাকেন। বোধ করি, তাঁহারও এক এক বার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। অন্ততঃ তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া আমাদেরও এক এক বার এমন ইচ্ছা হয় যে, শ্যামসুন্দরের সখার দলে গিয়া ভিড়ি। প্রখর মধ্যাহ্নতাপে সখাদের অঙ্গ বাহিয়া শ্রমজলধারা ঝরিতেছে। শ্যামচন্দ্র আর চলিতে পারেন না। তরুতলে ছায়ায় বসিয়া সখারা বিশ্রাম লাভ করে। সঙ্গে "ভোজন সম্ভার ছিল ভারে ভার"। বনপাত পাড়িয়া সখারা মণ্ডল করিয়া বসিল। পাতে পাতে ভাত, সিঙ্গা বেণু ভরিয়া জল। আহারটা বেশ তৃপ্তির সহিতই হয়।

আহারান্তে শিথিল তনু ছড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে শুইয়া পড়িলেন, সুবলের কোলে মাথা রাখিয়া বলরামের চক্ষু আলসে অর্দ্ধনিমীলিত। আর আর সখারা কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া, নানা ভাবে বিশ্রামসুখে মগ্ন। বৈষ্ণব কবি এই সখ্যরসেই মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন। রাখালবালকেরা ছায়ায় বসিয়া বাঁশী বাজায়, বৈষ্ণব কবির হৃদয়ে বাঁশীর স্বরে অলস মধ্যাহ্ন বহিয়া যায়। রাখালবালক হৃদয়ের আবেগে আকুলকণ্ঠে গাহিয়া উঠে, বৈষ্ণব কবির অঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, চরণ চলে না, হৃদয় উদাস। রাধার নামে কখনও কখনও মধ্যাহ্নে বাঁশী বাজিয়াছে বটে, কিন্তু সখ্যরসে বৈষ্ণব কাব্যে মধ্যাহ্নের যেরূপ বিকাশ হইয়াছে, মধুর রসে তেমন হয় নাই। সখাগণের খেলাধূলা সকলই মধ্যাহ্নে। যশোদা বেলা থাকিতে ঘরে ফিরিতে বলিয়া দিয়াছেন। গোধূলির পরে সখারা আর মাঠে থাকে না।

কিন্তু আজ ধেনু সব কোথায়? বেলা পড়িয়া আসিল, খেলায় ভুলিয়া বালকেরা গৃহে ফিরিতে পারে নাই। ধেনু লইয়া গৃহে ফিরিতে সন্ধ্যা হয় বুঝি বা। রাখালেরা ভাবিয়া আকুল, যশোদা কি বলিবেন! কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়া ধেনুদিগকে আহ্বান করিলেন।

"সব ধেনু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া, ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনু বৎস সব, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বা রব করি, দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, স্নেহে গাভী শ্যামঅঙ্গ চাটে॥
দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘন ঘন, কানুরে করিল আলিঙ্গন।"

সখারা কৃষ্ণকে মধ্যে লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। গোক্ষুররেণুতে আকাশ আচ্ছন্ন।

এ দিকে যশোদা ভাবিয়া সারা। তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,

"সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লৈয়া।
অভাগিনী রৈল তোমার চাঁদমুখ চাঞা॥"

গোপাল ত এখনও ফিরিল না। ধেনুর পাছে পাছে সে যদি কোনও দুর্গম বনে প্রবেশ করিয়া থাকে! যশোদা ঘর আর বাহির করিতেছেন—যত বেলা যায়, ততই মন ব্যাকুল হয়। পদশব্দ শুনিলে তিনি চমকিয়া উঠেন, কৃষ্ণ আসিতেছে বুঝি। বাতাসে দীপশিখা কাঁপিলে তাঁহার মনে হয়, গোপাল এখান দিয়া ছুটিয়া গেল বা। কিন্তু গোপাল কোথায়? গোপাল এখনও আসে নাই। যশোদার ভয় ক্রমেই গাঢ় হইতেছে।

এমন সময়ে সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত। যশোদার "গদগদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী"। তিনি কৃষ্ণের মুখ মুছিয়া দিলেন। সে বদনকমলে শত লক্ষ চুম্বন করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে আশ কিছুতেই মিটে না। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুকাঞাছে হিয়া॥"

কৃষ্ণকে ক্ষীর সর ননী দিয়া যশোদা ঘুম পাড়াইলেন। সখারাও আপন আপন ক্ষীর সরের ভাগ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

পাশ্চাত্য সখ্যে প্রেমের এরূপ কোমলতা কোথায় মিলিবে? পাশ্চাত্য প্রকৃতি স্বভাবতই কিছু কঠিন—মনের কোমলা বৃত্তির অনুশীলন তাহার ধর্ম্ম নহে। তবে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রাচ্য সংস্পর্শে বাহিরে যাহা কিছু কোমলতা আসিয়াছে। তথাপি য়ুরোপীয় রমণীর প্রকৃতিও আমাদের চক্ষে সময় সময় কেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য সখ্য, আমার বোধ হয়, মুষ্টিযোগের উপর যেমন নির্ব্বিবাদে এবং স্বচ্ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, কোমলতার উপরে তেমন নিশ্চিন্তে নির্ভর করিতে পারে না। তাই বলিয়া

সেখানে যে বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে না, মানবের হৃদয় কেবলমাত্র পাষাণ জড়, তাহা অবশ্য নহে। তবে আমাদের সহিত পাশ্চাত্য ভালবাসার প্রকৃতি যেন কিছু স্বতন্ত্র।

কিন্তু শুনিতে পাই, বাঙ্গালী হৃদয়প্রধান জাতি নহে। বাঙ্গালা দেশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা—একপ্রকার শাণিত তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধির জন্যই আমাদের যাহা কিছু গৌরব। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা যায় না। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা নৈয়ায়িক বলিয়াই ভারতবর্ষে সমাদৃত এবং বাঙ্গালী উকীলেরা তনু দেহযষ্টি অবলম্বনে এখনও এ জাতীয় মর্য্যাদা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে সমর্থ। তবে আর আমাদের হৃদয়ের প্রাধান্য কোথায়? কিন্তু এই ন্যায়শাস্ত্রের কেন্দ্রস্থল হইতেই ত প্রেমের চৈতন্যের আবির্ভাব। এবং এই প্রেমের ধর্ম্মেই ত তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে একাকার করিয়া তুলিয়াছিলেন। অন্তরের কথা না বলিলে সহজে কেহ গলে না। ভালবাসা আমাদের প্রকৃতি না হইলে প্রেমের ধর্ম্মে হৃদয় উথলিয়া উঠিত না। নৈয়ায়িকী বুদ্ধি আমাদের থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে না। আমরা ভালবাসা চাহি—প্রেমের অভাব আমাদের নিকট যেমন দারুণ, এমন আর কিছুই নয়!

বৈষ্ণব সাহিত্যে আমাদের এই প্রেমবৃত্তির সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে। এবং বোধ করি, আমাদের নৈয়ায়িকী বিশ্লেষণ-বুদ্ধিরও এখানে অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন করিয়াই হৌক্, কাব্যের প্রাধান্যে বৈষ্ণব সাহিত্যে হৃদয়েরই বিশেষ বিকাশ স্বীকার করিতে হয়। আর সখ্যরসে আমাদের হৃদয়ের বিস্তৃতির পরিচয়। পশুজগতে অবধি আমাদের প্রেম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের গৃহস্থ প্রকৃতিও এইখানেই সম্পূর্ণ ব্যক্ত। সখ্যে সামাজিকতার বিকাশ—সামাজিকতার মধ্যেও আমাদের গার্হস্থ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সখ্যে গার্হস্থ্য বড় প্রবল নহে। সেই জন্যই বোধ করি, আমাদের সখ্য কোমলতর। আমরা পরিবারপরায়ণ জাতি—আমাদের মজ্জায় মজ্জায় পরিবারপরায়ণতা। য়ুরোপ আমাদের তুলনায় সমাজপরায়ণ। সুতরাং কোমলতা এবং মধুরতা অপেক্ষা কঠিন বল তাহার আবশ্যক।

পরিবারপরায়ণ বলিয়াই আমাদের প্রকৃতি তাদৃশ জাঁকজমকপ্রিয় নহে। বাঙ্গালা দেশে বসনভূষণ আদবকায়দার তেমন বাহুল্য নাই। পরিবারপরায়ণতার ত আর এ সকল বড় আবশ্যক করে না। পৃথিবীর বিস্তৃত সমাজে বাহির হইলে এই জন্য অনেক সময় আমাদিগকে একটু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু আমাদের বসনভূষণে আদবকায়দায় জমকালো ভাব বড় না থাকিলেও শোভন সৌন্দর্য্যের অভাব স্বীকার করা যায় না। সৌন্দর্য্যজ্ঞান আমাদের মর্ম্মস্থলে প্রচ্ছন্ন, তবে কর্ষণাভাবে তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। সখ্যরসে আমাদের এই জাতীয় বিশেষত্ব অনেকাংশে ব্যক্ত

হইয়াছে। পাশ্চাত্য সখ্য জমকালো ব্যাপার—কায়দাকরণ, আইনকানুন, অনুষ্ঠানের ক্রুটি নাই। আমাদের সখ্য সরল এবং সুন্দর। য়ুরোপীয় প্রেমচর্চ্চায় দেখাইবার ইচ্ছা বোধ করি বিশেষ বলবতী। সেই জন্য তাহার মধ্যে তেমন শান্তি অনুভব করা যায় না। আমাদের প্রেম প্রশান্তভাবে উপভোগ করিবার।

বৈষ্ণব কাব্যে কোন কোন স্থলে সখ্যের সহিত দাস্যরসও যুক্ত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় তাহাকে ঠিক দাস্য বলা যায় না। কারণ, তাহার মধ্যে খেলার ভাবই প্রবল—যথার্থ দাস্য নাই বলিলেই চলে। কিন্তু বৈষ্ণব কবি সখ্যদাস্যরস বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। যমুনাপুলিনে সখারা মিলিয়া কৃষ্ণকে রাজা করিল। কদম্বতরুতলে ফুলের সিংহাসন, সিংহাসনে আসীন রাজা কৃষ্ণ। গলে ফুলের মালা, শিরে ফুলের মুকুট, করে পদ্ম-রাজদণ্ড। মদনের ফুলশরে তবু একটু তীব্রতা আছে। সখারা কৃষ্ণের পাত্র মিত্র সভাসদ্। যেমন রাজদণ্ড, তেমনি রাজশাসন। কঠোরতা কিছুমাত্র নাই। প্রেমে কৃষ্ণ এই সখা প্রজাদলের হৃদয় এবং নয়নরঞ্জন। খেলা বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ হইলে খেলার মধ্যে যে রাজার প্রবল প্রতাপ জাহির হইত না, সাহসপূর্ব্বক এ কথা বলা যায় না। প্রবল ক্ষমতাই পাশ্চাত্য রাজগুণ; আমাদের রাজা রঞ্জনে। সেই জন্যই ত সখারা কৃষ্ণকে রাজা করে।

কিন্তু কৃষ্ণের কি কোনও ক্ষমতা নাই? কেবলই একটুকু রমণীয় কোমলতা? তাহা নহে। সখারা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতা কেবল মাত্র পাষাণ বলে নহে। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতার বিকাশ প্রেমভাবের মধ্য দিয়া। সেই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে দাস্য সখ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় না। প্রেমের রাজ্যে বিরোধ স্থান পাইবে কিরূপে? কৃষ্ণও ত বৈষ্ণব কাব্যেরই চরিত্র। স্বভাবতই উদ্ধত ভাব তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সখারা কৃষ্ণকে যেমন ভালবাসে, কৃষ্ণও সখাদলের প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত। প্রেমই প্রেম আকর্ষণ করে। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে কোমলতার আশ্রয়ে দুর্ব্বল বল পাইয়াছে, সভয় নির্ভয় হইয়াছে, উচ্ছৃঙ্খলা অশান্তি মধুর সখ্যে শাসিত।

এই কোমল বৈষ্ণব সখ্য আমাদের মধ্যে চিরদিন জয়যুক্ত হোক্। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়া ভয় হইতে, রোগ হইতে, শোক হইতে মুক্ত হই।

'ভারতী ও বালক', চৈত্র ১২৯৭

বোল্‌তা ও মধ্যাহ্ন

আমি সন্ধ্যারও নহি, উষারও নহি, আমি মধ্যাহ্নের জীব। বৈশাখের প্রখর রবি-কিরণে আমার জন্ম—জন্মাবধি রবিকিরণ পান করিয়া এ দেহ গঠিত। সারা হিম-রজনী অন্ধ জীবনভার বহন করিয়া চাকের মধ্যে জড় হইয়া থাকি, ভীতিবিহ্বল বিবশ দেহে ক্ষীণ প্রাণ কোন প্রকারে লাগিয়া থাকে মাত্র, প্রভাতে রবিকিরণ আসিয়া প্রথম আমাকে জাগাইয়া তুলে—আমার দেহে প্রাণ সঞ্চার করে, নয়নে দৃষ্টি দেয়। আমি মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে জন্মিয়াছি, তাই রবিকরে আমার এত আনন্দ। রবিরই মত আমার কনকবর্ণ, মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য্য তীব্র। সন্ধ্যা ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আসে, উষা ছায়ার হৃদয়ে একটুকু মৃদু তরুণ অরুণ-আভা, মধ্যাহ্নের মত এত আলো কোথায়? এত রূপ কাহার? মধ্যাহ্ন আর আমি, দুই জনেই কেবল মাত্র আলোক, কেবল মাত্র ঔজ্জ্বল্য, ছায়া নাই, অন্ধকার নাই, ম্লান পাণ্ডু মধুরতা নাই। এ রূপ কেবলই তপ্ত তীব্র দহনজ্যোতি। তাই ত তোমাদের কবিরা মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য কদাচ গাহেন, বোল্‌তার সৌন্দর্য্যও গাহেন না। এ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদের হৃদয় জ্বলিয়া যায়, এ রূপ মর্ম্মে মর্ম্মে তীক্ষ্ণাগ্র সূচের মত বিঁধিতে থাকে, দারুণ দহনে কবিতা উথলে না। সন্ধ্যা উষা তরল কোমল ভাবে হৃদয় প্লাবিত করে, প্রখর জ্বলন নাই, তরঙ্গভঙ্গে মধুর ছন্দে কবিহৃদয় সে সৌন্দর্য্যে বহিয়া যায়। মধুকাতর হৃদয়ে মৃদু গুঞ্জনে পদ্মিনীর সহিত ভ্রমর মধুরালাপ করে, কবিহৃদয় মধুকাহিনীমুগ্ধ। কিন্তু মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্যও ন্যূন নহে, ভ্রমরও সৌন্দর্য্যে বোল্‌তার নিকটে ঘেঁসিতে পারে না। সৌন্দর্য্যই ত প্রখর। আলোক ঝলসিবে না ত কি অন্ধকার ঝলসিবে?

আমি মধ্যাহ্নের—তা কাব্যে স্থান পাই বা না পাই। মধ্যাহ্নকে আমি আপনার অন্তরে অনুভব করি—এমনি আমার মত হৃদয়, এমনি নীরব নৈরাশ্য, নিশিদিন অন্তরে অন্তরে এমনি দারুণ দহন। এই চাকে বসিয়া দেখিতেছি, আমার চাকের সম্মুখে বহুদূরবিস্তৃত প্রান্তরের প্রান্তদেশ ব্যাপিয়া অনল-মধ্যাহ্ন বহিয়া গিয়াছে—কম্পিত তীব্র লাবণ্যে ধরণী দিশাহারা। এই ত সৌন্দর্য্য। এমন প্রখর তেজ! এমন সুতীব্র স্নেহ! যেখানে দিয়া বহিয়া যায় সব শুকাইয়া, যেখানে হৃদয় খুলে হৃদয় জ্বালাইয়া। জ্বালা নহিলে ত সৌন্দর্য্য মৃদু। আমারও সৌন্দর্য্য তাই এমনি জ্বালাময়—যেখানে বিঁধে, তীব্র মদিরার মত প্রতি শিরায় শিরায় জ্বালা ধরাইয়া। তোমরা ত এ জ্বালা সহিতে পার না, সৌন্দর্য্য কিরূপে অনুভব করিবে? আমি হুল বিঁধাইয়া আপন অন্তরে মধ্যাহ্নের তীব্রতা উপভোগ করিতেছি। এক এক বার ইচ্ছা হয়, ঐ কবি-

হৃদয়ে এই হুল ফুটাইয়া সে তীব্রতা বিধিয়া দিই। কিন্তু তোমাদের কবি কি এ সৌন্দর্য্য সহিতে পারিবেন ?

তোমাদের কাব্যে ত কোথাও দারুণ তীব্রতা অনুভব করা যায় না। কেবলই ঢল ঢল কোমলতা, শিথিল মৃদু আলস, মধুর প্রেমে অর্দ্ধ নিমীলন। এত মধুরতার মধ্যে তোমরা নিমগ্ন হইয়া থাক কিরূপে ? আমি কেমন মধ্যাহ্নের প্রখর হৃদয়ে জ্বালাবিদ্ধ জীবন লইয়া চিরদিন এই রবিকিরণের জ্বলন্ত আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি। মধ্যাহ্ন আমাকে জানে, আমি মধ্যাহ্নকে জানি। সন্ধ্যার মত এ কেবলই প্রশান্ত মধুরতা নহে। তাই ত এত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াও একেবারে গলিয়া যাই না, আশ মিটে না। সন্ধ্যায় দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে, হৃদয় অবসন্ন, একরত্তি জীবনের পরে বৃহৎ সংসার যেন ঝুঁকিয়া পড়ে, সৌন্দর্য্য তখন কোথায় ? অন্ধকার ঘনাইয়া ত সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করে না। তোমাদের কবিরা বোধ করি, আধ ঘুমঘোরে স্বপ্নে সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেন। মধুরতা বৈ তাহা আর কিছুই নয়। মধ্যাহ্ন সুস্পষ্ট এবং সুতীব্র। পূর্ণালোকে স্বপ্ন রচিত হয় না, কোমলতাও তাদৃশ নাই। কোনও কোনও কবি মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে ছায়ায় দাঁড়াইয়া। এই জন্য মধ্যাহ্নের তরল অলস ভাবেই তাঁহারা মুগ্ধ ! কিন্তু এ মৃদুতায় আমার মন উঠে না। আমার মত এমনি হুল বিঁধিয়া সে তীব্রতায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মধ্যাহ্নকে একবার অন্তরে অনুভব না করিলে সকলই ব্যর্থ। তোমরা তীব্র প্রখর জ্বালা উপভোগ করিতে পার না, হুল নাই, মধুরতায় গলিয়া যাও। আমি চিরদিন এই প্রখর জ্বালায় জ্বলিতে থাকি।

এই জ্বালায় মধ্যাহ্নের প্রেম ব্যক্ত হয়। মধ্যাহ্নের প্রেম মর্ম্মবেধী—আমারই মত বিঁধিয়া বিঁধিয়া। বেধন প্রেমের ধর্ম্ম—জ্বালা প্রেমে অনিবার্য্য। তোমরা এত করুণহৃদয়, প্রিয়জনের অন্তরে ব্যথা দিয়া সুখ অনুভব কর না ? প্রিয়জনকে ভিন্ন পৃথিবীতে কে কাহাকে ব্যথা দিয়া থাকে ? এই জন্যই এ দারুণ নিষ্ঠুরতার মধ্যে এমন একটু সুতীব্র কোমলতা, এ কঠোর জ্বালায় এমন করুণ আনন্দ। প্রেম জ্বালাইয়া জ্বলে এবং এই জ্বলনেই তাহার জীবন। মধ্যাহ্ন মধুর ধার ধারে না, কোমলতায় হৃদয় হরণ করে না, অন্তরের অন্তরতম নিভৃতে দারুণ জ্বালা বিদ্ধ করিয়া কেবলি দহিতে থাকে। গুঞ্জনে এবং মধুরতায় যে যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহে, আমি ত তাহার প্রেম বুঝি না। তাই প্রেমে মধ্যাহ্ন আর আমি। মধুরতায় সন্ধ্যা আছে, উষা আছে, ভ্রমরও আছে বৈ কি।

ইহাদের প্রেমে কি জ্বালা নাই ? কিন্তু সে জ্বালা বড়ই মধুর। এত মধুর যে,

তাহাতে প্রেম জ্বলে না। সন্ধ্যার প্রেমে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্ত ভাব, উষার ত জ্বালা নাই বলিলেই চলে, আর ভ্রমরের মধুতেই পরিতৃপ্তি। ভালবাসিয়া আশ মিটে না! শুধু আমার আর মধ্যাহ্নের। যতই বিঁধি, ততই বিঁধিতে চাহি—যতই জ্বলি, ততই আরও জ্বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ ভালবাসা ত কেহ অনুভব করে না। মধুবিহ্বল মদির মোহই এখানে প্রেম বলিয়া চলিয়া যায়। প্রেম যেন নিতান্তই ছায়ায় ছায়ায়, একটুকু আলোক সহে না, উত্তাপ সহে না, কেবলি অতি মৃদু ললিত গলিত কোমলতা—কৃষ্ণ অন্ধকার এবং ছায়ালীন অনাতপ মাত্র অবলম্বন।

কৈ, আলোকে ত তোমাদের প্রেম ফুটে না। বিধাতা, কালোর প্রতি তুমি বুঝি কিছু সদয়। তাই এই মর্ত্ত্য মানবেরাও দেখি, সারা ক্ষণ কোকিল ভ্রমর আর সন্ধ্যা লইয়াই রহিয়াছে। ঐ কৃষ্ণবর্ণের সহিত কোমলতা যেন অবিচ্ছেদ্য। কেবল গৌরাঙ্গে যে তোমাদের প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া, বুঝিতে পারি না। আর এই পূর্ণিমা নিশীথে বিমল জ্যোৎস্নালোকে এত প্রেমের গানই বা উঠে কোথা হইতে? এ কি বিদ্রূপ! না ছলনা! জানি না, জ্যোৎস্নালোক অস্পষ্ট এবং ছায়াময় বলিয়া যদি তাহার মধ্যে প্রেমের রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আমার নিকট প্রেমে তীব্রতার মত আর দারুণ রহস্য নাই।

এই জন্যই মধ্যাহ্নের প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়। দিগন্ত হইতে দিগন্ত তপ্ত স্বর্ণপ্লাবন! যেমন তীব্রতা, তেমনি প্রেম! প্রেম নহিলে এত সৌন্দর্য্য টিঁকিয়া রহিবে কিসে? কিন্তু কাব্যে ত এ সৌন্দর্য্য স্থান পায় না। নাই বা পাইল। আমি তোমাদের অন্তরে এই সৌন্দর্য্য চিরদিনের তরে বিঁধিয়া দিতে চাহি। বিধি হে, কবিকে যদি আমার মত এমনি হুল দিতে। মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য হুল বিঁধিয়া অনুভব করিবার—জ্বলিতে হইবে কি না। মধুরতাই যদি চাও, ইহাতে কি নাই? প্রখর যৌবনে কি আর কোমলতা অনুভব করা যায় না? কিন্তু তাহা এই তীব্রতার মধ্যেই। হুল ফুটাইয়া যে এই তপ্ত তীব্রতা না অনুভব করিল, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য তাহার নিকটে অসম্পূর্ণ। তবু ছায়ায় দাঁড়াইয়াও, হে কবি, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য তুমি যে গাহিয়াছ, ইহাতেই তোমার কাব্যরস পানে আনন্দ পাই। তাই আরও ইচ্ছা হয়, তোমার ঐ উদার হৃদয়ে হুল বিঁধাইয়া দিই—তুমি আমাকে অনুভব কর, আমি তোমাকে অনুভব করি।

অতৃপ্ত হৃদয়ে কবিকে অনেক কথা বলি—কবিকে নহিলে আর কাহাকে বলিব?—কিন্তু সহসা এক এক বার মনে হয় যে, তোমাদের কবিও যেন কোথায় কবে মধ্যাহ্নের তীব্রতা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু অনুভব করিলে কি হইবে,—সে কেবল ক্ষণিকের

চকিত অনুভব—আমার মত এমন নীরবে সে অনলজ্বালা সহিতে পারেন নাই, জ্বালা ধরিতে না ধরিতে ছায়ায় গিয়া হৃদয় জুড়াইয়াছেন। তাই প্রখর মধ্যাহ্নে মালিনী নদীতীরে কম্পিত তরুতলে শকুন্তলা। শকুন্তলা ছায়া। বৃক্ষান্তরাল হইতে মুগ্ধ দুষ্মন্ত উঁকি মারিতেছেন। দুষ্মন্ত প্রখরতেজ মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন ছায়ার প্রেমে মুগ্ধ। কবিহৃদয়ও ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। দুষ্মন্তের প্রখর জ্যোতি কবি নীরবে সহিতে পারেন না। শকুন্তলায় তাঁহার হৃদয় শান্তি পায়। এই শকুন্তলার হৃদয়ে বসিয়াই তিনি দুষ্মন্তের সৌন্দর্য্য পান করিতেছেন। শকুন্তলা হইতে দূরে পরিপূর্ণ-হৃদয়ে দুষ্মন্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে কে? তবু জগতের প্রাচীন কবি তুমি মধ্যাহ্নকে অনুভব করিয়াছ। শকুন্তলার হৃদয়ে দুষ্মন্তের প্রেম বিঁধিয়া অবধি শকুন্তলা জ্বলিয়াছে। মধ্যাহ্নের প্রেম না জ্বলিয়া ত অনুভব করিবার জো নাই। মধ্যাহ্ন ত চিরদিন জ্বলিয়া সারা।

কিন্তু এই সুন্দর মধ্যাহ্ন-তীব্রতায় একটা কাল ভ্রমর আসিয়া দেখা দিল কেন? কবি, তুমি ঐ কাল রূপে বড়ই মুগ্ধ। ভ্রমরকে ছায়ায় রাখিয়া তবু কবিত্বের পরিচয় দিয়াছ বটে—সে ত আর প্রখর মধ্যাহ্ন সহিতে পারিবে না। কিন্তু যে ছায়া মধ্যাহ্নকে চায়, ভ্রমরের গুঞ্জন তাহার ভাল লাগিবে কেন? শকুন্তলা ঐ বাচাল ভ্রমরটার প্রতি বড়ই বিরক্ত—বার বার সখীদিগকে উহাকে তাড়াইয়া দিতে বলিতেছেন। ভ্রমরের ভাগ্যে অঞ্চলতাড়না! শুধু আমার কপালে নয়? হোক্ হোক্, মানব-সমাজে বিচার আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুনিতে পাই, শকুন্তলাও না কি মনে মনে ভ্রমরের উপর সদয়। তাই ত মিলন না হইতে হইতে শকুন্তলার কপালে দারুণ বিচ্ছেদ। ভ্রমর মধু-গুঞ্জনে যত বিঘ্ন ঘটায় বৈ ত নয়। কবি, আমাকে ত ডাকিবে না। ভ্রমর তোমার প্রিয় পাত্র। কিন্তু আমার হুল বিঁধিলে তোমার হৃদয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। এইটুকু সহিতে এত কাতর? আমি যে তোমার হৃদয়ে চিরদিন মধ্যাহ্নকে জ্বালাইয়া রাখিতে পারি। আমার মত তুমিও এমনি জ্বলিবে—এই জ্বলনের অবসান নাই—চিরদিন মগ্ন হইয়া সৌন্দর্য্য অনুভব কর।

যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবে, তখন না হয় ভ্রমরকে ডাকিও। তাহার গুঞ্জনে ঘুমঘোরে সন্ধ্যা আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে। ঐ কাল রূপ দিয়া ত মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবে না। ভ্রমর গুণ্ গুণ্ করিয়া তোমাদেরই মত সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য গাহেও বটে। গাহিবে না কেন? সন্ধ্যারই মত অন্ধকার রূপ কি না। আমার ত তাহা নয়। মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য্য তীব্র, প্রেম তীব্র, হুল তীব্র। বিধাতা, ভ্রমরকে বৃথা হুল দিয়াছ। হুলই যদি দিলে, তবে অমন কাল রূপ করিলে কেন?

কাল রূপে বড়ই যেন কেমন সুখের ভাব; হুলে এত সুখ সহে না। আর ভ্রমর সৌন্দর্য্যেরই বা কি ধার ধারে? বিস্মৃতি সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অন্ধকার ত কেবলই গুটাইয়া আসে। কিন্তু এখানে বোধ করি, লোকে অন্ধ হইয়া সৌন্দর্য্য দেখে। তাই অন্ধকারের প্রভাবে আমি আর মধ্যাহ্ন বাদ পড়িয়া যাই। তা হোক্। এ সৌন্দর্য্য ত আর অস্বীকার করিবার জো নাই। কাব্যে স্থান দিয়া সূর্য্যের গৌরব কেহ বৃদ্ধি করিতে পারে? না, চোখ বুজিয়া সে সৌন্দর্য্য হ্রাস করা যায়?

তোমাদের কাব্যে আমার হুলের জ্বালা না বিঁধিলে আর মধ্যাহ্নকে সুতীব্ররূপে উপভোগ করিতে পারিতেছ না। এখন দূর হইতে কেবল রাখালবালকের বংশী-ধ্বনির উদাস কোমলতায় তোমরা মুগ্ধ। বোধ করি, যাহা কিছু বিঁধে, তাহাই তোমাদের নিকট কোমল—কেবল আমার এই দারুণ হুলই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বংশীধ্বনিতে তীব্রতা কতকটা যেন কমিয়া আসে বটে। রাখালেরা ছায়ায় বসিয়া বাজায় কি না, তোমরাও ছায়ায় বসিয়া শুন। আর তাহারা ছায়ার প্রেম যেমন অনুভব করে, মধ্যাহ্নের দারুণ ভালবাসা ত তেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবু কৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজাইতেন, রাধিকার হৃদয় কি জ্বলিত না? মধ্যাহ্ন-বংশীধ্বনিতে তীব্রতার রন্ধ্রে উদাস নৈরাশ্য ফুঁ দিয়া কোমলতা বাহির করে। এই জন্য এ কোমলতা ঔদাস্যে, মধুরতায় নহে।

মধুরতা যেমন সন্ধ্যায়! ম্লানমুখে রবি ধীরে অস্ত যায়, চন্দ্র উঠে—তাহাও মধুর। আলোক কোথাও ফুটিতে পায় না। নীল আকাশ, অস্ফুট ছায়া, প্রশান্ত নীরবতা মিলিয়া কেবলি বিমল মাধুরী রচনা করে। মাধুরী গার্হস্থ্যে। তাই সন্ধ্যার কেমন সুকুমার গৃহস্থ ভাব। ইহার মধ্যে আমরা যেটুকু ঔদাস্য অনুভব করি, তাহা শান্তি-প্রধান। কিন্তু এত মধুরতা আমার পোষায় না। মধ্যাহ্নে আমি যেন ছুটিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়ি; সন্ধ্যায় জগৎ নিতান্ত মধুভাবে হৃদয় প্লাবিত করে। আমি জ্বলিতে চাহি—মধু লইয়া কি করিব? জ্বালা নহিলে সৌন্দর্য্য আমার নিকট ব্যর্থ।

আর সন্ধ্যাকে ত তেমন করিয়া দেখিতে পাই না। স্বল্পালোকে সুস্পষ্ট দেখা যায় না। তাই আজও কেহ সন্ধ্যার রঙ্ ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। তোমাদের কাব্যে তাম্রবর্ণের কথাও শুনি, ধূসর বর্ণের উল্লেখও দেখি, কেহ কেহ সন্ধ্যাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া সারিতে পারিলেও ছাড়েন না। বোধ করি, দূর হইতে যাহার যেরূপ বোধ হইয়াছে, আন্দাজে বর্ণনা করিয়া সারিয়াছ। এখন তাই কোনও বর্ণনা অপর বর্ণনার সহিত ঠিক মিল খাইতেছে না। আমি ত স্বল্পালোকে তেমন দেখিতে পাই না,

তবে অন্তরে তাহার প্রভাব কতকটা অনুভব করি বটে। আর ঐ আকাশের গায়ে রবির রাঙ্গা আলোটুকু যত ক্ষণ থাকে, তত ক্ষণ একরূপ দেখিও। কিন্তু এত অল্প দেখিয়া কি কাব্যে বর্ণনা করা চলে? তবু কিন্তু তোমাদের কবিদের বর্ণনা মর্ম্ম স্পর্শ করে।

কিন্তু সন্ধ্যা তোমাদের এত প্রিয় কিসে? বোধ করি, ভ্রমরগুঞ্জনেই সন্ধ্যার প্রতি তোমাদের অনুরাগ। নহিলে সন্ধ্যাকে ত আর কেহ বড় দেখ নাই। ভ্রমর পদ্মিনীর চারি ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গুণ্ গুণ্ করিতে থাকে, তোমরা প্রেম অনুভব কর। কিন্তু পদ্ম ত রবিক্রিরণপানে বিহ্বল—ভ্রমরের প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। দূর হইতে তাহা ত আর তোমরা জানিতে পাও না। তবে মধু দেয় কেন? মধু কি আর সাধ করিয়া দেয়? কত সাধ্য সাধনা, কত গুঞ্জন, অবসরমত ছোঁ মারিতেও ক্রটি নাই। আর যে গুঞ্জনে তোমরা ভুল, ক্ষুদ্রা পদ্মিনী যে ভুলিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গুণে নয়, ঐ গুঞ্জনেই ভ্রমরের ছলনা।

প্রেমে যাহারা কেবলি সুখ চাহ, ভ্রমরের গুঞ্জন শুন, ভ্রমরের পদানুসরণ কর। তোমাদের নিকটেই ত ভ্রমরের পদমর্য্যাদা—আদর করিয়া ষট্‌পদ নাম দিয়াছ। জ্বালা সহিতে পার না, কাঁটার ঘায়ে কাতর, ভ্রমরই তোমাদের আদর্শ। গুণ্ গুণ্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, ফুলের মধু লুটিয়া প্রেম ব্যক্ত কর, জ্বলিতে ত হইবে না।

কবি, তুমিই কিন্তু ভ্রমরকে বাড়াইয়া দিয়াছ। না জানি, কোন্ সন্ধ্যার স্বপনে কোন্ ফুলবনে কি শুভ ক্ষণেই তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলে! সন্ধ্যার অন্ধকারে বোধ করি, ঐ কাল রূপ আর ঐ আরও কাল হৃদয় সুস্পষ্ট দেখিতে পাও নাই। উষার মৃদু আলোকেও ত তুমি বাহির হও, একবার সে রূপ ভাল করিয়া দেখিয়া এ দারুণ ভুল সংশোধন করিয়া লইলে না কেন? ভ্রমরকে দেখিতে হয় মধ্যাহ্নে—ভ্রমর আর আমি পাশাপাশি। কেবলি স্বপ্নের কাব্যরচনা! একটুকু মধ্যাহ্নের আলো সহে না, হুলের জ্বালা সহে না! এ ছায়ালীন স্বপ্নরাজ্যে আমি স্থান চাহি না! যে দিন তোমার হৃদয়ে এই দারুণ হুলজ্বালা বিদ্ধ করিতে পারিব, তোমার নশ্বর কাব্যকে অমর করিয়া দিয়া মরিব। সে দিন হইতে তোমার কাব্যে মধ্যাহ্ন জ্বলিতে থাকিবে—সেই জ্বলন্ত মধ্যাহ্নে মগ্ন হইয়া কেবলি জ্বলিয়া রহিব। আপনাকে ভুলিব, জগৎকে ভুলিব, আর তাহার পূর্ব্বেই জগতের হৃদয় হইতে ভ্রমরের স্থান ঘুচাইব। এখন কবি, তুমি হৃদয় লইয়া এস—আমি সেখানে এই হুল ফুটাইয়া দি। বোঁ-বোঁ-বোঁ-বোঁ।

'ভারতী ও বালক', বৈশাখ ১২৯৮

কিন্তু শক্তি চাহি—হৃদয়ে গভীর প্রেম এবং বাহুতে দুর্জ্জয় বল। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের রমণীয় কোমলতা মাত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে, বলের সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্পই। কিন্তু প্রেমে এবং বলে একীকৃত না হইলে মানব-চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করে না। প্রেম বল দেয়, বল প্রেমকে দৃঢ় করে। এবং এইরূপে পরস্পরের নিত্য সহায়তায় মানব-জীবন সংসারের জটিল সমস্যার মধ্য দিয়া প্রতি দিন আপনাকে নিঃশব্দে বিকশিত করিয়া তুলে। বল হইতে বিচ্ছিন্ন প্রেম নিরুদ্যম বেগ এবং অলস রমণীয়তা লইয়া উত্তরোত্তর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন বল অন্তরে আশ্রয় না পাইয়া প্রচণ্ড কাপুরুষ দাপটে পর্য্যবসিত হয়। প্রেমের আশ্রয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে বলের কথঞ্চিৎ বিকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু সে বল এত মৃদু যে, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। বৈষ্ণব সাহিত্য রমণীর কোমলতা দিয়া গঠিত। মধুর তরল ভাব বৈ বৈষ্ণব হৃদয়ে ত স্থান পায় না। কোমল প্রেমে কঠিন বল সেখানে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। এই কারণে বৈষ্ণব কাব্যে সমুন্নত দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের অনেক স্থলে কেমন অভাব বোধ হয়। বল বৈষ্ণব কাব্যে স্ফূর্ত্তি বড় পায় না।

কংসবধ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের বলের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, এবং এই ব্যাপার বৈষ্ণব সাহিত্যেরই অন্তর্গত, কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণব কাব্যে কংসবধে ত আর কৃষ্ণের চরিত্র বিকাশ হয় নাই। বৈষ্ণব কবিগণের রচনায় দায়ে পড়িয়া উক্ত ঘটনার মধ্যে মধ্যে কদাচ উল্লেখ দেখা যায় মাত্র। কিন্তু রাধিকারঞ্জনের কুসুম-সুকুমার ললিত বর্ণনা পড়িয়া ত বীরভাব কাহারও মনে আসে না। মোহন চূড়া, কমল নয়ন, ভ্রমর ভাবে স্বভাবতই স্তম্ভিত না হইয়া মন কিছু আলগা হইয়া পড়ে। গাম্ভীর্য্যে বলের প্রতিষ্ঠা। সৌন্দর্য্য এবং শক্তি এখানে যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া কোনও উদ্দেশ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের এ গাম্ভীর্য্য নাই। নানা কারণে, ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, তিনি কতকটা রমণীকৃত হইয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যে রমণীতেই প্রেমের আলোচনা। অন্ততঃ রমণীর ভাব সেখানে যেরূপ ফুটিয়াছে, পুরুষের ভাব তেমন ফুটে নাই—হয় ত ফুটাইবার আবশ্যকও হয় নাই। বৈষ্ণব স্ত্রী-চরিত্রগুলি যেমনই হোক্, যতখানি স্ত্রী, পুরুষ-চরিত্রগুলি কিছুতেই সেই পরিমাণে পুরুষ নহে। প্রেমে পুরুষ-হৃদয়ে আশ্রয় লাভ করিয়া রমণী পরিতৃপ্ত, কিন্তু আশ্রয়-দানে পুরুষ-হৃদয়ের চরিতার্থতার ভাব বৈষ্ণব কাব্যে বিরল। বলিতে গেলে, পুরুষ-চরিত্র বৈষ্ণব কাব্যে অসম্পূর্ণ।

কিন্তু আদর্শ সম্পূর্ণ চরিত্রগঠন বৈষ্ণব কবির কোথাও উদ্দেশ্যও নহে। আর বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবির নিকট ইহা আশা করাও তেমন যায় না। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের পুরুষেরা কোমলাঙ্গীরই একটুকু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। সুতরাং পৌরুষের অভাবে বলে বীর্য্যে সম্পূর্ণ পুরুষ চরিত্র গঠন বৈষ্ণব কবির পক্ষে একরূপ অসম্ভব। কিন্তু কোমলতা আমাদের যথেষ্ট আছে। এই জন্য এ দেশের রমণী যত দূর রমণী হইবার হয়। কোমলতায় স্নেহে প্রেমে আমাদের গৃহিণীদের পার্শ্বে কেহই স্থান পায় না। আর ইহার মধ্যে কোথাও ভান নাই। ইংরাজ রূপসী ফুলের ঘায়ে কাতর হইয়া পড়েন, কেতাবের আইনানুযায়ী যথাসময়ে মূর্চ্ছা অবলম্বন করেন, শিকারে স্বামীর সুনিপুণা সহধর্ম্মিণী হইয়া লোকসমাজে শোণিতের উল্লেখ মাত্রে সঘনে শিহরিয়া উঠেন, অর্থাৎ অবসর এবং সুবিধা পাইলেই রমণীজনোচিত আত্যন্তিক কোমলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। আমাদের সুন্দরীদের কোমল ভাবে সলজ্জ সহিষ্ণুতা। দেখাইবার চেষ্টা কোথাও নাই। এই স্বাভাবিক কোমলতায় আমাদের কাব্যে কোমল ভাবের এত প্রধান্য। এবং এই কোমল ভালবাসায় আমাদের উত্তমার্দ্ধের যাহা কিছু বল।

অপরার্দ্ধও আমাদের কোমলহৃদয়। কেবলমাত্র কোমলহৃদয় নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কোমলাঙ্গও বটে। সেই জন্য অঙ্গে আঘাত পড়িলে হৃদয় আমাদের অনেকটা দমিয়া যায়। এবং নিতান্ত পূর্ব্বজন্মের দায়ে না ঠেকিলে অন্তরাত্মা এ ক্ষণভঙ্গুর কারাদেহ হইতে নির্ব্বিবাদে মুক্তি লাভ করতঃ অবিলম্বে লোকান্তরের অবস্থা-স্বচ্ছলতা সম্পাদনার্থে যত্নবান্ হয়। বৈষ্ণব কাব্যে তাই দেহ নিরাপদ্—বলের সংস্পর্শ যথাসাধ্য দূরীকৃত। বাঙ্গালার বাহিরে তবু বল প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এখানে মুগ্ধা গোপিনীকুলরঞ্জনে বলের বড় আবশ্যক হয় নাই। সমতল বৈষ্ণব রাজ্যে কোমলতায় যথেষ্ট ফল হয়। বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, তোড়ও সুতরাং নাই। অবাধে হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিয়া কোমল প্রেমস্রোত বহিয়া গিয়াছে। চারি দিকে ফলে ফুলে ধনে ধান্যে হৃদয় উর্ব্বরা হইয়া উঠে।

কিন্তু বলের অন্তঃপুরে কোমলতা যেরূপ সুরক্ষিতা, আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে তেমন নিরাপদ্ নয়। রসের সহিত কোমলতার উপমা খাটে। সরসতায় তরুহৃদয় সবল এবং বলে তাহার সরসতা। শুষ্ক কাঠিন্যে অস্ত্র ভেদ করে না বটে, কিন্তু এ জড়তা বলের পরিচয় নহে। জীর্ণ দেহেও রস শুকাইয়া আসে, দুর্ব্বল বার্দ্ধক্য কোমল নহে। বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে কোমলতা বলে পরিপুষ্ট হয় নাই। এই জন্য আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদনে এত বিলম্ব। বল নহিলে কোমলতা প্রয়োগ করিবে কে?

আমাদের প্রেম যতই গভীর হোক্, বলের অভাবে অলস এবং নিস্তেজ। নহিলে, হৃদয়ই ত বাহুতে বল দেয়। বাঙ্গালার চৈতন্যই ত হৃদয়ের বলে দশ দিক্ জয় করিয়াছিলেন। আশ্রয়দানে প্রেমের বল প্রকাশ পায়। রমণীর কোমলতায় নির্ভরের ভাব স্বাভাবিক। এবং রমণী এই নির্ভর-ভাবই পুরুষের প্রেমে আশ্রয়-বল প্রদান করে। কিন্তু নারীর রমণীয় কোমলতা পুরুষের প্রেমে অশোভন। পুরুষের প্রেমে হৃদয়ে বল চাহি এবং বাহুতে তাহার বিকাশ।

রমণীর কোমলতায় কি বল নাই? কিন্তু সে বল স্বতন্ত্র। যে বলে লতা দীর্ঘ ছায়া তরুকে জড়াইয়া উঠে, যে বলে নারী রৌদ্রতপ্ত অবসন্নকে আপন স্নিগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দান করেন। পুরুষের বল বাহিরের ঝটিকা হইতে রক্ষা করিয়া রমণীকে এই ছায়াময় নিভৃত শান্তিকুঞ্জ রচনার অবসর দেয়। বৈষ্ণব কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ এ বল হইতে বঞ্চিত। নিরবচ্ছিন্ন সুখবিলাসে তাঁহার সমস্ত চরিত্রে একটা অশোভন দুর্ব্বল কোমলতার ছায়া পড়িয়াছে। বাহুতে বল থাকিলেও হৃদয়ের অসংযত লঘুতায় তাহা ব্যর্থ। সক্ষম ক্ষমা এবং সংযত মনুষ্যত্বে বলের পরিচয়। পৌরুষ ত কেবল মাত্র মুষ্টিযোগে নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রচণ্ড মুষ্টি অনুভব করিতে পারিলেও আমরা ধন্য হইতাম। বৈষ্ণব কাব্যে বিলাস কোমলতায় দ্রবীভূত হইয়া কৃষ্ণের চরিত্র নামিয়া গিয়াছে।

আদর্শ পুরুষচরিত্র শিব। প্রেমে বলে, ক্ষমা ক্ষমতায়, গার্হস্থ্যে বৈরাগ্যে তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ। সমস্ত ভাবে তাঁহার প্রেম এবং বল প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমে বলে কোথাও বিযুক্ত হয় নাই। তাই শিবের চরিত্রে সৃষ্টি প্রলয়ের সহিত চিরবন্ধনে বদ্ধ। প্রেম হলাহল পান করিয়া প্রলয়কে কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছে, বল বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও মৃত্যুকে দমনে রাখিয়াছে। শৈব সাহিত্যে প্রেমে এবং বলে মহত্ত্বের অনুশীলন। বৈষ্ণব সাহিত্যের শিথিলতা এখানে নাই। শৈব দেবমন্দিরের সুদৃঢ় গাম্ভীর্য্যে ভয়ে বিস্ময়ে স্তিমিত অন্তররুদ্ধ আনন্দে হৃদয় নত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব হৃদয় নদীতীরে, তরুতলে, প্রকৃতির ছায়াসুপ্ত বিজন শ্যামলতায়, মাতৃস্নেহে, বন্ধুর প্রীতিতে, সুন্দরী প্রেয়সীর সহিত মধুর মিলনে নীরবে বর্দ্ধিত হয়। শৈব হৃদয় যক্ষ রক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-বেষ্টিত পর্ব্বতের কঠিন সৌন্দর্য্যে, পিতার রুদ্রস্নেহে, ত্রিশূলের প্রবল আশ্রয়ে দুর্জ্জয় বল সঞ্চয় করে। এই জন্য সমাজ সংগঠনে শৈবের প্রভাব। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সামাজিক অপেক্ষা পারিবারিক।

তাই বাঙ্গালা দেশে শিব অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রভাব অধিক। শিথিলতার মধ্যেই আমরা থাকি ভাল। পরিবারে ত আর সঙ্কোচ নাই—হাত পা ছড়াইয়া বেশ

নির্ভাবনায় থাকা যায়। শুধু এই কারণে নহে, শিবের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য আমাদের লঘু হৃদয়ে হয় ত গুরুভার বলিয়া বোধ হয়, আমরা এ সুদৃঢ় গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া কৃষ্ণের তরল কোমলতায় ঢলিয়া পড়ি। আমাদের জাতীয় চরিত্র শৈব ভাবের বড় অনুকূল নহে। বরঞ্চ পাশ্চাত্য চরিত্রে শৈব ভাব ঈষৎ লক্ষিত হয়। কিন্তু দানব-অধৈর্য্যে প্রশান্ত সবলতা পাশ্চাত্য চরিত্রে স্থান পায় না। শিবে বল আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ সংযত। উদ্ধত দাপট গর্ব্বগঞ্জন ভোলানাথের অন্তরে থাকিবে কিরূপে? ঔদ্ধত্য ত প্রেমের সহিত নিত্য অবস্থান করিতে পারে না। শিবের বল মুহূর্ত্তেক প্রেমহীন নহে।

শৈব ভাবের অনুশীলন আমাদের চরিত্র গঠনে এখন বোধ করি বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। কারণ, ইহাতে নূতন ভাবের সংস্পর্শে আমাদের অনেকগুলি প্রসুপ্ত মনোবৃত্তি নাড়াচাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণব প্রেমে শৈব বল মিশিতে পারিলে সর্ব্বাঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। নহিলে, এ কোমলতা চিরদিন নব বল দিয়া আমাদিগকে সজীব রাখিতে অক্ষম। যশোদার স্নেহে, রাধিকার প্রণয়ে, সুবল সুদামের সখ্যে হৃদয় যতই কেন প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না, আপন অন্তরের মধ্যে আপন দুর্জ্জয় বলে একবার প্রতিষ্ঠা অনুভব না করিলে সকলই নিষ্ফল। কেবলই পাষাণ পশুবলের কথা বলিতেছি না, কিন্তু যে বল পশুবলকে পরাজিত করিয়া দুর্জ্জয়, যে বল বাহুতে বল সঞ্চার করিয়া প্রবল, যে বল মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া অমর।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধঃপতনের সঙ্গে বলের চর্চ্চা এ দেশে একবার আসিয়াছিল। এরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াই থাকে। কিন্তু পৌরুষিক গাম্ভীর্য্য এবং রমণীর কোমলতা উভয়বর্জ্জিত হইয়া এ বল অনেকাংশে নিষ্ফল। কোমলতায় তখন আর বাঙ্গালীর মন উঠে না, অবস্থায় পড়িয়া শক্তির জন্য তাহাকে দেবতার দুয়ারে উপস্থিত হইতে হইল। প্রবলের পাশব অত্যাচার কোমলতার উপরেই সমধিক বল প্রয়োগ করে। সুতরাং বহু দিন নীরবে সহিয়া নিতান্ত যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, কোমলহৃদয় বঙ্গসন্তানও প্রেম ছাড়িয়া অস্ত্রধারণে উদ্যত হইল। বলিতে গেলে, মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধেই শাক্ত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। কিন্তু হইলে কি হইবে? বৈষ্ণব কোমলতা আমাদের হাড়ে হাড়ে এমনি বিঁধিয়াছে যে, শাক্ত আমাদিগকে সহজে গড়িয়া তুলিতে পারে না। বৈষ্ণব ধর্ম্মে কোমলতার মধ্যেই একরূপ বল ছিল। প্রেমের বলে আমরা বিশ্বসংসারকে অন্তরে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে সে প্রেম যখন শিথিল হইয়া আসিল, অক্ষম হিংসা এবং দারুণ তৃষা লইয়া অন্তরে আমরা প্রথম দুর্ব্বলতা অনুভব করিলাম। দুর্ব্বল সন্তান স্বভাবতই মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইতে ছুটে। কিন্তু

প্রেমে আর আমাদের তেমন নির্ভর নাই, জননীর স্নেহে আর আমরা হৃদয়ে বল অনুভব করি না, তাড়াতাড়ি মায়ের হাতে গোটাকতক প্রাচীন পুথিরক্ষিত ধাতব অস্ত্র গুঁজিয়া দিয়া সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইলাম। জননীর শারীরিক বলেই আমাদের যাহা কিছু আশা ভরসা। কাপুরুষ হৃদয় জননীর স্নেহে সাহস পাইল না, কোমলাঙ্গিনী রমণীর মৃণালভুজে অস্ত্র দিয়া অঞ্চলের আড়াল অবলম্বন করিয়া রহিল।

ইহাই শক্তিপূজা। এবং এই জন্যই শক্তির প্রভাবে আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় নাই। নির্ম্মম রক্তদৃশ্যে হৃদয়ের কোমলতা হানি হয় মাত্র; জীববলিতে, ঢাকের বাদ্যে, উন্মত্ত প্রচণ্ড তাণ্ডবে অর্থাৎ যথাসম্ভব আসুরিক ব্যবহারে সবল চরিত্র গঠন হয় না। রমণী লক্ষ্মীরূপিণী অন্নপূর্ণা জননী। এই ভাবেই তাঁহার বল। প্রেম বিতরণ করিয়া, শান্তি বিতরণ করিয়া, অন্ন বিতরণ করিয়া তিনি শক্তিমতী। অস্ত্র ধারণ করিয়া নহে, শোণিত পান করিয়া নহে, রণরঙ্গে সংহারিণী প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নহে। বলে অসুরজয় রমণীর পক্ষে কেমন অস্বাভাবিক এবং অনাবশ্যক ঠেকে। বিশেষতঃ শিব বর্ত্তমানে পার্ব্বতীকে দিয়া এ কার্য্য সাধনের প্রয়োজন কি? কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ইহার জন্য দায়ী নহে। সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই চণ্ডীর অবতারণা। চণ্ডী যদি কোথাও দুষ্প্রাপ্যা হয়েন ত এই বঙ্গদেশে।

তাই বোধ করি, শক্তি এখানে জমিল না। যেটুকু বা জমিয়াছে, তাহাতে বীর-রসের প্রাবল্য, কি অন্য কোনও বিদ্রূপাত্মক রসের প্রাধান্য, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৈষ্ণব প্রেমে আমাদের জন্ম, রমণীর কোমল করকমলে তৃষিত তরবারি সহিবে কেন? কিন্তু সামঞ্জস্য করিতে না পারায় আমাদের অদৃষ্টে তাহাই ঘটে। শাক্ত ভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিসদৃশ অসামঞ্জস্য অনুভব করা যায়। তীক্ষ্ণ যুক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাহা বুঝান দুঃসাধ্য। কিন্তু সবশুদ্ধ প্রকৃতি অপেক্ষা বিকৃতিরই সেখানে যেন কিছু প্রভাব। শিবের চরিত্রে এই বিকৃতি অভাবে সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ। শক্তি আছে, কঠোরতা আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং একান্ত আবশ্যক। মত্ততা শিবে নাই। তাঁহার চরিত্র বিশ্বের রহস্য মন্থন করিয়া নিঃশব্দে গঠিত হইয়াছে—পর্ব্বতের মত অটল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর।

কিন্তু শিব ত আমাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। কেবল কুমারীরা গৌরীর অনুকরণে পতিপ্রার্থনায় শিবপূজা করিয়া থাকেন মাত্র। তাহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, শিবের উদার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম নহি। এবং আমাদের রমণীদের মধ্যে স্বামীর আদর্শ এখনও সহৃদয় সবল পুরুষ—নিতান্ত সঙ্কীর্ণহৃদয় পুরুষবেশী নারীচরিত্র নহে। কিন্তু ইহা হইতে শিবের প্রভাব

সামান্যই প্রতিপন্ন হয়। আমাদের জাতিগঠনে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভিন্ন আর কাহারও বড় প্রভাব দেখা যায় না। সেই জন্য বাঙ্গালার একমাত্র গৌরবের সাহিত্য বৈষ্ণব কাব্য। শৈব সাহিত্য আমাদের আদবেই নাই। এবং শাক্ত সাহিত্য যাহা আছে, তেমন উচ্চ অঙ্গের নহে।

কিন্তু শক্তিপূজা আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত। তখনও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই। এবং বোধ করি, বাঙ্গালীজাতি-গঠনও তখন বিশেষ অসম্পূর্ণ। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার কারাগৃহ রচনা করিয়া হিংসার পদতলে দাঁড়াইয়া তন্ত্র তখন করাল-বদনে শত ব্যাখ্যানে আপনার নিদারুণ তিমির-মহিমা প্রচার করিতেছে—পৈশাচিক সন্দেহ অবিশ্বাস এবং নির্ম্মমতায় বঙ্গগৃহের প্রতিষ্ঠা প্রতি দিন টলমল। এমন সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আসিয়া স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই প্রথম আমাদের জাতিগঠন। প্রেমে এবং কোমলতায় আমরা পরস্পরকে অন্তরে অনুভব করিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মে আমাদের অন্তর বাহিরে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। সুতরাং সাহিত্য জন্মাইবার এই প্রশস্ত অবসর। শক্তি আমাদের অন্তরে স্থান পায় নাই। তাই অজ্ঞান এবং অন্ধকারের মধ্যে তাহা নিষ্ফল।

তাই বলিয়া একেবারে ব্যর্থ নহে। সেই জন্যই বৈষ্ণব যুগের পরে তাহার পুনরুত্থান। এবং সাহিত্যেও অল্পবিস্তর প্রভাব। মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য রচনা করিলেন, রামপ্রসাদ সঙ্গীতে এবং কাব্যে শক্তির গান গাহিলেন, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও শক্তির প্রভাব বড় সামান্য নহে। কিন্তু এ সাহিত্য আমাদের গভীর হৃদয়ে পরিপুষ্ট হয় নাই—বাহিরের পৌরাণিক উত্তাপে ইহার জন্ম। তথাপি ক্রমে ক্রমে শাক্ত সাহিত্যেও বৈষ্ণব প্রভাব পড়িয়াছে। আগমনী সঙ্গীত প্রভৃতিতে কোমল প্রেমচর্চ্চা বাদ যায় নাই। কোমলতা আমাদের প্রকৃতি। শক্তিপূজারই ভান করি, আর যাহাই বলি, কোমল ভাব নহিলে আমরা থাকিতে পারি না। কোমলতায় ভিন্ন আমাদের গৃহস্থ প্রকৃতি চরিতার্থতা লাভ করে না।

বাঙ্গালার শাক্ত কাব্যে শক্তির মহিমা প্রচারিত হইলেও যথার্থ বীররসের সম্বন্ধ অল্পই। কোমল বর্ণনাগুলি আমাদের আসে ভাল। সুতরাং শক্তির মধ্যেও কোমল রসেই আমাদের হৃদয় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এমন কি, অনেক স্থলে এই জন্য রসের যথাযথ বিকাশ অভাবে কাব্যের হানিও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই কোমল রসের কল্যাণেই বাঙ্গালা সাহিত্যে শিবের নাম উল্লেখ দেখা যায়। পার্ব্বতীর সহিত সম্বন্ধে তিনি আমাদের নিকট পরিচিত। গৌরীর কথা বলিতে গেলে শিবের উল্লেখ না করিয়া ত থাকিবার জো নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্র শিবের চরিত্র যেরূপ ভাবে অঙ্কিত

করিয়াছেন, তাহাতে যে পরিমাণে লঘুতা প্রকাশ পাইয়াছে, গাম্ভীর্য্য তাহার ধার দিয়াও যায় না। ভারতচন্দ্রের শিব আধুনিক ভণ্ড সন্ন্যাসীদলের একজন প্রতাপশালী দলপতি। কোনও প্রকারে যেন কতকগুলি অমানুষিক শক্তি আয়ত্ত করিয়াছেন মাত্র। দেবভাব ত দূরের কথা, সমুন্নত মনুষ্যত্ব দেখিলেও পরিতৃপ্ত হইতাম।

বাস্তবিক, দেবত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্বে আমাদের সমানানুভূতি অধিক। একেবারে সুখদুঃখবিবর্জ্জিত নিষ্কলঙ্ক দেবচরিত্রে হৃদয় টানে না। আমরা অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণতার নীরব বিকাশ অনুভব করিতে চাহি। চেষ্টায় আমাদের অর্দ্ধেক আনন্দ। অক্ষম মানব প্রাণপণ চেষ্টায় শত বার স্খলিত পদ হইয়া দেবত্বের পথে যতটুকু অগ্রসর হয়, আমরা হৃদয়ে সেই পরিমাণে আনন্দ অনুভব করি। মানব নহিলে সকল হৃদয়ে আমরা যেন তাহাকে ভাল বাসিতে পারি না। সেই জন্যই আমাদের রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হইয়াও অজ্ঞান। মানবের মত তাঁহার সুখ আছে, দুঃখ আছে, ভয় আছে, ভ্রান্তি আছে, তিনি বিপদে পড়েন এবং দুর্ব্বল মানবেরই মত বহু কষ্টে বন্ধুবর্গের সহায়তায় নানা কৌশলে বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করেন। সীতা রামচন্দ্রের লক্ষ্মী—দেবী। কিন্তু তাঁহার চরিত্র একেবারে সম্পূর্ণ নহে। রমণীজনসুলভ সকল সুখ দুঃখই তাঁহার আছে। ব্যথা পাইলে তিনি কাঁদেন, স্বজনবিরহে অধীর হইয়া পড়েন, গন্ধদ্রব্যে আনন্দ উপভোগ করেন, সেবায় সুখী হয়েন, এমন কি, দেবর লক্ষ্মণ ভাল ভাবিয়া তাঁহার আদেশ পালনে এতটুকু ইতস্ততঃ করিলে সময় সময় মনের আবেগে রূঢ় ভাষাও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অসম্ভব নির্ব্বিকার মহত্ত্ব সীতাকে আমাদিগের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। সীতায় আমরা এই মর্ত্ত্য ভাবের মধ্যে মহত্ত্ব, প্রেম, নিষ্ঠা দেখিয়াই মুগ্ধ। কেবলই রাম সীতা বলিয়া নহে, সর্ব্বত্রই অসম্পূর্ণতার মধ্যে, পদস্খলনের মধ্যে, সহস্র ত্রুটি এবং অক্ষমতার মধ্যে মহত্ত্বের সংযমচেষ্টা অনুভব করিয়াই আমরা তৃপ্ত হই।

শিবকেও আমরা মানবভাবে দেখিয়াই মহত্ত্ব উপভোগ করি। মানবভাবে না দেখিলে কাব্যে তাঁহার প্রতিপত্তি হইত না, কেবলই স্তবে, বন্দনায় এবং ধ্যানমন্ত্রের বিশেষ রকম কাব্যের মধ্যে শিব দেবাধিদেব হইয়া বিরাজ করিতেন। কাব্যে শিব নিরাকারও নহেন, নির্ব্বিকারও নহেন, তিনি কখনও যোগী, কখনও গৃহস্থ, কখনও বা গৃহী বৈরাগী। তবে কাব্যেও তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে শক্তি যেন ঈশ্বরের প্রসাদ মাত্র, শিবকে সে শক্তিতে ঈশ্বর বোধ হয় না। শিব যাহাই হৌন্, কাব্যে মানবীকৃত হইয়াছেন। মানবীয় অসম্পূর্ণতা তাঁহার চরিত্রেও লক্ষিত হয়। এবং ইহাতেই শিবের চরিত্র যত দূর সম্পূর্ণ। আমাদেরও শিবের প্রতি

অনুরাগের কারণ এইখানে। যখন দেখি যে, তাঁহার উপরেও মদনের প্রভাব, তাঁহারও চিত্ত চঞ্চল হয়, যোগ ভঙ্গ হয়, ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া উঠে, প্রতিহিংসা শত্রু দমন করে, তপস্যা বিনা সহজে চিত্ত সংযত হয় না, উন্নতির জন্য, শান্তির জন্য আপনাকে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইতে হয়, তখনই আমরা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই শিবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। নহিলে, সুখদুঃখহীন নির্দ্দয় দেবচরিত্রের নির্ব্বিকার মহত্ত্বে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আশা করা যায় কিরূপে ?

সতী হিমালয়ের গৃহে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—পূর্ব্বজন্মে দক্ষকন্যারূপে শিবের অর্দ্ধাঙ্গ ছিলেন, এ বারেও শিবের সহধর্ম্মিণী হইবার জন্যই তাঁহার জন্মগ্রহণ। শিব সর্ব্বদা যোগাসনে আসীন—সতীর দেহত্যাগ অবধি গৃহধর্ম্মে তাঁহার আর বড় মন নাই। সুতরাং তাঁহাকে সংসারী করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। দেবতাদেরও স্বকার্য্য উদ্ধারার্থে শিবকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। শিবের সন্তান নহিলে তাঁহাদের শত্রুদমন হয় না। দেবতারা নগেন্দ্রনন্দিনীকে শিবের হৃদয়হরণে তাই সহায়তা করিবেন স্থির করিয়াছেন। মধুসখা কন্দর্প ফুলধনু লইয়া নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকিবেন, পার্ব্বতী নিয়মিত শিবপূজা করিতে আসিলে পুষ্পশরে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিবেন। পার্ব্বতী এ ব্যাপার কিছুই জানেন না। প্রতি দিন যথাসময়ে আসিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শিবের সেবা করেন, যথাসময়ে চলিয়া যান। শিবের যোগ ভাঙ্গে না।

কিন্তু যোগ না ভাঙ্গিলে নয়। মন না টলিলে ত এত রূপ, এত সেবা, এ সকলই ব্যর্থ। রতিপতি সময় বুঝিয়া বসন্তের সহিত একদিন শিবের আবাসস্থানে নামিয়া আসিলেন। অসময়ে চতুর্দ্দিকে সহসা বসন্তের আবির্ভাব হইল—গাছে পালায়, মেঘে রৌদ্রে, জলে স্থলে বসন্তের কনক-বিকাশ। মানবহৃদয়েও বসন্ত যথারীতি প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করিল না—বিশেষতঃ শিবের হৃদয়ে। সম্মুখে অর্দ্ধোন্মুক্তযৌবনা গৌরী শিবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিতেছেন। ত্রিলোচন যেমন সেই পুষ্পাঞ্জলি প্রতিগ্রহণ করিতে যাইবেন, কন্দর্পের নিদারুণ সম্মোহন বাণে ব্যথিত হইলেন। চন্দ্রোদয়ে সাগরহৃদয়ের মত শিবের সেই অগাধ স্তম্ভিত হৃদয়ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। উমামুখে তাঁহার সমস্ত দৃষ্টি নিপতিত হইল। কিন্তু চঞ্চল মন শিবকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিল না। অটল দৃঢ়তার সহিত সংযমী আপনাকে দমন করিয়া রাখিলেন। মদনের চাতুরী বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ক্রোধে ভোলানাথের নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল। তীব্র দৃষ্টিতে তিনি মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। আপনিও আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন না, পাছে চিত্তসংযমে অক্ষম হয়েন, এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতীর সন্নিকর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। কালিদাস সংযমে শিবের চরিত্র বজায় রাখিলেন।

ভারতচন্দ্রের শিব কিন্তু এ প্রকৃতির নহেন। সিদ্ধি এবং গঞ্জিকায় তাঁহার অর্দ্ধেক শিবত্ব। সুতরাং চরিত্রও তদনুরূপ। বাণবিদ্ধ হইয়া তিনি মদনকে ভস্ম করিলেন বটে, কিন্তু আপনাকে সংযত করিলেন না। অপ্সরী কিন্নরীদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বঙ্গীয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এবং এই অশিব ব্যবহারে অতিরসজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠককুলের তাম্বূলরক্ত চর্ব্বণ-যন্ত্রে হাস্যসঞ্চারে খিটিমিটি খিটিমিটি দ্রুত শব্দের একপ্রকার গতিবিধিও অনুভব হইতে লাগিল।

কুমারসম্ভবে শিবের শিবত্ব অক্ষুণ্ণ। কালিদাস মহান্ সৌন্দর্য্যের কবি, গভীর ভাবের কবি, সরস মধুরতার কবি। শিবের কোমল-কঠোর চরিত্রসৌন্দর্য্য তিনিই ধরিতে পারেন। তাই তাঁহার কাব্যে কোথাও চরিত্রব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। তাঁহার শিবের চরিত্র সংলগ্ন এবং সঙ্গত। প্রেমে সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মাদের মত সমস্ত পৃথিবী যিনি ভ্রমণ করিতে পারেন, সতীর সহিত গার্হস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর তপস্যায় দীর্ঘ যৌবন যাপন করেন, মদনের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিতে না পারিলেও মুহূর্ত্তে আত্মহারা হইবার মত চরিত্র তাঁহার নহে। কালিদাসের শিব টলমল মনকে সংযত করিয়া সামলাইয়া লয়েন।

কিন্তু পার্ব্বতীতে শিবের মন টানিয়াছে। যতই সংযমচেষ্টা করুন আর যাহাই করুন, নগেন্দ্রনন্দিনীর রূপ তাঁহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে এখনও চাই কি শিব যোগে ফিরিতে পারেন। পার্ব্বতী অহরহ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য ধ্রুব, সঙ্কল্প স্থির, চিত্ত একাগ্র। শিবের সহধর্ম্মিণী না হইলে তাঁহার জীবনে আর কোনও সুখ নাই। তিনি সহধর্ম্মিণীরূপে চিরদিন শিবের সেবা করিবার অধিকার চাহেন। তাই এই কঠোর সাধনা।

শিবের মন গলিল। ব্রাহ্মণবেশে তিনি একদিন তপস্বিনীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শিবের যে একটু-আধটু নিন্দা না করিলেন, এমন বলা যায় না। ব্রাহ্মণ বলিলেন, শিব শ্মশানচারী, ভস্ম মাখিয়া থাকে, খেয়াল অনুসারে চলে, এমন রূপসীর পাণিগ্রহণের যোগ্য নহে। গৌরীর এ কথাগুলি তেমন ভাল লাগিল না। একটু তীব্র ভাষায় বেশ গুছাইয়া দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। কালিদাস উমার মুখ দিয়া শিবের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শিব-চরিত্রের কৈফিয়ৎ অনেকটা দেওয়া হইয়াছে। আর ঐশ্বরিক ভাবের সহিত মানবভাবের সম্মিশ্রণে শিব ফুটিয়াছেনও ভাল। উমা বলিলেন,

"বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূমি সমুৎসুকেন বা।

জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ ॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং
ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্ ॥
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা
বিনিদ্রমন্দাররজোঽরুণাঙ্গুলী ॥"

শিবের এ সকল আবশ্যক কি? তিনি সকল অবস্থাতেই শিব। শ্মশানবাসী দরিদ্র হইয়াও তিনি ত্রিলোকনাথ, ভীমরূপ হইয়াও সৌম্যমূর্ত্তি, সাজসজ্জা করুন বা না করুন, তাঁহার শিবত্বের এক তিল ব্যতিক্রম ঘটে না। দেবতারা তাঁহার অঙ্গচ্যুত চিতাভস্ম স্পর্শে সম্মানিত জ্ঞান করেন, ইন্দ্রও দূর হইতে বৃষারূঢ়কে দেখিলে ঐরাবত হইতে অবতরণ করিয়া চরণে শিরস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

উমার মুখে শিবের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া শিব সবিশেষ প্রীত হইলেন। ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। কালিদাস এই অবস্থায় সলজ্জ সম্ভ্রমে উমার কোমলতা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতি কোথাও ঝাঁঝাল নহে।

ইহার পর শিবের বিবাহ। গান্ধর্ব্ব বিধি অনুসারে নহে; যথারীতি হিমালয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন, দেব ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ সভায় উপস্থিত, অনুষ্ঠানের কিছু ত্রুটি নাই। শিবের বেশভূষা শিবেরই মত—চিতাভস্ম, বাঘছাল, ফণাজাল, সকলই আছে। কিন্তু কালিদাস ভারতচন্দ্রের মত শিবকে অসংযতবসন অতিরিক্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া

হাস্যরসাবতরণচেষ্টায় মাটি করেন নাই। গাম্ভীর্য্যে শিবচরিত্র অটল অচল। শ্লীলতা ভঙ্গ করিয়া শিবের বর্ণনায় লঘু হাস্য আকর্ষণ চেষ্টা নিতান্তই কবি-অযোগ্য !

বিবাহেই কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য সমাপ্ত--এ গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং শিবচরিত্র কালিদাসের রচনা হইতে সম্পূর্ণ বুঝা যায় না। কিন্তু তাহার তেমন আবশ্যকও নাই। পুরাণাদি হইতে শিব সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তবে অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র তাঁহাকে যেখানে মারিয়াছেন, কালিদাস সেইখানেই কিরূপে মহত্ত্বে গাম্ভীর্য্যে সংযমে শিবের সমুন্নত আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্যই কুমারসম্ভবের শিবের উল্লেখ আবশ্যক। আর মানবভাবে শিবের প্রতি সহানুভূতিও আমাদের অধিক এইখানে।

এখন হরগৌরীর মিলনে আমাদের গার্হস্থ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেম আছে, স্নেহ আছে, সখ্য আছে, কিন্তু কিসের অভাবে গার্হস্থ্য এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পারিবারিকতার মধ্যেও সেখানে কেমন শিথিল ঔদাস্য অনুভব হয়। শৈব সাহিত্যে বৈরাগ্যের অন্তরে গার্হস্থ্যের প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণব সাহিত্যে বোধ করি গার্হস্থ্যের মধ্যেও শিথিলতা। তাই হয় ত দাম্পত্য-বন্ধন সেখানে নাই, অথচ প্রেমের সম্বন্ধ গাঢ় এবং ঘনিষ্ঠ। শিব-সহধর্ম্মিণী শিবের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কন্যা হইতে মাতৃভাবে বিকশিত হইয়া তাঁহার মধ্যে গার্হস্থ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে হৃদয়ের বিকাশ এরূপ ভাবে দেখান হয় নাই। স্বতন্ত্র চরিত্রে স্বতন্ত্র ভাবমাধুরীটুকু যথাসাধ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই কারণে বৈষ্ণব সাহিত্য গীতিকাব্যপ্রধান। শৈব ভাবে গীতিকাব্য অপেক্ষা মহাকাব্য রচনার যেন সুবিধা অধিক।

বৈষ্ণব গার্হস্থ্যে কেবলই মাধুরী কি না। মাধুরী লইয়াই বৈষ্ণব কাব্য। কিন্তু গার্হস্থ্যের একদিকে ক্ষমতারও আভাস পাওয়া যায়। শৈব গার্হস্থ্যে ইহা কতকটা থাকিলেও থাকিতে পারে। শিবেরই ত অন্নপূর্ণা। বৈষ্ণব ভাব কিছু তরল। শৈব ভাবে বন্ধন দৃঢ়। ইহাতে সমাজ-সংস্রব আছে। কিন্তু শক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে এ সমাজ-সংস্রব টিঁকে না। শক্তির সহিত শিবের সম্বন্ধ সকল অবস্থায় না হইলেও অনেক অবস্থায় এমনি জড়িত যে, উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। তথাপি শাক্ত এবং শৈব ভাবে অনেক প্রভেদও আছে। কিন্তু তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এখন বৈষ্ণব স্বাধীনতায় শৈব সংযম, বৈষ্ণব প্রেমে শৈব বল, বৈষ্ণব মাধুর্য্যে শৈব গাম্ভীর্য্য মিশিতে পারিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

'ভারতী ও বালক', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮

ঋতুসংহার

ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম রচনা—প্রথম রচনারই মত দোষে গুণে জড়িত ; কাঁচা লেখায় এবং সরস বর্ণনায় তাহার পরিচয়। রচনায় এখনও সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ হয় নাই, সবে মাত্র অল্পদিন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সকল সময়ে ছায়া আলোকের মৃদু স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র ফুটাইতে পারেন না ; কিন্তু কবির প্রতিভা আছে, সৌন্দর্য্য তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায় না, ছায়ালোকসন্নিবেশে আভাসে সমস্ত ব্যক্ত না করিলেও যথাযথ সূক্ষ্ম বর্ণনায় সুনিপুণভাবে তিনি চিত্রটিকে খাড়া কারয়া তুলেন। মৃদুস্পর্শ আভাস ইঙ্গিতও যে না থাকে এমনও নহে, যতই অল্প হোক, শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় ইহা থাকিবেই। ঋতুসংহাবেও আছে। প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া তিনি ঋতুর পর ঋতু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—যথাসম্ভব স্পষ্ট, সরল এবং অনেক স্থলে কেবলমাত্র যাহা সহজে চোখে পড়ে, এইরূপ বাহিরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা। কিন্তু ইহারও মধ্যে প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের সুসম্বদ্ধ ঐক্য বিশ্লেষণে তুলিকার অবহেল মৃদু স্পর্শে স্পষ্ট চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইয়াও আমাদের মনে বিবিধ সুসঙ্গত ভাবের উদ্রেক করিয়া দেন।

ইহাতেই কালিদাসের কবিত্ব। শুধু কালিদাসের বলিয়া নহে, সকল শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় ভাবপরম্পরায় পাঠকের মনে একটি সুশৃঙ্খল কাব্য রচিত হয়। কেবলি যথাদৃষ্ট বর্ণনা কবিতা নহে। ভাবে ভাবের উদ্রেক করে। কালিদাস যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ কিছুই নহে—এই গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্য্য, পরুষ পবনবেগ, বরাহ মহিষ প্রভৃতি বিবিধ বন্য জীবজন্তুর ক্লান্তিভাব, দাবানল, আর আদিরসে প্রবাসী, বিরহী বা স-সখীর মনানল ; বর্ষায় বজ্র বিদ্যুৎ মেঘ, বিরহিণীর বিজন বিলাপ, দুই চারিটা কেতকী কদম্বের নীরব কাহিনী ; না হয় বসন্তে মলয়পবন, কোকিলকূজন, বড় জোর নবযৌবনা প্রিয়তমার সুখের কথা এবং কুসুমশরের উল্লেখে গোটাকতক ফুলের নাম ;—কিন্তু সাধারণ কথা হইলেও প্রত্যেক ঋতুর অন্তরের ভাব ফুটিয়াছে, কেবলি তাপে, বৃষ্টিতে বা নবকুসুমিত সহকারে বর্ণনা অবসিত হয় নাই। কালিদাস সহজ ভাবকে যথাযোগ্য সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি ঋতুসংহারের লেখা কাঁচা—কুমারসম্ভবে বা মেঘদূতে ভাষার যেরূপ পরিপাটি বাঁধুনি, সেরূপ নহে। তবে এ লেখাও কালিদাসেরই পক্ষে কাঁচা। এবং সেই জন্যই বোধ করি, কাঁচা হইলেও ইহাতে যে কাব্যরস আছে, অন্যত্র তাহা দুর্ল্লভ। অন্যান্য অনেক কবির মত অলঙ্কারপ্রাচুর্য্যে, কৌশলময় শ্লেষে, এবং পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তিতে

পাঠকের মনে বলপূর্ব্বক ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা নাই। তাই নবীন অবস্থাতেই কালিদাসের বর্ণনা এমন সরস এবং সত্য। এবং গভীরতায় পরে রচিত গ্রন্থগুলির সমকক্ষ না হইলেও ঋতুসংহারেই উদীয়মান কবির অসাধারণ প্রতিভার প্রথম পরিচয়।

তবে বর্ণনার মধ্যে মধ্যে এমন কথাও অবশ্য আছে, যাহা না বলিলেও হয় ত চলিত। অর্থাৎ সে সকল কথার উল্লেখ না করিলে ঋতুবর্ণনার যে বিশেষ ত্রুটি হইত, এমন বলা যায় না। কিন্তু অতি সংক্ষেপে যাহা না বলিলে নয়, তাহাই বলিয়া এক একটি ঋতুর চিত্র খাড়া করিয়া তোলা কালিদাসের উদ্দেশ্য নহে। শকুন্তলায় ইহাই কর্ত্তব্য বটে; কারণ, বর্ণনা সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আনুষঙ্গিক মাত্র। কিন্তু ঋতুসংহারের মত বর্ণনাকাব্যে দুই ছত্র অধিক বর্ণনা অসঙ্গত বলা সাজে না। আর প্রথম রচনায় বর্ণনার দিকে লোকের একটু ঝোঁক থাকেও।

কালিদাসের সকল কাব্যেই অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণনার কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। কিন্তু ঋতুসংহারের সহিত তাহার একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। ঋতুসংহারে কালিদাস মধুপের মত ছয় ঋতুর অন্তরে বসিয়া কেবলি আদিরসে মধুপান করিয়াছেন। বাহিরের জনকোলাহল, জীবন মরণ, সুখ দুঃখ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। জগৎ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, এই ফুলের উপর বসিয়াই। আর মহাকাব্যের বর্ণনা স্বতন্ত্র। ভ্রমর চাক ছাড়িয়া আকাশে বাহির হইয়াছে; নিম্নে ধরণীর যৌবনবিস্তার, জনকোলাহল, জন্ম মৃত্যু। দূর হইতে ভ্রমর এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে গান গাহে, তাহাতেই মহাকাব্য রচিত হয়।

কিন্তু মেঘদূতের সহিত ঋতুসংহারের তাহা হইলে প্রভেদ কোথায়? মেঘদূতও ত আদিরসপ্রধান খণ্ডকাব্য। আর সমস্তটাই বর্ণনাও বটে। কিন্তু প্রভেদ আছে। মেঘদূতে মানবহৃদয়েরই প্রাধান্য। কালিদাস বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া বর্ষার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। ঋতুসংহারে বাহ্য জগতেরই প্রাধান্য। বহিঃপ্রকৃতির অন্তরে বসিয়া কালিদাস মানবহৃদয় অনুভব করিয়াছেন। এই জন্য হৃদয়ও এখানে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। মেঘদূতে মৃদু স্পর্শে অনেকটা ভাব ফুটাইয়া তোলা হয়। বর্ণনা সেখানে বিরহের অধীন। গীতিকাব্যের সহিত বর্ণনা-কাব্যের এই প্রভেদ।

ঋতুসংহার আদিরসে ছয় ঋতুর ছয়টি নাতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আদিরস বৈ অন্য রস এখানে ফুটিবার কথাও নয়। বীর, করুণ বা অন্য রস ঘটনাবৈচিত্র্য অবলম্বন না করিয়া বড় স্ফূর্ত্তি পায় না। বর্ণনা কতকটা প্রকৃতির, কতকটা মানবের, কতকট সমস্ত জীবজগতের। প্রকৃতিকে কালিদাস দুই ভাবে দেখিয়াছেন—কোথাও অনেকটা

জড়ভাবে, অন্যত্র চেতনধর্ম্ম আরোপ করিয়া স্ত্রীরূপে। প্রকৃতির প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম। শকুন্তলায় পাঠকেরা তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য কবিদিগের মত আমাদের কবিরা জানিয়া শুনিয়া প্রকৃতিকে ভালবাসেন না। সেই জন্য প্রকৃতিকে ভালবাসি, এমন কথা তাঁহাদের মুখে শুনা যায় না, কাব্যের প্রতি ছত্রে ভালবাসা ব্যক্ত হয়। এবং এই অজানা অনুরাগেই আমাদের কাব্যে প্রকৃতির অন্তরে চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা।

ঋতুসংহারেও তাহাই। তাই মানবহৃদয়ের উপর এই প্রকৃতির প্রভাব। কালিদাস প্রতি ঋতুতে আমাদের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন। আর তাঁহার বর্ণনা বিলাসে ভরপূর। তাহাতে সে সমাজের বিলাসিতার ছায়া পড়িয়াছে। পাঠকেরা ঋতুসংহারের বর্ণনায় সর্ব্বত্রই তাহার পরিচয় পাইবেন। চাই কি, পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন।

ঋতুসংহারের সর্ব্বপ্রথমে গ্রীষ্মবর্ণনা। প্রচণ্ডসূর্য্য স্পৃহণীয়চন্দ্রমা দিনান্তরম্য নিদাঘকাল আসিয়াছে, তাই কবি প্রিয়জনকে সম্বোধন করিয়া তাহারই কথা বলিতেছেন। এ দারুণ গ্রীষ্মে আর কিছুই ভাল লাগে না; কেবলই সুশীতল জল, সুবাসিত মনোরম হর্ম্ম্যতল, আর প্রিয়জনের মুখচন্দ্র ত আছেই—কারণ, জল এবং হর্ম্ম্যতল অপেক্ষা তাহা শতগুণে স্নিগ্ধ ও মধুর। প্রিয়জনেরাও এ দারুণ গ্রীষ্ম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন—গরমে মোটা কাপড় গায়ে রাখিতে পারেন না, যথোচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করেন, এবং ইহাতে অলঙ্কারের শোভা বিস্তারেরও অনেকটা সহায়তা করে। অলঙ্কার এমন কিছু নয়, নূপুরটি মেখলাটি, দুইগাছি বলয়-কঙ্কণ, আর এটি সেটি; সে কালের যেমন ফেসান ছিল, ইহার উপর একছড়া করিয়া হার, বড় জোর বেল বকুলের মালা—মালিনীর যখন যেরূপ অনুগ্রহ হয়। কালিদাসের হাতে বলিয়া আমরা তবু অনেক অলঙ্কারের নাম হইতে বঞ্চিত হইয়াছি—তিনি তাদৃশ অলঙ্কারবাহুল্যপ্রিয় নহেন—নহিলে হয় ত এই গ্রীষ্মবর্ণনা মন্থন করিয়া প্রাচীন কালের বিবিধ গুরুভার অলঙ্কার সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর সগর্ব্ব জ্ঞান লাভ হইত। কালিদাস অলঙ্কারকুলের মধ্য হারযষ্টিকেই একটু প্রাধান্য দিয়াছেন। আর তাঁহার নজর ছিল, কোমলাঙ্গিনীদের অলক্তকরঞ্জিত দুইখানি বিকশিত শ্রীচরণকমলে। চন্দনের সৌরভেও তাঁহার কিছু টান দেখা যায়।

এই গেল সাজসজ্জার উপকরণ। রূপও বড় কম নয়। চন্দ্রমা সারা নিশি সুন্দরীদের সুখসুপ্ত মুখগুলি দেখিয়া নিশাক্ষয়ে লজ্জায় পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হয়েন। ঋতুসংহারের সুন্দরীদের এই প্রধান সৌন্দর্য্যবর্ণনা। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ আদিরসোদ্দীপক—

অন্ততঃ সে রূপ আদিরসের নায়িকাদিগেরই উপযোগী। কালিদাস দুইরূপ রমণীর বর্ণনা করিয়াছেন—কামিনী এবং বিরহিণী। প্রথমোক্ত সুন্দরীদেরই বেশভূষার পারিপাট্য। শেষোক্তেরা কৃশা মলিনা, অন্তরেও সুখ নাই, বাহিরেও বেশবাহুল্য নাই। কোনও প্রকারে পথ চাহিয়া দিন কাটান মাত্র। গ্রীষ্ম তবু ভাল, বর্ষা আসিলে ইঁহাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

রূপসীদের ত এই অবস্থা। কিন্তু রূপসী ভিন্ন আরও অনেক সৃষ্ট পদার্থের উপর গ্রীষ্মের প্রখর প্রভাব দেখা যায়। ফণী ময়ূরের পদতলে পড়িয়া থাকে, ময়ূর কিছু বলে না; ভেকেরা ফণাতপত্রের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, নাগিনী দংশন করে না; বরাহেরা উত্তাপে ম্রিয়মাণ, গর্ত্ত খনন করিয়া কর্দ্দমের উপরে বসিয়া থাকে; সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত—উদ্যম আর নাই। পরুষ পবনবেগে চারি দিকে ধূলি আর শুষ্ক পত্র উড়িতেছে। বনে দাবানল, দেহে ক্লান্তি, মনে চাঞ্চল্য। এত কষ্টেও তবু একটু সুখ আছে—নিদাঘের সন্ধ্যা মলয় জ্যোৎস্না। তাই কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুললিত সঙ্গীতে সুন্দরী প্রেয়সীর সহিত সুখে তোমরা নিশি যাপন কর।

কিন্তু চিরদিন এইরূপ ভাবে কাটিবে না। দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত। কালিদাস বর্ষার খুব গম্ভীর বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ষা রাজার মত—সৈন্য সামন্ত, হয় হস্তী, বিদ্যুৎ অশনি লইয়া খুব ঘটা করিয়া আসে। ধরণী বর্ষাগমে শুক্লেতররত্নভূষিতা হইয়া বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিরহের ভাব এই সময়ে বড় প্রবল। তাই নদী পূর্ণযৌবনে প্রবলবেগে সিন্ধু পানে ছুটিয়াছে; অভিসারিকা বজ্রবিদ্যুতের মধ্য দিয়া একাকিনী প্রিয়সন্দর্শনে চলিয়াছেন;—প্রাণের টানে বিপদ্‌ভয় আর কে মানে? কেবলি বিরহিণীর অন্তরে একেবারে নৈরাশ্য। অহর্নিশি ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্, যতই বৃষ্টি পড়িতে থাকে, সেই প্রবাসক্লিষ্টের জন্য বিরহিণীর মন উদ্বিগ্ন হয়।

কিন্তু বিরহের কথা এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কালিদাসের মত বিরহের কবি পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মেঘদূতেই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। ঋতুসংহারেও তিনি বিরহের যেখানেই উল্লেখ করিয়াছেন, কবিত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বর্ষা কালিদাসের বিশেষ প্রিয়। বর্ষার কবি তাঁহার সমকক্ষ পৃথিবীতে নাই। কেবলই যে বিরহের জন্য, এমন বলা যায় না। কিন্তু যে জন্যই হৌক্ তাঁহার বর্ষাবর্ণনা বড় সুন্দর। ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণনাতেই কালিদাসকে সর্ব্বাপেক্ষা ধরা যায়। ময়ূর ময়ূরীর নৃত্যে, ভেককুলের অবিরাম কণ্ঠধ্বনিতে, কদম্বসৌরভে, মেঘাচ্ছন্ন গগনতলে গম্ভীর গর্জ্জনে তাঁহার বর্ষা ফুটিয়াছে। অন্তরে বাহিরে, মানবহৃদয়ে প্রকৃতিতে তাহার প্রভাব। শেষ আশীর্ব্বাদশ্লোকে তাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত।

"বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণহেতু-
র্দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি ॥"

পাঠকেরা এ বর্ষার সহিত মেঘদূতের বর্ষা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

বর্ষার পরে শরৎ, এবং তাহার পর হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত বর্ণনা। বর্ষার মত জমাট ঋতুও নাই, এরূপ জমাট বর্ণনাও হয় না। কিন্তু শরতে হেমন্তে শিশিরে বসন্তেও কালিদাসের কবিত্বের ত্রুটি হয় নাই, এবং আগাগোড়া সমস্তই আদিরসে সমান চলিয়াছে। শরতের বর্ণনার প্রথমেই কালিদাসের সূক্ষ্ম বর্ণজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বর্ণজ্ঞান নহে, ভাব হৃদয়ঙ্গমে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। শরৎকে দেখিয়াই তাহার নববধূভাবে কালিদাস মুগ্ধ। দুইটি মাত্র কথায় তিনি শরতের যথাসম্ভব সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন—"কাশাংশুকাবিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা" আর "আপক্কশালি-ললিতাতনুগাত্রযষ্টিঃ"। ক্রমে অনেক বর্ণনাও আছে—শরতের নির্ম্মল আকাশ, সুধাবর্ষী চন্দ্র, স্নিগ্ধ বায়ু, অঙ্গনাগণের মনোভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। কালিদাস যে দেখিয়া লিখিয়াছেন, পরের মুখে শুনিয়া লিখেন নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ত্রীরূপে যেখানে যেখানে তিনি শরতের বর্ণনা করিয়াছেন, খুঁজিয়া দেখিলেই পাঠকেরা তাহার বিস্তর পরিচয় পাইবেন। আমরা শরৎরজনীর বর্ণনা হইতে অমনি দুই চরণ উঠাইয়া দিই, পাঠকেরা কালিদাসের বর্ণনারও পরিচয় গ্রহণ করুন।

"জ্যোৎস্নাদুকূলমমলং রজনী দধানা
বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা ॥"

এ বর্ণনা আপাততঃ আমাদের নিকট তেমন আশ্চর্য্য ঠেকে না, কিন্তু ইহারই মধ্যে কবির নিখুঁৎ হিসাব দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অন্য কবি হইলে শেষ চরণটি তাঁহার মাথায় আসিত কি না সন্দেহ। কিন্তু কালিদাসের এই এক প্রধান গুণ যে, প্রতি সামান্য খুঁটিনাটিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না।

হেমন্ত এবং শিশিরবর্ণনা কালিদাস কিছু সংক্ষেপে সারিয়াছেন। সংক্ষেপ বটে, কিন্তু নিতান্ত একেবারে দুই কথায় নয়। সর্ব্বশুদ্ধ তবুও গুটি পঁয়ত্রিশ শ্লোক হইবে। কালিদাসের এ সময়ের বর্ণনা আমাদের বাঙ্গালা দেশে বড় খাটে না। কারণ, আমাদের ত আর তুষারের সম্পর্ক নাই। শিশির-বর্ণনায় মদ্যপানেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর যেরূপ সব বর্ণনা, তাহাতে সে কালের বিলাসিতার চূড়ান্ত পরিচয়। কালিদাস সহরের লোক, চিরদিন রাজসভায় তাঁহার দিন কাটে, এ সকল বিলাসিতা ত তাঁহার চক্ষে

অষ্টপ্রহরই পড়িয়া থাকে। সুতরাং কাব্যেও স্থান না পাইয়া যায় না। উপযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের হাতে পড়িলে এই বর্ণনা মন্থন করিয়া সে সময়ের গৃহ, সাজসজ্জা, জাতির অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যও বাহির হইতে পারে। আমরা কেবলি দেখিতেছি, কালিদাসের কবিত্ব, প্রকৃতির প্রতি তাঁহার নিত্য অনুরাগ, এ ঋতু সে ঋতু নাই, সকল ঋতুতেই তিনি সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া মুগ্ধ। আমাদেরও তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া সেই অবস্থা। ক্রমাগত উদ্ধৃত করিতে সাহস হয় না, নহিলে অর্দ্ধেক বর্ণনা উঠাইয়া দিয়া পাঠকদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইতাম।

বসন্তবর্ণনাই কালিদাসের সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। বর্ণনার অনেক বিষয় পাইয়াছেন—জ্যোৎস্না, মলয়, কুসুম, কোকিল, মদন, ভ্রমর, যৌবন। বর্ণনাও তেমনি, বসন্তের তরঙ্গভঙ্গে, সৌরভে, রসে, মলয়ে, জ্যোৎস্নায় বাসন্তী ছন্দে বহিয়া গিয়াছে। জয়দেবের বাসন্তী ছন্দের মত ললিত অনুপ্রাসে কালিদাসের ছন্দ ভরিয়া উঠে না। তাঁহার ছন্দ, তাল লয় রক্ষা করিয়া সমধিক মধুর। কেবলি টানাটানা দীর্ঘচ্ছন্দ ললিত হইলেও এমন মধুর নহে। অথচ বসন্তের ছন্দ বর্ষার সহিত তুলনায় লঘু। কালিদাসের ছন্দে ভাবে কথায় এমন আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য অনুভব হয়। পরস্পরের মধ্যে কোথাও তিল মাত্র বিরোধ নাই। বসন্তের ছন্দ বসন্তের ভাবের মত লঘু এবং চারু। তাই প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া "সর্ব্বং চারুতরং বসন্তে"। এই চারু ভাবের মধ্যে কেবলি সুখ। বর্ষায় যেমন সুখী জনের অন্তরেও পূর্ণ সুখ উদয় হয় না, যতই সুখসম্ভোগ কর না কেন, তাহার মধ্যে দুঃখ কষ্ট থাকিবেই, বসন্তেও সেইরূপ দুঃখের মধ্যেও সুখের ভাব বিদ্যমান। সুখই বসন্তের সর্ব্বস্ব। তাই বসন্তে তোমাদিগের সুখকামনা করিয়া কবি ঋতুসংহারের উপসংহার করিয়াছেন। কবির কামনা সফল হৌক্ :—

"ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠকালঃ সুখায়।"

'সাধনা', অগ্রহায়ণ ১২৯৮

জানালার ধারে

বাগানের উপরেই আমার ঘর।

ছোটখাট ঘর, অল্পেতেই মনের মত করিয়া গুছাইয়া লওয়া যায়, বিশেষতঃ ঘরটি বাড়ীর এক কোণে, সহজেই মন বসে। আমি নিজের মনোমত এটি সেটি দিয়া ঘর সাজাইয়াছি, আস্‌বাব যৎসামান্য, পাঁচ জন ভদ্রলোককে হয় ত সাহসপূর্ব্বক এ ঘরে আহ্বান করা যায় না, কিন্তু আমি ইহাতেই বেশ সন্তুষ্ট।

ঘরের এক কোণে একটি কাচের আল্‌মারি, কতকগুলি বই সাজান, অপর পার্শ্বে একখানি পালঙ্ক, বিশেষ ক্লান্তি বোধ হইলে বই হাতে অর্দ্ধশয়ানভাবে শিথিল তনু তাহারই উপর ছড়াইয়া দিই, আর এক কোণে একটি ছোট্ট ডেস্ক, সম্মুখে কেদারায় বসিয়া আমি লিখি।

জানালা খোলা থাকে, প্রভাতের আলো আসে, মধ্যাহ্নের উত্তাপ আসে। সন্ধ্যাবেলা কোন কাজ করি না, এক এক দিন চুপিচাপি একেলাটি কেদারা হেলান দিয়া বসিয়া থাকি, আমার কোলের উপর অস্পষ্ট চন্দ্রালোক আসিয়া পড়ে।

কিন্তু আমার ঘরটি তত নিরিবিলি নয়। পথের ধারে না হইলেও জনকোলাহল এখানে যথেষ্ট আসে। আর নীচে বাগানের পথ দিয়া লোকজন সারা ক্ষণই আনাগোনা করে; হাসি, গল্প, কথাবার্ত্তা, রসিকতা, অনেকরকম শুনা যায়। লেখায় যখন সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে না পারি, সার্সী অর্দ্ধেক বন্ধ করিয়া দিয়া আমি এই কথাবার্ত্তা শুনি।

আমার জানালার সম্মুখেই অনতিদূরে একটি দালিমগাছ, লাল লাল ফুলে আপনার গোপন যৌবন ব্যক্ত করিয়াছে, তাহারই তলদেশে বাড়ীর চাকরেরা এক এক দিন বৈকালে জটলা করে।

আমার তাহাতে দুঃখ নাই। দিবসের শেষ ভাগে এরূপ লোকসমাগমে দৃশ্যের একটুকু বৈচিত্র্য সাধিত হয়। গাছপালা যতই দেখি, মানবের স্নেহপ্রেমের সহিত, সুখদুঃখের সহিত জড়িত না হইলে তাহার অর্দ্ধেক শ্রী ব্যর্থ।

গাছপালাও ত কত! এই দালিমগাছের সহিত চিরসখ্যে আবদ্ধ বাহুতে বাহু বেষ্টন করিয়া একটি পেয়ারাগাছ, আর-এক প্রান্তে একটি নাতিদীর্ঘ বিল্বতরু—ফলভারে অবনত। সহরের মধ্যে এক রত্তি ফাঁকা জমি আর একটুকু সবুজ রঙের সংস্পর্শ থাকিলেই লোকে বড় করিয়া বাগান বলে, আমিও তাই বলি। সকলের মতের বিরুদ্ধে কথা বলা আমার অভ্যাস নয়।

সন্ধ্যাবেলায় বাগানে কেহই থাকে না। গলির ওপাশে প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকার নিভৃত কক্ষে মিটিমিটি প্রদীপ জ্বলে। কম্পিত দীপালোকে ছায়ার মত কেবলি নিঃশব্দ আনাগোনা অনুভব হয়, কিন্তু জানালার ধারে বসিয়া কাহাকে ত দেখিতে পাই না।

যে দিন জ্যোৎস্না হয়, প্রস্ফুটিত দালিমপুষ্পের পেলব যৌবনের উপর দিয়া তরল রজতধারা পিছলিয়া যায়, কচি কিসলয়ে শুভ্র কিরণস্পর্শ শিশিরবিন্দুর মত ঝিকিমিকি করে, আর মলয়হিল্লোলে এই রজতবর্ণা তরল প্রেমধারা আমার জানালার কাছে আসিয়া, আমার কোলের উপর, মুখের উপর পড়িয়া এই বিমল নিশীথ-উৎসবের কথা বলে।

আমি কেবলি জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া দেখি, আর অনুভব করি। রজত-প্লাবিত নীল আকাশ, জ্যোৎস্নাবগুণ্ঠিতা নীল নিশীথিনী, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ব্যাপিয়া এক অনন্ত জ্যোৎস্নালোক, আমার এই ঘরে শুধু চঞ্চল আলোকবিস্তারের পার্শ্বে সুখসুপ্ত নিভৃত ছায়া।

সীমাহীন ছায়াহীন বাহিরের অগাধ রূপরাশি আমাকে বাহিরে টানে, গৃহ হইতে জগতে লইয়া যাইতে চায়, আমার গৃহকোণে এই নিভৃত মলিন ছায়া ম্লান নীরব কাতরতায় আমাকে বাঁধিয়া রাখে। আমি সংসারের সুখের মাঝে বাহির হই না, এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পার্শ্বে এমনি বসিয়া থাকি, মানবহৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করি।

'সাধনা', অগ্রহায়ণ ১২৯৮

রত্নাবলী

রচয়িতার নাম নিশ্চিত জানি না, গ্রন্থের নাম রত্নাবলী—সংস্কৃত ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটিকা, চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। একে ভাষা সংস্কৃত, তাহাতে নায়িকার নামে গ্রন্থের নাম, কোন্ রসের প্রাধান্য—পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আদিরসই মধ্যযুগের সংস্কৃত কবিদিগের প্রিয় অধিক। নাটকে, কাব্যে, সর্ব্বত্রই অন্যান্য রসের অপ্রাধান্য না হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যে এই রসের সমধিক আদর। রত্নাবলীতেও তাহাই। মদন-মহোৎসবে ইহার আরম্ভ, এবং প্রণয়ব্যাপারই ইহার আদ্যন্ত। নায়ক কৌশাম্বীর অধিপতি বৎসরাজ, নায়িকা সিংহলেশ্বরের দুহিতা রত্নাবলী, প্রথম দর্শনেই পরস্পর পরস্পরের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রণয়কাহিনী রত্নাবলী নাটিকার মেরুদণ্ড। ইহারই চারি পার্শ্বে ঘটনা এবং বিবিধ নূতন চরিত্র সংযোজনে আখ্যায়িকার বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। শুনা যায়, সোমদেবপ্রণীত বৃহৎকথা নামক গ্রন্থ হইতে এই রত্নাবলী উপাখ্যান সংগৃহীত। এবং কাশ্মীরের রাজা সুপণ্ডিত শ্রীহর্ষদেবই রত্নাবলীর রচয়িতা।

কিন্তু এইখানেই যত গোলযোগ এবং মতভেদ। শ্রীহর্ষদেবকে অনেকে নাকি রত্নাবলীর গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকার করেন না। মম্মট ভট্টের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহারা ধাবক নামক কবিকে উক্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা ঠাহরাইয়া থাকেন। বলেন—অর্থ দিয়া শ্রীহর্ষ গ্রন্থকারের নাম ক্রয় করিয়াছেন মাত্র, যশ অপযশের যথার্থ অধিকারী তিনি নহেন। বিরোধী পক্ষ রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লণ পণ্ডিতের কথা উদ্ধৃত করিয়া ইহার

প্রতিবাদ করেন। কহ্লণ পণ্ডিত নাকি তাঁহার গ্রন্থে শ্রীহর্ষকে সুপণ্ডিত এবং সৎকবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহর্ষের পক্ষে রত্নাবলীরচনা একেবারে আশ্চর্য্য কিছুই নহে। রাজা হইলে যে কবি হইতে পারে না, এমন ত কোনও নিয়ম নাই। তবে অর্থদানে গ্রন্থকার নাম ক্রয় করাও সে কালে শুনা যায় বটে। শুধু সে কালেই বা কেন, এখনও ত সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও অনেকে কেবলমাত্র অর্থবলে নির্ভুল সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন। শ্রীহর্ষদেব তবু গুণী এবং গুণগ্রাহী বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু এ সমস্যা মীমাংসায় আমাদের আবশ্যক নাই। আমরা শ্রীহর্ষকে রত্নাবলীর গ্রন্থকার জানিয়াই পরিতৃপ্ত। আপাততঃ গ্রন্থ লইয়াই কথা, গ্রন্থকারের নাম ধাম কুল শীল সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ব মন্থন করিয়া অমৃত অথবা বিবাদের বিষ উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য এবং সাধ্যবহির্ভূত। আমরা জানি, যাঁহারই রচনা হোক্, রত্নাবলী একখানি সংস্কৃত অলঙ্কার-সম্মত নাটিকা—চারিটির অধিক অঙ্ক নাই, স্ত্রীচরিত্রের কিছু বাহুল্য, নায়কটি ধীরললিত, নায়িকা নবানুরাগা নৃপবংশজা। নায়ক অপেক্ষা মহিষীর কিছু যেন প্রতাপও অধিক—রাজা মহিষীর ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটিকার প্রধান লক্ষণ এই। রত্নাবলীতে এ সকল লক্ষণের কোথাও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। নায়ক বৎসরাজের উপর মহিষী বাসবদত্তার যথেষ্ট আধিপত্য, বাসবদত্তাও রাজকন্যা, সম্ভ্রান্তবংশীয়া, মহিষী হইবারই যোগ্যা, রত্নাবলীর সহিত আবার তাঁহার সম্পর্ক আছে, তবে অনেক দিন তিনি তাহা জানিতেন না বটে। তবে জানিলেও যে রত্নাবলীর তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইত, এমন বলাও যায় না।

রত্নাবলী নাটকের আখ্যায়িকাংশ বিশেষ জটিল নহে। সিংহলেশ্বর বৎসরাজপ্রেরিত মন্ত্রীর সহিত রত্নাবলীকে কৌশাম্বীতে প্রেরণ করেন—বৎসরাজের সহিত রত্নাবলীর বিবাহই তাঁহার উদ্দেশ্য। পথিমধ্যে সমুদ্রে যানভঙ্গ হয়, কিন্তু তাহাতে কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই। অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ রত্নাবলীকে রাজধানীতে লইয়া আসেন এবং মহিষী বাসবদত্তার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেন। রত্নাবলীর যথার্থ পরিচয় বাসবদত্তা জানেন না, তিনি তাহাকে অন্তঃপুরে স্বীয় পরিচারিকাদিগের মধ্যে রাখিয়াছেন—সহজেই একটু বিশেষ সাবধানেও রাখিয়াছেন যে, রাজার সুদৃষ্টিতে সে যেন না পড়ে। কিন্তু মহিষীর এত সতর্কতা বিফল হইল। রত্নাবলীর সহিত বৎসরাজের সাক্ষাৎও ঘটিল। পরস্পরের প্রতি অনুরাগও জন্মিল। মহিষী এ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন, রত্নাবলীকে গোপনে অবরুদ্ধ করিয়া রাজার চোখের আড়াল করিলেন। কিন্তু ঐন্দ্রজালিকের কৌশলবিদ্যায় সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল। উজ্জয়িনী হইতে

একজন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে। যৌগন্ধরায়ণ রত্নাবলী কোথায় আছেন জানিবার জন্য ঐন্দ্রজালিককে সমস্ত অন্তঃপুর কাল্পনিক অগ্নিতে প্রজ্বলিত করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে ঐন্দ্রজালিক সমস্ত অন্তঃপুর অগ্নিময় করিয়া ফেলে। তখন রত্নাবলী অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া মরিবে আশঙ্কা করিয়া বাসবদত্তা তাড়াতাড়ি তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন। রাজসভায় সিংহলের মন্ত্রী বসুভূতি উপস্থিত ছিলেন, রত্নাবলীকে চিনিয়া ফেলিলেন। যৌগন্ধরায়ণও রত্নাবলীর যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন বাসবদত্তাও শুনিলেন, রত্নাবলী তাঁহারই মাতুলকন্যা। এবং রত্নাবলীর সহিত স্বীয় স্বামীর বিবাহ দিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। রত্নাবলীকে রাজা ত বিবাহ করিবেনই। অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধনে বিলাসী রাজকুলের কি কখনও ক্রটি লক্ষিত হয়? কিন্তু বৎসরাজ যে মহিষীকে ভাল না বাসিতেন, এমনও নহে। তবে বর্ত্তমানে আমরা ভালবাসার মধ্যে যে গভীর একনিষ্ঠতা আশা করি, সে কালের রাজপরিবারে তাহা দেখা যায় না। বিশেষতঃ রত্নাবলী যে সময়ে রচিত, ভারতবর্ষের রাজকুলে বিলাসস্রোত তখন এমন প্রবলবেগে চলিয়াছে যে, চরিত্রের দৃঢ়তা ইহাতে রক্ষিত হয় না। আজ এ উৎসব, কাল সে উৎসব, প্রতি দিন নূতন নূতন বলহারী বিলাসের সহস্র উপায় উদ্ভাবন। প্রাচীন ভারতে অযোধ্যা ও হস্তিনাপুরের রাজসভায় জাঁকজমক খুব আছে, কিন্তু বিলাস এমন প্রবল নহে। প্রমাণে কি দাঁড়ায় জানি না, কিন্তু কালিদাসের সময়ে উজ্জয়িনীর রাজসভায় যে বিলাসের কথা শুনা যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন বলের চর্চ্চাও যথেষ্ট ছিল, পৌরুষিকতারও আদর ছিল। রত্নাবলী যে সময়ের গ্রন্থ, তখন মদনোৎসব বৈ আর বড় উৎসব নাই, নৃত্যগীতাদি বৈ অন্য আমোদের তেমন প্রাধান্য দেখা যায় না, কার্ম্মিষ্ঠতার স্থলে অলস বিলাসিতারই তখন একাধিপত্য। এই শ্রীহর্ষেরই সভা তাহার এক প্রধান আদর্শ। বিলাসিতার জন্য দেবমন্দিরের বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি হস্তপ্রসারণ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এবং শুনা যায়, এই কারণে নাকি তাঁহার প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এবং সেই বিদ্রোহেই তাঁহার ইহলীলা শেষ হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র কবিবিশেষের রচনা হইতে কিম্বা ইংরাজ লেখকের প্রবন্ধবিশেষের উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলা চলে না। কালিদাসের সময়ের সহিত রত্নাবলীর সময়ের কিরূপ প্রভেদ হইয়াছে না হইয়াছে, আমরা তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না।

তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আমাদের প্রাচীন অবস্থার যে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ বড় নাই। কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকে বলেন, অন্যান্য দেশের সভ্য বিলাসী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়াই প্রাচীন

সমাজের কঠোর গাম্ভীর্য্যের স্থলে লঘু শৈথিল্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নহিলে, পৃথিবীর বিলাসে আমাদের মতি কবে? ইহা যে না হইতে পারে, এমন অবশ্য নহে—বাস্তবিকই বিলাস আমাদের তেমন স্বাভাবিক নয়—কিন্তু তাই বলিয়া পার্থিব বিষয়ে আমাদের একেবারে অনাসক্তি স্বীকার করা যায় না। দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত অবসর পাইলে ব্যক্তিই কি, আর জাতিই কি, ক্রমে লঘুপ্রকৃতি, অলস এবং বিলাসী হইয়া উঠে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে আমাদের বৈরাগ্য অনেক সময় এই নিশ্চেষ্ট আলস্যেরই রূপান্তর। বৈরাগ্যের মধ্যে একটি কঠোর দৃঢ়তা আছে, তাহা পুরুষজনোচিত—যে বৈরাগ্যে ভীষ্ম আপনার সকল সুখকামনা বিসর্জ্জন দিয়া পরের জন্য চিরজীবন কাজ করিয়াছেন, যে বৈরাগ্যে মহর্ষি জনক নির্লিপ্তভাবে গুরুতর রাজকর্ত্তব্যভার বহন করিয়া গৃহী জনের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু এ সবল বৈরাগ্য অতি বিরল। সকল প্রকার উদ্যম এবং চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া নিস্পন্দ জড়-জীবন বহন করা অনেক সময় আমাদের বৈরাগ্যের অর্থ। সেই জন্য এ বৈরাগ্যফলও অবস্থাবিশেষে বিলাসিতায় পরিণত হইতে সময় লাগে না।

এমনও হইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের দারুণ কঠোরতার প্রতিক্রিয়ায় এ দেশে বিলাস এক সময় সহসা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বহুদিন বৈরাগ্যের প্রভাবে আমাদের অন্তরের অনেকগুলি বৃত্তি কেবলমাত্র চাপা থাকিয়া থাকিয়া অবশেষে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ বেগে সহস্র বিলাসে প্রমোদে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। এমন ত হইয়াই থাকে। পিউরিটান রাজত্বকালে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদ একপ্রকার বলপূর্ব্বক রহিত করা হইয়াছিল। ফলে, দ্বিতীয় চার্ল্‌সের রাজত্বে বিলাস উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, দুরাচার ভদ্রতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে সম্ভ্রান্ত পদবীতে উত্তীর্ণ করিল, গৃহে পরিবারে, অন্তরে বাহিরে দুর্নীতি এত দূর প্রশ্রয় পাইল যে, কুল রহিল না, শীল রহিল না, প্রেম বিনষ্ট হইল, পরিবার ভাঙ্গিতে লাগিল, এবং অবশেষে একদিন লণ্ডনের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে অভিশাপ এবং হাহাকার উঠিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিল।

রত্নাবলী যখন রচিত হইয়াছিল, সভ্যতা তখন কূলে কূলে। কলাবিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল। স্ত্রীকন্যাদিগকে এ সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। রত্নাবলীতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা চিত্রবিদ্যায় বেশ পারদর্শিনী। রত্নাবলী মদন-রূপে বৎসরাজের একখানি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছিলেন। এবং প্রিয়সখী সুসঙ্গতা তাহারই পার্শ্বে রতিরূপে রত্নাবলীর চিত্র আঁকিয়া দেন। তখনকার অবস্থার সহিত বর্ত্তমান য়ুরোপের কতকটা সাদৃশ্য অনুভব হয়। তবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে এ সকল বিদ্যার কত দূর

কি অনুশীলন হইয়াছিল বলা যায় না। রাজকুলের সহিত সাধারণের অনেক প্রভেদ। কিন্তু প্রভাব কিছু না কিছু পড়েই।

রত্নাবলী নাটকে সাধারণতঃ যে সকল স্ত্রীচরিত্র দেখা যায়, সকলগুলিকেই বেশ সুচতুরা এবং কলাবতী বলিয়া বোধ হয়। সবশুদ্ধ বোধ করি আট নয়টির অধিক স্ত্রীচরিত্র হইবে না—মদনিকা, চূতমালিকা, কাঞ্চনমালা, সুসঙ্গতা, নিপুণিকা, সাগরিকা প্রভৃতি বাসবদত্তার পরিচারিকাগণ, আর এদিক্ ওদিক্ দু একটি যদি হয়। সাগরিকাই রত্নাবলী—সাগর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া এই নাম।

পুরুষচরিত্রও বড় অধিক হইবে না—রাজা এবং বিদূষকই প্রধান, ইহা ভিন্ন যৌগন্ধরায়ণ, বিজয়বর্ম্মা, বসুভূতি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পাঁচ জন। পাঁচ জনকে বড় একটা দেখাও যায় না।

প্রথম অঙ্কের সর্ব্বপ্রথমেই যৌগন্ধরায়ণ একবার এক মুহূর্ত্ত দেখা দিয়াছেন। তাহার পর বসন্তোৎসববেশে রাজা এবং সঙ্গে বিদূষক। রাজা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন—রাজ্য নির্জ্জিতশত্রু, যোগ্য সচিবে সকল ভার ন্যস্ত, প্রজাদের কোনও উপদ্রব নাই; মদনোৎসবে তিনি অখণ্ড হৃদয়ে যোগ দিতে পারিয়াছেন। কৌশাম্বী রাজধানীতে আজ মহা আনন্দ—ধারাযন্ত্র হইতে জল পড়িতেছে, প্রাঙ্গণে পথে নরনারী বিচিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত, ইহার উপরে মধুমাসে মধুসখার প্রবল প্রতাপ, দক্ষিণ-পবনে, বকুল-সৌরভে যুবতীজনের বহু যত্নে পোষিত মান শিথিলীকৃত। মহিষী বাসবদত্তা প্রাসাদের প্রমোদ-উদ্যানে রাজাকে আসিবার জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছেন। সেখানে রক্তাশোক তরুমূলে মহিষী কুসুমায়ুধের পূজায় নিযুক্তা। সাগরিকা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি পরিচারিকা দু একজন নিকটে উপস্থিত —মাহিষী কখন কি আদেশ করেন! রাজা এখনই আসিবেন—অধিক বিলম্ব নাই।

মহিষীর সহসা মনে পড়িল যে, সাগরিকাকে আনিয়া তিনি ভাল করেন নাই, রাজার নয়নগোচর না হইলেই ভাল হয়। স্ত্রীবুদ্ধি এ বিষয়ে বড সতর্ক। অমনি একটা কাজের ছুতা করিয়া বাসবদত্তা সাগরিকাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। সাগরিকা সরিয়া গেল, কিন্তু অন্তঃপুরে নয়, অনতিদূরে বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দেখিতে লাগিল যে, তাহার পিত্রালয়ে যেরূপ ভাবে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, এখানেও ঠিক সেইরূপ হয় কি না। রাজা আসিলেন। আসিয়াই প্রিয়াঁকে যথোচিত সম্ভাষণ করিলেন। প্রিয়াও যথাযোগ্য সম্ভাষণে রাজাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। কাঞ্চনমালা পূজোপকরণ সমস্ত লইয়া আসিল। মহিষী কুসুমায়ুধকে পুষ্প চন্দন দান করিলেন। বৎসরাজ প্রিয়তমার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন—

প্রথমে লতার সহিত তুলনায় গঠনের, সেই সঙ্গে বিকশিত কান্তিরও, তাহার পর সেই অতি মৃদু কোমলতার, যে কোমলতার বারেক স্পর্শের জন্য অনঙ্গ আপনার অঙ্গ-হীনতায় অতিমাত্র কাতর।

মহিষীর আর আহ্লাদ ধরে না। রূপের প্রশংসায় কোন্ রমণীর অন্তর না উথলিয়া উঠে?—বিশেষতঃ প্রিয়জন যখন সেই রূপেই বাঁধা! তাই রূপের প্রশংসা শুনিয়া মহিষী বেশ হৃষ্টচিত্তে কুসুম এবং বিলেপন দিয়া স্বামীর পূজা করিলেন।

সাগরিকা অন্তরাল হইতে সকলই দেখিল। সে ত রাজাকে প্রথমে মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গদেব ঠাহরাইয়া বসিয়াছিল। তাই দূর হইতেই যথারীতি প্রণামাদি করে। তাহার পরে যখন রাজা বলিয়া বুঝিল, তখন—

“কহং অঅং সো রাআ উঅঅণো ণাম জস্স অহং তাদেণ দিন্না ; তা পরপ্পেসণদূসিদং বি মে সরীরং এদস্স দংসণেণ দাণিং বহুমদং সংবুত্তং।”

এই সেই রাজা উদয়ন, যাঁহার করে তাত আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁর দর্শনে আজ জীবন সার্থক।

বলা বাহুল্য, বৎসরাজেরই এক নাম উদয়ন। এবং ইহাঁর সহিত বিবাহের জন্যই সিংহলেশ্বর কন্যাকে কৌশাম্বীতে প্রেরণ করেন।

এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। নেপথ্যে বৈতালিক সন্ধ্যার বর্ণনা পাঠ আরম্ভ করিল। উদয়ন মহিষীর রূপের সহিত চন্দ্রের তুলনা করিয়া চন্দ্রকে ম্লান দেখিলেন। নির্ব্বিঘ্নে সকলের নিষ্ক্রামণে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কে সাগরিকা রাজা উদয়নের একখানি চিত্র আঁকিতেছেন। সারিকা-পিঞ্জরহস্তা সুসঙ্গতা আসিয়া দেখিয়া ফেলিল। সুসঙ্গতা জিজ্ঞাসা করিল, কাহার চিত্র? সাগরিকা উত্তর দিল, ভগবান্ অনঙ্গদেবের। কিন্তু সুসঙ্গতা দেখিল যে, এ অনঙ্গ বৎসরাজ বৈ আর কেহ নহে। তখন ধীরে ধীরে সাগরিকার হস্ত হইতে তুলিকা গ্রহণ করিয়া মদনের পার্শ্বে রতির চিত্র আঁকিয়া দিল। এ রতিও সাগরিকা বৈ আর কেহ নহে। তাহার পর দুই সখীতে অনেক কথাবার্ত্তা। ইতিমধ্যে অশ্ব-শালা হইতে এক বানর বাহির হইয়া সারিকার পিঞ্জর খুলিয়া দেয়। সারিকা উড়িয়া গেল। দূরে বিদূষকের সহিত রাজা আসিতেছেন। সারিকা বকুলবৃক্ষের শাখায় বসিয়া সখীদ্বয়ের কথাবার্ত্তা যেরূপ শুনিয়াছিল, আবৃত্তি করিতেছে। রাজা শুনিয়া অবাক্। ক্রমে কদলীগৃহে আসিতে সে চিত্রও তাঁহার হস্তগত হইল। সাগরিকার সহিত সাক্ষাৎও হইল। এমন সময়ে মহিষী আসিয়া উপস্থিত। বিদূষকের হস্তে চিত্রটি ছিল, তাড়াতাড়িতে তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। মহিষী ব্যাপার

বুঝিলেন। অসুস্থতার ভান করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজার স্ফূর্ত্তি অনেকটা নির্ব্বাপিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা এই। এবং ইহাতেই রাজার চরিত্র, সাগরিকার ভাব, সখীগণের অবস্থা, মহিষীর অধিকার, বিদূষকের বিদ্যাবুদ্ধি অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। রত্নাবলী নাটকের মদনোৎসব এবং কদলীগৃহ, এই দুই অঙ্ক আলোচনা করিয়া দেখিলে সে সময়ের অবস্থাও যে কতক কতক বুঝা না যায়, এমনও নহে। প্রথমতঃ সে কালের রাজচরিত্র। বৎসরাজকে আমরা অন্তঃপুর লইয়াই অধিক ব্যাপৃত দেখিতেছি। রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া তিনি বেশ নিশ্চিন্তমনে সুখে আছেন। অবশ্য, রাজ্য তাঁহার মন হইতে একেবারে দূর হয় নাই, কিন্তু রাজকর্ত্তব্য পালন অপেক্ষা অন্তঃপুরের কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার মন টানে। রামচন্দ্রের মত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ সবল পুরুষচরিত্র ত কৈ, ইদানীন্তন রাজকুলে বড় একটা দেখা যায় না। রত্নাবলীর উদয়নের সহিত তুলনা করিলে দুষ্মন্তকে অনেক উচ্চ আসন দিতে হয়। তাঁহার চরিত্রের এক দিকে এমন তেজ বল ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে যে, কোমল প্রণয়ব্যাপারে রাজভাব কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। রত্নাবলীতে বৎসরাজের ক্ষমতার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই।

মহিষীর এখানে প্রবল প্রতাপ না হইয়া যায় না। রাজা গোপনে গোপনে অপরার সহিত প্রেমালাপ করেন, কাজেই মহিষীকে একটু বিশেষ ভয় করিয়া চলিতে হয়। তৃতীয় অঙ্কে নানা ঘটনায় মহিষীর সমুন্নত তেজস্বিতা বেশ ফুটিয়াছে। রাজা সাগরিকার সহিত গোপনে দেখাশুনার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রমোদ-উদ্যানে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন—কখন্ রত্নাবলী আসিবে। কথা আছে, বিদূষক বসন্তকের সহিত বাসবদত্তাবেশে রত্নাবলী এবং কাঞ্চনমালাবেশে সুসঙ্গতা রাজার নিকটে আসিবেন। কিন্তু মহিষী পূর্ব্ব হইতেই সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া যথাসময়ে কাঞ্চনমালা সমভিব্যাহারে বিদূষকের সহিত প্রিয়সঙ্কেতস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদূষক এবং রাজা উভয়েই বাসবদত্তাকে বাসবদত্তাবেশে রত্নাবলী ঠাহরাইয়াছেন। তাই মহিষীর সমক্ষেই বসন্তক মহিষীর নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। পরিশেষে মহিষী যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, বৎস এবং বসন্তক পরস্পরের মুখ চাহাচাহি করিয়া অবাক্। তেজস্বিনী বাসবদত্তা মধুর ভাষায় বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহিষী বলিলেন, প্রথম সাগরিকামিলনে বাধা দিয়া তিনিই অপরাধিনী। রাজা মহিষীর চরণে নিপতিত হইলেন। মহিষী নিবারণ করিয়া কহিলেন,

"অজ্জউত্ত উট্ঠেহি উট্ঠেহি; নিল্লজ্জো কৃখু সো জণো জো অজ্জউত্তস্স ঈদিসং হিঅঅং জাণিঅ পুণোবি কুপ্যদি, তা সুহং চিট্ঠদু অজ্জউত্তো, অহং গমিস্সং।"

আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ; যে তোমার এইরূপ হৃদয় জানিয়াও পুনর্ব্বার কুপিত হয়, সে অতি নির্লজ্জ, তুমি সুখে থাক আমি যাইতেছি।

মহিষীর প্রত্যেক কথায় তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পতিব্রতা সকল অত্যাচার অবমাননা সহিতে পারেন, কিন্তু প্রেমের অপমানে তিনি ব্যথিত হয়েন। মহিষী রাজার অনুগ্রহভিখারিণী নহে, ক্রীড়ার সামগ্রী নহে, তিনি জানেন, বৎসরাজের তিনি অর্দ্ধাঙ্গ, ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সহভোগিনী। তাই আজ আপন প্রেমের অবমাননায় রাজারই অপমান জ্ঞানে বাসবদত্তা মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত। রত্নাবলী নাটকে বাসবদত্তার চরিত্রেই তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছে। পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী নহিলে এরূপ তেজ কোথায় মিলিবে? যখন পুনর্ব্বার সাগরিকার সহিত প্রেমালাপ-কালে রাজা মহিষীর নিকট ধরা পড়িলেন, কি তেজস্বিতার সহিতই বাসবদত্তা ব্যবহার করিয়াছেন! আর কেহ হইলে রাজার সম্মুখে তাঁহার নবপ্রণয়িনীকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে পারিত না। বাসবদত্তার উক্তিগুলি বাদসাদ না দিয়া এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রবন্ধ অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িলে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় আমাদিগকে নিবৃত্ত হইতে হইল।

রাজার চরিত্রে তৃতীয় অঙ্কে যত দূর অসংযম প্রকাশ পাইবার পাইয়াছে। প্রিয়তমা পত্নীতে তাঁহার মন উঠে না, নিত্য নূতন প্রণয়িনীসঙ্গই যেন তাঁহার অধিক প্রিয়। ঠিক এমনটি না বলিলেও তাঁহার ভাবে ইহাই প্রকাশ পায়। সাগরিকার নিকট এবং বাসবদত্তার নিকট তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

রাজচরিত্রের আর এক দিক্ চতুর্থ অঙ্কে ব্যক্ত হইয়াছে। এখন তিনি প্রণয়ী নহেন, অসংযতও নহেন, রাজরূপে কৌশাম্বীর সিংহাসনে বসিয়া অমাত্য সেনাপতি প্রভৃতির সহিত রাজকার্য্য আলোচনায় প্রবৃত্ত। তাঁহার সেনাপতি কোশলরাজ্য জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, রাজা তাহারই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছেন। কিন্তু এখানেও আমরা তাঁহার কার্য্যদক্ষতার তেমন কিছু পরিচয় পাই না। কালিদাস বিবিধ ক্ষুদ্র ঘটনায় দুষ্মন্তের রাজকার্য্যে অসাধারণ পটুতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীহর্ষ সেরূপ কিছু করেন নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন যে, এই ধীরললিত রাজারও রাজ্য আছে, অমাত্য আছে, সেনাপতি আছে, এবং এই অমাত্য এবং সেনাপতি কার্য্য-কুশল, সক্ষম। মোটের উপর, রাজরূপে আমরা রাজার পরিচয় পাই নাই বলিলেই চলে। সিংহলদেশ হইতে মন্ত্রী বসুভূতি আসিয়াছেন, রাজা তাঁহার যথোচিত সৎকার

করিলেন। উজ্জয়িনী হইতে যে ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে, সে রাজসভায় অনেক অনেক আশ্চর্য্য ঘটনায় আপন বিদ্যার পরিচয় দিয়া অবশেষে অন্তঃপুরে কাল্পনিক অগ্নির উদ্ভাবনপূর্ব্বক রত্নাবলীকে বাহির করাইয়া দিল। মহিষী সাগরিকার যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন। এখন হইতে রত্নাবলীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার বেশ সকরুণ। রাজাও উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বিক্রমবাহু সিংহলেশ্বর সমান ঘরে কন্যা দিয়া বহুমানিত; সসাগরা ধরিত্রীর প্রাপ্তির একমাত্র কারণ এই অবলারত্ন রত্নাবলীকে প্রাপ্ত হইলাম; কোশলরাজ্য অধিকৃত হইল; ভগিনীলাভে দেবী বাসবদত্তা প্রসন্না হইলেন; এ পৃথিবীতে স্পৃহণীয় আর কি আছে?"

রত্নাবলী নাটকের উপসংহার এই। এখন ইহাকে ট্র্যাজেডি বলিতে হয় বল, কমেডি বলিতে হয় বল, দুয়ের বাহির বলিলেও আমাদের তর্ক করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। রত্নাবলীর প্রণয়ব্যাপার আলোচনা করিলে জুলিয়েটের সহিত তাহার ভাবের কতকটা সাদৃশ্য অনুভব হয়। গলায় লতা বাঁধিয়া রত্নাবলী একবার মরিতেও গিয়াছিল বটে। তবে সংস্কৃত নাটক নাকি মিলনান্ত না হইলেই নয়, তাই এ দুর্ঘটনা আর ঘটিবার সুবিধা হইল না। কিন্তু সে জন্য যে রত্নাবলী ট্র্যাজেডি নয়, এমন বলা চলে না। পরিচারিকাবৎসলা বাসবদত্তা স্বামীর মঙ্গলোদ্দেশে রত্নাবলীকে যখন তাঁহার উত্তমার্দ্ধ করিয়া দিলেন, তখনই রত্নাবলীর ট্র্যাজেডি অভিনীত হইল। কিন্তু তাহা বাহিরে নয়, সাধ্বী পতিব্রতা বাসবদত্তার সহিষ্ণু হৃদয়ে। সুতরাং বাহিরের লোকেরা মহিষীর বাহিরে হাসিমুখ দেখিয়া তাহা ঠিক অনুভব করিতে পারিল না। কবি শান্তিবাচন করিলেন,

"উর্ব্বীমুদ্দামশস্যাং জনয়তু বিসৃজন্ বাসবো বৃষ্টিমিষ্টাম্
ইষ্টৈস্ত্রৈর্বিষ্টপানাং বিদধতু বিধিবৎ প্রীণনং বিপ্রমুখ্যাঃ।
সাকল্পান্তঞ্চ ভূয়াৎ সমুপচিতসুখঃ সঙ্গমঃ সজ্জনানাম্
নিঃশেষং যান্তু শান্তিং পিশুনজনগিরো দুর্জয়া বজ্রলেপাঃ॥"

'সাধনা', পৌষ ১২৯৮

দেয়ালের ছবি

দেয়াল ঢাকিয়া ছবি মারিয়াছি, বিচিত্র দৃশ্য গঠন ভাব গায়ে গায়ে পরস্পরের ছায়া আলোকে সম্যক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সরসীতীরে শ্যাম তরুচ্ছায়ে তৃণশয্যোপরি সুখসুপ্তা রমণী, শাখাপল্লবের মধ্য দিয়া নগ্ন বক্ষ এবং বাহুর উপরে শ্রান্ত জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। আলুথালু বসনপ্রান্তে অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু যৌবন চারু চন্দ্রালোকে মৃদু চঞ্চল। কোমল পদতল রজতধৌত শ্যাম শিলাখণ্ডের উপরে রক্ষিত।

দূরে জ্যোৎস্নাসিক্ত একখানি গ্রাম—অস্পষ্ট ধোঁয়া-ধোঁয়া গোলাঘর, কুটীর, বেড়া, প্রাঙ্গণে দীর্ঘ ছায়া-তরু, দেয়াল বাহিয়া লতা।

ইহারই পার্শ্বে তিনটি ভগিনীর চিত্র—তিনটি পাশ্চাত্য রূপসী। গ্রীসীয় প্রস্তর-মূর্ত্তির মত গঠন, কুঁদিয়া নির্ম্মাণ করা, নাসিকা সূক্ষ্ম সরল, অধর পরিপূর্ণ। নীল নয়নে উজ্জ্বল চাঞ্চল্য এবং সরলতা।

আর এক পার্শ্বে অর্দ্ধ-আলসে তরল রূপ বিস্তার করিয়া একাকিনী প্রাচ্য রূপসী। ঘন কৃষ্ণ কেশপাশ, চূর্ণ কুন্তল মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ভ্রূযুগ ধনুর মত—তুলিকার মৃদু কোমল স্পর্শে অঙ্কিত। স্নিগ্ধ গভীর মৃগনয়ন স্নিগ্ধ রূপে নীরবে জগৎকে আহ্বান করিতেছে। এ গঠন বনলতার মত—আঁটসাট পারিপাট্য নাই, কিন্তু চিত্তহারী।

মধ্যে কতকগুলি অন্য ছবি।

তুষারের উপর পড়িয়া রাখাল বালক, পার্শ্বে হিমক্লিষ্টমুখে বালিকা সহচরী বসিয়া—একাকিনী কোনও উপায় করিতে পারিতেছে না। বহু দূরে পর্ব্বতের উচ্চ শিখরদেশে এক এক বার আলোক দেখা যাইতেছে, বালিকা সেই দিকে চাহিয়া।

কোথাও বিজন প্রান্তরে শ্রান্ত শিকারী, নিকটে প্রভুভক্ত কুকুর সমস্ত দিনের বিফল পরিশ্রমের পর থাবা পাতিয়া বসিয়াছে। চারি দিকে আর কেহ নাই।

অন্যত্র বিচিত্র গার্হস্থ্য দৃশ্য। নবীন যৌবন নব প্রণয়িনীর সহিত গোপনে প্রেমালাপে রত। সন্ধ্যাবেলায় গৃহকোণে গল্প শুনিবার জন্য ছেলেরা প্রবীণাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। বৃদ্ধ দাদামহাশয় রুমালে চোখ বাঁধিয়া লুকাচুরি খেলিতেছেন, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আসিয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া পালাইতেছে।

দেয়ালের এক প্রান্তে একটি জাপানী ছবি—জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত জাপানী

রমণী। অন্যান্য ছবিগুলির সহিত ইহার আঁকিবার ধরণে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। ছায়া আলোকের খেলা তেমন নাই। সূক্ষ্ম রেখায় দুটি কৃষ্ণ ভ্রূ। একটি ভ্রূপ্রান্ত হইতে রেখা নামিয়া আসিয়া নাসিকা। সূক্ষ্ম কৃষ্ণ একটি রেখার নীচে লাল ফোঁটা দিয়া অধর। খোপায় খানিকটা কালো রঙ মাখান। রঙ্গিন কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে কালো রেখা টানিয়া দেওয়া।

এ দিক্ ও দিক্ অনেকগুলি ফরাসী ছবি—আবক্ষ সুন্দরী, বিবসনা যুবতী, নগ্ন যৌবন। গঠন এবং বিলাসই অধিকাংশ স্থলে ব্যক্ত হইয়াছে। যৌবন আপনাকে কোথাও সঙ্কুচিত করে নাই, প্রতি অঙ্গ যেমন করিয়া বিস্তার করিলে সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হয়, তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তার করিয়াছে।

নগ্নতাই যে সর্ব্বত্র বিলাসের কারণ, তাহা নহে। এক একটি নগ্ন প্রতিমূর্ত্তি হাবভাবচেষ্টাহীন সরল সম্ভ্রমে অটল দাঁড়াইয়া। পার্শ্বে হয় ত সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র বসনে ঢাকিয়া নয়নের কোণে অধরপ্রান্তে বিলাস মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অদূরে শিথিলবসনা সুন্দরী পূর্ণবিকশিত তনু ঢাকিবার ছলে যৌবনসন্নদ্ধ সুগোল গঠন ব্যক্ত করিতেছেন।

দেয়ালের ছবির মধ্যে গঠনপারিপাট্যের মত মুখশ্রী কিন্তু অল্পই দেখা যায়! বাহু, বক্ষ এবং সর্বাঙ্গ নানারূপে বিভিন্ন দিক্ হইতে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে অঙ্কিত হইয়াছে। পুরুষের দেহও দু একটি মধ্যে মধ্যে আছে—সবল, দৃঢ় এবং তরঙ্গায়িত। পেশীর সৌন্দর্য্যই তাহাতে সমধিক ফুটিয়াছে।

আর একটি করুণ চিত্র—ক্রুসবিদ্ধ স্বামীর নিকটে প্রিয়তমা প্রেয়সী শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছেন। গাধার মুখ ধরিয়া বালক দাঁড়াইয়া। গাধার উপরে উঠিয়া রমণী স্বামীর শেষ চুম্বন গ্রহণ করিতেছেন। অধরে অধর দৃঢ়সম্বদ্ধ।

এই ছবিগুলি দিয়া আমার মনের মধ্যে জগতের মায়াময়ী ছায়াপুরী রচনা করিয়াছি। বসিয়া বসিয়া দেখি, আর আমার মনের মধ্যে ইহারা জীবন্ত হইয়া উঠে, ছায়ার মত আসে যায়, বিচরণ করে। আমি ইহাদের সুখ দুঃখ বেদনার মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হই।

'সাধনা', পৌষ ১২৯৮

পাঁচ অঙ্কের নাটক বটে, কিন্তু নাটিকা রত্নাবলীর সহিত মালবিকাগ্নিমিত্রের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সম্পূর্ণ ঐক্য না হইলেও মূল আখ্যায়িকা এবং চরিত্রাংশে উভয় গ্রন্থের মধ্যে ঐক্যস্থল এত অধিক যে, সত্য হৌক্ বা না হৌক্, একের অনুকরণে অপরের স্ফূর্ত্তি বিশ্বাস করিতে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হয় না। বৎসরাজের মত অগ্নিমিত্রও ধীরললিত নায়ক, মালবিকার প্রেমে পাগল, মহিষীর ভয়ে কেবল প্রকাশ্যে দেখাশুনার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। প্রমোদ-উদ্যানে গোপনে দু এক বার দেখাসাক্ষাৎ ঘটিল যদি বা, মহিষীর কর্ণগোচর হইতেই তিনি মালবিকাকে অবরুদ্ধ করিলেন। বলা বাহুল্য, ছলে কৌশলে মালবিকা অবরোধ হইতে মুক্ত হইল, এবং সাগরিকার মত মহিষী কর্ত্তৃক একদিন রাজার বাম পার্শ্বে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিল।

যে প্রণয়ব্যাপার রত্নাবলী নাটিকার মূল ঘটনা, মালবিকাগ্নিমিত্রেরও তাহাই। মহিষীর বৃথা সতর্কতা, নায়ক নায়িকার অবস্থা, গোপনমিলন এবং তাহার ফলাফল, রাজার ভাবভঙ্গী, বিদূষকের কার্য্যাকার্য্য, শেষ অঙ্কে দুই চারিটা যুদ্ধজয়সংবাদ, রাজকর্ম্মচারিসমাগম এবং বাঞ্ছিতমিলনে উপসংহার উভয় গ্রন্থেই এক। তবে দু একটি চরিত্র হয় ত এ গ্রন্থে আছে, ও গ্রন্থে নাই বা বিভিন্ন কবির হস্তে ঘটনার ঈষৎ পরিবর্ত্তনে একটু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গল্পেরও পরিবর্তন এইরূপ। রত্নাবলীর পিতা বৎসরাজের সহিত বিবাহের জন্যই কন্যাকে কৌশাম্বীতে প্রেরণ করেন, পথিমধ্যে যানভঙ্গ হইয়া রত্নাবলীকে অনেক কষ্ট সহিতে হয়, পরিশেষে কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার পরিচারিকাপদলাভ। মালবিকার ভ্রাতা মাধবসেন ভগিনীকে অগ্নিমিত্রের করে সমর্পণ করিতে বিদিশায় আসিতেছেন, পথিমধ্যে পিতৃব্যপুত্র যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়েন; সচিব সুমতি গোপনে মালবিকাকে অবরোধমুক্ত করিয়া স্বীয় ভগিনী কৌশিকী সমভিব্যাহারে এক সার্থবাহের সহিত বিদিশাভিমুখে চলিলেন। অরণ্যপথে রাত্রি হইল, সুমতি দস্যুহস্তে নিহত হইলেন, ধন রত্ন আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া মালবিকাকে দস্যুগণ তৎপ্রদেশের দুর্গপাল বীরসেনের নিকট উপঢৌকন পাঠাইল, মূর্চ্ছাপন্না কৌশিকীকে মৃতা ঠাহরাইয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল। বীরসেন শিল্পনিপুণা দেখিয়া মালবিকাকে ভগিনী বিদিশারাজমহিষী ধারিণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন, মালবিকা ধারিণীর পরিচারিকা হইয়া থাকে।

এখানে ঘটনার প্রভেদের মধ্যে সমুদ্রে যানভঙ্গ, আর মানবহস্তে অন্যরূপ বিপদ্। পরেও তাহাই। রাজ-অন্তঃপুরে রত্নাবলীরও যে দশা, মালবিকারও সেইরূপ। তবে

ধারিণী আপন চিত্রশালার জন্য মালবিকার একখানি চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছেন, বাসবদত্তার এরূপ কোনও অনুষ্ঠান শুনা যায় না। কিন্তু এই চিত্রই মহিষীর কাল হইল। চিত্রশালায় রাজ্ঞীর পরিচারিকাগণমধ্যে মালবিকার চিত্র দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার চিত্র? দেবী কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। বালস্বভাববশতঃ কুমারী বসুলক্ষ্মী নাম বলিয়া ফেলিল—মালবিকা! সেই অবধি মালবিকাকে দেখিবার জন্য রাজা অধীর।

কিন্তু উপায় কি? বিদূষকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিদূষকই এ সকল বিষয়ে রাজাদিগের প্রধান সহায়। বিদূষক ব্রাহ্মণের সন্তান, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যহীন, চাটুবৃত্তি অবলম্বনে বিপুল উদরপুরণেই পটু। ভাঁড়ামি করিতে পারে, অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার আছে, পরিচারিকাদিগের সহিত হাসিয়া রসিকতা করে, মন রক্ষাই তাহার ব্যবসায়। ব্রাহ্মণের সে পূর্ব্বগৌরব আর নাই, সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত শ্রমসাধ্য অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়িয়া অনেকেই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং অলস অনেক কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সে কালের রাজকুলে এমন এক একটি নখদন্তহীন অক্ষম জীব পোষণ একটা ফেসান ছিল। ইহারা জাতিগুণে রাজার সখা, এবং নিজগুণে চাটুকার মোসাহেব। সম্মানও জাতি এবং গুণে মিশ্রিত—কতকটা ব্রাহ্মণের মত, কতকটা চাটুকারোপযোগী।

মালবিকার চিত্র দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং বিদূষককে মালবিকাকে রাজার নেত্রপথে উপস্থিত করিতে হইবে। কিছু দিন হইল, অন্তঃপুরে কৌশিকীনাম্নী একজন পরিব্রাজিকা আসিয়া জুটিয়াছেন, তিনি এখন রাণীর খুব প্রিয়পাত্রী, বিদূষক তাঁহারই সহিত পরামর্শ আঁটিয়া এক উপায় অবলম্বন করিল। গণদাস এবং হরদত্ত নামে রাজপরিবারের আশ্রয়ে দুই জন নাট্যাচার্য্য ছিলেন। মালবিকা রাজ্ঞীর আদেশানুসারে গণদাসের নিকট অভিনয়াদি শিক্ষা করে। বিদূষক নাট্যাচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিয়া মীমাংসার্থে উভয়কে রাজসমীপে লইয়া আসিল। সেখানে দেবীর সমক্ষে কৌশিকীর পরামর্শে স্থির হইল যে, উভয়েই আপন আপন শিষ্যের প্রয়োগপ্রদর্শনে নৈপুণ্যের পরিচয় দিবেন। গণদাস মালবিকাকে লইয়া আসিলেন। মালবিকার রূপে এবং অভিনয়নৈপুণ্যে রাজা মুগ্ধ। বেলা অধিক হইয়াছে বলিয়া হরদত্তের গুণপনার পরিচয় সে দিন আর লওয়া হইল না। তাহার আর প্রয়োজনও নাই। এখন মালবিকাকে কোন প্রকারে পাইলে হয়।

বিদূষকের সাহায্যে প্রমোদ-উদ্যানে দেখাশুনারও সুবিধা ঘটিল। কিন্তু রত্নাবলীতে যেরূপ অনুকূল ঘটনায় আখ্যায়িকা জটিল এবং বিস্তৃত না করিয়া কবি চতুর্দ্দিক্ হইতেই

অনুরাগ প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন, মালবিকাগ্নিমিত্রে তাহা তেমন দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হয় নাই। বিদূষক মালবিকার সখী বকুলাবলিকাকে হস্তগত করিয়াছে। অদৃষ্টগুণে একটা সুবিধাও জুটিয়া গেল। অন্তঃপুরের প্রমোদ-উদ্যানে একটি অশোকতরু আছে, বহুদিন তাহাতে ফুল ফুটে নাই, সুতরাং প্রাচীন প্রথানুসারে সেই অশোকবৃক্ষে সুন্দরীর সনূপুর পাদতাড়ন আবশ্যক। দেবী নিজের শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন মালবিকার উপর এই কার্য্যভার ন্যস্ত করিলেন। মালবিকা সখী বকুলাবলিকার সহিত উদ্যানে গিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল। বকুলাবলিকা এইখানে নির্জ্জনে তাহাকে রাজার প্রার্থনা জানাইল। রাজাও এই সময়ে উদ্যানেই উপস্থিত ছিলেন। সখীদ্বয়ের কথাবার্ত্তায় ভরসা পাইয়া নিজেই আসিয়া মালাবিকার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রত্নাবলীতে সাগরিকার গোপনে মদনরূপে রাজার চিত্র অঙ্কনে এবং সুসঙ্গতাকর্ত্তৃক তাহারই পার্শ্বে সাগরিকার রতিমূর্ত্তি অঙ্কনে কাজটা অনেক সহজে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সারিকা-ব্যাপারে সাগরিকার প্রণয়-ব্যক্তি এবং তাড়াতাড়িতে চিত্রটি ফেলিয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। এবং পরে কদলীগৃহে রাজার সহিত নয়নে নয়নে মিলনে, নীরব লজ্জায়, সহসা মহিষীর আবির্ভাবে এবং বিদূষকের হস্ত হইতে চিত্রপতনে সমস্ত ব্যাপার খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর দৃশ্যকাব্যের দৃশ্যও এখানে চূড়ান্ত। আখ্যায়িকাপারিপাট্যেই কি, আর দৃশ্য হিসাবেই কি রত্নাবলীর স্থান মালবিকাগ্নি-মিত্রের উর্দ্ধে।

রত্নাবলীতে সকল চরিত্রগুলিতেই সজীবতা ও চতুরতা বিশেষ পরিস্ফুট। মালবিকাগ্নিমিত্র নির্জ্জীব নহে, কিন্তু রত্নাবলীর চরিত্রে যেরূপ আবেগ এবং উদ্যম দৃষ্ট হয়, মালবিকাগ্নিমিত্রে তেমন নয়। অনুরাগে, বিরাগে, অভিমানে, প্রেমালাপে সর্ব্বত্রই রত্নাবলীতে একটা তীব্রতা আছে। তাহার প্রতি ঘটনায় দ্রুত গতি অনুভব হয়। বিদূষকের হস্ত হইতে চিত্রটি পড়িয়া যাইতে মহিষী ব্যাপার বুঝিয়া অবিলম্বে যে অসুস্থতার ভান করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে যে মর্ম্মান্তিক তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছে, মালবিকাগ্নিমিত্রে তাহা কোথায়? তাহার পরে আর এক স্থলে কেমন বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া মহিষীর অভিমান ব্যক্ত হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রমোদ-উদ্যানে মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের যখন কথাবার্ত্তা হয়, নিকটেই বৃক্ষান্তরালে অপরা রাজভার্য্যা ইরাবতী লুকাইয়া ছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, এবং শঠ সম্ভাষণে রাজাকে যথেচ্ছা কড়া কড়া দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। মহিষীকে সকল কথা বলিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়াও গেলেন। কিন্তু বাসবদত্তার সাভিমান কথাবার্ত্তায় যেমন রস এবং বাঁধুনি আছে, ইরাবতীর ভৎর্সনায় সেরূপ

কিছুই নাই। কড়া মেজাজে কেবলই "সঠ! অবিস্‌সসণীওসি"। তাহার পর রাজাকে কাঞ্চী লইয়া তাড়না। রাজা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে চাহেন। ভামিনী রাগে গর্‌গর্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চলিলেন। সে কালের রাজকুল নারীর হৃদয়রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইতে নিতান্ত নারাজ। যে কয়েকটি দখলে রাখিতে পারেন, ততই সুখ।

অসংযত রাজচরিত্রের পক্ষে রূপসীর রূপমোহ অনিবার্য্য। এবং এই দারুণ রূপমোহই অধিকাংশ সময়ে প্রেম বলিয়া চলিয়া যায়। রাজাদিগের প্রেম বোধ হয় আসলে মহিষীর প্রতি। প্রথম বয়সে যে অনুরাগ জন্মে, তাহার উপর কতকটা বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। আর মহিষীর সন্তানই নাকি পরে পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হয়। এই কারণে মহিষীর প্রতি অন্তরে অন্তরে একটু টান থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এবং এই অনুরাগটুকুর জন্যই মহিষীর যাহা কিছু প্রভাব।

তাই মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের গোপন প্রণয়ব্যাপার মহিষীর কর্ণগোচর হইতেই তিনি সখী বকুলাবলিকার সহিত মালবিকাকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজা কিছু বলিতে পারেন না। প্রাচীন কালে আমাদের মহিষীদের এই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল বলিয়াই তবু রক্ষা। নহিলে এই উচ্ছৃঙ্খল রাজকুলকে দমনে রাখা কি সহজ? রাজা মালবিকাবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। দেবীপ্রদত্ত অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক বিনা প্রহরী মালবিকাকে বাহির হইতে দিবে না। বিদূষক উপায় ঠাহরাইল। একদিন রাজা, রাণী, পরিব্রাজিকা কৌশিকী অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন, বিদূষক কণ্টকবিদ্ধ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দৃঢ়রূপে উপবীত বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি হইয়াছে? বিদূষককে সর্পে দংশন করিয়াছে, হয় ত এ যাত্রা আর রক্ষা হইল না। ধ্রুবসিদ্ধির নিকট লোক পাঠান হইল। বিদূষক বাহিরে আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিহারী রাণীর নিকটে আসিয়া বলিল, বিষপাথর নহিলে ব্রাহ্মণ এ যাত্রা রক্ষা পায় কি না পায়। করুণহৃদয়া ধারিণী আপন অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া দিলেন—অঙ্গুরীয়কে বিষাপহার মণি ছিল। বিদূষক অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে মালবিকাকে মুক্ত করিল। রাণী শুনিলেন, ব্রাহ্মণের দেহ হইতে বিষ নামিয়া গিয়াছে।

রত্নাবলীতে ঐন্দ্রজালিকের কাল্পনিক অগ্নিতে অন্তঃপুর প্রজ্বলিত করায় দৃশ্যকাণ্ড জমকালো হইয়াছে। সে কালে রঙ্গমঞ্চে এখনকার মত দৃশ্যপট ব্যবহার ছিল না, হয় ত নেপথ্যে একটা খুব আগুন জ্বালাইয়া লোকের মনে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া দিতে হইয়াছিল। রত্নাবলীর গ্রন্থকার তাঁহার নাটকে দৃশ্যকাণ্ডের সমারোহে খুব জমাট করিয়াছেন। আরম্ভে মদনোৎসব হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ধারাযন্ত্র,

লোকজন, বসন ভূষণের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, সমস্ত মিলিয়া লোকের মনে একটা গম্ভীর জমকালো ভাব আনিয়া দেয়। অনেক কথা না বলিলে ইহাতে অনেকটা কাজ হয়। দৃশ্যকাব্যে দৃশ্যকাণ্ডের সরঞ্জাম বড় কম নয়। অনেক দোষ ঢাকিয়া যায়, এবং অনেক গুণ সমধিক ফুটিয়া উঠে।

মালবিকাগ্নিমিত্রে অনেক স্থলে কবিহৃদয়ের বিকাশ হইলেও এ সকল বিষয়ে রত্নাবলীতে অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। রত্নাবলীর সুনিপুণ রচয়িতা দৃশ্যবৈচিত্র্যে এবং সমারোহে মালবিকাগ্নিমিত্রের আখ্যায়িকাকে যেন দৃশ্যোপযোগী করিয়া রঙ্গমঞ্চের আরও উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। বিবিধ দৃশ্য-পরিবর্ত্তনে দর্শকবৃন্দের মন সমধিক স্ফূর্ত্তিতে থাকে। নয়নরঞ্জনে মনোরঞ্জনের বিশেষ সহায়তা করে কি না। মালবিকাগ্নিমিত্রে দৃশ্যের আয়োজন এত নহে। তবে দৃশ্য-পরিবর্ত্তন অবশ্য যথেষ্ট আছে, এবং এত জাঁকজমক না থাকিলেও দৃশ্যগুলি সুন্দর এবং কবির নাট্যরস ও নাট্যসরঞ্জাম জ্ঞানের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আর কেবলমাত্র দৃশ্যকাণ্ডই ত নাটকের সর্ব্বস্ব নহে। মালবিকাগ্নিমিত্রে গ্রন্থকারের হাত কাঁচা বটে, প্রথমেই লেখক তাহা কতকটা স্বীকারও করিয়াছেন। রত্নাবলী ইহাপেক্ষা পাকা নাটককারের রচনা। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহাতে ইহার লেখককে রত্নাবলীর লেখক অপেক্ষা সুকবি বলিয়া মনে হয়—কেবল এখনও হাত পাকে নাই। প্রথম রচনায় বাঁধুনির পারিপাট্যের অভাব একটু থাকেই। মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন ত। কিন্তু উভয় নাটক একই কবির রচনা কি না এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ। আখ্যায়িকাংশ শেষ করিয়া এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

অবরোধ হইতে বাহির হইয়া মালবিকার রাজার সহিত গোপনে আবার দেখাশুনা হয়। কিন্তু ইরাবতীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে রাজা কিছুতেই মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। দৈবানুগ্রহে এক বানর রাজার সহায় হইল। বসুলক্ষ্মীকে বানরে তাড়া করায় চতুর্থ অঙ্ক গোলেমালে সমাপ্ত হইল—ইরাবতীর কাঞ্চীতাড়নার হস্ত হইতে রাজা নিষ্কৃতি পাইলেন।

পঞ্চম অঙ্কে অগ্নিমিত্রের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। উদ্যানপালিকার নিকট হইতে অশোক-তরুর পুষ্পোদ্গমবার্ত্তা শ্রবণে মহিষী আহ্লাদিত হইয়াছেন। যজ্ঞসেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। অশ্বমেধের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত অগ্নি-মিত্রের পুত্র বসুমিত্র যবনদিগকে রণে পরাজিত করিয়াছেন। মহিষীর আহ্লাদ ধরে

না। অন্তঃপুরে তিনি বিবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার বিতরণ করিলেন। আর অগ্নিমিত্রের করকমলে বাঞ্ছিত মালবিকাকে সমর্পণ করিয়া দিলেন। পরিব্রাজিকা কৌশিকী মালবিকার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি দস্যুদিগের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যখন চেতনা লাভ করিলেন, চতুর্দ্দিকের অবস্থা বুঝিয়া পরিব্রাজিকাবেশে বিদিশায় আসিলেন। তাহার পর ঘটনাচক্রে মহিষীর সহিত পরিচয় ইত্যাদি ইত্যাদি। মালবিকালাভে রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

এইখানেই গ্রন্থসমাপন। তাহার পর এখন গ্রন্থের প্রধান অপ্রধান চরিত্র, রচনাপ্রণালী, ভাষা, ভাব, দোষ গুণ লইয়া কথা। আরও এক কথা, এ গ্রন্থ অভিজ্ঞান-শকুন্তলরচয়িতা কালিদাসের রচনা কি না! চরিত্র সম্বন্ধে আমরা আখ্যায়িকা বর্ণনার মধ্যে মধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। আর রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়াই ত রচয়িতাকে বাহির করিতে হইবে। সুতরাং মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা কে—কালিদাস বা অপর কেহ—ইহাই আমাদের এখন আলোচ্য।

গ্রন্থারম্ভে স্নিগ্ধগম্ভীর নান্দীবাচন এবং কৈফিয়ৎযুক্ত প্রস্তাবনা হইতেই মালবিকাগ্নিমিত্রকে কালিদাসের রচনা বলিয়া মনে হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল-পাঠকেরা অনেকেই বিশেষ মনোযোগ সহকারে বার বার পাঠ করিয়া থাকিবেন, তাহার নান্দীবাচনের সহিত মালবিকাগ্নিমিত্রের নান্দীবাচন তুলনা করিয়া দেখিলে দুইটিই যে একই কবির রচনা, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। রত্নাবলীর নান্দীবাচন দেখ, গাম্ভীর্য্যে এবং ঔদার্য্যে মালবিকাগ্নিমিত্রের পার্শ্বে কিছুতেই স্থান পায় না। কালিদাস দেবতার দেবত্ব বুঝিতেন, দেহ দিয়া ঘিরিলেও তাহার মধ্য হইতে অনন্ত মুক্ত ভাব ফুটাইয়া তুলেন। সীমা ছাড়াইয়া, দেহ ছাড়াইয়া তাঁহার মত ভাবময় অসীমে বিচরণ করিতে পারেন কোন্ কবি? ইহাতেই কালিদাসের নান্দীবাচন দেখিলেই বুঝা যায়। এবং এই নান্দীবাচনেই মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা ধরা দেন।

তাহার পর প্রস্তাবনায় ধাবক সৌমিল্লাদির কথা পাড়িয়া নিজের নূতন রচনার যেখানে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে,

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

সেইখানেই বুঝা যায় যে, মালবিকাগ্নিমিত্র নাট্য-সাহিত্যে কালিদাসের প্রথম উদ্যম। কালিদাস নিজের ক্ষমতা বুঝেন; তাই একটু জোর করিয়া বলিয়াছেন,—পরীক্ষা

করিয়া দেখ, নাম শুনিয়া বিচার করিতে বসিও না, পুরাতন হইলেই যে সকল জিনিস ভাল হয় আর নূতন হইলেই মন্দ, তাহা নহে, মূঢ়েরাই এইরূপ পরের মুখে ঝাল খাইয়া থাকে, সজ্জন পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া দেখেন। এরূপ সগর্ব্ব বিনয় কালিদাস ভিন্ন অন্যে দেখা যায় না।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অর্থাৎ রচনা দেখিয়া আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে কালিদাসকেই মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কালিদাসের রচনার অনেকগুলি গুণই মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখা যায়; যথা, সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরের অভাব, বলিবার সহজ ধরণ, মধ্যে মধ্যে সুবিধা পাইলেই কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেমও ব্যক্ত হইয়াছে। তবে মালবিকাগ্নিমিত্রের গঠন তেমন পরিপাটি নহে বটে। সেই জন্যই আমরা কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়াছি। আর একটু গঠনপারিপাট্য হইলে মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর হইত। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বাস্তবিকই সন্দেহের উদয় হয় যে, বুঝি কালিদাস এ গ্রন্থের রচয়িতা নহেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ মিলাইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সন্দেহ অনেকটা ঘুচে।

কিন্তু বিরোধী পক্ষ ধাবক, শ্রীহর্ষ এবং কালিদাসের কাল নিরূপণ করিয়া, এবং মালবিকাগ্নিমিত্রে ধাবকের নাম উল্লেখ দেখিয়া মালবিকাগ্নিমিত্রকে কালিদাসের সময়ের বহু পরে রচিত প্রমাণ করিতে চাহেন। কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিকরপ্রমাদে যেরূপ পাঠান্তর হয়—মালবিকাগ্নিমিত্রেরও কোনো কোনো পুথিতে ধাবক স্থানে ভাসক নাম দেখা যায়—তাহাতে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ছাড়িয়া এ সকল প্রমাণের উপর তেমন নির্ভর করা যায় না। ব্যুৎপন্ন পুরাতত্ত্বপণ্ডিতগণ এ বিষয়ে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বাধিত করিবেন। সংস্কৃত সাহিত্যে আমার তাদৃশী ব্যুৎপত্তি নাই যে, অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে কিছু প্রতিপন্ন করিয়া দিই। কাব্যপাঠকালে রচনাপ্রণালী দৃষ্টে সাধারণ পাঠকের মনে যে সকল কথার উদয় হয়, তাহাই বলিয়াছি মাত্র।

'সাধনা', মাঘ ১২৯৮

পুরাতন চিঠি

হাতে কাজ নাই; ডেস্কের মধ্যে কতকগুলি পুরাতন চিঠি ছিল, বাহির করিলাম।

শাদা কাগজের উপরে সারি সারি কালির অক্ষর—আমার পুরাতন বন্ধুর পুরাতন পরিচিত হাতের লেখা। দূর দেশে থাকিতে বন্ধু বন্ধুকে চিঠি লিখিয়াছে।

এই চিঠিটুকুর জন্য তখন কি অধীর ভাবে পথ চাহিয়া থাকিতাম! কখন্

গলির মোড়ে ডাকহরকরার শ্যামমূর্ত্তি দেখা দেয়! কখন্ আমার একখানি চিঠি আসে!

এখন বন্ধু আমার হাতের কাছে—এই এবাড়ী ওবাড়ী। যখন-তখন দেখা হয়। দুই ছত্র চিঠিতে সকল মনের কথা অসম্পূর্ণ নিঃশেষ করিতে হয় না।

কোণের ঘরে বসিয়া নিরিবিলি বন্ধুর চিঠি পড়িতেছি—বহু দিনের পুরাতন চিঠি, উজ্জ্বল কালির অক্ষর ঈষৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে। এই ম্লানোজ্জ্বল বর্ণে আমার বহু পুরাতন দিনের প্রথম স্নেহ-সখ্যের সম্বন্ধ মনে পড়ে। প্রথম সেই যখন চিঠি লিখিতে শিখি, আর প্রথম সেই যে চিঠি পাই।

এই পুরাতন চিঠিগুলি আমার সেই প্রথম বয়সের বিজন স্মৃতিমন্দির। তখনকার সকল কথা ভাল মনে পড়ে না, অনেক কথা এত দিনে ভুলিয়া গিয়াছি, চিঠিগুলি পড়িয়া কতক কতক মনে করি।

তাই অবসর পাইলেই আমি ডেস্ক ঝাড়িয়া চিঠি গুছাইতে বসি। সময়ের হয় ত একটু আধটু অপব্যয় হয়, কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগে। পুরাতন চিঠির কি এক সরল মোহ আছে।

এই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আমি বেশ সুখে থাকি। এ পুরাতনের মোহ অতিক্রম করিতে চাহে কে? উন্মাদনা নাই, তীব্রতা নাই, কেবলি বেদনার আনন্দ এবং সুখের শান্তিটুকু।

পরে পরে চিঠিগুলি পড়িয়া শেষ করিলাম। তারিখ অনুসারে আমি সাজাইয়াছি। অনেক চিঠি জমিয়াছে—অনেক দিনের লেখা। বন্ধু যেখানে গিয়াছে, চিঠি লিখিতে ভুলে নাই। আমিও যেখানে থাকি, আগেই তাহাকে লিখি।

অনেক চিঠির খামগুলিও রাখিয়া দিয়াছি। খামের উপরে মৃদু হস্তে আমার নাম লেখা। দুএকখানিতে আমার নামের পার্শ্বে কীটে ছিদ্র করিয়াছে। এ সনাতন কীটবৃত্তির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ বহু জন্মের বহু পুণ্যফল নহিলে ঘটে না।

আমি ঝাড়িয়া মুছিয়া চিঠিগুলি খামে পুরিলাম এবং যেমন ছিল, একে একে রাখিয়া দিলাম। ডেস্কের মধ্যে খোপ খোপ করা। একটি খোপে আমার চিঠি থাকে। পুরাতন বন্ধুর চিঠি বৈ আমার আর চিঠি নাই।

বন্ধু কত কি লিখিয়াছে! হিসাব করিয়া ত আর লেখে নাই। নিজের অবস্থা, চারি দিকের লোকজনের ভাবগতিক, দৃশ্যবৈচিত্র্য, সামাজিক রীতি নীতি, অনেক কথা—এমন অনেক হাস্যপরিহাস, গল্পগুজব।

সে সকল কথা অপরের ভাল লাগিবে না। তোমরা ত্রুটি ধরিবে, নয় সমালোচনা

করিবে। আমি বন্ধুকে জানি, আমার নিকট তাহার আদর। তোমাদের কাছে ত আর তাহা নয়।

তোমরা আবশ্যকের হিসাবে দেখ, আমার পুরাতন চিঠিতে, পুরাতন স্মৃতিতে তোমাদের যায় আসে কি? কিন্তু আমি এই চিঠি পড়িয়া বন্ধুকে হৃদয়ে অনুভব করি। মনে হয়, বন্ধুর সহিত বিজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি—পুরাতন শৈশবের কথা, পুরাতন সুখদুঃখের কথা।

আমার ঘরের দেয়ালে বহুদিনের একটি অসম্পূর্ণ মুখ অঙ্কিত আছে। প্রথম ছবি আঁকিতে শিখিয়া বন্ধু এই মুখটি আঁকিয়াছিল। তাই আমি আজও ছবিটি মুছি নাই। চিঠি পড়িয়া একবার সেইটি দেখি—ধূলায় ধূলায় প্রতি দিন অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও বুঝা যায়। যে পেন্সিলে বন্ধু আঁকিয়াছিল, সে পেন্সিলটি আমার কাছে আছে। পুরাতন চিঠির সঙ্গেই থাকে।

ছোট্ট ডেস্কের মধ্যে আমার ছোটখাট জীবনের ছোটখাট অতীত চাবিবন্ধ। আমার পুরাতন জীবন ইহারই নিভৃত খোপে নিরিবিলি বাস করে। কিন্তু এখানেও নিরুপদ্রব নহে। অদৃষ্ট কীট নিঃশব্দে তাহাকে কাটিতে থাকে।

আমি বর্ত্তমানশ্রান্ত পথিক, মধ্যে মধ্যে এই পুরাতনের স্নেহে শান্তি লাভ করিতে আসি। চুপিচাপি আমার শৈবালাচ্ছন্ন অতীতের সমাধিমন্দিরে গিয়া একা একা বসিয়া থাকি। একটি পেন্সিলের দাগে, দুইটি পুরাতন পরিচিত হাতের অক্ষরে আমার সমস্ত পুরাতন—আমার সমস্ত অতীত।

'সাধনা', ফাল্গুন ১২৯৮

নীতিগ্রন্থ

বাঙ্গলায় আজকাল অনেকে নীতিগ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা অল্প।

তাঁহারা কি করিতেছেন? ছেলেদিগকে নীতিকথা শুনাইতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নীতিকথা জানে না কে? যে ছেলে বই পড়িতে শিখিয়াছে এবং নীতিগুরু-মহাশয়ের রচিত বড় বড় সংস্কৃত কথা পরিপাক করিতে পারে, সে যদি জ্ঞানেও না জানে যে, পিতা মাতা ভক্তির পাত্র, তবে তাহার কানে নীতিমন্ত্র দেওয়া যা, আর সোনার পাখীকে হরিনাম পড়ানও তাই। আর যে ছেলে জানে, তাহাকে পুনর্ব্বার শত বার করিয়া জানাইতে গেলে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা।

নীতি যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের মত কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু নীতি যতক্ষণ কাজে পরিণত হইবার উপযোগী না হয়, ততক্ষণ তাহার কোন মূল্য থাকে না।

কেবলমাত্র জ্ঞান আমাদিগকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করাইতে পারে না, ভাবের আবশ্যক। সেটা কোথায় পাওয়া যায়?

নীতির মধ্যে এই যে দুটা অংশ আছে—জ্ঞান ও ভাব, তাহার মধ্যে জ্ঞানটা সর্ব্বপরিচিত ও পুরাতন, ভাবটা কাহারো আছে, কাহারো নাই, কাহারো বেশী, কাহারো কম এবং ভাব কখনও পুরাতন হয় না। পুরাতন জ্ঞানের কথাকে যত বার পুনরুক্ত করিবে, ততই সে পুরাতনতর জীর্ণতর হইয়া উঠিবে—কিন্তু ভাবকে যতই অনুভব করাইবে, ততই সে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে। আমাদের নীতিলেখকেরা বার বার নীতিকথা আওড়াইয়া নীতির অতি পরিচিত পুরাতন অংশকেই সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। যদি কোন ছেলেদের নীতির অভাব থাকে, নীতির প্রতি বিরাগ থাকে, তবে তাহার সেই বিতৃষ্ণা দৃঢ় বদ্ধমূল করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই।

কিন্তু লেখার দ্বারা ভাবোদ্রেক করিতে গেলে সাহিত্যের আবশ্যক। জনসাধারণের দুর্ভাগ্যক্রমে নীতিকথা যে সে বলিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য তেমন সহজ জিনিস নহে। এই জন্য নীতি-উপদেশ এতই সুলভ, এবং এই জন্যই নীতি-উপদেশের গন্ধ পাইলেই অধিকাংশ লোক পালাইতে চাহে। কিন্তু হতভাগ্য বালকেরা ইচ্ছা করিলেও পাঠশালা ছাড়িয়া পালাইতে পারে না, এই জন্য জুলুমটা তাহাদেরই উপরে হয় বেশী। ছেলেগুলো অভ্যস্ত কথা কেবল মুখস্থ বলিতে শেখে এবং অনেক বড় বয়স পর্য্যন্ত নৈতিক জ্যাঠামি কিছুতে ছাড়িতে পারে না।

কর্ত্তব্যের মধ্যে কঠোরতা এবং মাধুর্য্য দুই আছে। তাহার এক অংশ আমাদিগকে পীড়ন করে, আর এক অংশ আমাদিগকে আকর্ষণ করে। তাহার এক ভাগে আমরা অধীন, আর এক ভাগে আমরা স্বাধীন। নীতিগুরুদিগকে এইটে মনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা কর্ত্তব্য পালনের যন্ত্র নহি; আমরা স্বাধীন প্রীতির সহিত সৎকার্য্য করিবার অধিকারী। সেই প্রীতির মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই প্রীতির অভাবেই মানুষ কাঁদিতেছে। "পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছং সকলং।" জানি সকলি, কিন্তু প্রেম নাই বলিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারি না। হে নীতিবিৎ বৃদ্ধ, তুমি কি নীতিকথার চটি বই বাহির করিয়া আমাকে প্রেম দিতে পারিবে! শত বার কথিত কথাকে সহস্র বার ব্যাখ্যা করিয়া তুমি আমার স্বভাবতই বিদ্রোহী হৃদয়কে দ্বিগুণ

উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতেছ। উহাতে আমার নূতন জ্ঞান কিছুই শিক্ষা হইতেছে না, কেবল যে প্রেমের অঙ্কুরটুকু ছিল, তাহা ভারাক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব হে গুরো, ঐ চটি বইগুলো সম্বরণ কর!

নীতিশিক্ষার প্রধান স্থান গৃহ। সহস্র প্রেমের সম্বন্ধ আমাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। আমরা যে, পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশ অবহেলা করি না, সে শুধু শাসনের ভয়ে নহে, ভালবাসি বলিয়া। প্রেম আমাদের হৃদয়কে তাঁহাদের নিকট উন্মুক্ত রাখে। ঘরের মধ্যে আমরা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ধরা দিই। আমাদের কোন অংশ ঢাকা থাকে না। যে উপদেশ, যে আলোক, প্রেমের যে শিশিরবিন্দুটুকু পাই, তাহা সমগ্র প্রকৃতি দিয়া গ্রহণ করি এবং একত্রে সমগ্র প্রকৃতি পরিস্ফুট হইতে থাকে। গৃহের মধ্যে যদি সেই মুক্ত ভাব না থাকে, তবে আমাদের মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতির ব্যাঘাত হয়। বড গাছের আওতায় যেমন চারাগাছ বাড়িতে পারে না, চারি দিকে বাধা পাইলে উদ্ভিদ্ যেমন বাঁকিয়া চুরিয়া খর্ব্বাকৃতি হইয়া দাঁড়ায়, আমাদেরও সেই দশা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নীতিশিক্ষকেরা পরিবারের যে আদর্শ খাড়া করিয়া তুলিতে চাহেন, তাহাতে এই প্রীতির, এই মুক্ত ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। পিতাকে যম, দাদাকে পিতা, বৌঠাকুরাণীকে জননী এবং জ্যেষ্ঠ মাত্রকেই পিতৃমাতৃত্বে টানিয়া তুলিয়া সমস্ত পরিবারকে ইঁহারা কেবলি একটি গুরুপরম্পরার লৌহশৃঙ্খলরূপে গড়িয়া নিশ্চিন্ত হন। প্রীত্যংশটুকু বাদ দিয়া পরিবারের পরস্পরের মধ্যে এক কঠিন কৃত্রিম ভক্তির ব্যবধান স্থাপিত হয়। পিতাপুত্রে দেখাশুনা প্রায় হয় না—যদি বা হয়, স্নেহাস্পদ পুত্র নির্ব্বাক্ নতনেত্রে ভক্তির পরিচয় দিলে সকলে তাহার নম্রতার প্রশংসা করে এবং ভক্তিভাজন পিতৃদেব যথাসম্ভব সংক্ষেপে পুত্রকে অব্যাহতি দিয়া তাহাকে হাঁফ ছাড়িতে অবসর দেন। জ্যেষ্ঠের সহিতও এইরূপ পিতৃবৎ আচরণ ব্যবস্থা—সুতরাং কনিষ্ঠের পক্ষে তিনি অত্যন্ত দুর্গম দুর্দ্ধর্ষ। এমন কি, অনেক সময় মধ্যে তৃতীয় পক্ষ গুরুমহাশয় কিম্বা পাড়াপ্রতিবেশীকে খাড়া না করিয়া কথা চলে না। মা ত মা আছেনই, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকেও মা করিয়া তুলিতে হইবে, নীতিগুরুর এইরূপ বিধান—এইরূপ কৃত্রিম মা এবং কৃত্রিম বাপের ভীড়ে ঘরের মধ্যে ছেলেদের কোথাও পা ফেলিবার জায়গা নাই। ভাসুরকে দেখিলে ভাদ্রবউ ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলে, শ্বশুরকে দেখিলে পুত্রবধূ বিলুপ্ত হইতে চেষ্টা করে, জামাইকে দেখিলে শাশুড়ী ঘোমটা টানিয়া বসে, শাশুড়ীকে দেখিলে বধূ কোথায় লুকাইবে, স্থান খুঁজিয়া পায় না। স্বামী স্ত্রীতে গোপনে চোরের মত দেখাসাক্ষাৎ, যেন দাম্পত্য সম্বন্ধটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং সমাজের অননুমোদিত। ঘরের মধ্যেই যত লুকাচুরি বাঁধাবাঁধি,

ঘরের মধ্যেও বিশুদ্ধ প্রীতিপূর্ণ উদার আনন্দময় স্বাধীনতা নাই, পরস্পরের মাঝখানে প্রেমের সহজ প্রবাহ স্বাভাবিক আদান প্রদান নাই। এমন জায়গায় কি সহজ নীতি-শিক্ষা সম্ভব? কাজেই শাস্ত্রশাসন, গুরুমন্ত্র এবং চটি বইয়ের আমদানী হয়।

এই সকল কারণে বঙ্গবালকের বন্ধুত্বের মধ্যেও কতকটা বিকৃতি লক্ষিত হয়। তাহারা কিছু অসহ্য সেন্টিমেণ্ট্যাল্ হইয়া উঠে। গৃহে স্বাধীনতা অনুভব করি না, বাহিরের শাসনহীন বন্ধুত্বে রুদ্ধ উৎস উচ্ছৃঙ্খল বেগে উছলিয়া উঠে। তাই বন্ধুত্বের মধ্যে আমাদের অনেকটা লুকাচুরি ভাব আছে—দাদা আসিলে সখ্যালাপ বন্ধ হইয়া যায়, বাবার সাড়া পাইলে ভালমানুষ ছেলেটি জড়সড় হইয়া বসে এবং কড়িকাঠ গণিতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে; যেন বন্ধুত্ব একটা অপরাধ যেন এত ক্ষণ একটা দুষ্কর্ম্ম চলিতেছিল। দাম্পত্যের মত ইহাতেও দিবালোকের প্রবেশ নিষেধ।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠের মধ্যে পিতাপুত্র-সম্বন্ধ খাড়া করিয়া তোলা হয় ত কতকটা আবশ্যক হইয়া পড়ে। পিতার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠের উপরই পিতৃত্ব ন্যস্ত হয়। এবং ক্রমে জ্যেষ্ঠের পর জ্যেষ্ঠ ধারাবাহিকরূপে এই পদের উত্তরাধিকারী। সুতরাং গোড়া হইতেই কতকগুলি কর্ত্তা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। কর্ত্তারাই একান্নবর্ত্তী পরিবারের উচ্চনীচক্রমে স্তরবিন্যস্ত মেরুদণ্ড।

সকলই স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা মনে হয়, মনুষ্যত্ব একটি জীবন্ত এবং মহৎ জিনিস, যন্ত্রের দ্বারা সে তৈরি হয় না, প্রীতি এবং সংযত স্বাধীনতার দ্বারা সে বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু আমাদের পরিবার একটা জাঁতার মত; উপরে একখানা পাথর, নীচে একখানা পাথর; উপরে গুরুজন এবং নীচে কনিষ্ঠবর্গ—মাঝখান হইতে সামাজিক শান্তি শুভ্র ময়দার মত বাহির হইতেছে, সেই সঙ্গে মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্ব তাহার সমস্ত আকার আয়তন এবং স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া পিষিয়া যাইতেছে। বৃহৎ মানব-সমাজে উন্মুক্ত সংসারক্ষেত্রে কেহ যে সবলে সতেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, কেহ যে সুমহৎ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া অশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত অসাধ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবে, এতটুকু তেজ শরীরে অবশিষ্ট থাকে না। আমরা সকলে ধীর নম্র নিরীহ, আমরা কেবলমাত্র বাপের বাধ্য ছেলে, ভ্রাতার বশীভূত ভাই, গুরুর ভক্তিমান্ শিষ্য, আর কিছু নহি; আমরা কেবলমাত্র একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্নসেবী, বড় জোর আমরা আমাদের গ্রামটুকুর খুড়া জ্যাঠা দাদা ভাই—তাহার বাহিরে যে এক মহামানবমণ্ডলী আছে, সেখানে আমরা লজ্জিত নতশির, সেখানে আমরা ভীত অপমানিত; সেখানে আমরা প্রভুর কাছে খোসামোদ, অধীনের প্রতি পীড়ন, মুখে দম্ভ এবং কাজে গোঁজা-মিলন করিয়া চলি।

এখনকার দিনে এমন করিয়া আর চলে না। বাহিরের মানবসংস্পর্শে আসিয়া নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের অপমানটা একান্ত অনুভব করিতেছি। পূর্ব্বে গৃহই আমাদের প্রধান আশ্রয় ছিল—এখন বাহিরের টানে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছি—ইতিহাস বিজ্ঞান লোকনীতি সম্বন্ধে নব নব জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের হৃদয় গৃহ-প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে ব্যাপ্ত হইতে চাহিতেছে; এখনি কতকগুলি নূতন উপায় উদ্ভাবন না করিলে নীতি রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। এখন আমাদের পুরাতন গৃহের মধ্যে নূতন দরজা জানালা কাটিয়া তাহার অন্তরে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা এবং বাহিরের সহিত যোগ সাধন করিতে হইবে। কতকগুলি পারিবারিক পুত্তলি প্রস্তুত না করিয়া স্বাধীন এবং জীবনপূর্ণ মানুষ গড়িতে হইবে। তাহাতে আমাদের এই নির্জ্জীব সমাজের মৃত্যুশান্তি যদি নষ্ট হয়, যদি একটা জীবনের কলরব জাগ্রত হইয়া উঠে, তবে সে আনন্দেরই বিষয়।

'সাধনা', ফাল্গুন ১২৯৮

বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা

জাতির অবস্থার সহিত ধর্ম্মের যোগ অনুভব করিতে হইলে একবার বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক—বিশেষতঃ বাঙ্গলার মঙ্গলকাব্যগুলি এবং যে সমস্ত গ্রন্থে দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণন কিম্বা পূজাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আছে।

বঙ্গসাহিত্যের জন্ম অল্পদিন মাত্র। মুসলমান শাসন তখন আমাদের হাড়ে হাড়ে অনেকটা বসিয়াছে—এবং খামখেয়ালী নবাবীর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যথেচ্ছাচারপরায়ণতাই ক্ষমতার একমাত্র পরিচয় ও চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়। রাজপুরুষেরা কেবলমাত্র প্রচণ্ড শাসক—তাড়না করেন, লাঞ্ছনা করেন, গঞ্জনা দেন, অকথ্য বলেন এবং খেয়াল অনুসারে কুত্তা লেলাইয়া দিয়া তামাসা দেখেন। আমরা লাঞ্ছনা সহি, গঞ্জনা সহি, গালি খাই এবং কুত্তাকে বিষম ভয় করি। রাজাপ্রজার মধ্যে সম্বন্ধ কেবল ভয়ের। প্রজা রাজাকে ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলে—নহিলে বিপদ ঘটিতে আটক নাই, রাজা প্রজাকে তাঁবে দাবাইয়া রাখেন—তোষামোদ করিলে অনুগ্রহ করেন, নহিলে নিগ্রহের একশেষ। ন্যায়ান্যায়বোধ রাজদণ্ডের পরিচালক নহে—মর্জ্জিই একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

যেমন রাজ্য শাসন, দেবশাসনও তেমনি। এই পার্থিব শাসনতন্ত্রেরই আদর্শে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল আপনার দেবতাগুলি দিয়া একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠন

করিয়াছেন মাত্র। অপরিণতবুদ্ধি একটা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাবশাসকের পরিবর্ত্তে সেখানে একজন অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্দ্ধর্ষ দেবতা বসিয়া রাজত্ব করেন; সর্ব্বনাশভয়ে দুর্ব্বল ভক্তবৃন্দ চৌত্রিশ অক্ষরে দুর্ব্বোধ ছড়া বাঁধিয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করে, ষোড়শোপচারে সেবার বিধান করিয়া দিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে।

দেবতা বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র রাগদ্বেষভয়হিংসা-বিবর্জ্জিত নহে। দেবত্ব যাহা কিছু অপরিমিত অত্যাচার ও যথেচ্ছ অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতায়। এবং সুবিধা পাইলেই এই দারুণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেও দেবকুলের কখনও ত্রুটি দেখা যায় না। নবাব এবং বাদ্‌শাদেরই মত খামখেয়ালি মেজাজ—ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট—কখন্ এবং কেন যে কাহার প্রতি সদয় নির্দ্দয়, বুঝা ভার। খেয়ালবশতঃ সহসা যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহাকে ধন দেন, রত্ন দেন, নবাবী প্রথানুসারে জায়গীরও দিয়া থাকেন এবং পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া উক্ত ভূখণ্ডে প্রজাপত্তনের সুবিধা করিয়া দিতেও ত্রুটি করেন না। যে হতভাগ্য সকারণে অথবা অকারণে একবার ইঁহাদের কাহারও বিষদৃষ্টিতে পতিত হয়, তাহার প্রতি তেমনি দুর্জ্জয় কোপ—ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হোক, তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে! অনুগ্রহ নিগ্রহের কারণ প্রায়ই এত সামান্য যে, তাহাকে আমল দেওয়া চলে না। এবং সেটুকু কারণও অনেক সময় চঞ্চলমতি দেবতারা বলপূর্ব্বক ঘটাইয়া থাকেন। হয় ত পুরাতন ভক্তে অরুচি জন্মিয়াছে, নূতন নহিলে মন উঠে না—অথচ চক্ষুলজ্জার খাতিরে পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কি করেন?—ভক্তের প্রতি এক দুঃসাধ্য হুকুম জারি করিলেন। ভক্ত বেচারি প্রাণপণ যত্নে যথাসাধ্য আদেশ পালন করিয়া মরিল; কিন্তু দেবতার মায়া ত আর সে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তিনি তাহার মধ্যে গোপনে একটু ত্রুটি রাখিয়া দিয়াছেন। সেই ত্রুটিটুকু অবলম্বন করিয়া এক প্রচণ্ড অভিশাপ বাহির হইয়া আসিল—দুর্ব্বল ভক্ত সন্তানের এত দিনের কায়মন ভক্তির চরম পুরস্কার!

এইরূপ খামখেয়ালি আচরণ বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবচরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। কেবলি মানবের প্রতি নহে, ছোট দেবতার প্রতি বড় দেবতার ব্যবহারও এইরূপ। চণ্ডীর একবার সখ হইল, ইন্দ্রকুমার নীলাম্বরের দ্বারা মর্ত্ত্যে আপন পূজা প্রচার করিবেন। উপায় ঠাহরাইলেন—একটা কোন ছুতায় অভিশাপ দিয়া তাহাকে স্বর্গচ্যুত করিতে হইবে। ভগবতী শিবকে ধরিয়া বসিলেন। শিব মহাসঙ্কটে পড়িলেন। ইন্দ্র তাঁহার একজন একান্ত অনুগত সেবক, নীলাম্বর তাঁহারই উপযুক্ত পুত্র, শিবপূজার জন্য স্বহস্তে ফুল তুলিয়া আনেন—বিশেষতঃ নীলাম্বরের শরীরে তিলমাত্র পাপ নাই; কোন্

ছুতায় শিব তাহাকে অভিশাপ দিবেন? ভগবতী পরামর্শ দিলেন—তাহার আর ভাবনা কি,

যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার।
তবে অভিশাপ দিবা কি দোষ তোমার॥

শিব অবিলম্বে সম্মত হইলেন। এখন কেবল নীলাম্বরের মহী ইচ্ছা করার অপেক্ষা।

ভগবতী মায়াপ্রভাবে একদিন নন্দনের সমস্ত ফুল হরণ করিয়া রাখিয়াছেন। নীলাম্বর স্বর্গলোকে ফুল না পাইয়া পৃথিবীতে ফুলের সন্ধানে বাহির হইলেন। ব্যাধ ধর্ম্মকেতু এক রূপসী হরিণের পশ্চাতে তাড়া করিয়াছে—হরিণ আর কেহ নহে, স্বয়ং ভগবতী স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত এই রূপ ধারণ করিয়াছেন। নীলাম্বরের মন এই দৃশ্যে মুহূর্ত্তের জন্য ফুল হইতে বিচলিত হইল এবং তিনি মনে মনে বলিলেন যে, মালাকারের মত সাজি হাতে ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা ব্যাধের জীবন ঢের ভাল। ব্যাধজন্মের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইল। যেটুকু বাকি ছিল, তাড়াতাড়িতে ফুলের সহিত একটি কণ্টক সংগ্রহ করিয়া আনায়, এবং দেবী চণ্ডীর কৃপায়, তাহাও অসম্পূর্ণ রহিল না।

কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দেবী পিপীলিকা হৈয়া॥

নীলাম্বর বা ইন্দ্র কেহই তাহা জানেন না। সুতরাং যখন

কুসুম অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হরশিরে।
কণ্টক ভুঁকিল দুঃখ পাইল অন্তরে॥
দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।
মরমে দংশিল হর হইলা আকুলে॥

মহাদেবের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর ভীমমুখে তিনি ইন্দ্রকে যথেচ্ছা ভর্ৎসনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—ফুল আমি তুলি নাই, নীলাম্বর তুলিয়াছে। নীলাম্বরের কৈফিয়ৎ তলব হইল, কিন্তু সে কৈফিয়তে কোন ফল হইল না। চণ্ডীর পরামর্শ মহাদেব ভুলেন নাই। অভিশাপ বাহির হইল—

মোর সেবা ছাড়ি ইচ্ছা কর হৈতে ব্যাধ।
ত্বরিতে চলহ মহী দিনু অভিশাপ॥

নীলাম্বরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু মহাদেব টলিলেন না।

আর এক বার চণ্ডীর সখ হইল, স্ত্রীলোকের পূজা লইতে হইবে। পদ্মাবতীর সহিত যুক্তি করিয়া তিনি ঠাহরাইলেন, ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালাকে দিয়া কার্য্য উদ্ধার

করিবেন। রত্নমালার প্রতি হুকুম জারি হইল—হরের সভায় আসিয়া নৃত্য করিবে। রত্নমালা নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সভা পরিপূর্ণ। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া গান ধরিয়াছেন, রত্নমালা তালে তালে নাচিতেছে। দেবতারা সকলেই নৃত্যে মুগ্ধ। কিন্তু চণ্ডীর ত নৃত্য দেখা উদ্দেশ্য নয়—রত্নমালাকে মর্ত্ত্যে পাঠাইতে হইবে, একটা কোন ছুতা অবলম্বন করিয়া তাহাকে অভিশাপ দেওয়া চাহি। মদনকে দেবী টিপিয়া দিলেন, রত্নমালার প্রতি একটা বাণ হান। মদন সম্মোহন শর ছাড়িলেন। রত্নমালার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল এবং তালভঙ্গ হইল। চণ্ডী শাপ দিয়া বাঁচিলেন।

বিচার এবং বিবেচনা বঙ্গসাহিত্যের দেবতাদের নিকট কখনও প্রত্যাশা করা যায় না। কেবলি এক দল খেয়ালপরিচালিত কর্ত্তৃপক্ষ—যাহার প্রতি অনুকূল হয়েন, তাহার সাত খুন মাফ এবং বিমুখ হইলে বিনা দোষেও উৎপীড়নপরাঙ্মুখ নহেন। কালকেতুর নগর বসাইতে হইবে—সেই জন্য চণ্ডী বিনা দোষে কলিঙ্গদেশ ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। প্রথমে ত কলিঙ্গনগরে গিয়া ঘরে ঘরে স্বপ্ন দিয়া আসিলেন যে, বীর কালকেতু যে নগর বসাইতেছেন, তোমরা সেইখানে গিয়া বাস কর, অনেক ধনদৌলত মিলিবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কিন্তু স্বপ্ন সকলে শুনিল না। সুতরাং চণ্ডীকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তিনি গঙ্গাসন্নিধানে চলিলেন।

সাধিতে আপন কাম আইলাম তোমার স্থান
সহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলিবে আমার সঙ্গে
হাজাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥
গঙ্গা সন্তাপ করহ দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ হাজাবে কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজরাটপুর॥

গঙ্গা সম্মত হইলেন না। স্পষ্টই বলিলেন,

হইয়া বিষ্ণুর অংশা কারো না করি যে হিংসা
কেন রাজ্য হাজাব রাজার॥
মোরে পরপীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ হই আমি অশ্রুমুখ
তারে আমি সদয় হৃদয়॥

চণ্ডী গালি পাড়িলেন। বলিলেন, ভারি বৈষ্ণবী হইয়াছ দেখিতেছি, যত মকর

কুম্ভীর পোষা হয়, আর কাজের সময় সাধ্বী সাজিয়া বসেন, একবার রকম দেখ গা! গঙ্গাও পাণ্টা গালি দিতে ছাড়িলেন না। দুই পক্ষে ছড়া কাটাকাটি বেশ জমিয়া গেল। তখন পদ্মাবতী চণ্ডীকে সমুদ্রের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। ভগবতী, সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকটে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইল। ঝড় বৃষ্টিতে কলিঙ্গ হাজিয়া গেল। কলিঙ্গের প্রজা লইয়া কালকেতু স্বনগরে পত্তন করিলেন। বেচারা কলিঙ্গরাজের যে কি অপরাধ, কেহ বুঝিতে পারিল না।

চণ্ডীর মহিমা সম্বন্ধে লোকের আর সন্দেহ রহিল না। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, জাগ্রত দেবতা এই বটে। নিত্য নূতন খেয়াল উঠে এবং অবিলম্বে খেয়াল চরিতার্থ করিবার উপায় অবলম্বিত হয়। এরূপ জবরদস্ত নহিলে দেবতা কিসের? কোন্দল করিতে হইবে—আচ্ছা তাই সহি; নৌকাডুবি করিতে হইবে—তথাস্তু; কাহাকেও কারারুদ্ধ করাইতে কপটাচরণ করিতে হইবে—বেশ কথা; দেবী কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। সারাদিন বসিয়া বসিয়া পদ্মাবতীর সহিত কেবল ফন্দি আঁটিতেছেন—কাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, কাহার পূজা লইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে বিপন্ন কিম্বা লুব্ধ ভক্তের সুদীর্ঘ চৌতিশা স্তবে এক এক বার দেবীর মন বিচলিত হয়; পদ্মাবতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কে ডাকে? পদ্মাবতী গণনা করিয়া দেখেন—দেবী গতি করিয়া দেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর যেমন পদ্মাবতী, ভারতচন্দ্রের অন্নদার সেইরূপ জয়া। জয়ার সহিত পরামর্শ না আঁটিয়া অন্নদা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এবং জয়াকে তাঁহার অষ্টপ্রহরই আবশ্যক হয়। অন্নদা চণ্ডীরই বিভিন্ন সংস্করণ। খেয়ালের রকম-সকমও চণ্ডীরই অনুরূপ। সখ হইয়াছে, পৃথিবীতে পূজা প্রচার করিতে হইবে; জয়ার পরামর্শানুসারে একটা ছল ধরিয়া কুবেরানুচর বসুন্ধরকে অভিশাপ দিলেন—মর্ত্ত্যে গিয়া মানবের গৃহে জন্মগ্রহণ কর। বসুন্ধর দেবীর গায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটি করিল। দেবী শুনিলেন না। বিষ্ণু হোড়ের গৃহে তাহার জন্ম হইল—নাম হইল হরি হোড। দুঃখীর ছেলে হরি হোড় অল্পদিনেই বাড়িয়া উঠিল। বনে মাঠে ঘুরিয়া ঘুঁটে কুড়াইয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই কায়ক্লেশে পিতামাতার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে।

অন্নদা একদিন বুড়ী সাজিয়া সব ঘুঁটেগুলি একটি ঝুড়ী ভরিয়া রাখিলেন। হরি হোড় ঘুঁটে খুঁজিয়া পায় না। দেখিল, সব ঘুঁটে বুড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। হরি হোড় ভাবিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বুড়ীর অনুগ্রহ হইল। সে হরি হোড়কে ডাকিয়া বলিল, আমি বুড়ী হইয়াছি, এত ভার বহিতে পারি না, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া বহিয়া দাও, আমি অর্দ্ধেক ভাগ দিতে পারি। হরি হোড় বাঁচিয়া গেল। কিন্তু

হরি হোড়ের কুটীর অবধি আসিয়া বুড়ী আর চলিতে পারে না—সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। হরি হোড বলিল, আমরা আপনার অন্নসংস্থান করিতে পারি না, অতিথিসৎকার করিব কি দিয়া? তখন বুড়ী বলিল. সে জন্য ভাবনা নাই, অন্নপূর্ণার নাম লইয়া হাঁড়ী পাড দেখি,

হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥

তাহাই ঘটিল। হরি হোড় তখন বুড়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। অন্নদা পরিচয় দিবার পূর্ব্বে হরি হোড়ের হস্তে একখানি ঘুঁটে দিলেন। ঘুঁটেখানি হেমঘুঁটে হইল। হরি হোড় অবাক্। দেবী তখন আপন পরিচয় প্রদান করিয়া হরি হোড়কে বর চাহিতে আজ্ঞা করিলেন।

হরি হোড কহে মা গো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে এই দেহ বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥

অন্নদা তথাস্তু বলিয়া আসিলেন।

গৃহে আসিয়া—

ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায়॥

অবশেষে উপায় স্থির হইল। বৃদ্ধকালে হরি হোড়কে সোহাগীনাম্নী একটি রূপসীর সহিত গৌরী বিবাহ দিয়া দিলেন। হরি হোড়ের ঘরে সোহাগীর শুভাগমন পর্য্যন্ত

নিত্য কোন্দল ঝগড়া আরম্ভ হইল। অন্নদা নিজে কোন্দলপটু হইলেও পরের কোন্দল সহিতে পারেন না। হরি হোড়ের গৃহ ছাড়িবার পন্থা বাহির করিলেন। হরি হোড়—

একদিন পূজায় বসিয়া ধ্যান ধরে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরি হোড় যাহ যাহ বলে॥
এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥

কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে শুধু চণ্ডী আর অন্নদা নহেন—যে কয়টি দেবতা আছেন, এক একটি চণ্ডী। অষ্টপ্রহর কেবল আপন পূজা গণিয়া কাটান—কে মানিল না মানিল, কে ভক্তি করে, কে করে না, কে খুসী, কে নারাজ। চাল কলা নৈবেদ্য আর গোটা দুই প্রণাম পাইবার লোভে ইহাঁরা করিতে না পারেন, হেন কাজ নাই। শুধু তাই নয়। এইগুলি না পাইলে বিষম ক্ষাপা। অদৃষ্টও তেমনি। এক একজন বিদ্রোহী জুটিয়া যায়, তাহারা কিছুতেই বশ মানে না। মানব হইয়া দেবতাকে গালি পাড়ে, হেতাল হস্তে দেবতার মাথা লইবে বলিয়া বাড়ী বাড়ী ফিরে। দেবতা বেচারীকে হেতালের ভয়ে সাত হাত তফাতে থাকিতে হয়—যে পাড়ায় হেতাল আছে, তাহার ত্রিসীমায় ঘেঁসিবার জো নাই। তাই বলিয়া দেবতার সহিত লোকে অবশ্য চিরদিন আঁটিয়া উঠিতে পারে না—তাঁহাদের কত দুর্ভেদ্য ফন্দি আছে! নৌকা ডুবাইয়া, না হয় ছেলে কয়টাকে শিঙ্গা ফুঁকাইয়া দিবেন। তাহাতেও না হয়, সর্ব্বস্বান্ত করিবেন। দুর্ব্বল মানবশিশুকে জব্দ করা বৈ ত নয়—একটা না একটা উপায় খাটিয়া যাইবেই।

চাঁদ সদাগরকে লইয়া মনসা দেবী কি না করিয়াছেন? সেও বশ মানিবে না—তিনিও ছাড়িবেন না। মনসার সহিত তাহার নিরন্তর ঝগড়া বাধে। এবং

দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাঁহারে॥
মনস্তাপ পায় তবু না নোওায় মাথা।
বলে চেঙ্গমুড়ী বেটী কিসের দেবতা॥
হেতাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফিরে।
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে।

বলে একবার যদি দেখা পাই তার।
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর ॥
আপদ্ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি।
পরম কৌতুকে হবে রাজ্যেতে বসতি ॥

কিন্তু আপদ্ সহজে ঘুচে না। সদাগর সাত ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যে বাহির হইয়াছে, মনসা সন্ধান পাইয়াছেন।

নেতা লইয়া যুক্তি করে জয়বিষহরি।
মম সনে বাদ করে চাঁদ অধিকারী ॥
নিরন্তর বলে মোরে কাণী চেঙ্গমুড়ী।
বিপাকে উহারে আজি ভরাডুবি করি ॥
তবে যদি মোর পূজা করে সদাগর।—ইত্যাদি।

সদাগর সর্ব্বস্বান্ত হইল। তথাপি মনসার প্রতি তাহার বিদ্বেষ গেল না। মনসাও জুলুম করিতে ক্ষান্ত হয়েন না। ভিক্ষার উপরে সাধুর নির্ভর, গণেশের মূষিক ধার করিয়া আনিয়া তিনি তাহার ভিক্ষার অন্ন খাওয়াইয়া দেন। নিজের বাড়ীতে গিয়া চাঁদ বেণে মনসার অনুগ্রহে ঠেঙ্গা খাইয়া মরে। মনসা গণকের বেশ ধরিয়া সাধুর স্ত্রীকে মিছামিছি বলিয়া আসিয়াছেন যে, আজ তোমার বাড়ী চুরি হইবে, সন্ধ্যার পর কলাবনে আসিয়া চোর অপেক্ষা করিবে, সেই সময় তাহাকে ধরিয়া ঘা কতক বসাইয়া দিও। সে দিন সন্ধ্যার সময় সদাগর আসিয়া উপস্থিত—পরিধানে ছেঁড়া টেনা—স্থতরাং লজ্জায় বেচারী আলো থাকিতে ঘরে ঢুকিতে পারে নাই। সনকা বেণেনী যথাসময়ে আসিয়া মনসার কথামত ব্যবস্থা করিল—সদাগরের পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিল। এই শেষ নহে। বেণেকে প্রতি পদে মনসা জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছেন। অনেক দিনের পর সদাগরের একটি পুত্র জন্মিল—নখীন্দর। সদাগর বেহুলা বলিয়া একটি রূপসী পাত্রী স্থির করিয়া তাহারই সহিত নখীন্দরের বিবাহ দিলেন। মনসার কোপে বাসরেই নখীন্দরের মৃত্যু হইল। কিন্তু সদাগর বুলি ছাড়িল না। অবশেষে বহু দিন পরে বেহুলার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মনসা চাঁদ সদাগরের পুত্র এবং ধন রত্ন সমুদয় ফিরাইয়া দিলেন। তখন চাঁদ বেণে মনসার পূজা করিল।

বেহুলার সেবার একটু বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক। তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবলোকের আরও কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেবলোক যতটুকু দেখা গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, সেখানে পৃথিবীর কোন দৌরাত্ম্যেরই অভাব নাই—গালাগালি মারামারি হিংসাদ্বেষ অত্যাচার অবিচার বিভ্রম

বিলাস, সকলই ষোল আনা আছে, অধিকন্তু সেখানকার ঋষিরাও নাচের মজলিসে সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। মনসার ভাসানে দেবতাদের ঘরের খবর কিছু কিছু পাওয়া যায়। দেবতারা কি কাপড় পরেন, তাঁহাদের ধোপানী কে, সে কি দিয়া কাপড় কাচে ইত্যাদি ইত্যাদি। বেহুলা ত এই ধোপানীর সাহায্যেই কার্য্য উদ্ধার করে। নেতা ধোপানীকে সে মাসী বলিয়া ডাকে, দেবতাদের কাপড় দুএকখানা কাচিয়া দেয়, এমনি করিয়া ভাব-সাব করিয়া থাকে। ধোপানী বেহুলার কাচা থান দুই কাপড় লইয়া গিয়া একদিন দেবসভায় উপস্থিত। সে দিন কিছু পরিষ্কার কাচা হইয়াছে দেখিয়া দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগা বাছা, তুমি এত দিন কাপড় কাচিয়া আসিতেছ, এমন সুন্দর ত কোনও দিন হয় নাই—আজ হইল কিরূপে? নেতা বলিল, আমার বোনঝি আসিয়াছে, এ কয়খান কাপড় সেই কাচিয়াছে। তখন—

মহেশ বলেন নাহি দেখি এত দিন।
তোমার বোনঝি মোর হইল নাতিন॥
দেবতাসভায় আন দেখিব কেমন।
ধোপানী এ কথা শুনি করিল গমন॥

পরে বেহুলাকে সে সঙ্গে করিয়া দেবসভায় লইয়া গেল। সেখানে বেহুলার নৃত্য দেখিয়া দেবগণ পরিতুষ্ট হইলেন। এখন মনসাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিলেই হয়। নেতা ধোপানী মনসার প্রিয়সখী—অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া মনসাকে দেবসভায় লইয়া আসিল। দেবতারা পাঁচ জনে বেহুলার হইয়া ওকালতি করিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর ফল ফলিল। কিন্তু মনসার তরফে ইনাইয়া বিনাইয়া ন্যাকামি করিবার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, বলা বাহুল্য। একে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা, তাহাতে আবার নারী!

বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবতাদের কিছুমাত্র সম্ভ্রম নাই। বিলাসিতা সংস্কৃত স্বর্গেও কম নহে। দেবচরিত্রে এ কলঙ্ক বহুদিনের। অমরাবতীর বড় কর্ত্তাটির অপকীর্ত্তি ত সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতাগুলির মত 'খেলো' অপদার্থ চরিত্র কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের বড় বড় সম্ভ্রান্ত দেবগণ—যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—বাঙ্গলা দেশে আসিয়া পদমর্য্যাদা একেবারে হারাইয়াছেন। নেতা ধোপানীর সহিত 'ইয়ারকি' দিতে হইলে সম্ভ্রম বজায় রাখা বোধ করি কিছু কঠিন হইয়া পড়ে। চরিত্রের বল থাকে না। অন্নদামঙ্গলের শিব মদনের এক বাণে একেবারে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য। মদনকে ভস্ম করিয়াছেন নিতান্তই যেন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরোধে।

ভাগ্যে ভাগ্যে নারদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নারদ গৌরীর সন্ধান দিলেন।

শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার।

নারদ আশ্বাস দিলেন। কিন্তু

কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা।

"বাবা" সে দিন চলিলেন না—তাঁহার ত আর দায় নয়। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই বিবাহের সব স্থিরস্থার হইয়া গেল। এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে শিব বিবাহ করিতে আসিলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার—হুলাহুলির ধুম। এ দিকে বাঘছাল খসিয়া পড়ে—শিবের হুঁস নাই। মেনকা নারদের উদ্দেশে গালি পাড়িতে সুরু করিলেন,

হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়॥
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

ভারতচন্দ্র ভরসা দিয়াছেন—

কোন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক।

যাহা হৌক, বিবাহ করিয়া শিব গৌরীকে লইয়া আসিলেন। সিদ্ধিঘোটনের ধুম পড়িয়া গেল। তাহার পর হরগৌরীর কথোপকথন। শঙ্কর দেবীকে বলিতেছেন—

অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥

গৌরী পুরুষজাতির একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া বলিলেন—

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

দেবতাদের এই অবস্থা! পুরুষ মহলে ভাঙটুকু ধুতুরাটুকু খাওয়া আছে, মজলিসে নাচটা আশটা দেওয়া আছে, এবং আনুষঙ্গিক দোষেরও ত্রুটি নাই; স্ত্রীমহলে ঝগড়া কোন্দল—এখানকার প্রথিতনামা পাড়াকোন্দলীরাও তাহার নিকট হার মানেন। দেবলোকে সবই আছে—নাই শুধু সুগভীর প্রেম, সামান্যতম ত্যাগস্বীকার, কোনরূপ উচ্চ আদর্শ। না থাকিবারই কথা—মারণ উচ্চাটন বশীকরণে আমাদের সমস্ত হৃদয় তখন জোড়া—উচ্চ আদর্শ ঠাঁই পাইবে কোথায়? রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র শিথিল—কেবলি রাজা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ এবং সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ। সামাজিক আদর্শও এই শাসনীনীতিরই প্রভাবে গঠিত।

এখন কাল ফিরিয়াছে। সে সহস্র খুচরা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব নাই। এক বৃহৎ নিয়মতন্ত্রের অধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ একচ্ছত্র—এক রাজা, এক নিয়ম, সহস্র রাজপুরুষ একই সম্রাটের সহস্র বাহু। এবং এই বিপুল রাজশক্তি সমস্ত প্রজার সুনিয়ত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা এবং শান্তি। বিচিত্র বিভিন্ন শক্তি এক বৃহৎ শক্তিতে নিমগ্ন এবং এক মূল শক্তি সহস্র বিরোধী শক্তিকে নিয়ত নিয়মিত করিতেছে। এই রাজনৈতিক প্রভাবে সমাজতন্ত্রও নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। উপধর্ম্ম এবং উপদেবতার প্রভাব প্রতি দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক মহান্ ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মাধীনে আমরা এক হইয়া দাঁড়াইতেছি। আমাদের নূতন আদর্শ, নূতন আশা, নূতন উদ্যম।

'সাধনা', শ্রাবণ ১২৯৯

কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা

অলঙ্কারের নির্দ্দেশানুসারে মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইলেও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের সহিত কালিদাসের রঘুবংশের একটা বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কোনও মূল ঘটনা বা প্রধান চরিত্রের প্রভাব লক্ষিত হয় না—কেবলি ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত। দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত ভালমন্দ অনেকগুলি রাজা—কেহ পুত্রাকাঙ্ক্ষায় তপোবনে ধেনু চরাইয়া বেড়ান, কেহ দিগ্বিজয়ী ধনুর্দ্ধর, কেহ প্রিয়বিরহে বিলাপ করিয়া আকুল, কেহ পিতৃসত্য-পালনার্থে বনে বনে ফিরেন, কেহ বা প্রমদাজনবেষ্টিত হইয়া অহর্নিশি সুরাপানে কালক্ষয় করেন—প্রত্যেকের জীবনের মূল ঘটনা স্বতন্ত্র এবং কালভেদে একের জীবনের সহিত অপরের জীবনের ঘটনার বড় সম্পর্ক নাই। যোগ এই পর্য্যন্ত যে, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এবং এইরূপে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক বংশাবলী।

রামায়ণ মহাভারত এরূপ কুলজী নহে। কুলের কথা তাহাতে অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়াছে মাত্র। সমগ্র কাব্যখানি সেই সূত্রে গ্রথিত বলা যায় না। কবির হৃদয়ে মনুষ্যত্বের যে চরম আদর্শ জাগিয়াছিল, সেই আদর্শকে মূর্ত্তি দিয়া তিনি রামকে গড়িয়াছেন। এবং রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলিও রামেরই আনুষঙ্গিক।

মহাভারতে যেমন ঘটনারও অন্ত নাই, লোকেরও অন্ত নাই—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,

শত ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ—বিস্তর বড়লোক এবং প্রত্যেকেরই নিজত্ব বিশেষ পরিস্ফুট। কিন্তু এই বিবিধ ছোট বড় ঘটনা এবং বিচিত্র প্রধান অপ্রধান চরিত্রসমাবেশ কুরুক্ষেত্র-ব্যাপারেরই সূচনা। প্রতি ঘটনা এই মহা-প্রলয়ের পূর্ব্বায়োজন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রলয়ের রঙ্গভূমিতে অভিনেতা।

রঘুবংশের বিষয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিবস্বৎকুলের বর্ণনা। কোন মূল ঘটনাও নাই, বিশেষ নায়কও নাই, এবং রাজচরিত্রের একটা আদর্শস্থাপন কিম্বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যও দেখা যায় না। তবে এত বিষয় থাকিতে এক প্রাচীন বংশাবলী বর্ণনায় কবির এত উৎসাহ কেন?

ইহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনায় কালিদাসের একটু যেন বিশেষ আনন্দ ছিল। শম্বুক যেমন অতি সহজেই আপনার চারি দিকে বিচিত্র চিত্রিত আবরণ নির্ম্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমনি দেখিতে দেখিতে আপনাকে চিত্রময় শ্লোকে আবৃত করিয়া তোলে। ভবভূতি যেমন মানবপ্রকৃতিকে করুণারসে বিগলিত করিয়া লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে ভালবাসিতেন, কালিদাস তেমনি মানবপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতিকে চিত্র-আকারে পরিস্ফুট করিতে ভালবাসিতেন। রঘুবংশের ন্যায় প্রায়-অসংলগ্ন সর্গপরম্পরায় এই ছবি আঁকিবার অনেকটা অবসর পাওয়া যায়। একটা চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয়, সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেইরূপ হয়। অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ভাল ভাল ছবি।—দিলীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের মৃগয়াগমন। রামসীতার রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ। এইগুলি ছবি—বাকি সমস্তই ফ্রেম।

রঘুবংশে চরিত্র যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল বর্ণনা মাত্র, চরিত্র রচিত হয় নাই। দিলীপের গুণগ্রাম কালিদাস নীতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র—অন্য নৃপতিদিগকেও সর্ব্বাঙ্গীণভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিবার তেমন চেষ্টা হয় নাই। কেবল ছবিগুলির প্রতিই কালিদাসের টান।

এবং কালিদাস ক্রমাগতই চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়াছেন। অনেক স্থলে একই পথবর্ণনার এক-একটি শ্লোকে এক-একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পথ কখনও গ্রামের প্রান্ত দিয়া, কখনও বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—স্নিগ্ধ-গম্ভীরনির্ঘোষ এক স্যন্দনে বসিয়া রাজা ও রাণী এই পথে গুরুগৃহে চলিয়াছেন। পথের দুই ধারে কোথাও স্যন্দনবদ্ধদৃষ্টি হরিণমিথুন, কোথাও রথনেমিস্বনোন্মুখ ময়ূরদল, গ্রামপ্রান্তে মধ্যে মধ্যে ঘৃতভাণ্ডহস্তে ঘোষবৃদ্ধেরা রথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়—

রাজা তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, রাজদর্শনে প্রীত হইয়া তাহারা গৃহে ফিরে।

এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে রাজা দিলীপ সস্ত্রীক বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরাবিল তপোবন—কালিদাসের কল্পনার প্রিয় বিহারভূমি। উজ্জয়িনীর নাগরিকতা হইতে তিনি যেন এইখানে আপন মানসী আশ্রমে আসিয়া বিশ্রামলাভ করেন। কিন্তু এ তপোবনে তপস্যার কঠোরতা বড় নাই—কেবলি একটি পবিত্র হোমধূমাচ্ছন্ন নির্জ্জন গৃহাশ্রম। এখানে ঋষিপত্নীরা ব্রত আচরণ করেন, বিকালবেলায় উটজদ্বারে দাঁড়াইয়া অপত্যবৎ হরিণযূথকে নীবার রোমন্থ করিতে দেখেন, ঋষিকন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটহস্তে আলবালে জলসেক করিয়া থাকেন এবং সেকান্তে আলবালাম্বুপায়ী বিহঙ্গগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত দূরে সরিয়া দাঁড়ান। এখানে কেবলি স্নেহ দয়া মায়া, রমণীর শুভ্র কোমলতা—দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, সিংহাসন এবং চক্রান্ত নাই—শুধু শান্তি এবং সন্তোষ। কালিদাস ইহাই উপভোগ করেন—সরল হৃদয় এবং পবিত্র প্রীতিভাব, বিকশিত সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য এবং সুডোল নিটোল গঠন, নিরলঙ্কার রমণীয়তা এবং বল্কলবদ্ধ বিমল যৌবন।

রাজদম্পতি এই তপোবনে পর্ণশালায় থাকিয়া ধেনুর সেবা করেন। প্রত্যহ প্রভাতে নন্দিনীকে লইয়া বনে বাহির হন এবং সায়ংকালে ঝিল্লীমুখরিত বনপথ দিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসেন। একদিন সহসা দেখিলেন, নন্দিনী নিকটে নাই—অদূরে শৈলগহ্বরের সম্মুখে এক সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—নন্দিনী কাতরদৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চাহিয়া। রাজা ধনুতে শরযোজনা করিলেন—নন্দিনীর মায়াপ্রভাবে তাঁহার হস্ত অসাড়—ধনুর্ব্বাণহস্তে যেমনটি, তেমনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালিদাসও চিত্রিতবৎ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কেবল একটি সুন্দর চিত্র হিসাবেই ইহার সৌন্দর্য্য।

অবশেষে নন্দিনী প্রীত হইয়া রাজাকে অভিলষিত বর প্রদান করিল। গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনাদি করিয়া সস্ত্রীক দিলীপ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অল্পদিনমধ্যেই সুদক্ষিণার দোহদলক্ষণ দেখা দিল।

সুদক্ষিণা যখন অন্তঃসত্ত্বা, কালিদাস দিলীপের অন্তঃপুরে গিয়া এক এক বার মহিষীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। এবং গর্ভিণীর পাণ্ডু মুখশ্রী, মন্থরগতি, অলসভাব—পরিপূর্ণা দোহদশ্রী—এক আধটি মৃদু উপমায় চিত্রিত করিয়াছেন; কোথাও উষাকালীন ক্ষীণপাণ্ডু শশীর সাদৃশ্যে; কোথাও বা পুরাতন পত্রাপগমে সন্নদ্ধমনোজ্ঞপল্লবা লতিকার সহিত তুলনায়।

শুধু ইহাই নহে, দু' একটি নিভৃত সুন্দর দাম্পত্য চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। সন্তানসম্ভাবনায় মহিষীর আদর বাড়িয়াছে—রাজা যখন তখন অন্তঃপুরে আসিয়া প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, কি খাইতে ইচ্ছা করে, কি পরিতে সাধ যায়, ইত্যাদি। এবং ঘন ঘন সুদক্ষিণার মৃৎসুরভি আনন আঘ্রাণ করিয়া দিলীপের আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মে না।

এই দোহদচিত্র রঘুবংশে আরও দু' এক স্থলে দেখা যায়। রামচন্দ্রও একদিন আলেখ্যগৃহে বসিয়া অঙ্কনিষণ্ণা সীতাকে এমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কি সাধ যায়; এবং তদুত্তরে সীতা—বোধ করি, চতুর্দ্দিকের বনবাসবৃত্তান্তালেখ্য-দর্শনে—আর একবার সেই ঋষিকন্যাপরিবৃত তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দিলীপ রাজ্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রঘু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশদেশান্তরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তখন শরৎকাল। উজ্জ্বল দিন। দূরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে ইক্ষুচ্ছায়ায় বসিয়া কৃষকাঙ্গনারা গ্রাম্য কবিরচিত রঘুকর্ত্তৃক ইন্দ্রবিজয়গাথা গাহিতেছে। রাজধানী সুরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শুভ দিনে শুভ ক্ষণে রঘু সেনাদল সহ যাত্রা করিলেন। পৌরাঙ্গনারা চতুর্দ্দিক্ হইতে লাজরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল।

চতুরঙ্গ সেনা যেখান দিয়া যায়, ধূলায় আকাশ ছাইয়া ফেলে। মাতঙ্গকুল শুণ্ডের দ্বারা বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে থাকে—বন উজাড় হইয়া যায়। জয়োল্লাসমত্ত রঘুসেনা কোথাও পার্ব্বত্যপ্রদেশে পানভূমি রচনা করিয়া তাম্বুলপত্রপুটে নারিকেলসুরাপানে কালহরণ করে। কোথাও নৌসেতু বাঁধিয়া, কোথাও বা হস্তিপৃষ্ঠে রঘু সসৈন্যে নদী পার হয়েন। এবং মদমত্ত সেনাগজগণের অবগাহনে সরিৎসকল মদগন্ধে আকুল হইয়া উঠে।

তাহার পর স্বয়ম্বরসভা। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভায় ভারতের যত সম্ভ্রান্ত নরপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন, কালিদাস প্রত্যেকের এক একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। এই রাজগণ-বর্ণনার মধ্যে দু' একটি মৃদুস্পর্শ টান দিয়া রূপসীর রূপের আভাসে তিনি চিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতিহারিণী সুনন্দা মগধ-ঈশ্বরের বর্ণনা করিতেছে—মগধরাজ বহু যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে নিজগৃহে রাখিয়াছেন এবং সেই অবধি বিরহিণী শচীর কেশবিন্যাস বন্ধ। দেবাঙ্গনাবাঞ্ছিত অঙ্গদেশাধিপতির বর্ণনা—অঙ্গরাজ যখন শত্রুদিগকে বধ করিলেন, তাহাদের রমণীরা মুক্তাহার ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে বসিল এবং মুক্তাফলস্থূল অশ্রুবিন্দু তাহাদের স্তনদেশে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ

করিয়াছিল। দুর্ব্বিষহতেজ মথুরাধিপ সুষেণ স্নিগ্ধকান্তি এবং নয়নাভিরাম—জলক্রীড়াকালে তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণের স্তনচন্দনপ্রক্ষালনে কালিন্দীর নীল জল যেন শুভ্র গঙ্গোর্ম্মিসংযুক্ত হইয়া শোভা পায়। ইন্দুমতী একে একে নমস্কারপূর্ব্বক সকলকেই সসম্ভ্রমে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রমে অজের নাম; সুনন্দা বলিতে লাগিল—ইহারই পিতামহ দিলীপ, যাঁহার শাসনে পথিমধ্যে নিদ্রিতা নর্ত্তকীর অঙ্গবসন উড়াইতে বায়ুও সাহস করিত না, পিতা রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে মৃণ্ময় পাত্র রাখিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন, এবং কুলে শীলে রূপে গুণে নবীন যৌবনে ইনি তোমার তুল্য বর, ইহাঁকে বরণ কর, রতনে কাঞ্চনে মিলন হউক্। অজের গলদেশে বরমাল্য শোভা পাইল।

কেবলি রূপের তরঙ্গ। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর পর রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সমগ্র প্রকৃতি অনুকূল প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিত মায়ারাজ্য—রূপযৌবনসমাচ্ছন্ন এবং রমণীয়।

রাজা দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন, তখন কোথায় অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহিতধ্বনিতে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইবে, না—কালিদাস, স্ত্রী এবং বসন্ত এবং ললিত আদিরসে মৃগয়াকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বসন্তকাল, গাছে গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে কোকিলকূজন, ফুলে ফুলে ভ্রমরগুঞ্জন, মৃদু মলয়ানিল, এবং মদনশরজর্জ্জর বিলাসবিভ্রম, পতির সহিত অঙ্গনাগণের বকুলমদ্যপান, ঢলাঢলি গলাগলি। রূপসী নহিলে মৃগয়া হয় না—অধরসুধার উত্তেজনা, নূপুরনিক্কণের উদ্দীপনা এবং মদনশরের পরিচালনা ইহার প্রধান অঙ্গ।

রামায়ণের মৃগয়াবর্ণনা হইতে কালিদাসের মৃগয়াচিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রামায়ণে এ সকল ললিত বর্ণনা কোথাও নাই। দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন, তখন তিনি যুবরাজ এবং অবিবাহিত। অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার নিকট দশরথ এই মৃগয়াবৃত্তান্ত বলিতেছেন—

"দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য ভূমির রস আকর্ষণপূর্ব্বক কঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পরিতপ্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে, তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া গেল; স্নিগ্ধ মেঘ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল। ভেক, চাতক ও ময়ূরগণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখাসকল বৃষ্টির পতনবেগ ও বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গেরা বর্ষাজলে স্নাত ও পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে অতি কষ্টে তথায় গিয়া আশ্রয় লইল। মত্ত ময়ূরশোভিত পর্ব্বত নিরন্তর-নিপতিত

জলধারায় আচ্ছন্ন হওয়াতে জলরাশির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। জলস্রোত স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ডুবর্ণ, কোথায় রক্তবর্ণ, কোথায়ও বা ভস্মমিশ্রিত হইয়া তথা হইতে ভুজঙ্গবৎ বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবি! এই সুখময় কালে মৃগয়াবিহারে আমার ইচ্ছা হইল। তখন আমি রাত্রিযোগে নিপানে জলপানার্থে আগত মহিষ, হস্তী বা যে কোন জন্তু হউক, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শর শরাসন গ্রহণ ও রথারোহণপূর্ব্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আবৃত হইলে, ঐ অদৃশ্য সরযূর জলমধ্যে করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণরব শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার হস্তী বোধ হইল। তখন আমি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ সুতীক্ষ্ণ শর তূণীর হইতে গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম।"*

রামায়ণের এই মৃগয়াবর্ণনার পার্শ্বে কালিদাসের মৃগয়া সৌখীন বিলাস মাত্র। কালিদাস মৃগয়াবলম্বনে কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্র ফুটাইতে চাহেন বৈ ত নয়। রামায়ণের এই বর্ষাবর্ণনায় বাল্মীকি সেই অন্ধকার কালরাত্রির ভয়ঙ্করী ঘটনার পূর্ব্বসূচনা করিয়াছেন। বাল্মীকির চিত্রে একটি গম্ভীর ভীষণতা ব্যক্ত হয়। কালিদাসের চিত্র উজ্জ্বল এবং মধুর।

ভবভূতি হইলে মুনিপুত্রবধ লইয়া এইখানে অনেক করুণরস উদ্রেক করিতেন। বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া তিনি ঘন বর্ষার একটি গম্ভীর দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেন এবং সেই অন্ধকার দৃশ্যপটে ধনুর্ব্বাণহস্ত দশরথের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেন। এবং বাণবিদ্ধ ঋষিবালকের করুণ বিলাপে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিত।

কালিদাস করুণরসে এমন পটু নহেন। দশরথের মৃগয়ায় মুনিপুত্রবধ ব্যাপারকে তিনি বড় প্রাধান্যই দেন নাই। যেখানে বা তাঁহার করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সেখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য চিত্রবিন্যস্ত। শোকের মধ্যেও তিনি রূপ এবং যৌবন, বিলাস এবং বিভ্রম চিত্রিত করেন, এবং এই রূপযৌবনবিভ্রমবিলাসের স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ বিলাপ রচিত হয়। প্রেয়সীর মৃতদেহ কোলে করিয়া অজ যেখানে বিলাপ করিতেছেন—ইন্দুমতীর চারু বিলাসগমন; নূপুরনিক্কণসহিত অশোকতরুতে মৃদু পাদতাড়ন; কোথাও অসমাপ্ত মালাগাঁথার কাহিনী; ললিত কলাবিদ্যায় তাঁহার নিপুণতার কথা; কোথাও বা রূপসীর রূপের অতি মৃদু আভাস; কোথাও একটি সুন্দর

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

উপমা—এমন করিয়া বলা যে, শুনিলেই মনে একটি চিত্র ফুটিয়া উঠে; শ্লোকের পর শ্লোক কেবলি চিত্রবিন্যাস।

সমস্ত রঘুবংশটিই এইরূপ চিত্রপরম্পরা। হৃদয়াবেগ অপেক্ষা চিত্রসৌন্দর্য্যই কালিদাসের কাব্যে সমধিক অভিব্যক্ত। এবং ঘটনা যৎসামান্য অবলম্বনে বর্ণনা বিচিত্র। রাম যখন সীতাকে লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, ঘটনা কিছুই নাই—কেবল আকাশপথে একখানি রথ চলিয়াছে এবং সেই রথে বসিয়া অযোধ্যার রাজদম্পতি। কিন্তু পথ দীর্ঘ এবং সমুদ্র নদনদী পাহাড় পর্ব্বতে দৃশ্য বিচিত্র। সুতরাং চিত্ররচনার এই অবসর। প্রথমেই সমুদ্রবর্ণনা—কতকগুলি চিত্র—কোথাও সেতুবন্ধে ফেনিল অম্বুরাশি আছাড়িয়া পড়িতেছে, কোথাও আকাশে সাগরে মিশাইয়া গিয়া এক অনন্ত বিস্তার, কোথাও তমালতালীবনরাজিনীলা দূর বেলাভূমি, কোথাও বা গুটিকতক পৌরাণিক স্মৃতি—বিস্মৃত সগরকাহিনী, পুরাতন মন্থনকথা—এবং ইহারই মধ্যে যেখানে অবসর ঘটিয়াছে, সুবিধামত একটু আধটু অধরপানের প্রসঙ্গ। ক্রমে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া রথ জনস্থানের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে দেখাইতেছেন;—এই সেই স্থান, তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যেখানে আসিয়া তোমার চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখে বদ্ধমৌন একটি নূপুর কুড়াইয়া পাই; এই পর্ব্বতশৃঙ্গে একদিন—মনে পড়ে কি?—গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে পতির গাঢ় আলিঙ্গনমধ্যে মুদ্রিতনয়নে আপনাকে লুকাইয়াছিলে; আর ঐ অম্বরলেখি গিরিশৃঙ্গে একদিন বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, কেকাধ্বনিতে কদম্বসৌরভে চারি দিক্ সমাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার বিরহে সে দিন আমার জীবন অসহ্য বোধ হইয়াছিল; এই পম্পাসরোবরে—অহো!—তুমি তখন নিকটে ছিলে না, আমি নির্নিমেষনেত্রে শুধু ঐ চক্রবাকমিথুনের নীরব প্রেমালাপ দেখিতাম; সাশ্রুনয়নে এই স্থানে একদিন স্তবকাভিনম্র অশোকলতাকে দেখিয়া পীনপয়োধরা জনকতনয়া ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হই—ভাগ্যে লক্ষ্মণ ছিল, সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিল; দূরে ঐ পঞ্চাপ্সরবিহারবারি—সমাধিভীত ইন্দ্র একজন তপস্বীকে এইখানে অপ্সরাগণের যৌবনকূটবন্ধে আবদ্ধ করেন; আর এই সেই সুতীক্ষ্ণাশ্রম—সুতীক্ষ্ণের নিকট সুরাঙ্গনাদিগের বিভ্রমচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, সহাসপ্রেক্ষিতদৃষ্টি এবং ব্যাজার্দ্ধসংদর্শিতমেখলা উভয়ই সফল হয় নাই; ঐ সরযূ দেখা যায়—তরঙ্গহস্তদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন জানাইতেছে। রথ আসিয়া থামিল। রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ করিলেন।

এত দিনে অযোধ্যার শ্রী ফিরিল। প্রাসাদসকল হইতে কালাগুরুধূম নির্গত হইতেছে—যেন রামচন্দ্র প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বহস্তে পুরীর বেণী মোচন

করিয়া দিয়াছেন। রাম একদিন প্রাসাদশিখরে উঠিয়া অযোধ্যাপুরীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বিলাসী বিলাসিনীরা প্রমোদ-উদ্যানে বিহার করিতেছে এবং সরযূ পণ্যবাহিনী তরণী-পরিপূর্ণা।

অগ্নিবর্ণের রাজত্বকালে এই বিলাস পূর্ণমাত্রায় উন্মুক্ত। রাজা বিলাসিনীপরিবৃত হইয়া অষ্টপ্রহর অন্তঃপুরেই থাকেন; প্রজারা তাঁহার দর্শন পায় না; রাজকার্য্য মন্ত্রিবর্গ সুসম্পন্ন করেন। অন্তঃপুরে নিত্য মন্মথোৎসব। রাজা কামিনীগণের সহিত জলবিহার করেন—জলে বিলাসিনীদিগের নয়নাঞ্জন ও অধরের কৃত্রিম রাগ ধুইয়া যায় এবং স্বাভাবিক মুখরাগ অগ্নিবর্ণকে অধিকতর প্রলোভিত করে। বিলাসিনীদিগের সহিত মনোরম পানভূমিতে বসিয়া তিনি বকুলের সুরা পান করিতে থাকেন এবং প্রমদাগণ-প্রদত্ত মুখাসবপানে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন। রাজার এক অঙ্কে বীণা, অপর অঙ্কে অঙ্গনা, এবং সম্মুখে অবিশ্রাম নর্ত্তকীর লাস্যলীলা। প্রমদা হইতে প্রমদান্তরে, বিলাস হইতে বিলাসান্তরে অগ্নিবর্ণ নিত্য রমণ করেন। বিপুল অন্তঃপুরেও কুলাইয়া উঠে না। লতাকুঞ্জে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া পরিজনাঙ্গনাগণের সহিত প্রমোদালাপে কালক্ষেপ করিতে যান। বাদ্‌শাহী বিলাসিতাও এখানে হার মানে। এবং এই উৎকট উন্মাদনা রাজযক্ষ্মাকারে ব্যক্ত হইয়া অল্পদিনমধ্যেই অগ্নিবর্ণকে ঐহিক প্রমোদের বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া লয়।

এইখানেই রঘুবংশের উপসংহার—এই বাদ্‌শাহী বিলাসের এক-সর্গ চিত্রপরম্পরায়। সুতরাং রঘুবংশ সম্বন্ধে আমাদের আর জানিবার বড় কিছু রহিল না। এবং এই ঊনবিংশ সর্গের মহাকাব্য হইতেই বোধ করি, কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।

কিন্তু ইহাই চরম নহে। কালিদাসের অন্য কাব্য আলোচনা করিলেও তাঁহার এই বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘদূতের মত অমন সামান্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া কেবল কাল্পনিক কথা লইয়া এমন একখানা সমগ্র কাব্য কালিদাসের পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না। কিন্তু কালিদাসের চিত্রপ্রিয় কবিপ্রকৃতি কেবল ছবি আঁকিবার জন্য আপন মনের মত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছে। যক্ষের বিরহবর্ণনা উপলক্ষ্য মাত্র।

মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল এই চিত্রপরম্পরায়। কুবেরানুচরের দীর্ঘ পথ, বর্ষা বিরহ এবং অভিসারের মায়ারচনা। প্রতি বিরহিণীর দুঃখবর্ণনায় যক্ষ আপন প্রেয়সীর বিরহবিধুর মূর্ত্তি আঁকিয়া বাঁচে, প্রবাসীর কথায় মেঘের নিকট আপন হৃদয় খুলিয়া দেখায়। অলকার প্রমোদবিলাস বর্ণনা করে—প্রতিযোগিতায় তাহার বিরহ যেন সমধিক ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কেবলি চিত্র—ছবির পর ছবি।

এইরূপ চিত্র আঁকিতেই কালিদাস কিছু ভালবাসেন। বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকারে লঘুগতি অভিসারিকা; মুক্ত বাতায়নে বসিয়া একবেণী বিরহিণী—উৎসঙ্গে বীণা পড়িয়া রহিয়াছে, মুখের গান মুখেই রহিয়া গিয়াছে, এবং চারি দিক্ হইতে শুধু মেঘমন্দ্রস্বরে শ্রাবণ ঘনাইয়া আসিতেছে; প্রবাসী রামগিরিশিখরে দাঁড়াইয়া মেঘের পানে চাহিয়া—মেঘ যদি দৌত্য-কার্য্য করে!

কুমারসম্ভবও কতকগুলি ছবি। প্রথমে হিমালয়ে বালিকা গৌরী। দ্বিতীয়তঃ শিবের তপোবনে যুবতী গৌরী। তৃতীয়তঃ গৌরীর তপোবনে বৃদ্ধ শিব। চতুর্থতঃ শিবের বিবাহ।

রতিবিলাপেও করুণরসে কালিদাসের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই– তাহা নৈপুণ্যপরিপূর্ণ, কেবল মাঝে মাঝে এক একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমেই কালিদাস রতিকে এক কথায় আঁকিয়া তুলিলেন—রতি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী। রতির আর বাঁচিবার সাধ নাই—স্বামীর অনুগমন ভিন্ন তাহার জ্বালা জুড়াইবে না। সেই রতি বিলাপ করিতেছেন,

রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়াঃ
ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ॥
নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্
বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ
প্রমদানামধুনা বিডম্বনা॥ ইত্যাদি।

পরে পরে কতকগুলি ছবি—ঘন-অন্ধকার রাজপথে ঘনগর্জ্জনভীতা একাকিনী অভিসারিকা, বারুণীমদ্যপানে অরুণনয়না স্খলিতবচনা প্রমদাজন, তাহার পর জ্যোৎস্না কোকিল মলয় লইয়া বসন্ত; কিন্তু মদনাভাবে এই সকলই নিষ্ফল—অতএব, হে মদন, তুমি ফিরিয়া আসিয়া ইহাদের গতি কর।

এ পর্য্যন্ত কালিদাসের প্রতিভার যে বিশেষত্ব দেখা গেল, শকুন্তলায় ইহার পূর্ণ বিকাশ। বহিঃপ্রকৃতিতে চিত্রকরের মানসী প্রতিমা এইখানে যেন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য চিত্রগুলি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ।

প্রথমেই রথযাত্রা। রাজা দুষ্মন্ত রথারোহণে দ্রুতগামী কৃষ্ণসারের অনুসরণ

করিয়াছেন, মৃগ প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং মনোহর গ্রীবাভঙ্গসহকারে মুহুর্মুহু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে। রথের গতিবেগ এত দ্রুত যে,

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্‌বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥

ইহা নাট্যকলার বিরোধী। কারণ, অতিদ্রুত রথযাত্রা এবং তদবস্থায় রাজা ও সারথির কথোপকথন দৃশ্যকাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু কেমন ছবি!

তাহার পর তপোবনবর্ণনা। ক্রমে, আলবালে ঋষিকন্যাদের জলসেচন এবং রাজাকর্ত্তৃক গোপনে তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ; শকুন্তলার নিবিষ্টচিত্তে রাজার ধ্যান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ; শকুন্তলার বিদায়; রাজসভার দৃশ্য; অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্ত রাজার উৎকণ্ঠা ও দূরে মহিষীর গান; সিংহশিশুর সহিত বালকের খেলা ও শিশুচিত্র।

এইগুলি একখানি ছবি নহে—ইহারই এক একখানি অনেকগুলি ছবির সমষ্টি। শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত যেন তুলি দিয়া আঁকা যায়। চিত্রকর যেমন রূপসীকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এবং নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন, কালিদাস সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্যে এবং বিবিধ ভাব ও ভঙ্গীতে যত রকমে সম্ভব, শকুন্তলার সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। কোথাও বা কুরবকশাখায় বল্কল বদ্ধ হইয়া যায়, কোথাও বা প্রিয়সখী বল্কলের দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, কোথাও অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সুন্দরীর নব কিসলয়বৎ রূপলাবণ্য ফুটিয়া পড়ে; সৌন্দর্য্যের কবি সৌন্দর্য্য ফুটাইতে ব্যাকুল—একটি বাহুভঙ্গী, একটি হৃদ্‌স্পন্দন, পাণ্ডু মুখকমলে অতি ক্ষীণ মৃদু অরুণিমা-সঞ্চার এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টির নিবিড় চাঞ্চল্যটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না। যেখানে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন—যেমন "স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ" আসিয়া শকুন্তলাকে লইয়া যাওয়া—সেখানেও কেবল একটি সুন্দর চিত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা যদিও নাটক এবং উহার মধ্যে প্রকৃতিতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ তত্ত্ব থাকিতে পারে, তথাপি শকুন্তলা আমাদের মনে প্রধানতঃ কতকগুলি চিত্রশ্রেণী টাঙ্গাইয়া দিয়া যায়। আমরা যে শকুন্তলার ঘটনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাই, তাহা নহে; বরঞ্চ উহার স্থির মুহূর্ত্তগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখে—নাটকটি অগ্রসর

হইতে হইতে যে যে স্থানে ছবি-আকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সেই স্থানই আমাদের চোখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে।

যেমন, বিদায়দৃশ্য। শকুন্তলা অগ্রসর হইতে যান, পশ্চাৎ হইতে কে যেন টানিয়া রাখে; ফিরিয়া দেখেন, তাঁহারই স্নেহপালিত মৃগশিশু অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে। প্রত্যেক তরু এবং লতা শকুন্তলার সুখদুঃখের সঙ্গী—বার বার তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া শকুন্তলা তপোবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

রাজসভামধ্যে দুষ্মন্ত যখন প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখনও ঘটনা অধিক নয় এবং শকুন্তলা কথাও বড় বলেন নাই, কেবল সেই সভামধ্যে দুষ্মন্তকে 'পোরব' সম্ভাষণ করিয়া যখন দাঁড়াইলেন, তখনই দুষ্মন্ত, রাজসভা, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত এবং এই দুই তপস্বীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানা তেজস্বিনী তপোবনবালিকার একখানি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল।

কেবলমাত্র "অয়মহং ভোঃ" এইটুকুতে শকুন্তলার বিরহ চিত্রিত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা এই বলিয়া আশ্রমের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু তবু শকুন্তলা মাথা তুলিলেন না, তাঁহার মুখে কথা নাই।

এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি রূপসীর চিত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে কালি-দাসের স্ফূর্ত্তি ধরে না। সুখে দুঃখে বেদনা বিলাসে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যেন কিছু সস্নেহ সহৃদয়তা দেখা যায় এবং স্ত্রীসঙ্গে তিনি একটু বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

নারী এবং প্রকৃতিসৌন্দর্য্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোন কবিতে দেখা যায় না। যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষিবালিকার সমাবেশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সেই দুই অনুরাগের একত্র মিলন হইয়াছে। নগরবাসী রাজা, তপোবনের পালিত মৃগসেবিত তরুকুঞ্জের মধ্যে একটি ঋষিকুমারীর—একটি অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া যে একটি নাট্যব্যাপার ঘটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যেন কবির নিজের কামনাস্বপ্ন। আত্মপ্রকৃতির সমগ্র অনুরাগ সেচন করিতে পারেন, কালিদাস এমন একটি বিষয় সৃজন করিয়া লইয়াছেন, এই জন্য সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে শকুন্তলা এমন একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কেবল চিত্ররচনা নহে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনাতেই কালিদাসের প্রতিভার বিশেষ পটুত্ব। পাঠকেরা তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। পথের বর্ণনা করিতে কালিদাস বড় ভালবাসেন। তাহার কারণ, পথের দুই পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড চিত্র পরে পরে চক্ষের সমক্ষে উপনীত হয়; একটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পরেই আর একটার প্রতি চক্ষু

পড়ে। একটা সমগ্র সম্পূর্ণ বৃহৎ চিত্র রচনা করিতে হয় না। সমস্ত রঘুবংশ যেন ইক্ষ্বাকুবংশের একটি দীর্ঘ প্রাচীন রাজপথ। কবি রথে চড়িয়া বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। দিলীপের প্রথম চিত্র রথযাত্রা। রঘুর দিগ্বিজয়ও এই ভাবের; দেশ হইতে দেশান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভাতেও কবির প্রতিভা দুই পার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ রাজগণকে অবলম্বন করিয়া এক একটি দৃশ্যকে পরে পরে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। রামের রথযাত্রাতেও কবিপ্রতিভার সেই গতি-লীলা প্রকাশ পায়। অগ্নিবর্ণের বিলাসসম্ভোগও সেইরূপ; প্রমোদ হইতে প্রমোদান্তরে অপরিতৃপ্ত চপল হৃদয়ের ভ্রমণচাঞ্চল্য। মেঘদূত কাব্য মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুই পার্শ্বের ছবি তুলিতে তুলিতে ভ্রমণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অমনতর নিতান্তই বর্ণনাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ঠিক পথবর্ণনা নহে বটে—কিন্তু ইহাও চলিতে চলিতে বর্ণনা। বিক্রমোর্ব্বশী যদিও নাটক, কিন্তু কবি নাট্যরীতি পরিহার করিয়া নায়ককে অরণ্যে বিলাপপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়াছেন। কখনও পাখী, কখনও মেঘ, কখনও লতা, কখনও পর্ব্বতের প্রতি খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাস।

এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট্ দৃশ্যে কবি যদি এক মুহূর্ত্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন, তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ, বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব্ব করা হয়। পর্ব্বতে যে চমরী লাফাইতেছে বা ওষধি জ্বলিতেছে বা গজমুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা চিত্রিতব্য বিষয় নহে—কারণ, বৃহৎ হিমালয়ের মধ্যে তাহারা কে কোথায় বিলীন হইয়া থাকে, তাহা চিত্রকরের দৃষ্টিগোচর হওয়াই উচিত নহে। কিন্তু কালিদাস নিপুণ চিত্রকর হইয়াই তাঁহার অতিনৈপুণ্য-বশতই হিমালয় ও সমুদ্র বর্ণনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র বর্ণনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘমন্দ্র সমাসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।

'সাধনা', ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯

ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা

দ্বাপর যুগে অভিমন্যু যেমন সপ্ত রথীর ব্যূহ ভেদ করিবার সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু নির্গমনের পথ বাহির করিতে পারেন নাই, কলি যুগে ইংরাজি শিক্ষায় নব্য বঙ্গেরও কতকটা সেই দশা—আমরা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম, কিন্তু সেই জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচার করিবার পথ খুঁজিয়া পাই না। ইংরাজি শিক্ষাও আবার শুধু জ্ঞানটুকু মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, স্বদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া দিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়। কিন্তু বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষায় কোনরূপ শিক্ষা না পাইয়া তাহাতে নূতনলব্ধ জ্ঞান ব্যক্ত করা কঠিন হইয়া উঠে। হইয়াছে যেন নাবালকের বিষয়প্রাপ্তির মত; অল্পস্বল্প ভোগ করা চলে, কিন্তু দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নাই।

অনেকে সেই জন্য মনে করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষাটাকে কেবলমাত্র ঘরকন্নার কাজে লাগাইয়া, সাহিত্য এবং জ্ঞানালোচনার ভাষা ইংরাজি করিলেই কোন গোল থাকে না। তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষায় ভাব ব্যক্ত করিবার আর আবশ্যকই থাকে না। এবং শিক্ষার বিস্তারের সহিত অল্পে অল্পে ইংরাজি ভাষায় দেশ ছাইয়া ফেলে। এইরূপে প্রাদেশিক ভাষার বিলোপে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যসাধনের পথও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে।

বাস্তবিক যদি ইহা সম্ভবপর হয়, হউক্;—শিশু বঙ্গভাষাকে সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়া ভারতবর্ষের উন্নতিস্রোত রোধ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? কিন্তু ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন যদি দেশের সর্ব্বসাধারণের উন্নতিকে বাদ দিয়া না হয়, তাহা হইলে বোধ করি, সাধারণপ্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিতজনবোধ্য বিদেশীয় ভাষা অবলম্বনে বিশেষ সুবিধা হয় না। কারণ, শিক্ষাবলে সমাজের এক অংশ যে ভাবে গঠিত হইতে থাকে, বিদেশী ভাষার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া অপর অংশে সে ভাবের প্রবাহ সহজে পঁহুছে না; এইরূপে ভাষাভেদে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবপ্রবাহসঞ্চার বন্ধ হইয়া গিয়া প্রত্যেক অঙ্গ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সমগ্র সমাজদেহের সম্যক্ পুষ্টিসাধনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

প্রাচীন ভারতে বিস্তৃত শূদ্রসমাজ যে ব্রাহ্মণজনোচিত জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিল, সে কেবল মনুর বিধানগুণে নহে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যে ভাব অনুশীলিত হয়, শিক্ষিতদের হৃদয়শিখর হইতে নামিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সর্ব্বসাধারণের

মধ্যে নিঃশব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং সম্যক্ আয়ত্ত না হইলেও সাধারণের উপর তাহার একটা মোটামুটি প্রভাব থাকিয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত তখন কেবলমাত্র সাহিত্যের ভাষা, শিক্ষিতের ভাষা; রাজসভায় পণ্ডিতেরা বসিয়া তাহার আলোচনা করিতেন, চতুষ্পাঠীতে ছাত্রেরা মিলিয়া অধ্যাপকের নিকট তাহার ব্যাকরণ শিক্ষা করিত; এখন যেমন ইংরাজি না জানিলে সমাজে প্রতিপত্তি হয় না, তখন সেইরূপ সংস্কৃত না শিখিলে সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত। সাধারণ লোকের সংস্কৃত ভাষার সহিত সুতরাং বড় একটা সংস্পর্শ ছিল না। তাহারা জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে প্রচলিত ভাষায় তুচ্ছ প্রসঙ্গের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

কিন্তু বুদ্ধদেব আসিয়া যখন দেশের সর্ব্বসাধারণকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন, সম্ভ্রান্ত সংস্কৃত ছাড়িয়া তাঁহাকে পালির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ফল হইল যে, ব্রাহ্মণশাসনের সংস্কৃত বেড়া কাজে লাগিল না, এবং দেখিতে দেখিতে দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভাব বায়ুতাড়িত বহ্নিশিখার ন্যায় হূহু শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

চৈতন্যও যখন বাঙ্গলা দেশের গৃহে গৃহে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইলেন, প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতশাস্ত্র রচনা না করিয়া বঙ্গসন্তানকে তিনি তাহার মাতৃভাষায় আহ্বান করিলেন—নির্জ্জীব বঙ্গসমাজও আলোড়িত হইয়া উঠিল। এবং নবদ্বীপের সমস্ত শুষ্ক পাণ্ডিত্য সে বৈষ্ণব প্রেমের প্রবাহ রোধ করিতে পারিল না।

কেবলমাত্র শিক্ষিতবোধ্য ভাষা যতই সম্পূর্ণ এবং সম্ভ্রান্ত হউক না কেন, প্রেমের সহজ ভাষার নিকট তাহা চিরদিনই নিষ্ফল। প্রেমের ভাষা আমাদের মাতৃভাষা—মাতৃস্তন্যের সহিত প্রতি দিন যাহা পান করিয়া পিতৃপিতামহক্রমে আমরা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছি।

বাঙ্গলা লেখকেরাও তাই বুদ্ধ এবং চৈতন্যের পদানুসরণ করিয়া স্বদেশীয় ভাষার মধ্য দিয়া একটা নূতন জীবনপ্রবাহ আনিয়া বঙ্গসমাজের সর্ব্বাঙ্গে একটা স্পন্দন সঞ্চার করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদের সাহিত্যে এখন অল্পে অল্পে আমাদের নবোদ্ভিন্ন জাতীয়তা অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্য জীবনকে এবং জীবন সাহিত্যকে প্রতিদিন নিঃশব্দে গড়িয়া তুলিতেছে। এবং পরস্পরের সহায়তায় উভয়েরই স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারে যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষার বিনাশসম্ভাবনা কল্পনা করেন, তাঁহাদের সেই বহুযত্নপোষিত আশার বিরুদ্ধে এক প্রধান উদাহরণ এই নব্য বঙ্গসাহিত্য। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যখন গ্রাম্য বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে উপেক্ষা করিতেন, ইংরাজি-

শিক্ষিতেরাই তখন বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়া এই বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করেন এবং সেই ইংরাজিশিক্ষিতেরাই এ পর্য্যন্ত অবিশ্রাম যত্নে ইহাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

শুধু বাঙ্গলা দেশ বলিয়া নহে, ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে ইংরাজিশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সেইখানেই ইংরাজিশিক্ষিতদের যত্নে সাহিত্যবদ্ধ হইয়া প্রাদেশিক ভাষার স্থায়িত্বলাভ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে ইংরাজি শিক্ষার বাতাসে সাহিত্যের নব নব অঙ্কুর উদ্গত হইয়া উঠিতেছে। তবে বাঙ্গালা দেশেই ইংরাজি শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়, সেই জন্য বঙ্গসাহিত্যই অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনায় অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বত্রই যদি ইংরাজির শুভাগমনে দেশীয় সাহিত্যের এইরূপ অভ্যুদয় দেখা যায়, তাহা হইলে ইংরাজি শিক্ষাকেই প্রাদেশিক ভাষার উন্নতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ হয় না। বাস্তবিকও তাহাই। ইংরাজি শিক্ষায় মানবহৃদয়ে ভাব-প্রকাশ ও জ্ঞানবিস্তারের যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, ইহা তাহারই অনিবার্য্য ফল। নহিলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়া সুদূর যশোবিস্তার, রাজসম্মান বা অর্থাগমের কিছুমাত্র সুবিধা হয় না; এবং দেশের লোকেও ইংরাজি লেখককে যেরূপ সম্মানে পথ ছাড়িয়া দেয়, বাঙ্গলা লেখককে দেখিলে তাদৃশ সসঙ্কোচ সম্ভ্রম অনুভব করে না।

মনে করা যাক, এক সময় ইংরাজি ভাষাই দেশের বালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে প্রচলিত হইবে, কিন্তু সে দিন যে বহু দূরে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে দেশের যে বৃহৎ অংশ ইংরাজি না জানে, তাহাদের কি গতি হইবে? তাহারা কি জ্ঞানলাভের জন্য সেই দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে? যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা কখনই আপন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভ্রাতাভগিনীদিগের প্রতি এত কাল উদাসীন হইয়া থাকিবেন না; তাঁহারা নিজে যাহা বুঝিতেছেন, অন্য লোককে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন এবং সেই চেষ্টাতেই দেশীয় সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিবে এবং পরিপুষ্ট হইবে। এইরূপে দেশীয় সাহিত্যের যতই পরিণতি হইতে থাকিবে, বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের আশা ততই সুদূরপরাহত হইবে। সংক্ষেপে বলিলে ইহা একটি স্বতোবিরোধী বচনের মত শুনিতে হইবে;—আমরা যত ইংরাজি শিখিব, ততই দেশী সাহিত্য বিস্তৃত হইবে, এবং দেশী সাহিত্য যতই বিস্তৃত হইবে, ততই ভবিষ্যৎ ইংরাজি ভাষা ব্যাপ্তির ব্যাঘাত করিবে।

আরও, ইংরাজিকেই যদি কাহারও আদেশানুসারে আমাদের সাহিত্যের ভাষা করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেই কি সাহিত্য সেই মহামহিমের আদেশ পালন করিবে? সে আশা দুরাশা মাত্র। ইংরাজি সাহিত্যের কোথাও আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিবে না। তোতা পাখীর মত আমরা সে সাহিত্যকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যে সাহিত্য স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের অন্তরের উত্তাপে আপনি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তাহার প্রত্যেক কথার সহিত আমাদের জীবনের যেমন এক চিরন্তন নিগূঢ় যোগ থাকিয়া যায়, পরিপূর্ণ ইংরাজি সাহিত্যের সহিত আমাদের জীবনের সেরূপ অবিচ্ছেদ্য যোগ সাধিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, ইংরাজি সাহিত্য আমাদের জাতীয়তা বিকাশের ফল নহে, এবং দেশে, কালে, সকল বিষয়েই তাহা আমাদের সুখদুঃখের বাহির, সুতরাং স্বদেশীয় সাহিত্যের মত আমাদের জীবনগঠনে ইহার প্রভাবও তেমন অমোঘ নহে।

ইহা কেবলমাত্র কল্পনা নহে। ফরাসী ভাষায় সাহিত্যরচনা যখন জর্ম্মন দেশের প্রথা ছিল, তখনকার জর্ম্মনির সাহিত্য শুনা যায়, কেবলমাত্র ফরাসী সাহিত্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র—তাহার মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই, জর্ম্মন বল নাই, কেবল কতকগুলি পরিপাটি অনুকরণ এবং নির্ভুল ব্যাকরণলীলা। কিন্তু জর্ম্মনেরা যখন দেশীয় ভাষায় সাহিত্যানুশীলন সুরু করিল, তখন জর্ম্মনির গৌরবে য়ুরোপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এখন এই ভারতবর্ষের দূর প্রান্তেও জর্ম্মন কবির গাথা শিক্ষিত জনের চিত্ত হরণ করে।

ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না করিলেও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, ইংরাজি এ দেশের সর্ব্বসাধারণের ভাষা হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না এবং য়ুরোপীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহার অনুকূল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ফ্রান্স এবং স্পেন যখন রোমক শাসনের অধীন ছিল, তখন উক্ত দেশের ভদ্রসমাজের রোমীয় আচার ব্যবহারের সহিত লাটিন ভাষাও প্রচলিত ছিল, এবং রোমকেরা কখনও তত্তৎ-দেশের ভাষার উন্নতি সাধনের বিন্দু মাত্র চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু ফ্রান্স এবং স্পেনের ভাষা লাটিন হইল না—জাতীয় জীবনবিকাশের সহিত ধীরে ধীরে জাতীয় সাহিত্য মুকুলিত হইয়া উঠিল। গ্রীস যখন রোমের অধীনতা স্বীকার করে, তখন তাহার পূর্ব্বগৌরব কিছুই নাই, লাটিন ভাষা এবং লাটিন সাহিত্যই সর্ব্বত্র প্রবল এবং তৎকালীন গ্রীক লেখকেরা লাটিন লেখকদিগের তুলনায় অতি হীন, তথাপি লাটিন গ্রীকের স্থান অধিকার করিতে পারিল না। তাহার পরেও বহু বৎসরের তুরস্ক-শাসন গ্রীসকে নির্বীর্য্য করিয়া রাখিয়াছিল। এই শতাব্দীকাল মাত্র গ্রীস আপন

লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত দারুণ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও পরাধীন গ্রীস আপন মাতৃভাষাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্য যদিও গ্রীক সাহিত্যের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নহে, তথাপি সে দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিবে ; কারণ, দেশের মাটির মধ্যে তাহার শিকড় আছে। স্কুল কালেজে এক-মাত্র ইংরাজিতেই শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয় বটে, তাহার ফলে বঙ্গসন্তানের জীবনে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে না। কিন্তু দেশের ভাষা বাঙ্গলাই থাকিয়া যায়। বাহিরের কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় ভাষণপ্রসঙ্গে কিম্বা পত্রব্যবহারে বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিলেও বাড়িতে আসিয়া মা, বোন, স্ত্রী কন্যার সহিত ইংরাজিতে স্নেহপ্রীতির আদানপ্রদান চলে না। এবং বিবাহের পূর্ব্বে বাঙ্গলা বই কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিতে রাজি না হইলেও গৃহিণীর শুভাগমন হইতে অনেক ইংরাজিনবীশের বাঙ্গলা গ্রন্থের সহিত পরিচয়ও সাধিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের ভরসাও সেইখানে। বঙ্গসাহিত্য আমাদের অন্তঃপুরেই প্রতি দিন জীবনে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে দেশের সর্ব্বত্র তাহার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

'সাধনা', চৈত্র ১২৯৯

উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র

ভূগর্ভের নিম্ন স্তরে যেমন বহিরুপদ্রব হইতে নিরালায় বহু পুরাতন যুগের কঙ্কালাবশেষ পাষাণ হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মবিপ্লব সেইরূপ বহিঃশত্রুর নিরন্তর আক্রমণ হইতে দূরে উড়িষ্যার উপকূলে পাষাণখোদিত হইয়া কথঞ্চিৎ রহিয়া গিয়াছে। সিন্ধুপার হইতে মুসলমান আক্রমণের বন্যা এত দূরপ্রান্ত অবধি আসিয়া প্রায় পঁহুছিত না, এবং কাঠজুড়ি ও মহানদীর তীর হইতে মুসলমান সেনাকে দুই চারি বার এমন বিফলমনোরথ হইয়াও ফিরিতে হইয়াছে। অবশেষে উড়িষ্যা যদিও মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি এই নদী-পাহাড়-বনজঙ্গলসমাকীর্ণ ভূখণ্ডের সর্ব্বত্র তাহার স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মন্দিরে মন্দিরে দেবতাগণ মধ্যে মধ্যে লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং প্রাচীন কীর্ত্তিও দু একটা বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত দেবমন্দিরের পাষাণে মস্‌জিদের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই।

সেই জন্যই উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণ-শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে

উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন-গৌরব রক্ষা করিতেছে। পুরীতে জগন্নাথ ভুবনেশ্বরে শিব, যাজপুরে পার্ব্বতী, বিনায়কে গণেশ, কণারকে দেবতাহীন সূর্য্যমন্দির, খণ্ডগিরিতে পরিত্যক্ত বৌদ্ধ গুম্ফাবলী। নদীতীরে, গিরিশিখরে, সাগরবেলায়, যেখানে প্রকৃতি দেবী আপন সৌন্দর্য্য ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, সেইখানেই নীল দিগন্তের গায়ে হয় দেবালয়, নয় অনুশাসন-স্তম্ভ, নয় প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সমস্ত উৎকলদেশ যেন দেবতার বিহারভূমি এবং মানবের তীর্থক্ষেত্র।

ভারতবর্ষের বহু দূর প্রান্ত হইতে বহু সহস্র যাত্রী—বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়—এই সকল প্রাচীন মন্দিরের দ্বারে আসিয়া নিত্য পুণ্য অর্জ্জন করিয়া যায়। বৈতরণী পার হইয়াই তাহারা মনে মনে যেন কোন্ পুণ্যলোকে উপনীত হয়—এখানে ব্রাহ্মণ নাই, শূদ্র নাই, উচ্চ নাই, নীচ নাই, ক্ষুদ্র জাতি, ক্ষুদ্র মান, ক্ষুদ্র গর্ব্ব এ রাজ্যের নহে।

সম্মুখে আম্রমুকুলিত ছায়াময় প্রাচীন পথ, কাঠজুড়ির বালুগহ্বর হইতে উঠিয়া পুরুষোত্তমের দ্বার অবধি প্রসারিত। এই পথ বাহিয়া চিরন্তন মানবপ্রবাহ নিশ্চল দেবতার দ্বারে আপন বেদনা জানাইতে আসে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী বাসন্তী নগনদী পথের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদু প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। দূরে মেঘের মত নীল শৈলশ্রেণী কখনও ছায়াসুপ্ত, কখনও রবিকিরণে উদ্ভাসিত।

বালুহস্তা হইতে অদূরে দেখা যায়, বিজন ধাউলির পাহাড, শিরোদেশে প্রাচীন দেবমন্দিরের শ্যাম মুকুট। দেবতাহীন ব্রাহ্মণহীন মন্দিরে যাত্রী আর কেহ যায় না। পুরাতত্বান্বেষী শুধু এই গিরিপাদমূলে দাঁড়াইয়া রাজা অশোকের পালি অনুশাসন পাঠ করিয়া আসেন, এবং প্রাচীনা দয়া নদী নিভৃত কল্লোলে সেই পুরাতন দিনের কাহিনী কহিয়া যায়—যখন এই একাদশ অনুশাসন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত জনসমাজে জীবে অহিংসা এবং সর্ব্বভূতে দয়া প্রচার করিত।

আরও কিছু দূর গিয়া প্রাচীন শিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ভুবনেশ্বর—আম্রকাননের মধ্য হইতে সমুচ্চ চূড়া উঠিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শৈব মতের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, ভুবনেশ্বর তাহারই সাক্ষিস্বরূপে দাঁড়াইয়া। কেশরী বংশ তখন উড়িষ্যার অধিপতি। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গুরু এবং শিব তাঁহাদের দেবতা। রাজা ললাটেন্দু কেশরী বৌদ্ধধর্ম্মকে আড়াল করিয়া খণ্ডগিরির সম্মুখ প্রদেশে ভুবনেশ্বরের দেবধানী স্থাপন করিলেন। সহস্র নাগবালা প্রস্তরস্তম্ভের বেষ্টনে শত পাকে চির-আবদ্ধ হইল—আবক্ষ নারীদেহের শিরোভাগে যেন মন্ত্রবলে অযুত ফণা পাষাণ হইয়া রহিল। শত দেব, শত দেবী, নব গ্রহ, নব রস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাসকলা

পাষাণে চিরমুদ্রিত হইয়া নিশ্চল শিল্পসৌন্দর্য্যে দেশদেশান্তরের বিস্মিত নয়ন আকর্ষণ করিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খণ্ডগিরির শিখরদেশ হইতে প্রতি দিন চাহিয়া দেখিতেন, এক একখানি করিয়া পাষাণের পর পাষাণ উঠিয়া তাঁহাদের প্রতি দিবসকে নিষ্ফল করিতেছে। একটির পর একটি, এমনি করিয়া সাত সহস্র মন্দির শির উত্তোলন করিয়া উঠিল। নিরাশহৃদয়ে সন্ন্যাসীর দল খণ্ডগিরি পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

আরও যোজন পথ অতিক্রম করিলে, সত্যবাদীতে বসিয়া নিরীহ সাক্ষীগোপাল পুরুষোত্তমযাত্রীর সংখ্যা গণিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। জগন্নাথদেবের প্রাপ্য অংশ হইতে তিনিও যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করেন।

পুরীর পথপার্শ্বে দূরে নিকটে এমনি মন্দিরের পর মন্দির। সারা পথ জুড়িয়া পাণ্ডার দল শিখা এবং উপবীত আস্ফালন করিয়া ফিরিতেছে এবং দূরাগত যাত্রিগণমধ্যে দুই হস্তে সুলভ আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়া দুর্লভ তাম্ররজত সঞ্চয় করিতেছে। যাত্রীরও অন্ত নাই। শকটের পর শকটপ্রবাহ—আবরণের ছিদ্রপথ দিয়া শত পশ্চিম-কুলরমণীর কুবলয়নেত্র, বঙ্গগৃহিণীর উজ্জ্বল স্নেহদৃষ্টি পথক্লিষ্ট পথিক জনের অন্তরে গৃহকাতর বেদনা জন্মাইয়া দেয়।

পুরুষোত্তমে আসিয়া এই দীর্ঘ যাত্রার অবসান। ' যাত্রিহৃদয়ের বহু দিনের বহুযত্ন-পোষিত আশার প্রথম সফলতা। মন্দিরের মহা অন্ধকারমধ্যে ক্ষীণ দীপালোকে নিম্বদেহ জগন্নাথ ভগিনী সুভদ্রা ও ভ্রাতা বলরামের সহিত সিংহাসনে বসিয়া। দিবালোক সেখানে পঁহুছে না, সংসার রুদ্ধদ্বার; শুধু ভক্তি এবং স্তুতি, বেদনা এবং আবেদন, নিরাশ হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন এবং দুঃখগাথা সেখানে দেবতার সিংহাসনতলে নিত্য স্তূপাকার হয়। ব্রাহ্মণ নৈবেদ্য নিবেদন করেন, দেবতা প্রসাদ করিয়া দেন; সেই মহাপ্রসাদ বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, রাজা প্রজায়, স্ত্রী পুরুষে মিথ্যা উচ্চনীচ ভেদ ঘুচাইয়া দেয় এবং হৃদয়ে হৃদয়ে পুণ্য প্রীতি সঞ্চারিত করে।

এই জগন্নাথের মাহাত্ম্য বৃহৎ ভারতভূমিতে অদ্বিতীয়। তিনি শুধু ব্রাহ্মণের দেবতা নহেন, আচণ্ডাল সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার। তিনি বিষ্ণুর অবতার, পতিতের পাবন, পরম অহিংসক; তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সর্ব্বদেশ সর্ব্বলোক একাকার। জাতিভেদময় ভারতবর্ষে জাতিভেদের এমন গুরুতর প্রতিবাদ আর কোথাও দেখা যায় না। এবং এই জাতিবিহীন মহাতীর্থে আসিয়া নানকী, কবীরী, প্রাচীনপন্থী, নব্যপন্থী, নানা মতের নানা মুনি সেই একই জগন্নাথদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়েন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের দেবতা অবধি জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্থান লাভ করিয়াছেন এবং সেই বিমলা দেবীর দেবভোগ সম্বন্ধেও ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নাই।

জগন্নাথের মাহাত্ম্যের কারণ ইহাই বটে। ইহার মধ্যে যে সর্ব্বগ্রাসী সামঞ্জস্যশক্তি আছে, তাহাতেই সকল সম্প্রদায় এখানে আসিয়া মিলিত হয়। জগন্নাথ বৈষ্ণব বলিয়াই সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁহার মন্দিরে অনেক তন্ত্রাচারের বৈষ্ণবীকরণ হইয়াছে শুনা যায়। এবং ঘষা-জল ও মাসকলাই ভোগের ব্যবস্থা নাকি তান্ত্রিক কারণসলিল ও আমিষাশেরই বৈষ্ণব বিধান।

জগন্নাথদেবকে যাঁহারা উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারা একবাক্যে জগন্নাথদেবের পরকে আপন করিবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কেমন দ্বিধাশূন্য মনে তিনি সুভদ্রা ও বলরামকে লইয়া বৌদ্ধ সংঘ-ধর্ম্ম-বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। অধিক দিনের কথা নয়, চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও বুদ্ধের দন্ত রথারোহণে মন্দির হইতে বাটিকান্তরে গিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহন করিয়া আসিত; জগন্নাথ অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনাকে বুদ্ধের দন্তমর্য্যাদার স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তিনি সাধারণের দেবতা—এবং উড়িষ্যার জনসাধারণের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জয়ে পরাজয়ে, পলায়নে প্রত্যাগমনে, সকলের সহিত তিনিও চিরদিন আপন গুরু দেব-অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। লোকরঞ্জনার্থে ভিন্ন মতের বিধি বিধান দুই চারিটা আত্মসাৎ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন কিসের?

কিন্তু শুধু জগন্নাথ বলিয়া নহে—উৎকলভূখণ্ডের সর্ব্বত্র মতবিরোধের মধ্যে একটা নির্ব্বিবাদ ঐক্যস্থাপনচেষ্টা দেখা যায়। বৈষ্ণবের পক্ষে শিবের মন্দির নির্ম্মাণ উড়িষ্যায় একটা মহাপুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য। অথচ ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে বৈষ্ণবে শৈবে অনেক সময় মুখ-দেখাদেখি নাই। কাশীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হইলে অনেক ধনী বৈষ্ণব নৌকার সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দেন—পাছে দৈবক্রমে বিশ্বেশ্বরের মহিমা নেত্রপথে পতিত হয়, এবং রাধাকৃষ্ণের নামমাত্র কর্ণগোচর হইলে অনেক ভক্ত শৈব আহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন!

উড়িষ্যার জগন্নাথের মন্দিরে শৈব দেবতা, শিবের মন্দিরে বৈষ্ণব নৃসিংহ। ভুবনেশ্বরে দোলযাত্রা সম্পাদিত হয়—তাহার প্রধান অনুষ্ঠান হরিহর-মূর্ত্তির দোলন। জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে শিবের পাণ্ডারা শ্রীকৃষ্ণের পূজাও করিয়া থাকে, এবং ভুবনেশ্বর শিব আপন মন্দিরে বিষ্ণু অবতারের পূজা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়েন না। কিম্বদন্তী শুনা যায় যে, বিষ্ণুর আদেশানুসারেই শিব ভুবনেশ্বরে বাস করেন; এবং এই কিম্বদন্তী স্মরণ রাখিয়া ভুবনেশ্বর-যাত্রীরা বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া প্রথমেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুদেবকে প্রণাম করিয়া আসে।

দেবতায় দেবতায় এইরূপ সদ্ভাব থাকায় বিভিন্ন মন্দিরের বিচিত্র অনুষ্ঠানসকলের

মধ্যেও আদানপ্রদান চলে। প্রাবর্ণোৎসবে ভুবনেশ্বর গ্রীষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিয়া শীতবস্ত্র পরিধান করেন, পুরুষোত্তমে ইহারই অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া জগন্নাথদেবের দেহে শীতবস্ত্র উঠে; ভুবনেশ্বরের পুষ্যাযাত্রা,* জগন্নাথদেবের অভিষেক; ভুবনেশ্বরে শয়ন-চতুর্দ্দশী, জগন্নাথে শয়ন-একাদশী; ভুবনেশ্বর এবং জগন্নাথ উভয়েরই সেই চন্দনযাত্রা, সেই মকরসংক্রান্তি, ভৈমী একাদশী এবং গুণ্ডিচাশ্রম গমন ও মন্দিরে প্রত্যাগমন বিধি।

কণারকের সূর্য্যমন্দিরেও এই রথযাত্রার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কপিল-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, অর্কক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রথযাত্রা দর্শন করিলে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শনলাভ হয়। আরও, এখানে সকল দেবতার উপাসনাবিধি আছে এবং যে ব্যক্তি যে লোকে যাইতে চায়, তাহারও বাধা নাই—কেবল দিন ক্ষণ দেখিয়া দেবতাবিশেষকে ডাকিলেই হইল। অমুক দিন মহোদধিতে স্নান করিয়া যে রামেশ্বরকে পূজা করে, রামচন্দ্র তাহার অভীষ্টসাধনে সহায়তা করেন; মহেশ্বরের চরণে ভক্তি-পূর্ব্বক নৈবেদ্য নিবেদন করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়; বিখ্যাত অর্কবটমূলে বসিয়া যে ভক্ত বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি সদ্য প্রসন্ন হয়েন।

পৌরাণিক বর্ণনানুসারে এই অর্কক্ষেত্রে বিষ্ণুর পদ্ম পড়িয়াছিল; সেই জন্য ইহার আর এক নাম পদ্মক্ষেত্র। পুরাণরচয়িতা উড়িষ্যার চারি ক্ষেত্রে বিষ্ণুর চারিটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন ঃ—কণারকে পদ্ম, পুরীতে শঙ্খ, ভুবনেশ্বরে চক্র এবং যাজপুরে গদা। বিষ্ণুদেব গয়াসুরকে বধ করিয়া গয়ায় স্বীয় পদচিহ্ন এবং উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আপন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রাখিয়া যান। তন্মধ্যে চক্রক্ষেত্র ও গদাক্ষেত্র হরপার্ব্বতীর এলাকা। কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোনও গোল উঠে নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সন্দেহ হয় যে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের একটু বিশেষ প্রভাব হইয়াছিল এবং হয় ত তাহারই ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরদিগের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া কালক্রমে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। এক হইতে পারে, বৌদ্ধ মতের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত বিরোধ ত্যাগ করিয়া এক হইয়াছিল; আর এক হইতে পারে, সকল সম্প্রদায়ই যেখানে যতটুকু আবশ্যক বোধ করিয়াছে, বৌদ্ধ মত ও অনুষ্ঠান হরণ করিয়া লইয়া আপন আপন দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, এবং এইরূপে স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্র-দায়ের মধ্যে বিরোধ সংযত হইয়া আসিয়াছে।

যেমন করিয়াই হউক, হয় বৌদ্ধধর্ম্মের ব্রাহ্মণীকরণে, নয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বৌদ্ধীকরণে, কিম্বা উভয়েরই সংযোগে, উড়িষ্যায় যে হিন্দুধর্ম্ম একটা নূতন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং পদ্মার প্লাবনে যেমন সমস্ত আল ভাঙ্গিয়া গিয়া ভিন্ন

ভিন্ন জমির সীমানা মিশাইয়া যায়, এই ধর্ম্মবিপ্লবে সেইরূপ উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এলাকার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া গিয়া একসা হইয়া গিয়াছে—কতটুকু কাহার অধিকার, নির্ণয় করা সুকঠিন।

মন্দিরে মন্দিরে পাষাণে খোদিত সহস্র আধা-মঙ্গোলীয় ছাঁচের বৌদ্ধ মূর্ত্তি। কোন কোন স্থলে হিন্দু দেবদেবীও যেন বৌদ্ধ ছাঁচে ঢালাই হইয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। জগন্নাথের মূর্ত্তি, চক্র, রথযাত্রা, জাতিভেদবিহীনতা যখন বৌদ্ধ প্রভাবেরই অবশেষ, তখন মন্দিরের স্থাপত্যে কিম্বা ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? যোগাসীন শিব যখন বৌদ্ধ রথযাত্রা উৎসবে বিচলিত হইয়া গুণ্ডিচাশ্রমে অবস্থিতির লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তখন ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য বৌদ্ধ দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, ইহাতেই বা বিস্মিত হইবার কি আছে?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শুষ্ক নীতিধর্ম্মের মধ্য হইতে এমন বিলাসকলা স্ফূর্ত্তি পাইল কিরূপে? উড়িষ্যার মন্দিরে যে সমস্ত চিত্র খোদিত হইয়াছে, তাহা বিলাসভাবময় ত বটেই, এবং অনেক স্থলে বিলাস শ্লীলতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপন নগ্ন শৃঙ্গার-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে নাই।

বৌদ্ধ স্থাপত্যে এই বিলাসপরায়ণতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই যাহা চোখে পড়ে, তাহা এই যে, যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার আদিম বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়া চতুর্দ্দিকের পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং গ্রীকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতায় কল্পনাকে পাষাণে বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষাও সম্ভবতঃ তখন সমধিক উদ্দীপিত হইয়াছিল। বাস্তবিক, ভুবনেশ্বরের দেয়ালে কতকগুলি উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবয়বা নারীমূর্ত্তি দেখিলে এমনি য়ুরোপীয় ছাঁচে ঢালা বোধ হয় এবং কোন কোনটির ভঙ্গী এমনি য়ুরোপীয় যে, গ্রীক প্রভাব অস্বীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবশ্যক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতীমূর্ত্তির সন্নিহিত নিভৃত কোণে কলানিপুণা রমণীগণমধ্যে সহসা গ্রীসীয় লায়র-যন্ত্রহস্তা নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, তখন চমকিয়া উঠিতে হয়—এ কি গ্রীস, না ভারতবর্ষ!

ভারতবর্ষে যে তখন গ্রীকদিগের গতিবিধি ছিল, তাহার সপক্ষে বিস্তর প্রমাণ আছে। রাজা অশোকের পালি প্রস্তরলিপিতে গ্রীক অন্তিয়োকসের নাম পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় গ্রীকেরা অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নূতন ধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচার করিতেও বাহির হইয়াছিলেন, ইতিহাসে এরূপ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এক দিকে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিকী কল্পনা এবং অন্য দিকে গ্রীক

সৌন্দর্য্যচর্চ্চা মিলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে যে তাহার শুষ্ক নীতি-সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে সাধারণের মনোরম করিয়া তুলিয়াছে, ইহাতে সংশয়ের বিশেষ কিছুই নাই। এবং এইরূপে সাধারণের মনে মুদ্রিত হইয়াই যে তাহা কালক্রমে রূপান্তরিত আকারে সর্ব্বশরণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, ইহাও নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না।

এমনি করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে পরিপুষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে আবার পরিপুষ্ট করিয়াছে। আপনাকে সর্ব্বসাধারণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পৌরাণিকতার সহায়তা গ্রহণ তাহার আবশ্যক হইয়াছিল, আবার আপনি যখন দেশান্তরিত হইল, প্রাচীন পৌরাণিকতাকে আরও পৌরাণিক করিয়া দিয়া গেল। এখন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন—কোন্ অবধি ব্রাহ্মণ্য এবং কোন্ অবধি বৌদ্ধ সীমা।

হিন্দুধর্ম্ম এমনি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এখনও ইহার গঠনকার্য্য শেষ হয় নাই। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রে যেন ইহার আদিম অনুষ্ঠান হইতে চরম অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত গায়ে গায়ে মিশিয়া পুঁটুলি পাকাইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া যেন কতকটা বুঝা যায়, নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, কর্ম্মফল, জ্ঞান মোক্ষ, ভক্তি মুক্তি, দর্শন এবং কাব্য চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া কেমন করিয়া মিশিয়াছে, এবং বুদ্ধি যাহার মধ্য দিয়া বাঁধা পথ বাহির করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে, আমাদের নিরক্ষর সাধারণের হৃদয়ে সেই সকল বিরোধী মতের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

'সাধনা', বৈশাখ ১৩০০

খণ্ডগিরি

ভুবনেশ্বরের শিবালয় হইতে ক্রোশেক পথ অগ্রসর হইলেই একাম্রক্ষেত্রের বিক্ষিপ্ত আম্রকুঞ্জের মধ্য হইতে সহসা দুইটি গিরিখণ্ড শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। দুইটি একই পাহাড় এবং সাধারণতঃ খণ্ডগিরি নামেই অভিহিত—মধ্যে কেবল একটি মাত্র নিম্ন পার্ব্বত্য পথ ব্যবধান হইয়া এই গিরিখণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, নাম হইয়াছে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। উড়িষ্যার যেখানে যে মন্দির স্থাপিত হইয়াছে, খণ্ডগিরি তাহার প্রাচীর রচনায় আপন প্রস্তর দান করিয়াছে এবং আপন বক্ষকোটরে এক কালে সংসারত্যাগী বৌদ্ধ তাপসদিগকে আশ্রয় দিয়াছে; এখনও প্রস্তরে খোদিত সেই শূন্য গুম্ফাবলী শৈলপটে প্রাচীন ইতিহাসের অক্ষর লিখিয়া রাখিয়াছে।

বহু পুরাতন দিনে স্বাধীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এইখানে গুহাবাসে থাকিয়া নিভৃতে

ধর্ম্মালাপে কাল যাপন করিতেন। তখনও ভুবনেশ্বর মস্তক তুলিয়া উঠে নাই এবং একাম্রক্ষেত্রে শিব আসিয়া বাস করেন নাই; একদিকে ধবলগিরি অনতিদূর জনস্থানের শিরোদেশে অশোকের অনুশাসন হৃদয়ে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অন্য দিকে নিবিড় অরণ্যানীর পশ্চাতে নীলাদ্রিশ্রেণীর উন্নত প্রাচীরে দৃষ্টি প্রতিহত হইত; সম্মুখে ভুবনেশ্বরের স্থানে কুটীর-প্রাসাদ-সমাচ্ছন্ন বৌদ্ধ লোকালয়—প্রতি প্রভাতে সেইখানে গিয়া নিঃসম্বল সন্ন্যাসীরা দিবসের অন্ন ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেন।

খণ্ডগিরি গুহায় গুহায় পরিপূর্ণ। মানবের বুদ্ধি পাষাণ কাটিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র গিরিখণ্ডকে আপন বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে—তলার উপর তলা, ঘরের পর ঘর, বারান্দায় বিচিত্র আকারের গিরিকর্ত্তিত স্তম্ভ এবং স্তম্ভের শিরোদেশে ব্র্যাকেটাকারে উন্নতবক্ষ নারীদেহ পাষাণ-ছাদভার বহন করিতেছে। দেয়ালেও মধ্যে মধ্যে নানা মূর্ত্তি খোদিত—নর নারী, সৈনিক প্রহরী, যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রমোদ বিলাস, হয় ত কোনও প্রাচীন বৌদ্ধ উপাখ্যানের অবশেষ, কোথাও বা বিশেষ একটা চিহ্ন মাত্র।

বৌদ্ধ রাজা ও রাণীরা সন্ন্যাসীদিগের জন্য বহু ব্যয়ে এই সকল চারু শিল্পরচিত গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও রাণীগুম্ফা একজন বৌদ্ধ রাণী-সন্ন্যাসিনীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বৌদ্ধ যাজকেরা খণ্ডগিরির শিখরদেশে দাঁড়াইয়া প্রতি দিন সন্ধ্যাকাশে গম্ভীর স্বরে সংঘ, ধর্ম্ম ও বুদ্ধের শরণমন্ত্র ধ্বনিত করিতেন; গিরিপ্রাঙ্গণ হইতে মধুর নিনাদে সান্ধ্য ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইত; গুহায় গুহায় দীপালোকে ধূপগন্ধে একটা মহা আনন্দ জাগিয়া উঠিত। ধবলগিরিশৃঙ্গ হইতে অপর সন্ন্যাসীর দল এই উৎসব-আনন্দে যোগদান করিতেন; সেখান হইতেও সংঘ ধর্ম্ম বুদ্ধ নাম উত্থিত হইয়া দিগ্ দিগন্তরের শৈলশিখরে প্রতিধ্বনিত হইত।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তখন উড়িষ্যার ধর্ম্মগুরু। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সহিত সর্ব্বত্রই তাঁহাদের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে লোকে তাঁহাদের নিকট আসিয়া মীমাংসা প্রার্থনা করে; কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রমে দুষ্কৃত খণ্ডনের উপায় অনুসন্ধান করিতে আসে। কর্ম্মফলবাদ যত বলে—দুষ্কৃতের ফল দুঃখ অনিবার্য্য, দুর্ব্বল মানবহৃদয় সান্ত্বনা মানে না—দুর্ব্বলতাকে দমন করিতে না পারিলেও দুঃখ হইতে সে অব্যাহতি চায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দেখিলেন, জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে সান্ত্বনা দিতে অক্ষম, মানবের প্রতি পদস্খলনে অবিচলিত দণ্ডহস্তে সে কেবল কর্ম্ম এবং ফলের মধ্যে অমোঘ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে; লোকে নিরাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা সহজ বিধি দিলেন, যাজকমণ্ডলীসমীপে দুষ্কৃত স্বীকার করিলেই পাপ হইতে মুক্তি। ইহাতে কর্ম্মফলও টলিল না, মুক্তিও সুলভ হইয়া আসিল। কর্ম্মফল

যেন সহসা এই নূতন প্রায়শ্চিত্তবিধি আবিষ্কার করিল। মুক্তিলাভের সহজ উপায় দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে এই পথ অবলম্বন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীরা মালাজপের ব্যবস্থা দিলেন, আশীর্ব্বচনের অমোঘতা প্রতিপন্ন করিলেন এবং স্থলবিশেষে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রও দিতে লাগিলেন; ক্রমে দাঁড়াইল এই যে, এক দিকে বুদ্ধগণ, অন্য দিকে অজ্ঞান মানব, এবং মধ্যে যাজকমণ্ডলী সেতুস্বরূপ। এইরূপে স্পষ্টতঃ না হইলেও নিঃশব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানমার্গচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ্যের তন্ত্রজালে জড়িত হইয়া পড়িল। যেখানে কর্ম্মফলের একমাত্র অধিকার ছিল, সেখানে দেবপ্রসাদবৎ একটা অনুগ্রহলিপ্সার ভাব অল্পে অল্পে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে অনুষ্ঠান যত বাড়িতে লাগিল, ব্রাহ্মণ্যের সহিত ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধি সহকারে প্রাচীন বৌদ্ধ সরলতা বিলুপ্ত হইয়া আসিল। এবং ব্রাহ্মণ্য যখন যথাবশ্যক বৌদ্ধাচারকে স্বীয় অঙ্গভুক্ত করিয়া লইতে আপত্তি করিল না, তখন এ দেশে বৌদ্ধ মতের বিশেষ সার্থকতা রহিল না—বৌদ্ধধর্ম্ম দেশান্তরিত হইয়া গেল।

যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মঠ ছিল, ব্রাহ্মণ মঠধারী গিয়া সেখানে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করিলেন। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মঠে হিন্দু দেবদেবীরও প্রতিষ্ঠা হইল। খণ্ডগিরি বাদ গেল না। গণেশ আসিয়া একটি গুম্ফা অধিকার করিয়া বসিলেন। এবং গিরিপাদমূলে বাসা বাঁধিয়া বৈষ্ণব বাবাজী এক ধার হইতে বৌদ্ধ মূর্ত্তির হিন্দু নামকরণ সুরু করিয়া দিলেন। খণ্ডগিরিও সময়ে অসময়ে দুই চারি জন যাত্রীর তীর্থদর্শনস্পৃহা চরিতার্থ করিল।

পথের পাথরকে সিন্দূর দিয়া যাহারা দুই বেলা পূজা করিয়া থাকে, তাহাদের সেই ভক্তি-উন্মুখ হৃদয় খণ্ডগিরির আশ্চর্য্য গুম্ফাবলী দেখিয়া দেবপ্রভাব অনুভব করিবে না ত কি? ব্রাহ্মণেরা আবার বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং বৌদ্ধ মূর্ত্তি লইয়া যদি বা কোন কালে গোলযোগ উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও মিটান হইয়াছে। আর আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বহুকাল হইতেই নানা বিভিন্ন মত পরিপুষ্ট হইয়া মনটিকে এমনি করিয়া তুলিয়াছে যে, সকল বিরোধের মধ্যেই সেখানে নির্ব্বিবাদে কেমন একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া আসে। কর্ম্মফলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াও আমাদের দেবভক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না; বিশ্বসংসারকে মায়া এবং মোহ বলিয়া উড়াইয়া দিই, আবার সমস্ত বিশ্বে দেবতার আবির্ভাব দেখিয়া, তরু লতা গুল্ম হইতে সর্ব্বলোকে মায়াতীত বিশ্বেশ্বরের মহতী মঙ্গল-ইচ্ছার বিকাশ অনুভব করিয়া প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি; দেবতা এক এবং অদ্বিতীয় জানিয়া ইতর বস্তুর পূজা নিষ্ফল বলিয়া বুঝি, আবার প্রতি ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ডের চরণে নৈবেদ্য নিবেদন না করিয়া থাকিতে

পারি না; দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদকে সমানভাবে অন্তরে স্থান দিয়া থাকি; ব্রহ্মকে নির্গুণও বলি, সগুণ জানিয়াও পূজা করি; যেখানে বিভিন্ন মতের মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়, সেখানেও আমরা উভয়কেই অকাতরে আত্মসাৎ করিয়া লই। নানা মতের সংঘর্ষে আমাদের মনের বোধ করি নানা বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিবার শক্তি একটু বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দেখি বলিয়াই আমাদের মনে বিরোধ সহজেই ভঞ্জন হইয়া আসে।

যে সমস্ত বড় বড ধর্ম্মতত্ত্ব ইংরাজ সংস্কারকেরা হালে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাইতে চাহিতেছেন—যেমন, জাতি-উচ্ছেদ, মানবে মানবে সাম্য, ঈশ্বরের একমাত্রতা এবং প্রতিমার অকিঞ্চিৎকরতা—সে সকলই আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও নূতন কথা নহে। সামান্য কুটীরবাসী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বলিবে, ধর্ম্মের নিকটে জাতি নাই, সকলেই সেই একমাত্র অদ্বিতীয় প্রত্যক্ষের অগোচর পরমেশ্বরের সৃষ্টি এবং সেই মহান্ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বঘটে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তবে শিলাখণ্ডকে পূজা করিয়া ফল কি, পিতৃপিতামহাগত লোকাচারের উল্লেখ করিয়া সেও বলিবে, ইহার মধ্যেও ত পরমেশ্বর আছেন, এবং সেই সঙ্গে নিরাকারকে ধারণা করিবার সামর্থ্য অস্বীকার করিয়া বিনীতভাবে সর্ব্বসমক্ষে আপন অজ্ঞতা নিবেদন করিবে। কিন্তু নিজে শিলাখণ্ড পূজা করে বলিয়া অপ্রতিম ব্রহ্মোপাসনার মহত্ত্ব অস্বীকার করিবে না।

ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দেখিবার অভ্যাসে মনের এইরূপ প্রসর বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই এবং সৃষ্টির সর্ব্বত্র নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন নিগূঢ় অবিরোধ আবিষ্কার করিয়া সমগ্র বাহিরকে চিত্ত অন্তরে আয়ত্ত করিতে শিখে। কিন্তু আমাদের অন্তরের একাংশে এই সামঞ্জস্যসাধনী শক্তির পরিপুষ্টি হইলেও সময় সময় বৈপরীত্যের অযথা সম্মিলনে অনেক অসঙ্গত অদ্ভুত ফলও প্রসূত হয়। এবং দেবে দানবে, অবতারে নিরীশ্বরে ঘোলাইয়া গিয়া মন অনেক সময় বিহ্বল হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, এই বিরোধগ্রাসিতাই কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের জীবন। এবং ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে এইটুকু ছিল বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে স্থায়ী হইতে পারিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষেই ব্রাহ্মণ্যের এই শক্তি অধিকতর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে এবং তজ্জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট ব্রাহ্মণ্য কতকাংশে ঋণী।

বৌদ্ধধর্ম্মও যে ব্রাহ্মণ্যের দ্বারা সহজেই প্রভাবীকৃত হইয়াছিল, তাহারও এক কারণ এই। ব্রাহ্মণেরা যেমন-তেমনি বৌদ্ধ কর্ম্মফলটিকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন এবং তাহার উপর চিরন্তন দৈবের প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ম্মফলের দুঃখ লাঘব করিলেন।

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মকেও দৈবের স্থানে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণ্যের সহিত সমান সম্মান বজায় রাখিতে হইল। সৃষ্টি হইল বৌদ্ধ তন্ত্র—যাহা যথার্থ বৌদ্ধভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের কালস্বরূপ। এই তন্ত্র যেন ব্রাহ্মণ্যেরই ছদ্ম শিশু, বৌদ্ধবেশে ব্রাহ্মণ্যকেই উচ্চ করিয়া তুলিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিল।

কিন্তু এ সমস্তই যাহা কিছু ঘটিয়াছে, বিপ্লবের আকারে নহে—ধীরে ধীরে নিঃশব্দে যেন একই ধর্ম্ম নানা অবস্থার মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকও বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বরাবর পাশাপাশি ছিল এবং বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগকে ও ব্রাহ্মণীয়েরা শ্রমণদিগকে শ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করিতেন না। ব্রাহ্মণ্য দর্শনাদি বৌদ্ধ আশ্রমে পঠিত হইত এবং ব্রাহ্মণ গুরুর নিকটে শাস্ত্রাধ্যয়নও অগৌরবের বিবেচিত হইত না। বৌদ্ধ শ্রমণেরাও যে কিরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন, এখনকার হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে দেখিলেই তাহা অনেকটা বুঝা যায়। কারণ, এই সন্ন্যাসবাহুল্য অনেক পরিমাণে বৌদ্ধ সন্ন্যাসেরই ফল।

খণ্ডগিরির গুহাবলীতে এই প্রাচীন ধর্ম্মযুগের সমাধি। এখন কিছুই নাই, শুধু শূন্য গুম্ফাবলী, কোনটি ব্যাঘ্রের মুখব্যাদানের অনুরূপ, কোনটি বা হস্তীর স্থূল দেহের আকারসদৃশ, কোথাও দেবসভা—পাহাড়ের পাষাণ-দেয়ালে খোদিত কতকগুলি বৌদ্ধ মূর্ত্তি, এবং তাহারই সন্নিহিত সর্ব্বোচ্চ শিখরে নব্য জৈন মন্দির। জৈন দেবতা সেই বিজন গিরিশিখরে বসিয়া আপন মহিমায় বিলীন হইয়া আছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে একবার উৎসব হয়। ভুবনেশ্বর হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া ঘণ্টা নাড়িয়া যায়। দূর নিকট হইতে কতকগুলি জৈন যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হয়। গিরিপাদমূলে যে বাবাজী বাসা বাঁধিয়া থাকে, যাত্রীদিগকে সাদর অভ্যর্থনাসহকারে নানাপ্রকারে খণ্ডগিরির অতীত গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়। এবং সেই পুরাতন গল্পটি বার বার করিয়া বলে যে, হনুমান্ পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় ঋষিসেবিত হিমালয়ের এক খণ্ড কেমন করিয়া এখানে ফেলিয়া যায় এবং বহুদিন ঋষিদিগের বাসস্থান থাকিয়া কলির প্রারম্ভে পাপের প্রাদুর্ভাবের সহিত সেই নিক্ষিপ্ত হিমাচলখণ্ড কালক্রমে কিরূপে ঋষিগণের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে।

'সাধনা', জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

উত্তরচরিত

উত্তররামচরিত কালিদাসের কাব্যের মত কেবলি মধুর ও সুন্দর চিত্রপরম্পরার সমাবেশ নহে; সেখানে মেঘমন্দ্র সমাসে যেমন প্রকৃতির নিবিড নিশ্চল গাম্ভীর্য্য মুদ্রিত হইয়া উঠে, তীব্র করুণ আবেগে সেইরূপ মানবহৃদয়ের সমস্ত গভীর সুখ দুঃখ, বেদনা আনন্দ প্রগাঢ় হইয়া আসে; এবং এই নির্ঝরঝঙ্কৃত উত্তাল তরঙ্গকল্লোলিত প্রচণ্ড প্রকৃতি মানবের মেঘমেদুর অন্তরে ঘনীভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। কালিদাসের চিত্রশালা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভবভূতির কাব্যজগৎ যেন এক সম্পূর্ণ নূতন দেশ—এখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য সুবিন্যস্ত এবং মানবহৃদয় বহিঃ-প্রকৃতির সহিত নানা অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া আপনাকে নানা ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু কালিদাসের চিত্রশালায় মন যেরূপ ভ্রমরবৎ চিত্র হইতে চিত্রান্তরে, সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যান্তরে, উপমা হইতে উপমান্তরে নীত হয় এবং নানা ফুল হইতে কেবল মধুর সৌন্দর্য্যটুকু সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে, ভবভূতির দৃশ্যকাব্যে মনে সেরূপ হিল্লোল সঞ্চারিত হয় না—চক্ষের সম্মুখে ঘননিবিড অরণ্যানীর নীরন্ধ্রনিচুলনীলিম একটি গম্ভীর দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হয় এবং দূর দিগন্তপটে মুদ্রিত মেঘমালাবৎ নীল শৈলশ্রেণী, গদ্‌গদ্‌ভাষিণী নদী গোদাবরী, নিরন্তরধ্বনিত নিবিড় নির্জ্জনতা, সমস্ত মিলিয়া সেই নিবিড়তা আরও নিবিড়তর করিয়া তুলে; একটি সমগ্র সংহত দৃশ্যগাম্ভীর্য্যে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। কালিদাস যেখানে ফুলটি, মালাটি, মদরাগ ও চুম্বনবিলাস এবং তদানুষঙ্গিক সুন্দর জ্যোৎস্না, মধুর মলয় ও উদ্ভিন্নযৌবনা প্রকৃতি দিয়া খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করাইয়া দেন, ভবভূতি সেখানে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিয়জনকে যেন মন্থন করিয়া তুলেন; সেই জন্য প্রিয়জন তাঁহার নিকট এমন কি-জানি-কি এবং প্রিয়স্পর্শে তিনি একেবারে আকুল হইয়া উঠেন—নিশ্চয় করিতে পারেন না—সুখ না দুঃখ, প্রবোধ না নিদ্রা, শরীরে বিষসঞ্চার হইয়াছে অথবা মদিরা পান করিয়াছেন, চৈতন্য লুপ্ত কি উন্মীলিত।

সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এবং সকল হৃদয় দিয়া ভবভূতি প্রিয়জনকে অন্তরের অন্তরদেশে যতই চাপিয়া ধরেন, সে কি-জানি-কিকে সম্যক্‌ অনুভব করিয়া উঠা যায় না; অঙ্গ অবশ হইয়া আসে, চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, ভবভূতি আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু প্রিয়জন ততই কি-জানি-কি। উত্তরচরিত নাটকের সপ্ত অঙ্কের মধ্য দিয়া বরাবর এই একটি করুণ বেদনা সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রথম হইতে শেষ

পর্য্যন্ত যেন কোন্ প্রিয়াকুল করুণ হৃদয় আপন গোপন মর্ম্মস্থলে প্রিয়জনকে বিদ্ধ করিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া আপনাকে তাহাতে ক্ষীণ করিতেছে এবং সেই নিবিড় মর্ম্মনিপীড়িত বেদনা কোথাও দেহ অবলম্বনে, কোথাও হৃদয় অবলম্বনে, কোথাও চিত্র অবলম্বনে, কোথাও বা ছায়া অবলম্বনে অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তরচরিতে তবে সুখ কি নাই? কেবলি একটি ধারাবাহিক করুণ ব্যাকুলতা? কেবলি হা হতোস্মি, হা রাম, হা সীতে, কিম্বা কোথা প্রিয়ে, প্রাণনাথ, এবং অন্তর্বাষ্পাবস্থা ও সাশ্রু নয়ন? লক্ষ্মণ যখন পিতৃবিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা সীতাদেবীকে তাঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্তের চিত্রগুলি দেখাইতেছেন, তখন কি সকলের মনে সুখসঞ্চার হয় নাই? নিদ্রালসে শিথিলাঙ্গী আলিঙ্গনবদ্ধা সীতার স্পর্শে রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চার হইয়াছিল, সে কি সুখ নহে? দীর্ঘ বিরহনিশাবসানে সীতার সহিত রামের যখন মিলন সম্পাদিত হইল, তখন কি সুখের সীমা ছিল?—কিন্তু ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মত হইয়া আসে। হয়, তাহার সহিত কতকগুলি দুঃখকাহিনী বিজড়িত, নয়, তাহার মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য বিবশ ব্যাকুলতা—সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; যদি বা মিলন হয়, মিলনের মাঝখানে যেন শতবর্ষের বিরহ জাগিয়া থাকে এবং মিলনান্ত উপসংহারেও পুরাতন বিরহ পরিতৃপ্ত হয় না। কালিদাসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস-অলসিত মোহন মধুরবেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবদ্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্ম্মস্থলে বেদনাবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ ও নিবিড় হইয়া উঠে।

নাট্যারম্ভের অল্পক্ষণমধ্যেই সীতার বিনোদনজন্য চিত্রিত কতকগুলি আলেখ্য লইয়া লক্ষ্মণ যখন প্রবেশ করিলেন, রামচন্দ্র ও সীতাদেবী অষ্টাবক্রকে সবে মাত্র বিদায় দিয়া নিভৃতে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণের আগমনে প্রথম সেই নীরবতা ভঙ্গ হইল। রামচন্দ্র আলেখ্যের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, ইহাতে কি অবধি চিত্রিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা বধূঠাকুরাণীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত। প্রিয়াগতপ্রাণ রামচন্দ্রের নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, হায়, জন্মপরিশুদ্ধাকেও আবার অগ্নিতে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইল! সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে, তোমার প্রতি যে রুক্ষ আচরণ করিয়াছি, তাহা সর্বথা তোমার অযোগ্য, অপরাধ মার্জ্জনা কর। সীতা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য আলেখ্যের প্রতি রামের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

সে বহুদিনের কথা; প্রথম যখন আর্য্যপুত্র, ঋষি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে মিথিলায় শুভাগমন করেন—উদ্ভিদ্যমান নবনীলোৎপলশ্যাম স্নিগ্ধ মসৃণ চারুদেহ, সৌম্য সুন্দর

মুখশ্রী, কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভঙ্গ করিতেছেন—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাত জনক, বিস্মিত দৃষ্টি বালকের মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ করিয়া নিশ্চল। সেই শুভ বিবাহ-রজনী—মঙ্গলাচার, হুলুধ্বনি, রাজন্যবর্গ ও ঋষিগণপরিবৃত সভামণ্ডপ—চারি ভ্রাতার চারি বধূ—তাত দশরথ বধূসমাগমে পরিপূর্ণহৃদয়। জানকীকে দেখিয়া মাতৃগণের কি আনন্দই হইয়াছিল! বালিকার অনতিনিবিড় সূক্ষ্ম দন্তপংক্তি, উভয় গণ্ডদেশে চারু অলকাবলী আসিয়া পড়িয়াছে, চন্দ্রকরনির্ম্মল মনোহর মুখশ্রী, বিভ্রমবিলাসহীন সরল অঙ্গযষ্টি। তখন জীবন অতি লঘু—তাত জীবিত—ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, দিনগুলি নিশ্চিন্তমনে কাটিয়া যাইত। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

লক্ষ্মণ একটির পর একটি চিত্র উল্টাইয়া যাইতেছেন, এবং পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলি সকলের চক্ষের সমক্ষে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে। সীতা রামকে বলিতেছেন, কখনও বা রাম সীতাকে বলিতেছেন, সেই দিন স্মরণ হয় কি?—এই সেই কালিন্দীতটস্থ শ্যামবট—হে প্রিয়ে, এখানে একদিন পথশ্রমে ক্লান্তদেহ তুমি আমার বক্ষের মধ্যে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলে। ঐ যে সেই বিন্ধ্যাটবীর প্রবেশদ্বার—আর্য্যপুত্র হস্তস্থিত তালবৃন্তের দ্বারা এইখানে একদিন আমার আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ দেখাইয়া দিলেন, দূরে ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষসমূহে নিরন্তরস্নিগ্ধনীলপরিসর গোদাবরীমুখরিত অরণ্যপ্রদেশ দেখা যায়, বনভূমির মধ্য হইতে মেঘমেদুরিতনীলিমা প্রস্রবণগিরি উঠিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই পর্ব্বতের পর্য্যন্তভাগে গোদাবরীশিশিরকণাসম্পৃক্ত বায়ুসেবনে আমাদের বিজন স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণ মনে পড়ে কি? কপোলে কপোল সংসক্ত এবং পরস্পরকে প্রগাঢ় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া সুখপর্ণশয্যায় অবিরত মৃদু গল্পগুঞ্জনে অজ্ঞাতসারে নিশাতিবাহন মনে পড়ে কি? লক্ষ্মণ আর একটি চিত্র উদ্‌ঘাটন করিলেন—রামচন্দ্রের সেই প্রথম বিরহ। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চোখ ফুলিয়াছে এবং অধর ও নাসাপুট রুদ্ধ আবেগে ঈষৎ স্ফুরিত। রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস, বৈরপ্রতিমোচনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তৎকালে কোনরূপে এ দারুণ বিরহও সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দুঃখাগ্নি পুনঃপ্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়া হৃন্মর্ম্মব্রণের ন্যায় অন্তরে অত্যন্ত দুঃসহ বেদনা দিতেছে। এইরূপ বহুতর চিত্রের মধ্য দিয়া গিয়া সেই প্রসন্নগম্ভীর বনরাজি এবং চিরাকাঙ্ক্ষিত পবিত্রসৌম্যশিশিরাবগাহা ভাগীরথী—যাহা দেখিয়া সীতার মন তপোবনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং রামচন্দ্র অচিরেই তাঁহার দোহদাভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সকল চিত্রগুলি আমরা অবশ্য এখানে উল্লেখ করিলাম না। ঊর্ম্মিলার চিত্র লইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার মৃদু পরিহাস "বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা", শূর্পণখাকে দেখিয়া

তাঁহার স্ত্রীজনোচিত ভীতিভাব, মন্থরার চিত্র হইতে অবিচলিত অবলীলাক্রমে রামের চিত্রান্তরে গমন, এই সকলের মধ্যে কাব্যকলা যথেষ্ট আছে। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস প্রথম পরিচ্ছেদের কল্যাণে বঙ্গীয় পাঠকসমাজে তাহা অপ্রকাশও নাই। আমরা যে চিত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেইগুলি হইতে কালিদাসের বর্ণনার সহিত ভবভূতির বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিবার কতকটা সহায়তা হইতে পারে বোধ হয়।

কালিদাসও এই পথ দিয়া দু' এক বার যাত্রা করিয়াছেন। এবং ভবভূতি যে তরুসমাচ্ছন্ন গোদাবরীপ্রদেশ, হংসকারণ্ডবাদিবিচরিত কমলশোভিত রমণীয় পম্পাসরোবর ও ককুভস্বরভিত নীল স্নিগ্ধ নূতন তোয়বাহবেষ্টিত মাল্যবান্ শৃঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাসের লেখনী তাহার একটিকেও পরিত্যাগ করে নাই এবং এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহারও মনে পত্নীগতপ্রাণ রামচন্দ্রের বিরহ উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন, এইখানে বেতসকুঞ্জে গোদাবরীতরঙ্গশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার উৎসঙ্গে মস্তক রাখিয়া কত নিশি যাপন করিয়াছি; এই মাল্যবান্ গিরি—নূতন মেঘবারির সহিত এইখানে আমারও বিরহজনিত নেত্রজল পতিত হইয়াছিল; নবোদকসিক্ত পল্বলগন্ধ, অর্দ্ধোদ্গতকেশর কদম্বপুষ্প, শিখিকুলের কেকাধ্বনি তোমার বিরহে অসহ্য বোধ হইয়াছিল; মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া তুমি যে গাঢ়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে, তাহারই স্মৃতি লইয়া গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত ঘনগর্জ্জন অতি কষ্টে সহ্য করিতাম; ঐ পম্পাসর—অয়ি প্রিয়ে, ঐখানে চক্রবাকমিথুন ক্ষণমাত্র বিযুক্ত না হইয়া পরস্পরের মুখে পদ্মের কেশর প্রদান করিত, তাহা দেখিয়া বহু কষ্টে আমি তোমার বিরহ যাপন করিতাম; পম্পাতটে ঐ স্তনাভিরামস্তবকাভিনম্রা তন্বী অশোকলতাকে দেখিয়া তোমাভ্রমে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলাম। ইহার পর যেখানে ঋষ্যাশ্রম আসিয়াছে, সুরাঙ্গনাগণের ব্যর্থ বিভ্রমচেষ্টা দিয়া তপঃপ্রভাব প্রদর্শনচ্ছলে কালিদাস রূপসীর উন্মুক্ত যৌবন বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং গিরিপাদপ্রবাহিত নগনদীদর্শনে মুক্তাহারবিন্যস্ত পীন পয়োধর চিত্রিত করিয়াছেন। ভবভূতির বর্ণনায় মাল্যবান্ চিত্র দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কেবল বলিয়াছেন, বৎস, থাক্ থাক্, আর পারি না, আমার জানকীবিপ্রয়োগ পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইতেছে; পম্পাসরোবরে অশ্রুজলের আভাস আছে মাত্র; এবং ঋষ্যাশ্রম ও প্রকৃতিদর্শনে কেবল সরল গম্ভীর ভাষায় তাহার বিরলোপমা বর্ণনা।

কিন্তু ভবভূতির পরিচয় এ পর্য্যন্ত আমরা অল্পই পাইয়াছি। চিত্রদর্শনে এই বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের একাংশমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইয়া গেলে সীতাদেবী বাহুপাশে রামচন্দ্রের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বাতায়নসন্নিহিত নিভৃত প্রদেশে

শয়ন করিলেন। সেই স্পর্শটুকুমাত্রে ভবভূতির সমস্ত বেদনা যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। একখানি নবনীসুকুমার কোমল করস্পর্শ—শুধু একটা আত্মবিস্মৃত অনির্দ্দেশ্য আবেগের মত। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,

প্রিয়ে কিমেতৎ

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

বহু বর্ষ পরে নাইটিঙ্গেলের কণ্ঠস্বরে একজন বিদেশী কবির হৃদয়ে অনেকটা এইরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

"My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk."

শুধু কি তাই? গান শুনিতে শুনিতে কীট্‌সেরও রামচন্দ্রের দশা ঘটিয়াছে --"প্রবোধো নিদ্রা বা"—"Do I wake or sleep?"

রামচন্দ্রের বাহূপরি মস্তক রাখিয়া সীতা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিবাহসময় হইতে গৃহে বনে, শৈশবে যৌবনে চিরদিনই এই বাহু তাঁহার উপাধান হইয়া আসিয়াছে। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র, আছ ত?" রামচন্দ্র স্নেহভরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে করস্পর্শ করিলেন। সীতা তাঁহার গৃহের লক্ষ্মী, নয়নের অমৃতশলাকা, সীতার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে বহুল চন্দনরস লেপন, কণ্ঠদেশে এই বাহু শিশিরমসৃণ মুক্তাহার; অসহ্য বিরহ ভিন্ন সীতার কিই না প্রিয়? "হা আর্য্যপুত্র, সৌম্য, কোথা তুমি?" চিত্রদর্শনজনিত বিরহভাবনা স্বপ্নাবস্থায়ও প্রিয়ার চিত্তোদ্বেগ ঘটাইতেছে।

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য-
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥

সুখে দুঃখে একরূপ, সর্ব্বাবস্থাতেই অনুকূল, হৃদয় যাহাতে বিশ্রাম লাভ করে, বয়সে

যাহার রসক্ষয় হয় না, কালক্রমে লজ্জা ভয় সঙ্কোচ অপগত হইয়া যাহা পরিণত স্নেহসারে অবিস্থিতি করে, সুমানুষের সেই অদ্বিতীয় নিরুপাধি প্রেম কত পুণ্যেই পাওয়া যায়!

এমন সময়ে দুর্মুখ আসিয়া সেই দারুণ লোকাপবাদসংবাদ নিবেদন করিল। কোথায় এত প্রেম? কোথায় সেই চিরন্তন পত্নীগতপ্রাণতা? প্রবল কুলগৌরব আসিয়া বলিল, সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। হৃদয় বলিল, সীতা যে নিরপরাধিনী। আর, হে রাম, সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি? তোমার জগৎ ত সীতাবিহনে জীর্ণারণ্য। ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্ক মোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অখণ্ড প্রেম সমস্ত প্রজাপুঞ্জের প্রীতি হইতেও গুরুতর ও উচ্চতর, যে অদ্বিতীয় প্রীতি, শুধু ইক্ষ্বাকুবংশ কেন, সমস্ত মানবকুলের জীবন, তাহাকে অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া কলঙ্কক্ষালন কিরূপ? তবে আশৈশব এত করিয়া সীতাকে পোষণ করিলে কেন? সৌনিকবৃত্তিই যদি অবলম্বন করিবে, ক্ষুদ্রা পক্ষিণীকে বক্ষনীড়ে টানিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল? কুলগৌরব বলিল, ও কথা নয়; তুমি রাজা, তুমি দশরথের পুত্র, রঘুর প্রপৌত্র, সূর্য্য তোমার আদিপুরুষ স্মরণ রাখিয়ো; তুমি শুধু সীতার স্বামী নহ, সসাগরা ধরিত্রী তোমাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে ভুলিয়ো না; পত্নী ত্যাগ কর—নহিলে, আজ তুমি রাজা হইয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইবে, তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ গৃহে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে; তুমি রাজা, তুমি শুদ্ধ মাত্র প্রেয়সীর প্রেয়ান্ নহ, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া চিরন্তন বিধি রক্ষা কর। রামচন্দ্র কুলগৌরবের নিকট শির নত করিলেন। হৃদয় বলিতে লাগিল—কি করিলে! হায় রামচন্দ্র, কি করিলে!

দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটনা বড় নাই। একটি সুন্দর বিষ্কম্ভক—সেই বিষ্কম্ভকে ঋষিপত্নী আত্রেয়ী ও বনদেবতা বাসন্তীর কথোপকথনচ্ছলে দ্বাদশ বৎসরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা, সীতার যমক সন্তান প্রসবানন্তর রসাতলপ্রবেশ, সন্তানদ্বয়ের বাল্মীকি আশ্রমে অবস্থান. রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ, লক্ষ্মণাত্মজ চন্দ্রকেতুর প্রতি অশ্বরক্ষণভার, নীচজাতীয় শম্বূকের তপশ্চর্য্যানিবন্ধন রাজ্যে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ও শম্বূকের শিরশ্ছেদনমানসে রামের পঞ্চবটী আগমন বৃত্তান্ত। বিষ্কম্ভক এই; এবং অঙ্কটি রামখড়্গাঘাতে শাপবিমুক্ত দিব্যপুরুষ শম্বূকের সহিত রামের কথোপকথনে পঞ্চবটী বর্ণনাদি।

সম্মুখে দণ্ডকারণ্য। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভীষণ রুক্ষ দৃশ্য; স্থানে স্থানে নিরন্তর নির্ঝর ঝরঝর মুখরিত; কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী, কোথাও ঘন বন। ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ দক্ষিণারণ্য চলিয়াছে। এই

অরণ্যভূমি চিরদিন সর্ব্বলোকলোমহর্ষণ—এখানকার গিরিগহ্বরসকল উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল। কোথাও একেবারে নিষ্কূজস্তিমিত, কোথাও নিরন্তর গর্জ্জনধ্বনিত, কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীরগর্জ্জনকারী ভুজঙ্গগণের নিশ্বাসে জ্বালিত-অগ্নি; কোথাও গর্ত্তমধ্যে অল্প জল দেখা যাইতেছে, এবং তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের স্বেদবিন্দু পান করিতেছে।—রামের সেই সকল পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে, সীতা তাঁহার সহিত এই বনে বনে থাকিতে কত ভালবাসিতেন এবং সীতাসান্নিধ্যে তাঁহার সকল দুঃখ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত!

তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।

এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মদকল ময়ূরের কণ্ঠসদৃশ কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ, ঘনসন্নিবিষ্ট নীলপ্রধান তরুণ তরুসমূহে শোভিত এবং অনাকুল বিবিধ মৃগযূথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীসকল বহুস্রোতে বহিতেছে; মদমত্ত বিহঙ্গগণের অধিষ্ঠানে বৃন্তচ্যুত বেতসকুসুম পতিত হইয়া সেই জলকে স্নিগ্ধ ও সুরভিত করিতেছে; এবং পরিপক্ক ফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্রোত স্খলিত হইয়া মুখরিত হইতেছে। গুহাবাসী ভল্লুকগণের থুৎকারনিঃস্মরণসহিত শব্দ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া অত্যন্ত গম্ভীর বোধ হইতেছে, এবং গজভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকল হইতে শিশির-কটুকষায় গন্ধ বাহির হইতেছে।—এই পঞ্চবটী বনে সীতার সহিত বিশ্রম্ভালাপে কত দিন কাটিয়াছে। সেই সকল কথা মনে হইয়া রামের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ উথলিয়া উঠিতেছে—শরীরপ্রবিষ্ট তীব্র বিষরস যেমন বহুদিন পরে সহসা আপন বেগ প্রকাশ করে।

চিরাদ্বেগারম্ভী প্রসৃত ইব তীব্রো বিষরসঃ
কুতশ্চিৎ সংবেগাচ্চলিত ইব শল্যস্য শকলঃ।
ব্রণো রূঢ়গ্রন্থিঃ স্ফুটিত ইব হৃন্মর্ম্মণি পুন-
র্ঘনীভূতঃ শোকো বিকলয়তি মাং নূতন ইব॥

অগস্ত্যাশ্রমে আমন্ত্রিত হইয়া রামকে এই পঞ্চবটী অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। পথে

গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাডম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ-
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥

এই ক্রৌঞ্চাবত গিরি। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকারবৎ বায়ুপ্রবিষ্ট বংশগুচ্ছের শব্দে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দ, এবং চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া সর্পেরা প্রাচীন বটের স্কন্ধদেশে লুক্কায়িত।

অদূরে

এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥

এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত। পর্ব্বতের কুহরে গোদাবরীর বারিরাশি গদ্গদনিনাদ করিতেছে; নীল শিখরদেশ মেঘালঙ্কৃত; এবং অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গ-কোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ গভীরবারি নদীগণের পুণ্য সঙ্গম দেখা যায়।

এই পঞ্চবটীপ্রবেশ নামক অঙ্কের পরেই সেই ছায়াঙ্ক। মনোহর ক্ষুদ্র বিষ্কম্ভকে কলকলভাষিণী তমসা ও মুরলা আসিয়া মিলিয়াছে—এবং বিরহক্ষীণ "অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ" রামচন্দ্রের—চতুর্দ্দিকে বধূসহবাসবিস্রম্ভের স্মৃতিদংশনে—ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কা করিয়া গোদাবরীর নিকটে শীতল জলকণাসম্পৃক্ত বায়ুহিল্লোল প্রার্থনা করিতেছে। ভগবতী ভাগীরথীর অনুগ্রহে সীতা ছায়ারূপিণী—স্পর্শ আছে, কিন্তু দর্শনের অতীত; ঠিক ছায়ার মত নয়, যেন বাতাসের মত—স্পর্শে তেমনি সঞ্জীবনী এবং বাতাসেরই মত নয়নের অতীত। কিন্তু বাতাসের মত কেবলি একটা উন্মত্ত হাহাকার নহে—যখন নর্ম্মদাহ্রদ হইতে উঠিয়া আসেন, পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দর বিলোলকবরী মুখখানি—দেখিয়া মনে হয়, যেন করুণার মূর্ত্তি অথবা শরীরিণী বিরহব্যথা সমুপস্থিত।

উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কটিই এই করুণাবিগলিত বেদনা দিয়া রচিত। এক দিকে পূর্ব্বস্মৃতি সীতাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে—কবে কোন্ করিশাবককে তিনি শল্লকীপত্র খাওয়াইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, তাহার বিপদ্ হইয়াছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি আর্য্যপুত্রকে আহ্বান করিয়া বসেন এবং পরক্ষণেই দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান স্মরণ করিয়া একেবারে যেন ধূলিসাৎ হইয়া যান; অন্য দিকে রামও সেই পঞ্চবটীর তরু লতা, মৃগ মৃগী, ময়ূর ময়ূরী, সর্ব্বত্র সীতার স্নেহ অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সীতা সীতা করিতে করিতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন।

তখন সীতার স্পর্শ ভিন্ন কিছুই আর তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিতে পারে না। সেই ছায়ারূপিণীর সঞ্জীবনস্পর্শে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়া আনন্দে একটা অবশ অলস বিহ্বলতা জন্মে। সেই ছায়াহস্তকে তিনি চাপিয়া ধরেন—করে করস্পর্শে উভয়েরই

অঙ্গে অঙ্গে যেন পুলক সঞ্চারিত হইয়া উঠে—কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না, অঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, হাত ছাড়িয়া যায়। যেন সফল হইতে আসিয়া আশা সহসা বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

চেতনা সম্পাদিত হইলেও জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বহ। একে সেই পঞ্চবটী বন—এইখানে বসিয়া সীতা মৃগদম্পতিকে তৃণভক্ষণ করাইতেন, ঐ তাঁহার স্বহস্তরোপিত কদম্বতরু, সম্মুখে সেই উল্লাসচঞ্চলা ময়ূরবধূ—চতুর্দ্দিক্ সীতাময়; তাহার উপর বাসন্তীর সেই মর্ম্মবেধী বজ্রকঠিন বিদ্রূপাচরণ। মহারাজ, অঙ্গের অমৃত, নয়নের কৌমুদী, দ্বিতীয় হৃদয় বলিয়া যাহাকে ভুলাইতে, লোকাপবাদ মিথ্যা জানিয়াও তাহাকে বিসর্জ্জন দিলে কোন্ হৃদয়ে? প্রেয়সী তবে শুধু কথার কথা, যশই তোমাদের একমাত্র প্রিয়! রামচন্দ্রের হৃদয় বিকীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহাই বা হয় কৈ?

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

এ শুধু অনন্ত দহন, ভস্মসাৎ করে না, জ্বালা দেয় মাত্র; শুধু মর্ম্মচ্ছেদ করিতে থাকে, জীবন শেষ করিয়া দেয় না।

হা জানকি! হা চণ্ডি! চতুর্দ্দিকেই তোমাকে দেখিতেছি—তবু তুমি নির্দ্দয় হইয়া আছ কেন? হৃদয় স্ফুটিত হইতেছে, দেহবন্ধ শিথিল হইয়া আসিতেছে, জগৎ শূন্য, অন্তরে নিরন্তর জ্বালা, মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমি অতি মন্দভাগ্য! বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সীতা তাঁহার ললাট স্পর্শ করিতে চেতনা সঞ্চার হইল। সেই স্পর্শ অন্তরে বাহিরে অমৃতের প্রলেপ; চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আনন্দও যেন মোহ উৎপাদন করে।

ভবভূতির হৃদয় এই অশরীরী স্পর্শটুকু—এই আনন্দেও বেদনা, চৈতন্যেও মোহ, এই আবেগ, আকুলতা, মায়া, রহস্য। বাসন্তী, তমসা, সীতা, রাম, পঞ্চবটী, সমস্ত মিলিয়া যে একটি নিবিড় মায়ারহস্য রচনা করিয়াছে, তাহা শুধু এই বেদনাবিদ্ধ কবি-হৃদয়ের বহিরুচ্ছ্বাস। সৃষ্টি যেমন মায়াও বটে, সত্যও বটে, ইহাও সেইরূপ। এই ছায়াঙ্ক সম্বন্ধে বোধ করি বলা খাটে "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু"।

এই স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম উত্তরচরিতের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্মীকি-আশ্রমে কৌশল্যা-জনকাদি সমাগমেই কি, লব-চন্দ্রকেতুর সুবর্ণিত সৌজন্য-পরিপূর্ণ যুদ্ধদৃশ্যেই কি, এবং সপ্তম অঙ্কের নাট্যাভিনয়েই বা কি, সর্বত্রই যেন একটা কি

ধরি-ধরি-ধরা-যায়-না, যেন কাহাকে জানি না, অথচ জানি, যেন অভিনয়, কি সত্য, ভ্রম, কি বাস্তব, ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন। সেই জন্য সুখের মধ্যেও বেদনা, জ্ঞানেও সংশয়। এবং যখন সেই রসাতলোত্থিত সিংহাসনে গঙ্গা ও ধরিত্রীর মধ্যস্থলে দেবী সীতা আবির্ভূতা হইলেন, তখন সকলে নিশ্চল স্তিমিত—সত্য, না মায়া! সেই কুশলবের মুখে "হা তাত হা অম্ব হা মাতামহ", সেই রামের স্নেহার্দ্র সহর্ষ আলিঙ্গন, সেই অরুন্ধতী, সীতা, গঙ্গা, পৃথিবী, বাল্মীকি, কুশ-লব, প্রজাপুঞ্জ, স্নেহ প্রেম, ভক্তি বিস্ময়, সুখ দুঃখ, মোহ চৈতন্যের অনির্ব্বচনীয় মহাসঙ্গম—সত্য, কি মায়া!

'সাধনা', আষাঢ় ১৩০০

কণারক

(উড়িষ্যার সূর্য্যমন্দির)

কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িতহস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্কমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহু দিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুক-কেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনককিরণে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন!

এখন এ অর্কক্ষেত্রে যাত্রীর পদধূলি আর পড়ে না। পুরী হইতে দশ ক্রোশ পথ বালু ভাঙ্গিয়া একটা ভগ্ন মন্দির দেখিতে কে যাইবে? মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে—শুধু জগমোহনটুকু বিচিত্র শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্যে ও অক্ষুণ্ণশিল্প নীলাভ প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারদেশে দৈবাগত পথিক জনের মুগ্ধ নয়ন আকর্ষণ করে। এবং পুরাতত্ত্ববিৎ এই

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন, পাষাণে প্রাচীন ভারতবর্ষ আপনাকে কি সুন্দররূপেই মুদ্রিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুদিগের মূর্ত্তিগুলিই কি সুন্দর! এমন সুগ্রীব তেজে ভরা অশ্ব, এমন সুন্দর সুঠাম করিবর! কেবল সিংহ দুইটি প্রকৃতির অনুরূপ নহে—কিন্তু তাহাও উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের সিংহের সহিত তুলনায় কতকটা সিংহের মত বটে। আর সেই অতুল্য শিল্প—নবগ্রহ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে মুদ্রিত কয়টি বুদ্ধসদৃশ প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও বা অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণঘট। এখন এই নবগ্রহমূর্ত্তি মন্দির হইতে প্রায় চারি শত হস্ত দূরে ইংরাজের লৌহরথোপরি শায়িত—কলিকাতায় আনিতে আনিতে আনা হয় নাই; পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দূর লেপনপূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়; কিন্তু এই নূতনলব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছু কাল পড়িয়া থাকিলে এই অক্ষুণ্ণ প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজস্ব সমুদ্রের বালুতটে এই একমাত্র পাষাণমন্দিরে নিঃশেষিত হইয়াছে। মন্দিরটি ত সামান্য নহে। গত শতাব্দীতেও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহারই পাথর খসাইয়া খসাইয়া জগন্নাথের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এবং জগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে সমুচ্চ অরুণস্তম্ভ দেখা যায়, তাহাও এই কণারকেরই গৌরবের ভগ্নাবশেষ।

বিলাসকলার তখন ত্রুটি ছিল না। মন্দিরের সমস্ত ভিত্তি পূর্ণ করিয়া নগ্ন নারীমূর্ত্তি—বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও সুডোল গঠন অনেক স্থলে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কুৎসিত কল্পনায় শিল্পগৌরব সঙ্কুচিত।—হয় ত বাহিরেও যেমন, ভিতরেও সেইরূপ ছিল। নর্ত্তকীর লাস্যলীলা দেবতার মনোরঞ্জন করিত এবং ভোগবিলাসেই দেবচরিত্রের সমস্ত গৌরব স্থাপিত ছিল। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে নর্ত্তকীর প্রাধান্য এখনও বড় কম নহে। জগন্নাথের পবিত্র নিকেতনে এখনও নিত্য রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় এবং পাণ্ডাবর্গের পুণ্যসঞ্চয়ের তাহাতে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোকে কত দিন অন্তরের দারুণ নির্ব্বেদ লইয়া আসিয়াছে! সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোন দিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটান না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধনচ্ছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে—হে দেবতা, রক্ষা কর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড় দেবতা, সে যদি বুঝিত—তুমি কি অন্ধকার মোহরাশিতে গঠিত! ক্ষীণ দীপালোকে তুমি ভক্তহৃদয়ের

বৈরাগ্য অনুমোদন কর ; এবং শত দীপালোকে তোমারই সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নিত্য মদন-বিলাসের এক এক অঙ্ক অভিনীত হয়।

তবে এ কি মায়া? এ কি এই সংসারখেলার একটা রূপক? বুঝান যে, চারি দিকে মদন মন যৌবন লইয়া নিত্য যে আন্দোলন উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে অন্তর কিরূপে অবিচলিত শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? তাই বুঝি কবিহৃদয় তোমার মন্দির দেখিয়া মনে করে, বিশ্বসংসারেরও বহিঃপ্রাচীরে আমরা এইরূপ ভাস্কর্য্যের মত—আপন আপন বিচিত্র জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্বপাষাণে মুদ্রিত হইতেছি ; কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে মহান্ দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন, এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পঁহুছে না।—বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক্ হইতে আসিয়া মিশিয়াছে—শুধু এ পিঠ ও পিঠ, শুধু ভিতর বাহির, শুধু দেহ মন।

কণারকে এখন দেবতা নাই—এত কথা বলা খাটে না। কিন্তু সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে। তাহার মুখে কেবল হায় হায়। বৈদান্তিক মায়াবাদীর মত সে শুধু বলিতেছে,—জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, ধন জন অনিত্য, সুখ অনিত্য, সংসার অনিত্য, সকলি যেখানে অনিত্য ও মায়া, সেখানে দেবালয়ে এ বিড়ম্বনা কেন? দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষ দিয়া এ পাষাণস্তূপ রচনা করিয়া কি ফল? দেশ কাল ত সাগরবক্ষে একটা ক্ষণিক বুদ্বুদ মাত্র ; হায়, মায়াহত, তুমি জানিয়া শুনিয়াও ইহা বুঝিলে না!

মায়াই বটে—বিধাতার মায়ারাজ্যে এ শুধু মানবের মায়াস্বপ্ন।

ভুল করিয়া শাম্ব সে দিন সরসীতীরে আসিয়াছিলেন—জননী জাম্ববতী জানিলে নিষেধ করিতেন, জনক শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থাকিলে আসিতে দিতেন না—শাম্বের বিমাতৃগণ তখন পরিপূর্ণ যৌবনে জলক্রীড়ায় মত্ত। মৃণাল-ভুজ আলোড়নে জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দরীদের যৌবনও তখন সেইরূপ আবেগভরে আন্দোলিত। এই পথে শাম্ব! পিতৃমুখ হইতে অভিশাপ বাহির হইল—কুষ্ঠরোগে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হউক।—অভিশপ্ত শাম্ব দ্বাদশ বৎসর কাল শান্ত দান্ত নিরাহার বায়ুভক্ষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে সূর্য্যকে স্তবে সন্তুষ্ট করিলেন। এবং সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকরের বরে রোগমুক্ত হইয়া মুক্তিদাতা দেবতার নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিলেন।

সেই অবধি এই অর্কক্ষেত্রে আসিয়া সমুদ্রে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে সদ্য মুক্তিলাভ হয়। ঐ যে অর্কবট দেখা যায়, সূর্য্য স্বয়ং এখানে আসিয়া ঐ রূপ ধারণ করিয়াছেন; তিন পক্ষ কাল এই বটতরুতলে বসিয়া সূর্য্যমন্ত্র জপ করিলে মানব

তৎক্ষণাৎ চরম সদ্গতি লাভ করে। এখানে রথযাত্রা দর্শনমাত্রে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শনলাভ ঘটে। যে পুণ্য জন এইখানে আসিয়া অনন্যমনে নবগ্রহের স্তোত্র পাঠ করিতে পারেন, তিনি ধন্য।—অর্কক্ষেত্রের মহিমা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। কপিলসংহিতা-রচয়িতা শত শ্লোকে তাহা শেষ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই ঘোর কলির অভ্যুদয়ে সে প্রাচীন শ্লোকসমূহও ব্যর্থ। সংহিতা কে শুনে? বিধি কে মানে? মন্দিরের দ্বার হইতে সমুদ্র যেমন মাইল পথ সরিয়া গিয়াছে, যাত্রীর প্রবাহও সেইরূপ অর্কক্ষেত্র ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া ঠেকিয়াছে।—রৌদ্রদীপ্ত নারিকেল-তরুশ্রেণীর গায়ে শৈবালশ্যাম কণারক শুধু চিত্রার্পিতবৎ দেখা যায়।

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে. হিম-শিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিক জন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।—কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়। মনে হয়,

> "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
> রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

'সাধনা', ভাদ্র ১৩০০

প্রাচীন উড়িষ্যা

উড়িষ্যার গৌরবের দিন গিয়াছে। সে কেশরী রাজবংশও নাই, সে নিপুণ শিল্পীও নাই, সে ব্রাহ্মণ্যও নাই, সে শ্রমণ সম্প্রদায়ও নাই। আর অভ্রভেদী মস্তক তুলিয়া নিত্য নূতন মন্দির উঠে না, ধূপগন্ধে ঘণ্টাধ্বনিতে দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া শত গিরি নদী প্রান্তর-ভূমি হইতে প্রতি সন্ধ্যায় ধর্ম্মের নাম তেমন উত্থিত হয় না; পথপ্রান্তে, বালুতটে, পরিত্যক্ত গিরিশৃঙ্গে সহস্র জীর্ণ মন্দির মঠ পড়িয়া আছে, তাহারা কেবল সেই পুরাতন অতীতের সাক্ষী—দূর হইতে পথিকহৃদয়ে প্রাচীন গৌরব সঞ্চার করিয়া দেয় মাত্র।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত উড়িষ্যার ইহাই এখন একমাত্র সম্বল। এই সকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষ

যুগযুগান্তরের বহু বিপ্লবের মধ্য দিয়া বহু প্রাচীন কালের একটি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। শুধু ধর্ম্ম নহে, শুধু ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব অথবা বৌদ্ধ সন্ন্যাসমাহাত্ম্য নহে, শুধু একটা বিপ্লবের ইতিহাস নহে; কিন্তু এই দেবমন্দিরের ভাস্কর্য্যে এ দেশের প্রশান্ত প্রাচীন সভ্যতার একটি অখণ্ড চিত্র, একটি সম্পূর্ণ মহিমা চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। পাষাণে খোদিত শত নারীমূর্ত্তির কত বিভিন্ন প্রকারের কেশবিন্যাস, কত বিচিত্র বেশভূষা, হস্তে কত বিস্মৃত প্রাচীন যন্ত্র, গঠনে কি মায়ামন্ত্র, ভঙ্গীতে কি অবলীলা মাধুরী! শত নিশ্চল দেবতা বিবিধ সজ্জায়, বহুবিধ শিরস্ত্রাণে, আজানু উপানহে সভা উজ্জ্বল করিয়াছেন। এখানে সেখানে নানাবিধ কলস, পানপাত্র, দীপাধান, শয্যা, আসন, গদা, অসি, খাঁড়া, ঢাল, ধ্বজা, দণ্ড—প্রাচীন সভ্যতার বিবিধ বিলাস-উপকরণ।—চক্ষের সমক্ষে মন্দিরে খোদিত একখানি সুবৃহৎ প্রাচীন গ্রন্থ—হে দূরাগত পান্থ, এইখানে আসিয়া একবার তোমার পূর্ব্বপুরুষের সমাজচিত্র দেখিয়া যাও।

বর্ত্তমান উৎকলের সহিত ইহার কিছুই মিলে না। কোথায় সে নিত্য নব কবরীর শোভা, কোথায় সে বিচিত্র কেশবিন্যাসের সহিত সুশোভন বিবিধ অলঙ্কার, কোথায় সে মৃণালভুজে চারু বলয়কঙ্কণ! উড়িষ্যাসুন্দরী হরিদ্রারঞ্জিতদেহে একখানি আজানু-লম্বিত শাড়ী জড়াইয়া গুরুভার কাংস্যালঙ্কারে মৃণালবাহুর মণিবন্ধাবধি অর্দ্ধাংশ নরলোকের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখেন এবং মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া ও সীমন্তে সিন্দূর লেপন করিয়া কেশবিন্যাসনৈপুণ্যের প্রতি অনেক পরিমাণে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন।—তাই বলিয়া সুকেশিনীগণের মধ্যে তখনকার সকল ফেসান একেবারে লোপ পায় নাই। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্যে কেশবিন্যাসের যে সকল ফেসান দেখা যায়, তাহার কোন কোনটি অদ্যাবধি উড়িষ্যার নর্ত্তকীদিগের মস্তকের শোভা সম্পাদন করে এবং কোন কোনটি মান্দ্রাজ অঞ্চলে এখনও বিশেষ প্রচলিত। সচরাচর আমরা যাহাকে মান্দ্রাজী খোঁপা বলি—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে গুচ্ছীকৃত বেণীবন্ধনহীন কেশ-কলাপ—তাহা অনেকটা এই পাষাণখোদিত খোঁপারই অনুরূপ। কেবল, সে কালে এই খোঁপার সহিত যে সকল গহনা ব্যবহার ছিল, এখন তাহা আর দেখা যায় না।

ভুবনেশ্বরে এই মান্দ্রাজী ধরণের খোঁপারও আবার নানা বিভিন্ন ফেসান দৃষ্ট হয়। খোঁপা কখনও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, কখনও বা বাম পার্শ্বে ঈষৎ হেলান, কখনও কেশগুচ্ছকে বিভক্ত করিয়া দুই পার্শ্বে দুইটি স্বতন্ত্র খোঁপার মত করিয়া দেওয়া, এবং কোন কোনটিতে এই খোঁপার উপর গুটিকতক কুঞ্চিত কুন্তল ও ললাটদেশ বাহিয়া দুইটি সুন্দর ঝাপ্টা। মস্তকের উপরিভাগেও অনেক সময়

খোঁপা স্থাপিত হইত—কখনও বাম পার্শ্বে কর্ণদেশের উপরিভাগে ঈষৎ বঙ্কিম ঝুঁটির মত, কখনও একটু চেপ্‌টা বেল্লনাকার এবং তাহারই মধ্যস্থলে একটি চারু গোলক, কখনও বা কর্ণ হইতে কর্ণান্তর অবধি শ্রেণীবদ্ধ ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনীবৎ; কেশবিন্যাসের অন্ত নাই এবং বৈচিত্র্যও অশেষ।

এখন যাহা পাষাণে খোদিত মাত্র, এক সময়ে এ সকলি জীবন্ত ছিল। কুলনারীরা প্রাসাদের নিভৃত বাতায়নসম্মুখে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুখাসনোপরি উপবেশন করিয়া কেশ এলাইয়া দিতেন; দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কেদারার মকরমুখশোভিত পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িত এবং সুন্দরী পরিচারিকা কঙ্কতিকা হস্তে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কেশের পরিচর্য্যা করিত। পার্শ্বে সুনির্ম্মিত টিপায়ের উপরে পানের বাটা, সম্মুখের পাদপীঠে দুইখানি অলক্তক-রঞ্জিত কোমল পদপল্লব।

কেশবন্ধনাদি সমাপনান্তে বেশভূষার পালা। কঞ্চুলিকাবদ্ধ অঙ্গোপরি লঘু অঙ্গিকা এবং কোঁচা দিয়া পরা মনোহর শাড়ী। খোঁপায় মুক্তার মালা; ললাটের উপরিদেশে সিঁথি; কর্ণে দুটি দুল্; কণ্ঠে হীরককণ্ঠী বা মুক্তাহার; বাহুতে তাবিজ, বাজু বা তাড়; প্রকোষ্ঠে বলয়, কঙ্কণ বা শাঁখা; কটিদেশে চন্দ্রহার; চরণে নূপুর, কিঙ্কিণী, গুজরী।

অলঙ্কার ব্যবহার পুরুষদিগের মধ্যেও নিতান্ত বিরল ছিল না। সম্ভ্রান্ত পুরুষদিগের কটিদেশে প্রায়ই এক একটি চন্দ্রহার শোভা পাইত। এবং কারুকার্য্যখচিত রেশমী ধুতির উপরে তাহারই উজ্জ্বল আভা পড়িয়া যুবতীজনের চিত্ত হরণ করিত। ইহা ভিন্ন হস্তে বলয়, কর্ণে বীরবৌলি, গলায় হার, এ সকলও কঠিন পুরুষদেহের শোভা সম্পাদনে অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত না। এবং উচ্চ জনের ধনগৌরব ও পদমর্য্যাদার সহিত ইহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়।

শুধু অলঙ্কার নহে, বেশবিন্যাসেরও বিশেষ একটু পারিপাট্য ছিল। এবং ধুতি ভিন্ন পায়জামা, জামা, চাপকান, উষ্ণীষ প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইত। রাজসভায় এক বেশ, এবং দেবমন্দিরে এক বেশ; রণক্ষেত্রে যে বেশ, প্রিয়জনকক্ষে সে বেশ নহে।—খণ্ডগিরি ও ভুবনেশ্বরের পাষাণশিল্পে এই বেশবৈচিত্র্যের একটি সুন্দর চিত্রাভাস পাওয়া যায়। এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেই বহু প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষীয় সভ্যতা আদিম অবস্থা হইতে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল।

জীবনস্রোত ভারতবর্ষে তখনও মন্দীভূত হইয়া আসে নাই। জীবনে সুখও ছিল, সখও ছিল।—সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে সুসজ্জিত কক্ষে প্রমদাগণ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া প্রিয়জনের সহিত সুখে প্রেমালাপ করিতেন; অনতি উচ্চ মঞ্চোপরি সরক ও পানপাত্র থাকিত, এবং সুন্দরীর পাণ্ডু কপোলদেশ বারুণীরাগসঞ্চারে অরুণিম শোভা ধারণ

করিত। কলাবিদ্যার তখন বিশেষ প্রাদুর্ভাব। বীণার তারে তারে নাচিয়া নাচিয়া তন্বঙ্গীর চম্পক-অঙ্গুলি সৌদামিনীর মত খেলিয়া বেড়াইত এবং প্রিয়জন সেই চঞ্চল অঙ্গুলিচালনার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইতেন না। কেবল, সেই মধুর বীণাধ্বনি, সুন্দরীর অঙ্গরাগসৌরভ ও চঞ্চল রূপের তরঙ্গ মিলিয়া মলয়সেবিত চন্দ্রালোকস্নিগ্ধ নিশাকে স্বপ্নের মত মনোহর করিয়া তুলিত।

দীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানে দিগন্তবিস্তৃত নীল চন্দ্রাতপতলে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া সুন্দরীগণ কত নিশি প্রিয়জনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। দূর হইতে গন্ধবহ কেতকীসৌরভ বহন করিয়া আনিত, এবং চূতশাখায় বসিয়া পাপিয়া জ্যোৎস্নাপুলকিত-কণ্ঠে মনের খেদ মিটাইত। প্রিয়জন এখানে আসিয়াই প্রেয়সীর কেশপাশে বহুযত্ন-গ্রথিত বকুলমালা জড়াইয়া দিয়া অনঙ্গের মনোবেদনা দূর করিতেন।

উৎকলের সে সকল দিন গত। মাল্য এখনও গ্রথিত হয়, কিন্তু তাহার সে পূর্ব্বাদর নাই; বীণা নীরব হইয়াছে; সুসঙ্গীতও বড় শুনা যায় না। উৎসবের সময়ে উড়িষ্যার গৃহে গৃহে শুধু এক অত্যন্ত বেসুরা সানাই প্রাণপণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সঙ্গীতের কলঙ্ক রটনা করে মাত্র; এবং পথক্লিষ্ট পথিক তাললয়সুরহীন দারুণ চীৎকারে মধ্যে মধ্যে কর্ণজ্বর উপস্থিত করে।

সহজেই সন্দেহ হয় যে, এই উৎকলীয়েরা কি সেই কলাকুশলদিগের বংশধর? ইহাদের পিতৃপুরুষেরাই কি স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে বিলাসকলার এমন অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন? অথবা গঙ্গা ও যমুনার দেশ হইতে এক উন্নত প্রবলপ্রতাপ আর্য্যজাতি আসিয়া এইখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন? এবং উৎকলীয়েরা তাঁহাদের অধীনে জন খাটিত মাত্র?

কারণ, বিলাস অবশ্য সমস্ত দেশ জুড়িয়া ছিল না। দেশে দরিদ্রও বিস্তর ছিল। এবং বিলাস সমুচ্চ প্রাসাদ ছাড়িয়া দরিদ্রের গৃহে পদার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইত। সেখানে চিরদিন যেমন হইয়া থাকে, স্ত্রী গৃহকার্য্য করে, স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনে। মাটির ঘরে গুটিকতক হাঁড়ি কলসী এবং একটি চারপাই মাত্র হয় ত দম্পতির ইহজীবনের সম্বল। ইহার উপর, অতিরিক্ত খাটিয়া কোনরূপে স্ত্রীর হাতের দুইগাছি রূপার খাড়ু গড়াইয়া দিতে পারিলেই পতির জীবন সার্থক।

এবং তাহাও নিতান্ত দুর্লভ ছিল না। কাজ যথেষ্ট ছিল। তন্তুবায় তাঁত বুনিত, স্বর্ণকার গহনা গড়িত, কর্ম্মকারের ঘরে অস্ত্রের ফরমাস বারো মাসই ছিল। রাজবাড়ী হইতে মধ্যে মধ্যে যে দিন পাগ্‌ড়ী-আঁটা প্রহরী আসিয়া তাগাদা করিত, কর্ম্মকারপত্নী বাপু বাছা কহিয়া প্রহরীকে খুসী করিয়া দিত, স্বর্ণকার প্রহরিগৃহিণীর জন্য রূপার দুইটি

গুঁজি গড়িয়া দিয়া বলিত,—মহারাজ, এখন কিছু কাল অব্যাহতি দাও, এবং তন্তুবায় গোপনে প্রহরীকে ঘরে লইয়া গিয়া দেখাইত, প্রহরিণী-মাসীর কাপড় হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

এমনি দেখিতে দেখিতে ধান কাটার দিন আসিত। সোনার ধানে ক্ষেত ভরিয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা দলে দলে ধান কাটিতে বাহির হইয়াছে; কৃষকাঙ্গনারা গান গাহিতে গাহিতে ধানের আঁটি বাঁধিতেছে। গৃহে গৃহে উৎসব। দেবতামন্দিরে পূজার ভারি ধুম। সিংহাসন হইতে রাজা নামিয়া আসিয়াছেন, প্রাসাদ হইতে অমাত্যের দল উপস্থিত, পশ্চাতে সমস্ত প্রজাপুঞ্জ; মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরের দিগন্ত অবধি লোকারণ্য। উজ্জ্বল নীলাকাশতলে বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের বেশভূষা—ময়ূরকণ্ঠী ধূপছায়া লাল নীল সোনালী গোলাপী বেগুনী নানা বর্ণের তরঙ্গ; মণিমুক্তা জরী জহরৎ ঝক্‌মক্ করিতেছে। পট্টবস্ত্রপরিহিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, হোমাগ্নিতে অনবরত ঘৃতাহুতি ও লাজাঞ্জলি প্রদত্ত হইতেছে, স্তূপাকার পুষ্পরাশিতে দেবতা দুর্নিরীক্ষ্য; বাহিরে নহবৎ বসিয়াছে, ভিতরে কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খধ্বনির বিরাম নাই; আবালবৃদ্ধবনিতা রাজা হইতে ভিক্ষুক অবধি নতশিরে দেবতার আশীষ গ্রহণ করিতেছেন।

এখনকার কালের মত রাজা প্রজায় তখন একটা দূর সম্পর্ক ছিল না। রাজা পিতার মতন ছিলেন—পুত্রনির্বিশেষে প্রজাদিগকে পালন করিতেন। প্রজারাও সুখে দুঃখে রাজদ্বারে গিয়া দাঁড়াইত—তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। শাসনতন্ত্র তখন এত জটিল হয় নাই, সুচারুও হয় নাই বটে; কিন্তু দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের স্কন্ধদেশে তাহা একটা দুর্ব্বহ গুরুভারের মত চাপিয়া ছিল না। রাজার অধীনে সমস্ত দেশ যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার; তাহার ত্রুটি সহস্র, কিন্তু সেখানে সহৃদয়তারও অসদ্ভাব নাই। স্বদেশীয় রাজা সহজেই দেশের সুখদুঃখ বুঝিতেন, এবং তাঁহার সমস্ত হৃদয় দেশের সহিতই বাঁধা ছিল।

প্রতি দিন প্রাতঃকালে রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত। বৃহৎ সভামণ্ডপ বিবিধ বর্ণের উষ্ণীষে শোভিত। স্বর্ণসিংহাসনোপরি হেমমুকুটশিরে রাজা; দণ্ডধর দণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইয়া, ছত্রধর মুক্তাঝালরশোভিত ছত্র ধারণ করিয়া আছে, দুই দিক্ হইতে দুই জন পরিচারক চামর ব্যজন করিতেছে। সিংহাসনতলে পদমর্য্যাদানুসারে সভাসদ্‌গণের আসন নির্দ্দিষ্ট। শুক্লকেশ প্রবীণেরা শুভ্র বেশ পরিধান করিয়াছেন—আজানুলম্বিত চাপকান, মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ। নবীনদিগের বেশভূষায় বর্ণবৈচিত্র্যের অন্ত নাই—বিবিধ বর্ণের বহুমূল্য চীনাংশুক বসন এবং তদুপরি নানাবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। এখনকার

মত আপাদমস্তক কুয়াশার দেশের কৃষ্ণ আবরণে আচ্ছাদিত করা তখনকার ফেসান ছিল না। ভারতবর্ষের উজ্জ্বল সূর্যকিরণে স্বভাবতই বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের বেশভূষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নশঙ্খধ্বনি শুনা পর্য্যন্ত এই উজ্জ্বল রাজসভা পরিপূর্ণ থাকিত। প্রজা বেদনা জানাইতে আসিয়াছে, রাজা বিচার করিতেছেন। বৈদেশিক দূত উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছেন, যথাযোগ্য সৎকার সহকারে উপঢৌকন গ্রহণপূর্ব্বক রাজা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। মন্ত্রিগণ রাজকার্য্যের উপদেশ লইতেছেন; ব্রাহ্মণেরা দেবকার্য্যের উপদেশ দিতেছেন; রাজ্যের তুচ্ছতম কর্ত্তব্য অবধি এখানে উপেক্ষিত হয় না।

রাজা যদি কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন, প্রজাগণ দেবদ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। রাজার উপরে এক দেবতা, আর ব্রাহ্মণ। দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ্য দেবতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার এক অভিশাপে সহস্র সিংহাসন নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যায়, বাসুকির সহস্র শির বিচলিত হইয়া উঠে, সৃষ্টি সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। দেবতা আর ব্রাহ্মণ একই। যে ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করিতে পারে, সে দেবতার প্রসাদ লাভ করে; যে দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া চলে সে ব্রাহ্মণেরও প্রিয়। সেই ব্রাহ্মণ মনুর বিধি লঙ্ঘন করা রাজারও অসাধ্য। যদি করেন, সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, দেবতা বিমুখ হইয়া দাঁড়ান, রাজ্য উৎসন্ন যায়। সুতরাং রাজার অত্যাচারের প্রতীকার এই দেবমন্দিরেই সম্ভব—যেখানে দেবতা এবং দেবতার অন্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ নিয়ত বিরাজ করিতেছেন।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের তাড়নে ব্রাহ্মণ্য তখন কতকটা দুর্ব্বল হইয়াও পড়িয়াছিল। যদিও বৌদ্ধ রাজসভায় ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা শ্রমণ অপেক্ষা হীন ছিল না এবং বৌদ্ধ রাজগণ দানাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন, তথাপি চিরন্তন অদ্বিতীয়ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণেরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই জাতিনাশী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যের প্রধান শত্রু এবং ইহার যতই প্রচার হয়, ব্রাহ্মণ্যের ততই সঙ্কট দশা। সেই জন্য তাঁহাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণেরা সহজে উত্তেজিতও হইতেন না।—রাজন্যশক্তিও ব্রাহ্মণ্যকে মানিয়া চলিত। তখনও চাণক্যের নাম কেহ ভুলে নাই। রাজা বুঝিতেন যে, ঐ প্রশস্ত ললাট তীক্ষ্ন নাসাগ্র দিয়া যাহাকে বিঁধে, তাহার আর নিস্তার নাই।

এই সন্ধিস্থাপনে ব্রাহ্মণ্যও প্রবল হইয়া উঠিল এবং রাজন্যও প্রাধান্য লাভ করিল। ব্রাহ্মণদিগের সহস্র অনুষ্ঠান-আড়ম্বরে রাজা প্রাণপণে সহায়তা করেন এবং রাজা যখন আবশ্যকমত শূদ্রকণ্ঠে যজ্ঞোপবীত দিয়া এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গড়িয়া লয়েন, ব্রাহ্মণেরাও

তখন তাদৃশ আপত্তি করেন না। এবং এই ব্রাহ্মণ্যের অনুগ্রহ-বিধিতে সাধারণ্যেও সকলি নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়।

প্রাচীন উড়িষ্যা এইরূপ ছিল। ব্রাহ্মণ্যের পক্ষপুটচ্ছায়ায় রাজন্যের পরিপোষণে ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার অনুষ্ঠান বেশভূষা শিল্পকলা পুঞ্জীভূত হইয়া কেমন একটি শান্ত সমগ্রতা লাভ করিয়াছিল। ইহাই সভ্যতা। এবং প্রাচীন উড়িষ্যার ইহাই গৌরব। এখন শুধু ভগ্নাবশেষ ভাস্কর্য্যে এই গৌরবকাহিনী কথঞ্চিৎ মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে মাত্র। নহিলে, সে সভ্যতার কিছুই নাই; সে বেশভূষাও নাই, চাপকানও নাই, উষ্ণীষও নাই, বিবিধ আগুল্ফ আজানু উপানৎও নাই। প্রাচীন কালে সোফা কৌচ কেদারার ন্যায় বিবিধনাম যে সকল আসনাদি ও গৃহসজ্জার বহুবিধ আসবাব ছিল, তাহাও এখন দুর্লভ। উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যেও তাহার শ্রেষ্ঠ নমুনা অল্পই পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বপণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে অমরাবতী-ভাস্কর্য্যের যে গুটিকতক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার আসনাদি বর্ত্তমান সভ্যতানুমোদিত গৃহসজ্জার আসবাবের এত অনুরূপ যে, দেখিলে বিস্ময় জন্মে। ইহা ভিন্ন, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির বর্ণনা পাঠে ও পুরাতত্ত্ববিষয়ক চিত্রাদি দর্শনে সময় সময় আশ্চর্য্য হইয়া থাকিতে হয়—সে কালে কি এ কাল ছিল! এবং এই সকল হইতেই প্রাচীন ভারতবর্ষে একটি সুন্দর পরিপাটি সংস্কৃত সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না; এবং সেই বহু প্রাচীন কালের মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া ক্ষণিকের জন্য আমরা বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য হইতে দূরে থাকি।

'সাধনা', আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০০

মৃচ্ছকটিক

মৃচ্ছকটিক প্রাচীন উজ্জয়িনীর একখানি উজ্জ্বল সমাজচিত্র। ইহাতে তপোবন নাই, ঋষ্যাশ্রম নাই, মানবহৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে বহিঃপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসে নাই; কেবল উজ্জয়িনীর রাজশ্যালক, সার্থবাহ, গণিকাকন্যা, ধর্ম্মাধিকরণ, বিলাসভবন ও বৌদ্ধ বিহার দিয়া তদানীন্তন সমাজের কতকগুলি সুন্দর চিত্র রচিত হইয়াছে এবং একটি প্রণয়কাহিনীসূত্রে এই সমস্ত চিত্রগুলি পরে পরে যথাশোভনরূপে গ্রথিত হইয়া মধ্যযুগের সংস্কৃত সভ্যতার একটি অখণ্ড আদর্শ গঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী। প্রশস্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে সুসজ্জিত পণ্যবীথিকা, শ্রেণীবদ্ধ সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী ও নিত্য উৎসবময় বিলাসভবন;

নগরপ্রান্তে অহরহ সঙ্গীতধ্বনিত প্রমোদকাননশ্রেণী, পাদমূল ধৌত করিয়া চঞ্চলা শিপ্রা কলস্বরে বহিয়া গিয়াছে। অদূরে বৌদ্ধ বিহার—পরিব্রাজকেরা সেখানে বসিয়া বৌদ্ধ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ; এবং নগরীমধ্যে মহাকালমন্দিরে মহাসমারোহে প্রতি দিন ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা সম্পন্ন হয়।

এই চির-উৎসবময়ী উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠিচত্বরে দ্বিজসার্থবাহ চারুদত্তের বাস ; এবং গণিকাকন্যা বসন্তসেনা এই নষ্টবিত্ত সম্ভ্রান্ত পৌরজনের গুণমুগ্ধা প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। কিন্তু যাহার রূপ ও যৌবন দুই আছে, মকরকেতন তাহার প্রণয়পথ কখনও নিষ্কণ্টক করেন না। বসন্তসেনার রূপযৌবন নষ্টচরিত্র রাজশ্যালকের শরীর মন নিরন্তর মদনানলে দগ্ধ করে। কিন্তু বসন্তসেনা গণিকাকন্যা হইলেও গণিকার মত তাঁহার স্বভাব নহে—সুতরাং শকারের ঐশ্বর্য্যপ্রভাব তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি চারুদত্তের গুণাবলী শুনিয়া অবধি মনে মনে তৎপ্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন ; এবং যে দিন কাম-দেবায়তনোদ্যানে চারুদত্তের দর্শন লাভ করিলেন, সে দিন হইতে সেই সৌম্যমূর্ত্তি ভিন্ন তাঁহার অন্তরে আর কিছুই স্থান পায় নাই।

কিন্তু নীচবংশ শকারের ইহা সহ্য হইবে কেন ? 'সে ভগিনীপতির অনুগ্রহপরিপুষ্ট হইয়া কেবলমাত্র অষ্টাদশ ব্যসন আয়ত্ত করিয়াছে ; এবং উজ্জয়িনীতে নিশাচর দুর্জ্জনদিগের অগ্রণী বলিয়াই তাহার খ্যাতি। সন্ধ্যার পর তাহার ভয়ে যুবতীজনের একাকিনী পথে বাহির হইবার জো ছিল না। বসন্তসেনাকে একবার সুবিধামত পাইলে শকার কি সহজে ছাড়ে ?

দৈবক্রমে কামদেবায়তন উদ্যান হইতে বসন্তোৎসব দেখিয়া ফিরিতে বসন্তসেনার সে দিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। তখন শকার সদলবলে পথে বাহির হইয়াছে এবং পথ প্রায় জনশূন্য। সেই নির্জ্জন পথে একাকিনী পাইয়া শকার, বিট ও চেটের সহিত, বসন্তসেনার অনুগমন করিল। এবং নানাবিধ সম্বোধনে বসন্তসেনাকে দ্রুতগতি হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। বিট সাধুভাষায় বসন্তসেনার নৃত্যপ্রয়োগবিশদ চরণযুগলের প্রশংসা করিয়া ও ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীর সহিত উপমা খাটাইয়া কথাগুলি একটু সাজাইয়া গুছাইয়া বলে। এবং শকার অত্যন্ত কুৎসিত গ্রাম্য ভাষায় আপন দারুণ অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করিতে থাকে ; এবং কখনও "রামভয়ে পলায়মানা দ্রৌপদীর" সহিত, কখনও বা "রাবণের কুন্তীর" সহিত তুলনা করিয়া বসন্তসেনাকে স্বীয় শয্যাসঙ্গিনী করিবার আশ্বাস দেয়। কিন্তু বসন্তসেনার গতিবেগ যখন কিছুতেই মন্দীভূত হইল না, তখন আশ্বাসবচনের পরিবর্ত্তে অজস্র কটুকাটব্য বর্ষিত হইতে লাগিল এবং শকার এক বার তাঁহার কেশগুচ্ছ ধারণ করিলে

ভীমসেন, জমদগ্নিপুত্র, কুন্তীসুত প্রভৃতির বলবীর্য্যও যে ব্যর্থ হইবে, বার বার করিয়া এ কথা বসন্তসেনার কর্ণগোচর করা হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে বসন্তসেনা অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে চারুদত্তের পক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চারুদত্তের জপ-সমাপ্তি হইয়াছে এবং বয়স্য মৈত্রেয়, পরিচারিকা রদনিকা সমভিব্যাহারে মাতৃকাগণের পূজার্থে পক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিতেছেন। দ্বার উন্মুক্ত হইতেই বসন্তসেনা তাড়াতাড়ি রদনিকার হস্তস্থিত দীপ নিবাইয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল ভাবিয়া মৈত্রেয় পুনরায় দীপ জ্বালিয়া আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যে শকার আসিয়া বসন্তসেনাভ্রমে রদনিকার কেশগুচ্ছ ধারণ করিল। মৈত্রেয় প্রদীপ লইয়া আসিতেই শকার রদনিকাকে ছাড়িয়া দিল। বিট মার্জ্জনা ভিক্ষাপূর্ব্বক এ ঘটনা যাহাতে চারুদত্তের কর্ণগোচর না হয়, সে জন্য মৈত্রেয়কে বিস্তর অনুনয় সহকারে অনুরোধ করিল। কিন্তু শকারের আস্ফালন থামিল না। সে শাসাইয়া গেল যে, বসন্তসেনা আমাদের অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব সেই গণিকাকন্যাকে প্রত্যর্পণ না করিলে কপাটতলপ্রবিষ্ট কপিত্থবৎ মড্‌মড্‌শব্দে চারুদত্তের মস্তক চূর্ণীকৃত হইবে জানিয়ো।

বাহিরে যখন এই কাণ্ড চলিয়াছে, গৃহাভ্যন্তরে তখন চারুদত্ত বসন্তসেনাকে রদনিকা ভাবিয়া পুত্র রোহসেনকে গৃহাভ্যন্তরে আনিতে আদেশ করিলেন এবং বসন্তসেনার প্রতি স্বীয় জাতীকুসুমবাসিত উত্তরীয়খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা রোহসেনের গাত্রাচ্ছাদন করিয়া দিতে বলিলেন। বসন্তসেনা নীরব নিশ্চল। আদেশ পালিত হইল না দেখিয়া চারুদত্ত ক্ষুণ্ণহৃদয়ে বলিলেন, হায় রদনিকে, আজ প্রতিবচন পর্য্যন্ত নাই—পুরুষের অবস্থাবিপর্য্যয়ে মিত্রও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, চিরানুরক্তও বিরক্ত হয়।

কথা শেষ হইতে না হইতে রদনিকাকে লইয়া মৈত্রেয় প্রবেশ করিলেন। চারুদত্ত দেখিলেন যে, যাহার অঙ্গে উত্তরীয় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সে রদনিকা নহে; কিন্তু যেই হোক্, ইহার অঙ্গে উত্তরীয় বড় শোভা পাইয়াছে।

ছাদিতা শরদভ্রেণ চন্দ্রলেখেব দৃশ্যতে।

মৈত্রেয় বসন্তসেনার পরিচয় দিয়া দিলেন। এবং কামদেবায়তনের কাহিনী ও রাজশ্যালকের দুর্ব্যবহারের কথাও প্রকাশ করিয়া বলিতে ত্রুটি করিলেন না। চারুদত্ত কেবল বলিলেন, "অজ্ঞোঽসৌ" এবং উত্তরীয়নিক্ষেপের জন্য বসন্তসেনার নিকট অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসন্তসেনাও চারুদত্তের ন্যায় সম্ভ্রান্ত জনের গৃহে তাঁহার প্রবেশ অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন। ইহাই প্রথম

সূচনা। তাহার পর রাজপথে বিপদাশঙ্কায় বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। এবং পরিশেষে চারুদত্তই তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া আসিলেন।

এইখানে মৃচ্ছকটিকের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল। এবং এই যে চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার সংস্পর্শ সূচিত হইল, দশ অঙ্কের মধ্য দিয়া বিবিধ বিপ্লবচক্রে ও বিচিত্র চিত্রে ইহাই ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা-কবি শূদ্রক গণিকা-কন্যার এই প্রণয়বন্ধনে উজ্জয়িনীর সাময়িক সমাজনাট্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং অঙ্কে অঙ্কে এই প্রণয়-ঘটনার চতুর্দ্দিকে বিলাসী উজ্জয়িনীর সমগ্র বিলাস অনুলিপ্ত হইয়াছে।

গণিকা তখন নগরের শোভা বলিয়া গণ্য হইত এবং দ্যূতভবন তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক ছিল। এবং এই দুই বিলাসের অনুগ্রহে উজ্জয়িনীতে চৌরেরও অসদ্ভাব ছিল না। রজনীতে রাজপথে নগরের রক্ষকেরা যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত, গৃহস্থের প্রাচীরের ছিদ্রপথে সেইরূপ বহুসংখ্যক সুদক্ষ চৌরেরও গতিবিধি ছিল। এবং বসন্তসেনার অলঙ্কারন্যাসের পর দরিদ্র চারুদত্তের ভবনেও চুরি হইল। চোর বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলির একখানিও রাখিয়া গেল না, কেবল প্রাচীরগাত্রে বহুযত্নরচিত একটি দর্শনীয় ছিদ্রপথ রাখিয়া গেল যে, প্রভাতে উঠিয়া চারুদত্ত ও প্রতিবেশিবর্গ চোরকে কেবলমাত্র গালি না দিয়া তাহার শিল্পনৈপুণ্যেরও প্রশংসা করিবার অবসর পান।

এই ঘটনায় চারুদত্তকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া মৈত্রেয় পরামর্শ দিলেন, সখে, যখন সাক্ষী কেহ নাই, তখন এই অলঙ্কারন্যাসের কথা অস্বীকার করিলেই চলিবে—তুমি অতিমাত্র ভাবিত হইয়ো না। কিন্তু চারুদত্ত মিথ্যা বলিবার পাত্র নহেন। তিনি ভিক্ষা করিয়াও বসন্তসেনার গচ্ছিত ধন পরিশোধ করিবেন, তথাপি চরিত্রভ্রংশকারণ মিথ্যার শরণাপন্ন হইবেন না।—পত্নী ধূতা এই সংবাদ শ্রবণে অচিরে মৈত্রেয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবং চারুদত্ত পাছে স্ত্রীর ধন লইতে কুণ্ঠিত হয়েন, রত্নষষ্ঠী ব্রত উদ্‌যাপনচ্ছলে ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়কে রত্নমালা দান করিয়া স্বামীর সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

চারুদত্তের আদেশে মৈত্রেয়ই বসন্তসেনা-সমীপে সেই রত্নমালা লইয়া গেলেন। বসন্তসেনার প্রকাণ্ড আটমহল পুরী। পথের সম্মুখেই গগন স্পর্শ করিয়া দন্তিদন্তনির্ম্মিত তোরণ উঠিয়াছে এবং বিচিত্র পতাকাবলী নিয়ত বায়ুবশে সঞ্চালিত হইয়া তোরণস্তম্ভসমূহের শোভা সম্পাদন করিতেছে। নিম্নে সুনির্ম্মিত প্রস্তরবেদিকার উপরে চূতপল্লবরম্য স্ফাটিক মঙ্গলকলসসমূহ সুসজ্জিত; এবং দুর্ভেদ্য কনক-কপাট দারিদ্র্যকে সেই বিলাসপুরী হইতে নিয়ত দূরে রক্ষা করে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিবিধরত্নপ্রতিবদ্ধ কাঞ্চনসোপানশোভিত শুভ্র প্রাসাদশ্রেণী দর্শকের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে

গো-মহিষ-অশ্বশালা। শত শত পরিচারক দিবারাত্রি এই সকল হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ জীবগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে কুলপুত্রগণের উপবেশন নিমিত্ত বহুবিধ আসন; কোথাও মণিময় গুটিকাযুক্ত পাশকপীঠ, কোথাও বা পাশকপীঠোপরি অর্দ্ধপঠিত পুস্তক অনাবৃত পড়িয়া রহিয়াছে; এবং মদনসন্ধিবিগ্রহচতুর গণিকা ও বৃদ্ধ বিটগণ বিবিধবর্ণবিলিপ্ত চিত্রফলকহস্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠে নিত্য যুবতিকরতাড়িত গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি, মধুকরবিরুতমধুর বংশীরব ও কামিনীগণের নূপুরশিঞ্জন সহ তালে তালে নৃত্য। কোথাও নাট্যপাঠ হইতেছে, কোথাও গণিকাদারিকাগণ বিবিধ দেহভঙ্গী ব্যক্ত করিতেছে। এবং গবাক্ষে সলিলগর্গরীসকল বাতগ্রহণে শীতল হইতেছে। পঞ্চম প্রকোষ্ঠে হিঙ্গুগন্ধসুরভিত রন্ধনশালা—যেখানে আসিয়া বিবিধ মাংস ও পায়সাদির লোভে মৈত্রেয়ের রসনা সিক্ত হইয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণলাভের বৃথা আশায় মন চঞ্চল হইতে লাগিল। ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠের তোরণ সুবর্ণনির্ম্মিত এবং গৃহতল নীলমণিপরিশোভিত। উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ বৈদূর্য্য মৌক্তিক প্রবালক পুষ্পরাগ ইন্দ্রনীল পদ্মরাগ মরকত প্রভৃতি রত্নরাশি লইয়া পরীক্ষা ও অলঙ্কারনির্ম্মাণ করিতেছে। কোথাও মদিরাপান চলিয়াছে, দাসীগণ কর্পূরসুবাসিত তাম্বূল বিতরণ করিতেছে এবং হাস্যপরিহাসের বিরাম নাই। সপ্তম প্রকোষ্ঠে পক্ষিশালা। অন্যোন্যচুম্বনরত কপোতমিথুন, সুভাষিণী মদনসারিকা, পরপুষ্টা কোকিলা প্রভৃতি নানাজাতীয় বিহঙ্গকুল এই বিহঙ্গবাটিকায় সুখে নিষণ্ণ। অষ্টম প্রকোষ্ঠে বসন্তসেনার আত্মীয় স্বজনেরা বাস করে। বসন্তসেনার মাতাকে দেখিয়া মৈত্রেয় চেটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তৈলচিক্কণ পদযুগল উপানৎমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চাসনোপবিষ্টা পুষ্পপ্রাবারকপ্রাবৃতা ঐ রমণীটি কে? চেটী উত্তর করিল, ইনিই আমাদের আর্য্যার জননী। মৈত্রেয় আর্য্যার মাতার দৈহিক পরিধি দেখিয়া উপহাসরসিকতার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। চেটীকে বলিলেন, ইঁহার যেরূপ আয়তন দেখিতেছি, বোধ করি বৃহৎ শিবলিঙ্গের ন্যায় ইঁহাকে অগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে চতুষ্পার্শ্বে এই প্রাচীর ও দ্বার সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। চেটী বলিলেন, ঠাকুর, উপহাস করিবেন না, ইনি চাতুর্থিকে অত্যন্ত কাতর আছেন। মৈত্রেয় প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ চাতুর্থিক, তুমি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানের প্রতি একবার কৃপা কর।

এইরূপে মুগ্ধ মৈত্রেয়ের মুখ দিয়া মৃচ্ছকটিককার বসন্তসেনার পুরী বর্ণনা করিয়াছেন। এবং প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইতে বিলাসের এক একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটককারেরা এইরূপ আনুপূর্ব্বিক চিত্রন্যস্ত বর্ণনা করিতে যেন কিছু ভালবাসেন। কালিদাসের শকুন্তলাও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলি চিত্রাঙ্কিত—

এমন কি, ছোটখাট উপমাগুলিও এক একটি সুন্দর চিত্রে উদ্ভাসিত। মৃচ্ছকটিকও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে এইরূপ একটি চিত্রপরম্পরা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তবে কালিদাসের নাটকের মত ইহাতে কেবলি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সমাবেশ নহে। বাস্তব জগতের দুই চারিটা নাতিসুন্দর স্থূল দৃশ্যও ইহাতে আছে। কালিদাস বসন্তসেনার আলয়ে প্রবেশ করিলে তদীয়া স্থূলাঙ্গী জননীটিকে মৈত্রেয়ের সমক্ষে কিছুতেই বাহির করিতেন না। একেবারে নৃত্যগীত মদিরা উৎসব ও রূপসীগণের অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু যৌবনের মধ্য দিয়া মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার বৃক্ষবাটিকায় লইয়া যাইতেন—যেখানে যুবতীগণের সনূপুর পাদতাড়নে অশোকতরু মুকুলিত হইয়া উঠে এবং সেই অশোকশাখা হইতে বিলম্বিত দোলায় বসিয়া মৃদু সান্ধ্য পবনে দূর মৃদঙ্গধ্বনির তালে তালে বসন্তসেনা যৌবনের আন্দোলনসুখ অনুভব করেন।

অষ্টম প্রকোষ্ঠের পর এই বৃক্ষবাটিকা। চেটী মৈত্রেয়কে বরাবর সেইখানে লইয়া গেল। বসন্তসেনা সেইখানেই ছিলেন। পরস্পরের কুশলজিজ্ঞাসাদি সমাপনান্তে মৈত্রেয় বলিলেন যে, চারুদত্ত দ্যূতক্রীড়ায় আপনার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি হারাইয়া তৎপরিবর্ত্তে এই রত্নমালা প্রেরণ করিয়াছেন। বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলির সন্ধান পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তাঁহারই পরিচারিকা মদনিকার প্রণয়ী শর্ব্বিলক নামক এক ব্রাহ্মণসন্তান প্রণয়িনীকে নিষ্ক্রয়দানে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিতে এই কার্য্য করিয়াছে। এবং এই ঘটনা প্রকাশ হইবার পর মদনিকাকে তিনি শর্ব্বিলকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু মৈত্রেয়কে সে কথা না বলিয়া, রত্নমালা গ্রহণপূর্ব্বক, প্রদোষে চারুদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন বলিয়া বিদায় করিলেন।

মৈত্রেয় গিয়া চারুদত্তকে সমস্ত বলিলেন। এবং ঝড়বৃষ্টিবিদ্যুতের মধ্য দিয়া যথাসময়ে ছাতা মাথায় দিয়া বসন্তসেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংস্কৃত কবির নিকট বর্ষাবর্ণনা কখনও ফাঁক যায় না—বিশেষতঃ যখন এমন একটি প্রণয়কাহিনীর সুবিধা আছে। মৃচ্ছকটিককার নানা ছন্দে এই মেঘ ঝঞ্ঝা অশনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং গুরুগুরু বর্ষাবর্ণনায় এক দিকে সোৎকণ্ঠ চারুদত্ত ও অন্য দিকে অভিসারিকা বসন্তসেনার মনে প্রকৃতিকে প্রেমার্দ্র করিয়া তুলিয়াছেন। এবং বিদ্যুৎ যখন অম্বরকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিল, কবি আর থাকিতে পারিলেন না—চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অঙ্ক শেষ করিলেন।

বর্ষশতমস্তু দুর্দিনমবিরতধারং শতহ্রদা স্ফুরতু।
অস্মদ্বিধদুর্লভয়া যদহং প্রিয়য়া পরিষ্বক্তঃ॥

কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইল। চারুদত্ত ভৃত্য বর্দ্ধমানককে শকট ঠিক করিয়া

বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে লইয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। বসন্তসেনা গাত্রোত্থান করিয়া ধূতা দেবীর সংবাদ লইলেন ঃ—

বস। অবি সন্তপ্পদি চারুদত্তস্স পরিঅণো? *

চেটী। সন্তপ্পিস্সদি।

বস। কদা?

চেটী। জদা অজ্জআ গমিস্সদি।

বস। তদো মএ পঢমং সন্তপ্পিদব্বম্

তদনন্তর তিনি আর্য্যা ধূতার নিকট এই বলিয়া সেই রত্নাবলী পাঠাইয়া দিলেন যে, আমি চারুদত্তের গুণনির্জ্জিতা দাসী, আপনারও দাসী, অতএব এই রত্নাবলী যোগ্য কণ্ঠে ন্যস্ত হউক্।

ধূতা বলিয়া পাঠাইলেন—তাহাও কি হয়? আর্য্যপুত্র প্রসন্নমনে যাহা আপনাকে দান করিয়াছেন, তাহা আমি লইব কেন? আর্য্যপুত্রই আমার একমাত্র আভরণ।

এমন সময় রদনিকা রোহসেনকে লইয়া প্রবেশ করিল। রোহসেন মৃৎশকটিকার পরিবর্ত্তে সুবর্ণশকটিকা লইয়া খেলা করিতে চায়। দাসী তাহাকে বুঝাইতেছে যে, তোমার পিতার আবার ধন হউক্, সকলি হইবে। বসন্তসেনা চারুদত্তের পুত্রকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইলেন। এবং বালক সুবর্ণশকটিকার জন্য কাঁদিতেছে শুনিয়া স্বীয় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিলেন—ইহার দ্বারা তুমি সুবর্ণশকটিকা প্রস্তুত করাইয়া লইয়ো।

শূদ্রক বসন্তসেনাকে বরাবরই নারীহৃদয়ের এই স্বাভাবিক সৌকুমার্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন। এ স্নেহ গণিকাসুলভ নহে—নারীহৃদয়ের অতি গভীর তল হইতে ইহা উৎসারিত। রোহসেনকে দেখিয়াই চারুদত্তগতপ্রাণার হৃদয়ে মাতৃস্তনে ক্ষীরসঞ্চারের ন্যায় এই অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্য সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রিয়জনের পরিজনবর্গকেও প্রেম এমনি আপনার করিয়া তোলে।

কিন্তু শকট সুসজ্জিত। আর বিলম্ব করা চলে না। বর্দ্ধমানক চেটীকে দিয়া

* বস। চারুদত্তের পরিজন কি সন্তপ্ত হইতেছেন?

চেটী। সন্তপ্ত হইবেন।

বস। কখন?

চেটী। যখন আর্য্যা চলিয়া যাইবেন।

বস। তবে আমাকেই প্রথম সন্তপ্ত হইতে হইবে।

সংবাদ পাঠাইল যে, বসন্তসেনার জন্য পক্ষদ্বারে কর্ণীরথ অপেক্ষা করিতেছে। বসন্তসেনা আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন—তখনও তাঁহার প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। বর্দ্ধমানক যানের আচ্ছাদন ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি তাহা ঠিক করিয়া আনিতে গেল। ইতিমধ্যে বসন্তসেনা আসিয়া শকটে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে সে শকট চারুদত্তের নহে, তাহা রাজশ্যালক সংস্থানকের।

চারুদত্তের শকটও শূন্য গেল না। তাহাতে আর্য্যক নামে এক রাজবিদ্রোহী গোপপুত্র উঠিয়া বসিয়াছেন। সে সময়ে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য উজ্জয়িনীতে এক চক্রান্ত চলিয়াছিল। লোকমুখে একটা ভবিষ্যদ্বাণী রটনা হইয়াছিল যে, উজ্জয়িনী-রাজ পালককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে আর্য্যক নামে এক গোপপুত্র অভিষিক্ত হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী রটনার ফলে অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গের অনেকেই গোপনে আর্য্যকের দলভুক্ত হইয়াছিল। শকট যখন পুষ্পকরণ্ডকে আসিয়া পঁহুছিল, চারুদত্ত বসন্তসেনাকে নামাইয়া লইতে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন।

করিকরসমবাহুঃ সিংহপীনোন্নতাংসঃ
পৃথুতরসমবক্ষাস্তাম্রলোলায়তাক্ষঃ।
কথমিদমসমানং প্রাপ্ত এবং বিধো যো
বহতি নিগড়মেকং পাদলগ্নং মহাত্মা ॥*

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ততঃ কো ভবান্?"—আর্য্যক স্বীয় পরিচয় দিলেন। চারুদত্ত বলিলেন,

বিধিনৈবোপনীতস্ত্বং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অপি প্রাণানহং জহ্যাং নতু ত্বাং শরণাগতম্ ॥†

এবং তাঁহার নিগড় অপনীত করাইয়া দিয়া তাঁহাকে সেই শকটেই রাজপুরুষদিগের দৃষ্টির বাহিরে নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন।

এ দিকে বসন্তসেনা পড়িলেন শকারের হাতে। সে প্রথমে প্রবহণমধ্যে উঁকি মারিয়াই স্থির করিল, গাড়ীতে চড়িয়া নিশ্চয় কোন রাক্ষসী আসিয়াছে। বিট গিয়া দেখিল, বসন্তসেনা। বসন্তসেনা বিটের শরণাপন্ন হইলেন। বিট তাঁহার কথা

* করিকরসমবাহু, সিংহপীনোন্নতাংস, বিশালবক্ষ, তাম্রলোলায়তচক্ষু, এই সকল মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও ইনি পাদলগ্ন নিগড় বহন করিতেছেন কেন?

† আপনি দৈবকর্ত্তৃকই এখানে উপনীত হইয়া আমার চক্ষুগোচর হইলেন। প্রাণও যদি ত্যাগ করিতে হয়, শরণাগত আপনাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ যাহাতে শকার প্রবহণ ছাড়িয়া পলায়ন করে, তৎপক্ষে চেষ্টা করিল। কিন্তু রাজশ্যালক গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজে যাইতে রাজি হয় না। তখন অগত্যা বসন্তসেনার কথা প্রকাশ হইল। শকার একেবারে তাঁহার চরণে পড়িয়া আরম্ভ করিল,

এশে পড়েমি চলণেশু বিশালণেত্তে
হথঞ্জলিং দশণহে তব শুদ্ধদন্তি।
জং তং মএ অবকিদং মদণাতুলেণ
তং খম্মিদাশি বলগত্তি তব ম্হি দাশে ॥*

কিন্তু বসন্তসেনা আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তখন শকার ক্রুদ্ধ হইয়া বিটকে বলিল, এই স্ত্রীলোকটাকে মারিয়া ফেল। বিট সম্মত হইল না। বলিল যে, নগরের শোভা কুলকামিনীসদৃশী প্রণয়বতী এই তরুণী নিরপরাধাকে হত্যা করিয়া পরলোকনদী উত্তীর্ণ হইব কিরূপে?

শকার উত্তর করিল, আমি ভেলার ব্যবস্থা করিব। এখানে হত্যা করিলে কে দেখিবে?

বিট বলিল, দেখিবে অনেকে,

পশ্যন্তি মাং দশ দিশো বনদেবতাশ্চ
চন্দ্রশ্চ দীপ্তকিরণশ্চ দিবাকরোঽয়ম্।
ধর্ম্মানিলৌ চ গগনঞ্চ তথান্তরাত্মা
ভূমিস্তথা সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা ॥†

শকার বলিল, তবে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া হত্যা কর—কেহ দেখিতে পাইবে না।

বিট আর থাকিতে পারিল না—"মূর্খ অপধ্বস্তোঽসি" বলিয়া গালি দিয়া বসিল।

তখন শকার চেটকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদনার্থে আদেশ করিল। সেও প্রভুবাক্য পালন করিতে অসম্মত হইল।

* হে বিশালনেত্রে, তোমার চরণে পতিত হইতেছি, হে দশনখে, শুদ্ধদন্তি, তোমার নিকট হস্তাঞ্জলি করিতেছি। মদনাতুর আমা কর্ত্তৃক তুমি যে অপকৃত হইয়াছিলে, তাহা ক্ষমা করিয়াছ—হে বরগাত্রি, আমি তোমার দাস।

† আমাকে দেখিতেছেন দশ দিক্, বনদেবতাসকল, চন্দ্র, দিবাকর, ধর্ম্ম, অনিল, গগন, অন্তরাত্মা এবং সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা ভূমি।

শকার বলিল, তবে আমি স্বহস্তেই ইহাকে বিনাশ করি।

বিট তাহাতে বাধা দিল। বলিল, খবরদার, আমাদের সম্মুখে স্ত্রীহত্যা করিয়া তুমি কখনও নিষ্কৃতি পাইবে না।

বিপদ্ দেখিয়া শকার পুনরায় মদনশরাহতের ন্যায় বসন্তসেনাকে "বাসু বাসু" সম্বোধন করিতে লাগিল। বিট ও চেট এই ভাব দেখিয়া প্রস্থান করিল। এবং তখন শকার নির্ভয়ে বসন্তসেনার গলা টিপিয়া ধরিল। চারুদত্তের নাম গ্রহণ করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মৃতা ভাবিয়া শকার তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। এবং ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া চারুদত্তের নামে এই হত্যাভিযোগ উপস্থিত করিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রেষ্ঠিকায়স্থ সহ অধিকরণিক বিচার করিতে বসিলেন। অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গৃহীত হইল। বসন্তসেনার মাতা আসিয়াও রাজশ্যালকের কথার অনুকূলে সাক্ষ্য দিল। বিস্তর বিচারবিতর্কের পর অধিকরণিক চারুদত্তকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ বাহির হইল।

এ দিকে বসন্তসেনাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিকটস্থ বিহারে লইয়া গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।—বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জয়িনীতে তখনও প্রবল ছিল বলিয়া বোধ হয়। এবং তদানীন্তন নাটকাদিতে শিবের নামে নান্দী থাকিলেও বৌদ্ধদিগের প্রতি বিশেষ একটু সহানুভূতি দৃষ্ট হয়।—আমাদের ভিক্ষু বসন্তসেনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন—ইনিও বুদ্ধেরই একজন শরণাগতা। ভিক্ষুটিও বসন্তসেনার পরিচিত—নাম সংবাহক। বসন্তসেনা এক সময়ে ইহাঁকে স্বীয় বলয় বিক্রয় করিয়া দ্যূতাধ্যক্ষের ঋণ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এখন এই ভিক্ষুর সেবা-শুশ্রূষায় তিনি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধৃত হইলেন।

এইরূপে কখনও পারিবারিক শান্তির চিত্র, কখনও গণিকালয়, কখনও দ্যূতশালা, কখনও সন্ধিচ্ছেদ, কখনও ধর্ম্মাধিকরণ, কখনও বৌদ্ধবিহার, কখনও শ্রমণক, কখনও বা রাজশ্যালক, নানা চিত্রের মধ্য দিয়া মৃচ্ছকটিকের আখ্যায়িকা অগ্রসর হইয়াছে। সকল চিত্রগুলি চিত্ররূপে পরিস্ফুট করিয়া দেখান আমাদের এ স্বল্প স্থানে অসম্ভব। তৃতীয় অঙ্কে সামান্য চৌর্য্যঘটনা লইয়াই মৃচ্ছকটিককার কতগুলি চিত্র দিয়াছেন! দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক ও মাথুরের দ্যূতদৃশ্যে দ্যূতশালার কত চিত্র আছে! এমন প্রতি অঙ্কে উজ্জয়িনীসমাজের ছোট বড় চিত্র কি যে না বর্ণিত হইয়াছে, বলা কঠিন। এবং এই সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রচিত্রাবলী দশম অঙ্কে বধ্যভূমিতে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। সেখানে চণ্ডালেরা চারুদত্তকে শূলে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সহসা কোথা

হইতে জীবিতা বসন্তসেনা আসিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন। দুন্দুভিরবে চতুর্দ্দিকে পুরাতন রাজার সিংহাসনচ্যুতি ঘোষিত হইল। আর্য্যক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। শকার চারুদত্তের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। চারুদত্তের অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। রাজাদেশে বসন্তসেনা চারুদত্তের ধর্ম্মপত্নীরূপে গৃহীত হইলেন। ধূতা দেবী তাঁহাকে সাদরে ডাকিয়া লইলেন। সংবাহক সর্ব্ববিহারের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। এবং সর্ব্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।—এই বধ্যভূমিতে সমস্ত উজ্জয়িনী-সমাগমে মৃচ্ছকটিকের উপযুক্ত উপসংহার।

'সাধনা', মাঘ ১৩০০

জয়দেব

সকল জিনিষেরই এমন এক একটি কেন্দ্রস্থল আছে, যেখান হইতে না দেখিলে তাহাকে কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে ও.সমগ্রভাবে দেখা হয় না। এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন একদেশ মাত্র দেখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মনে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা জন্মিয়া থাকে।

ন্যায়শাস্ত্রের একটি উদাহরণে এই তত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কতকগুলি অন্ধ স্পর্শদ্বারা একবার হস্তীর আকার নির্ণয় করিয়াছিল। যে অন্ধ হস্তীর পাদস্পর্শ করিল, সে হস্তীকে স্তম্ভাকার বলিয়া বর্ণনা করিল। যে শুণ্ড স্পর্শ করিল, সে বলিল, না, এ ত স্তম্ভ নয়, এ যে সর্পাকার দেখিতেছি। যে ব্যক্তি দৈবক্রমে হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে উভয়কেই মিথ্যাবাদী ঠাহরাইয়া হস্তীকে কুলার মত বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল। এইরূপে হস্তীর আকার লইয়া অন্ধে অন্ধে যখন তুমুল কলহ বাধিয়াছে, এক চক্ষুষ্মান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বাপুসকল, তোমরা কেহই মিথ্যা বল নাই, কিন্তু হস্তীর এক এক অঙ্গমাত্র স্পর্শ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ বর্ণনা করিয়াছ। তোমাদের সকলের বর্ণনা মিলাইয়া লইলে একটি সমগ্র হস্তীর বর্ণনা করা হয়।

হস্তী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যে কথা বলিয়াছিলেন, প্রেম সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রেমের স্বরূপ সমগ্রভাবে না দেখিয়া অনেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখেন। সেই জন্য কেহ বা বলেন, শারীরিক সম্ভোগেই প্রেমের পর্য্যবসান। কেহ বলেন, ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং যোগিজনসুলভ ধ্যানমাত্রাবলম্বী। কেহ বলেন, ইহা ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তিমাত্র। কেহ বলেন, ইহা এক অতীন্দ্রিয় মনোজ ভাব। কিন্তু যে কেন্দ্রভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই শরীর, মন, সম্ভোগ এবং প্রীতি, আলিঙ্গন এবং ধ্যান একটি সমগ্র সত্তার

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়, সে কেন্দ্রভূমিতে এই সকল ভিন্নমতাবলম্বী বিরোধি-বর্গের কেহই উপনীত হয়েন নাই ।

সেখান হইতে যেরূপ প্রতিভাত হয়, একজন ইংরাজ কবি—শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং—"Inclusions" নামক একটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"Oh, wilt thou have my hand, Dear,
to lie along in thine ?
As a little stone in a running stream,
it seems to lie and pine.
Now drop the poor pale hand, Dear,
unfit to plight with thine.

Oh, wilt thou have my cheek, Dear,
drawn closer to thine own ?
My cheek is white, my cheek is worn,
by many a tear run down.
Now leave a little space, Dear,
lest it should wet thine own

Oh, must thou have my soul, Dear,
commingled with thy soul ?
Red grows the cheek, and warm the hand ;
the part is in the whole ;
Nor hands nor cheeks keep separate,
when soul is joined to soul."*

* হে প্রিয়তম, আমার এই হাতখানি কি তোমার ঐ হাতের উপরে ফেলিয়া রাখিতে চাও ? এই দেখ-স্রোতের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের মত আমার এই করতল মুহ্যমানভাবে পড়িয়া আছে, এই ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ হস্ত তুমি পরিত্যাগ কর প্রিয়তম, এ তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার যোগ্য নহে।

হে প্রিয়তম, আমার এই কপোল কি তোমার কপোলের নিকটে আকর্ষণ করিতে চাও ? দেখ, আমার বিবর্ণ কপোল অশ্রুজলধারায় ক্ষীয়মাণ--মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া দাও প্রিয়তম, নহিলে অশ্রুজলে তোমার কপোলও সিক্ত করিয়া দিবে।

হে প্রিয়তম, আমার এই হৃদয় কি তোমার হৃদয়ের সহিত এক করিতে চাও ? আমার বিবর্ণ কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল, আমার অসাড় হস্তে জীবনের উত্তাপ সঞ্চারিত হইল। সমগ্রের মধ্যেই অংশ আছে · করতলের সহিত করতল, এবং কপোলের সহিত কপোল বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, যখন হৃদয়ের সহিত হৃদয় সংযুক্ত হয়।

যখন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়, তখন শরীর দূরে পড়িয়া রহে না; তখন স্বতই বাহু বাহুর নিকটে আকৃষ্ট হয়, কপোল কপোলে আসিয়া সংলগ্ন হইতে চাহে। দেহ মন আত্মা একত্র হইয়া জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতে গেলে প্রেমকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। প্রেমের মধ্যে এই সকলই অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে একীকৃত হইয়াছে।

এখন, যে কবি তাঁহার কাব্যে প্রেমকে তাহার এই স্বাভাবিক অখণ্ড মহিমায় যেরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সেই অনুসারে তাঁহার কাব্যের গৌরব। যিনি প্রেমকে কেবলমাত্র শারীরিক শৃঙ্গারসম্ভোগে অভিব্যক্ত করেন, তাহার সহিত অন্তরের কোন-প্রকার সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহার মহত্ত্ব নাই—তিনি এমন একটি সীমাবদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে তাঁহার কাব্যকে স্থাপন করেন, যেখানে অক্লান্ত আনন্দ সম্ভোগের স্থান নাই, যেখানে মানবহৃদয়ের তৃপ্তি অতি শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়। যে কবি শরীরের উপরে প্রেমের প্রতিষ্ঠা না করিয়া তাহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহারই কাব্যে সম্ভোগের প্রসর অনন্ত বিস্তৃত। কান টানিলে যেরূপ মাথা আসিয়া পড়ে, অন্তরের প্রেম সেইরূপ মনের সহিত সমস্ত শরীরকেও টানিয়া আনে, এবং সেই সঙ্গে শরীর মনের অতীত এক অপরিসীম আনন্দলোকের অপরূপ সৌন্দর্য্যজ্যোতি দীপ্যমান হইয়া উঠে। কিন্তু যাঁহারা শরীরকে হেয়জ্ঞানপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতেই মনকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া প্রেমকে ধ্যানমাত্রে অভিব্যক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সে প্রেম আকারবিহীন নিষ্ফল। কারণ, প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, সে প্রিয়জনকে দর্শন করিতে চাহে, স্পর্শ করিতে চাহে, তাহার কাছাকাছি থাকিতে পারিলে সুখানুভব করে। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিতে গেলে, শরীরমাত্রগত সম্ভোগ ও দর্শনস্পর্শনাকাঙ্ক্ষাহীন অতিসূক্ষ্ম ধ্যানমাত্রগত সম্ভোগ—মৃতদেহ ও প্রেতাত্মা—উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম। জীবন্ত মানবই—আত্মাধিষ্ঠিত দেহই—মানবের শরীর মন আত্মাকে সমগ্রভাবে আকর্ষণ করিয়া মনুষ্যত্বকে সফল করিতে পারে।

এই সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ প্রেমের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তানুসারেই আমরা প্রেমসাহিত্যে গীতগোবিন্দের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, গীতগোবিন্দে অঙ্গে অঙ্গে যে মদনতরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার পরিতৃপ্তি কোথায়।

অঙ্গের সম্বন্ধ আছে বলিয়া পাঠকেরা বিচলিত হইবেন না। মনের সহিত এই দেহও দেবতারই দান। এবং প্রেমের পুণ্য হোমাগ্নিতে মন ও বাক্যের সহিত শরীরও চিরদিন আহুতি প্রদত্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইন্ধনে যেমন হোমাগ্নি সংরক্ষিত হইলেও সেই অগ্নিশিখা দেবতার উদ্দেশে উত্থিত হয় বলিয়াই তাহার গৌরব, প্রেমাগ্নিও

সেইরূপ অঙ্গে অঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া যে অন্তরতম গভীরতম পুণ্য আকাঙ্ক্ষার দিকে নির্দেশ করে, তাহাতেই তাহার এত মাহাত্ম্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বিদ্যাপতির কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির কবিতা নব্য রুচি অনুসারে সর্ব্বত্র যে খুব শ্লীল, তাহা বলা যায় না। এবং তাঁহার কাব্যে শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ যথেষ্ট সূচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির কবিতার স্থান বহু উচ্চে। কারণ এই যে, তাঁহার কবিতায় শরীর শরীরের সহিত মিলিত হইয়া সেই প্রেমকেই চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, যে প্রেম যতই প্রগাঢ় হয়, ততই অপরিতৃপ্ত এবং ততই তাহার সম্ভোগানন্দ।

সখি রে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রস অনুমগন,
অনুভব কাহ্ না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

এখানে কেবলমাত্র প্রেমের শীতল ইন্ধন সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু সেই দীপ্ত অগ্নিশিখা বহু উর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। শুদ্ধ শরীর মাত্র সম্ভোগ হইলে অনুরাগ তিলে তিলে এমন নূতন হইয়া উঠিত না, প্রতি মুহূর্ত্তে ম্লান ও জীর্ণ হইয়া পড়িত। রূপ দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্ত হইয়া আসিত, কথা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ অসাড় হইয়া পড়িত, হৃদয় হৃদয়ের উপরে ভার বোধ হইত, এবং কেলি ক্লান্তিতে পরিণত হইতে বিলম্ব হইত না। শ্রান্তি শরীরের ধর্ম্ম। কিন্তু অন্তরের প্রেম এ ক্ষণিক

সম্ভোগমাত্র নহে। অন্তরও রূপ দেখে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে না। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া প্রিয়জনকে হৃদয়ে রাখিয়াও তাহার পরিতৃপ্তি নাই। সে প্রগাঢ় প্রেম কেলিকলামাত্রে চরিতার্থ হয় না; সে যতই পায়, ততই চায় এবং প্রিয়জনকে প্রাণপণে যতই বক্ষে চাপিয়া ধরে, কিছুতেই মনের মত করিয়া পায় না।

জয়দেবে এই চির-অতৃপ্ত প্রগাঢ়তা কোথাও চোখে পড়ে না। গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায়শাস্ত্রবর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহুল বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়া গিয়াছেন; তিনি খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, অন্তরের অসীমতার দ্বারে ধূলিস্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছেন, সে ধূলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য্যরাজ্যের পথে বাধাস্বরূপ।

এই সহজপরিতৃপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চিরপ্রচলিত শরীরসম্বন্ধীয় উপমাসনন্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ছন্দও যেমন পিচ্ছিল, জয়দেবের সুন্দরীগণের যৌবনসন্নদ্ধ অঙ্গসমূহ তদপেক্ষা অধিক পিচ্ছিল, এবং এই সুদীর্ঘ শৃঙ্গারকলুষ বর্ণনায় পাঠকের মনে সে সৌন্দর্য্যও সামান্যমাত্রও বসে না। শ্লোকের পর শ্লোক ধারাবাহিক সমভাবাপন্ন শৃঙ্গার-প্রতিধ্বনি মাত্র। সর্গের পর সর্গ—হয় সখীমুখে, নয় রাধামুখে, নয় কৃষ্ণমুখে—সেই একই কথা। কখনও সখী অন্তরাল হইতে রাধিকাকে দেখাইয়া দেয় যে, সহস্র গোপবালাগণের নিবিড় আলিঙ্গন-ভরে কৃষ্ণের বক্ষস্থল কিরূপ নিপীড়িত হইতেছে; কখনও বা রাধা সখীর নিকট আত্ম-মনোরথ ব্যক্ত করিতে করিতে অনঙ্গবিলাসের প্রত্যেক অঙ্গ বর্ণনা করিয়া যান। পরের সর্গে শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী অবলম্বনে অনঙ্গকে অঙ্গবদ্ধ করিয়া তুলেন। আবার সখী আসে, সখী যায়—এবং প্রত্যেকেই বার বার সেই একই চুম্বন, কটাক্ষ, পঞ্চশর ও তদানুষঙ্গিক যাবতীয় পীবর বিলাস বর্ণনা করে। এবং এইরূপে প্রভাতকালে খণ্ডিতা রাধিকার হৃদয়ে মানের আবির্ভাব ও সখীজনমুখে পল্লবশয্যাগত কন্দর্পবিলাসের সুখশ্রবণে সন্ধ্যাকালে রাধার সম্পূর্ণ ভাবান্তরের মধ্য দিয়া অনঙ্গবিলাস বর্ণনার পর বর্ণনায় অগ্রসর হইতে থাকে। এবং এই শ্লোকশ্রেণীর মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পাঠকের মনে শ্রান্তি ও তদানুষঙ্গিক বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই বিরক্তি উদ্রেকের একটা প্রধান কারণ এই যে, জয়দেবের কবিতা ক্রমাগত কর্ণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক শব্দ বর্ষণ করিয়া যায়, কিন্তু কল্পনাপটে কোন চিত্র অঙ্কিত করে না। ইন্দ্রিয়ের উপভোগশক্তি সীমাবদ্ধ, সে অতি অল্পেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।

বিশেষতঃ জয়দেবের দীর্ঘ ছন্দের মধ্যে কাঠিন্যলেশ না থাকাতে বৈচিত্র্য অভাবে চিত্তকে শীঘ্রই অসাড় করিয়া ফেলে। চিত্রের দ্বারাও মন আকৃষ্ট হয় না, শব্দবৈচিত্র্যেও কর্ণ জাগ্রত হয় না, অনুপ্রাসসঙ্কুল অবিরলতরল বাক্যবিন্যাসে মানসরসনার রসবোধ ক্রমশ যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আসে।

গীতগোবিন্দের গীত-অংশে চিত্র নাই, কেবল ধ্বনি আছে। ধ্বনির দ্বারা চিত্র এবং ভাবের উদয় করা বিশুদ্ধ সঙ্গীতের কার্য্য। কবিতার ছন্দোবন্ধের মধ্যে যেটুকু ধ্বনি থাকিতে পারে, সঙ্গীতের তুলনায় তাহা অসম্পূর্ণ—এই কারণে কবিতায় ছন্দের ঝঙ্কার ব্যতীতও ভাবপ্রকাশের অন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।

কিন্তু গীতগোবিন্দের গানগুলিতে ঝঙ্কার বাদ দিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বর্ণনাগুলি নিতান্ত সাধারণভাবে। একজন অন্ধও সেরূপ বর্ণনা কেবল জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিতে পারেন। তাহাতে কবির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ এবং স্বাভাবিক প্রতিবিম্বগ্রাহিতা নাই। বসন্তবর্ণনায় "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে" কেবল লকার-লসিত ধ্বনির লহরীলীলা মাত্র, তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট চিত্র নহে।

কবিতায় চিত্র কাহাকে বলে, তাহা জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের সূচনাশ্লোকের প্রথম দুই ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন :—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ——————————————।

নিম্নে বনভূমি তমালদ্রুমে শ্যাম, এবং ঊর্দ্ধে আকাশ মেঘে মেদুর, এবং সময় রাত্রি। অন্ধকারের উপর অন্ধকার—তাহার উপর সুগম্ভীর শব্দের এবং মেঘমন্দ্র ছন্দের ঘনঘটা। একমাত্র "নক্তং" শব্দ, তাহার ক্রিয়া নাই, বিশেষণ নাই, আনুষঙ্গিক পদ নাই, কেবল একটি কথামাত্রে একটি অখণ্ড তামসী রাত্রি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এইখানে বলা আবশ্যক, গীতগোবিন্দ প্রকৃতই গীত। তাহা সুরসংযোগে গেয়। একদিন তাহা রাজসভায় গীত হইয়াছিল। সে রাগিণী অদ্য আমাদের নিকট মৌন—সুতরাং আমাদের নিকট গীতগোবিন্দ অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, গীতে যেরূপ বাক্যবিন্যাস হওয়া উচিত, গীতগোবিন্দ তাহার আদর্শস্থল। সঙ্গীতে আমাদের মনে যেরূপ ভাবের উদ্রেক করে, তাহা চিত্রের ন্যায় সুনির্দ্দিষ্ট নহে। তাহা একপ্রকার অব্যক্ত অথচ সুতীব্র; অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার উত্তাপ এবং আলোক এবং স্পন্দন আছে, কিন্তু তাহার আকার, আয়তনের কাঠিন্য এবং নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই—তাহাকে প্রবলভাবে অনুভব করিতে পারি, অথচ মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না।

এই জন্য গানের কথা অত্যন্ত সরল এবং সাধারণ ভাবের হাওয়া উচিত। নতুবা কথা সুরের অনুগামী না হইয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে। কথা যদি ভাবকে কোন বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, তবে সঙ্গীত সেই বন্ধনে পীড়িত হইতে থাকে।

গীতগোবিন্দের ভাষা সর্ব্বাংশেই সঙ্গীতের সহায়তা করিয়াছে, কোথাও প্রতিকূলতা করে নাই। অনুপ্রাসে এবং কথার লালিত্যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার বর্দ্ধিত করিয়া তোলে এবং ভাবের বিরলতা ও সরলতায় রাগরাগিণী অব্যাহতভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে।

সঙ্গীতে চিত্রবৈচিত্র্য এবং কল্পনাকৌশলের স্থান নাই, কেবল সাধারণভাবে একটি স্থায়ী রস অবলম্বন করা আবশ্যক। জয়দেব শৃঙ্গাররস আশ্রয় করিয়াছেন—এবং এই রসকেই স্বরোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছেন।

এই শৃঙ্গারসম্ভোগই গীতগোবিন্দের দেহ অথবা প্রাণ, যাহা বল। এবং সমালোচকেরা ইহাতেই জয়দেবের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ, ইহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক মিলনেরই শরীরী রূপক। এবং জয়দেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যদি হরিস্মরণে মন সরস হয়, তবে জয়দেব-সরস্বতী শ্রবণ কর।

সুতরাং শারীরিক সম্ভোগেরই বর্ণনা বলিয়া গীতগোবিন্দকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য বলা যায় না। কবি যদি সেই ঈশ্বরের ভাবে তন্ময় হইয়া সাধারণ সম্ভোগের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে এমনই কি দোষ হইয়াছে? হাফেজ ত বার বার মদিরাপানের কথা বলিয়াছেন এবং মর্ত্ত্য বিরহের ভাষাতেই প্রিয়জনের জন্য বিলাপ করিয়াছেন। তাঁহাকে ত কেহ সে জন্য অপরাধী করে না!

বাস্তবিক, ভাবুকের অন্তরে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে আসিয়া মনুষ্যত্বের সহিত দেবত্বের মিলন সংঘটিত হয়। এবং সেই সঙ্গমক্ষেত্রের ভাষা মানবকবির রচনায় কতকটা এই মর্ত্ত্য প্রেম ও সম্ভোগের ভাষারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে না—কেবল হৃদয়ের একটি নিবিড় প্রগাঢ়তা ব্যক্ত হয়, যে তন্ময়ী প্রগাঢ়তা এই মর্ত্ত্যধামে দম্পতির শরীর মনের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয় এবং হৃদয় হৃদয়ের ও সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে।

কেবলি যে দাম্পত্য প্রেমেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়, এমনও নহে। সকল প্রেমই যাঁহা হইতে নিঃসৃত, সেই প্রেমস্বরূপকে প্রেমের যে কোন ভাবে উপলব্ধি কর, তিনি তাহাতেই প্রকাশমান। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখিয়া তাঁহার সহিত পুত্রের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতে এই মাতাপুত্রভাব মর্ত্ত্য মাতাপুত্রেরই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ঈশ্বরকে নানা ভাবে দেখিয়াছে।

এবং বৈষ্ণব সঙ্গীতে মানবভাবই প্রগাঢ় হইয়া সেই সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। এই যে রাধাকৃষ্ণের রূপক, ইহা ত সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই অঙ্গ। বৈষ্ণব জয়দেব গোস্বামী যদি ইহা লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহাতে ঈশ্বরতন্ময়তার পরিবর্ত্তে শরীরতন্ময়তাই প্রকাশ পাইবে কেন ?

কারণ এই যে, জয়দেব ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া গীতগোবিন্দ রচনা করেন নাই। হরিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় ত তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বিলাসকলায় কুতূহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না। আধ্যাত্মিক সমালোচকেরা স্বপক্ষে যে শ্লোকের কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকেরা ইহার প্রমাণ পাইবেন।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং ॥

সুতরাং জয়দেব যে, হরিস্মরণ এবং বিলাসকলা, উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এবং গীত-গোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়।

তিনি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি এই বিলাসকলাই রচনা করিতেছেন। এবং তাঁহার কাব্যে আদিরসের সমস্ত বাহ্য উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতিটুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরল ভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিত, তাহাই নাই।

এই অতি সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। শৃঙ্গাররসও নহে, সম্ভোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহও নহে।—প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নব্য রুচির বিরুদ্ধ ভাষায় এমন অনেক কথা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্বেদের পুরুরবা ও উর্ব্বশী উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।* ঋগ্বেদের এই নগ্ন বর্ণনায় অশ্লীলতা, রুচি অরুচি, শরীর মন, এ সমস্ত অতি সূক্ষ্ম ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে এমন একটি দীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত পাপ, সমস্ত অবিশুদ্ধি নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জয়দেবে এই সহজ স্বাভাবিকতাটুকু নাই। সম্ভোগবর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে

* ৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায়, ১০ মণ্ডল, ৯৫ সূক্ত

সহজ আবেগভরে বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানা ছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য।

নহিলে, মানবের শরীরও হেয় নহে, উলঙ্গতাও অপবিত্র নহে। উলঙ্গ যোগীকে দেখিয়া কেহ ত সঙ্কোচ অনুভব করে না। বরঞ্চ সেই নগ্ন দেহই পুণ্যদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। উলঙ্গ শিশু কাহারও চক্ষে অপবিত্র নহে। এবং বন্য মানবের উলঙ্গতাও অশোভন বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ আর কিছুই নহে, ইহার মধ্যে কোনরূপ ঠার নাই, ইঙ্গিত ইসারা নাই, নাগরিকতা নাই।

গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ নিষ্প্রয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসে না।

কিন্তু এই গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির পার্শ্বে ফরাসী চিত্রশালার একখানি নগ্নদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্ত গৌরব নাই। ফরাসী চিত্রকর ঐ নারীমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ হইতে বসন স্খলিত করিয়া দিয়া পায়ে হয় ত জুতা রাখিয়াছেন, কিম্বা এমন করিয়া এমন কিছু রাখিয়াছেন, যাহাতে এই বর্ত্তমান শতাব্দীর বসনভূষণের একটি ভাব মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটা সচেতন উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করে।

বৈদিক পুরুরবা ও উর্ব্বশী চিত্রের পার্শ্বে জয়দেবের সম্ভোগচিত্রাবলী এইরূপ। এবং হরিস্মরণ ত দূরের কথা, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ এখানে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কি না, আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

'সাধনা', ফাল্গুন ১৩০০

পশুপ্রীতি

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের সহিত সমস্ত জীবজগতের প্রতি একটি প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখা যায়। গোযূথ, চক্রবাকমিথুন, কলহংস এবং মৃগশাবক সংস্কৃত সাহিত্যরাজ্যের একটি সুবৃহৎ সামাজিকতার মধ্যে কেমন সুন্দর স্থান অধিকার করিয়া আছে—মানুষের সুখদুঃখ এবং দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে তাহারা কেমন সহজে অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা আমাদের যেন পর নহে, ঘরের লোকের মত।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে পশুজাতির প্রতি মমতা ব্যক্ত হয় নাই, এ কথা বলিলে

নিতান্তই অত্যুক্তি হইয়া পড়ে। মূষিককে সম্বোধন করিয়া কবি বার্ণ্‌সের যে করুণার্দ্র বাৎসল্যপূর্ণ কবিতাটি আছে, তাহার তুলনা অন্য দেশের কোন কবিতায় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সংস্কৃতসাহিত্যে ত দেখা যায় না।

কিন্তু আমার বিবেচনায় না থাকিবার একটি কারণ আছে। কবি বার্ণ্‌সের যে কবিজন-সুলভ মমত্ব, তাহা যেন চতুর্দ্দিকের নির্দ্দয়তার নিপীড়নে কিছু সচেতন বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জানেন, এই অসহায় জীবকে কেহ দয়ার চক্ষে দেখে না, তিনি জানেন, অকারণে খেলাচ্ছলে পশুহত্যা মানুষের আমোদের একটা অঙ্গ হইয়া গেছে, সেই জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে বাধা এবং ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দয়া এমন প্রবলভাবে স্নেহসঙ্গীতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃতসাহিত্যে কবিহৃদয়ের দয়া চতুর্দ্দিকের সমাজ কর্তৃক সেই বেদনা প্রাপ্ত হয় নাই, এই জন্য তাহা উচ্ছ্বসিত গীতে পরিণত হইতে পারে নাই, তাহা কেবল একটি আত্মবিস্মৃত অচেতন স্নেহে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। প্রকৃতি পশু এবং মানব একটি সহজ প্রেমে যেন এক গার্হস্থ্যের অঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে মৃগয়া ছিল না, তাহা নহে ; কিন্তু ক্রীড়ার্থে পশুহনন কেবল রাজাদের মধ্যে বদ্ধ ছিল—সাধারণ হিন্দুপ্রকৃতির সহিত উক্ত কার্য্যের যেন একটা অসামঞ্জস্য ছিল। সেই জন্য মৃগয়ায়—অন্য দেশের কবি যেখানে অশ্বের হ্রেষারবে ও কুক্কুরগণের উল্লাসকোলাহলে উৎসাহিত হইয়া শোণিতাক্তকলেবর পলায়মান পশুর পশ্চাতে জয়োল্লাসে ধাবমান হয়েন—সংস্কৃত কবির করুণ হৃদয় সেই প্রাণভয়ে পলায়মান আর্ত্তের দুঃখে বিগলিত হইয়া আসে এবং তাঁহার শিকারদৃশ্য উল্লাসের পরিবর্ত্তে করুণাই উদ্রেক করে।

কাদম্বরীর প্রারম্ভেই ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। শুকমুখে বাণভট্ট যেখানে ব্যাধগণের অত্যাচার উপদ্রবের বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার এই সহৃদয়তা, পশুজগতের প্রতি—অহিংসা মাত্র নহে—আন্তরিক নিবিড় অনুরাগ, বর্ণনার পর বর্ণনায় প্রতি ছোটখাট ঘটনার উল্লেখে কেমন প্রগাঢ় হইয়া ফুটিয়াছে।

সেই যমদূতসদৃশ বিকটমূর্ত্তি জবালোহিতচক্ষু নিষ্ঠুর শবরসেনা, নরকের দ্বারপালসদৃশ ভীষণ সেনাপতি, প্রাণভয়ে পলায়মান সিংহ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গগণের গর্জ্জন ও চীৎকারে আলোড়িত বনরাজি, জরচ্ছবরের নৃশংস পক্ষিবধব্যাপার ও নিরীহ পক্ষিকুলের অন্তরে দারুণ ভীতিসঞ্চার, প্রতি বর্ণনায় বাণভট্টের অন্তর হইতে বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায়, পাশবদ্ধ পক্ষিশাবকের ন্যায় একটি করুণ আর্ত্তনাদ বাহির হইয়াছে, যে করুণ স্বরে ব্যাধগণের সমস্ত উল্লাসকোলাহল ডুবিয়া গিয়াছে।

কাদম্বরীর গ্রন্থকার যে অধিক হা হুতাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; এবং মৃগয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অহিংসার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দীর্ঘ নীতি-উপদেশও প্রদান করেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে সমস্ত বর্ণনায় একটি গভীর সহানুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধ শবরের পক্ষিবধ-বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে বোধ করি ক্ষতি নাই।

কিমিব হি দুষ্করমকরুণানাং যতঃ স তমনেকতালতুঙ্গমভ্রঙ্কষশাখাশিখরমপি সোপানৈরিবাযত্নেনৈব পাদপমধিরুহ্য তাননুপজাতোৎপতনশক্তীন্, কাংশ্চিদল্পদিবস-জাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্ত্তিকানুকারিণঃ কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্, কাংশ্চল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃ-কম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতীকারাসমর্থান্, একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরান্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাব-পাতয়ৎ।

এই পক্ষিশাবকগুলির বর্ণনাই কি সকরুণ! কেহ এখনও উড়িতে শিখে নাই, কেহ অতি অল্পদিন হইল জন্মিয়াছে, সেই জন্য গর্ভচ্ছবিপাটলবর্ণ—যেন শাল্মলীকুসুমগুলির মত, কাহারও অল্প অল্প নূতন ডানা যেন পদ্মের নবদলের মত উঠিয়াছে, কাহারও লোহিতায়মান ক্ষুদ্র চঞ্চু যেন পদ্মকলির একটুখানি খোলা মুখটুকুর মত, কেহ বা অবিরত শিরঃকম্প দ্বারা এই নিষ্ঠুরকে যেন তাহার অকরুণ কার্য্যে নিবারণ করিতে চাহিতেছে। এই সমস্ত প্রতীকারে অসমর্থ বিহগশিশুগুলিকে যেন এক একটি ফলের মত বনস্পতির শাখাসন্ধি হইতে, কোটরাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া নিষ্ঠুর শবর যখন গ্রীবা মোটনপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কবির হৃদয়ে তখন কি শেলই বিঁধিতেছিল।

সেই জীর্ণ শাল্মলী-তরুকোটরে বহু যুগ ধরিয়া বহু পক্ষিবংশ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া আসিতেছে। প্রভাত হইলে তাহারা দিকে দিকে আহারান্বেষণে বহির্গত হয় এবং আহারানন্তর প্রত্যাগত হইয়া কুলায়াবস্থিত শাবকদিগকে চঞ্চুপুটের দ্বারা শালিধান্য-মঞ্জরী খাওয়াইয়া দেয় এবং শাবককে ক্রোড়াস্তে নিহিত করিয়া সেইখানেই দীর্ঘ নিশা যাপন করে।

একটি জীর্ণ কোটরে একটি বৃদ্ধ শুকদম্পতি বাস করিত। বৃদ্ধবয়সে তাঁহাদের একটি সন্তান হয়। প্রবল প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহার জননী প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধ পত্নীবিয়োগে অতিমাত্র কাতর হইলেও সুতস্নেহবশতঃ

শাবকের লালনপালন ও তৎসম্বর্দ্ধনে যত্নবান্ হইয়া একাকী কায়ক্লেশে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে লাগিল। বয়সের আধিক্যহেতু ও বহুদিনের অনভ্যাসবশতঃ তাহার আর উড়িবার শক্তি ছিল না। নব শেফালিকাকুসুমবৃন্তের ন্যায় পিঞ্জরবর্ণ চঞ্চুপুট দ্বারা পরনীড়নিপতিত শালিবল্লরী হইতে তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিয়া ও তরুমূলনিপতিত শুক-কুলাবদলিত ফলসকল সংগ্রহ করিয়া শাবককে আহার করাইত এবং শাবকের ভুক্তাবশিষ্ট নিজে আহার করিত।

সে দিন প্রভাতে মৃগয়াকোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া শবরকে তরু অভিমুখে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর ভয়ে দ্বিগুণতর কম্পিত হইতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, এবং অশ্রুপরিপ্লুত ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সন্তানস্নেহপরবশ বৃদ্ধ, শাবককে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করিয়া প্রাণপণে বক্ষতলে চাপিয়া রহিল। শবর যখন তাহার কুলায়সমীপে আসিয়া কোটরের মধ্যে স্বীয় বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধী অনবরত কোদণ্ডগুণাকর্ষণহেতু ব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠ যমদণ্ডসদৃশ বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া দিল, বৃদ্ধ চঞ্চুদ্বারা তাহাকে যথাশক্তি আঘাত করিল, কিন্তু সে বাহুপাশ ছাড়াইতে পারিল না। শবর তাহাকে বাহির করিয়া বধ করিল এবং বক্ষতলে শিশু সহ বৃদ্ধ শুক ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

এই শিশু শুক কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজসন্নিধানে আপন পিতার অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে :—

তাতস্তু তং মহান্তমকাণ্ড এব প্রাণহরমপ্রতীকারমুপপ্লবমুপনতমবলোক্য দ্বিগুণতরোপজাতবেপথুঃ, মরণভয়াদুদ্‌ভ্রান্ততরলতারকাং বিষাদশূন্যামশ্রুজলপ্লুতাং দৃশমিতস্ততো দিক্ষু বিক্ষিপন, উচ্ছুষ্কতালুরাত্মপ্রতীকারাক্ষমঃ, ত্রাসস্রস্তসন্ধিশিথিলেন পক্ষপুটেনাচ্ছাদ্য মাং তৎকালোচিতপ্রতীকারং মন্যমানঃ, স্নেহপরবশো মদ্রক্ষাকুলঃ কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ়ঃ ক্রোড়ভাগেন মামবষ্টভ্য তস্থৌ। অসাবপি পাপঃ ক্রমেণ শাখান্তরৈঃ সঞ্চরমাণঃ কোটরদ্বারমাগত্য, জীর্ণাসিতভুজঙ্গভোগভীষণং প্রসার্য্য বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধিকরতলমনবরতকোদণ্ডগুণাকর্ষণব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠমন্তক-দণ্ডানুকারিণং, বামবাহুমতিনৃশংসো মুহুর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহারমুৎকূজন্তং তমাকৃষ্য তাতমপগতাসুমকরোৎ।

এই দৃশ্যে কবির সহানুভূতি কোন্‌খানে, তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। বৃদ্ধ শুক তাহার পত্নীবিয়োগের পর যে কত কষ্ট এবং কত স্বার্থ-ত্যাগ স্বীকারপূর্ব্বক আপন শাবকটিকে প্রাণপণে পালন করিয়া আসিয়াছে এবং সেই অনেক দুঃখের পালিত সন্তানটিকে রক্ষা করিবার জন্য যে কি যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মরিল—

এই বর্ণনাতেই কবিহৃদয় সম্যক্‌ ব্যক্ত হইয়াছে। পক্ষিকুলের অন্তরের মধ্যে তিনি কেমন প্রবেশ করিয়াছেন! কেমন সহৃদয়তার সহিত সুন্দররূপে তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের সন্তান আমাদের নিকট যেমন প্রাণাধিক প্রিয়, পাখীর সন্তানও পাখীর কাছে ঠিক সেইরূপ! ভিন্নজাতীয় জীবের প্রতি করুণা সঞ্চার করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা কল্পনা অভাবে অন্য জীবের সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারি না, কবি যখন দেখাইয়া দেন, আমাদের জননীর বাৎসল্য, পিতার স্নেহ, জীবনের মমতা, ঐ ভাষাহীন পাখীর নীড়ের মধ্যেও আছে, তখন সেই "Touch of nature makes the whole world kin." তখন আমাদের হৃদয় সমস্ত অনাথ জীবজন্তুর প্রতি আত্মীয়ভাবে ধাবিত হয়।

কেবলমাত্র কাদম্বরীতে নহে, জীবজগতের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি সংস্কৃত কাব্যে প্রায়ই দেখা যায়। রঘুবংশের নবম সর্গে মৃগয়ার মধ্যস্থলে রাজা দশরথের লক্ষ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য সহচরী হরিণী প্রিয়তম হরিণকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, এবং তদ্দর্শনে কঠিন রাজহৃদয়েও দাম্পত্যের নিবিড় অনুরাগ ঘনাইয়া আসে; শিখিকুলের বর্হবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া উদ্যত বাণ তূণীরে ফিরিয়া আসে, এবং এই মৃগয়ামত্ততার মধ্যেও মানবহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সকরুণ স্নেহ ক্ষরিত হইতে থাকে।

শকুন্তলার প্রথম দৃশ্যেও দুষ্মন্তের মৃগানুসরণে কালিদাসের এই গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। নহিলে, উদ্যতবাণ দুষ্মন্তের মুখ দিয়া তিনি সেই গ্রীবাভঙ্গাভিরাম সৌন্দর্য্য বর্ণনা করাইবেন কেন? এরূপ সহৃদয়তার সহিত যে প্রাণভয়ে ধাবমান পশুর সৌন্দর্য্য অনুভব করে, চতুরা মৃগয়া তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিতে পারে নাই।—ঋষি রাজাকে শরসন্ধানে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা যেন পশুবৎসল ভারতবর্ষের ব্যথিত হৃদয়ের ভাষা। আহা, এই হরিণকের অতিলোল জীবনটি কতটুকুই বা, আর কোথায় তোমার বজ্রসার শর—পুষ্পরাশির মধ্যে কি আগুন ধরাইতে আছে! কবি বড় করুণার সহিত এই কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মৃগয়া আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নিবারণের উদ্যত বাহু আছে—মনের সহিত সেই নিষ্ঠুর প্রমোদে কবি যোগ দিতে পারেন নাই।

কালিদাস পশুজগতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তপোবনে কামধেনু নন্দিনীর সেবার কথা পাঠ কর। সেই অনিন্দ্যতনু ধেনুর নবকিসলয়সদৃশ চিক্কণ পাটল বর্ণ ও ললাটতটে প্রদোষসময়ের নবোদিত শশিকলাসদৃশ ঈষৎ বক্র শ্বেত রেখা বর্ণনা করিয়া কবি কত আনন্দ লাভ করিয়াছেন! রাজা যখন রথারোহণে গুরুগৃহে অথবা মৃগয়ায় বাহির হন, কালিদাস সমস্ত পথ তাঁহার অশ্বের নিভৃতোর্দ্ধকর্ণ নিষ্কম্পচামরশিখা গতিবেগসৌন্দর্য্য

দেখিতে দেখিতে চলেন ; এবং কি বশিষ্ঠাশ্রমে, কি মালিনীনদীতীরে, রথ হইতে অবতরণকালে রাজমুখে অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ দিতে কখনও ভুলেন না।

এই সহানুভূতি শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যে—যেখানে হরিণশিশু বার বার অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে এবং হরিণশিশুর স্নেহে শকুন্তলার নয়ন ছলছল করিয়া আসে—সেইখানেই সম্যক্ মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। নিপুণ চিত্রকর কালিদাস এইরূপে চতুর্দ্দিকের সুন্দর প্রকৃতির মধ্যস্থলে মানবের সহিত মৃগ-হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাঁধিয়া দিয়া যে একখানি সুন্দর চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাহার মর্ম্মস্থলে কবিহৃদয়ের অনেকখানি বেদনা, পশুজগতের প্রতি অনেকখানি সহানুভূতি যেন আপনা হইতে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে।

ভবভূতির নাটকেও এ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে সীতার পালিত করিশিশু ও ময়ূরবর্ণনায় এই অনুরাগ অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতি, পশু এবং মানবের সম্মিলনে সংস্কৃত কবির হৃদয় কিরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।—শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের সহিত উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্ক, বিদায় এবং পুনর্মিলন দুই সম্পূর্ণ বিভিন্নবিষয়ক হইলেও, দৃশ্যাংশে নিতান্ত বিসদৃশ নহে। এবং ভাবের ঐক্যে উভয় নাটকের পাত্রপাত্রীগণও যেন এইখানে কতকটা ঘনিষ্ঠ হইয়া আসে।

সংস্কৃত কাব্যের সর্ব্বত্রই জীবজগতের প্রতি এই উদার সহানুভূতি দেখা যায়—এবং ইহাতে ভারতবর্ষেরই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। বাস্তবিক জগতে কোথাও সিংহে হস্তীতে, ব্যাঘ্রে মৃগে সদ্ভাব দেখা যায় না, সেই জন্যই ভারতবর্ষীয় কবি আপনার হৃদয়ের অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করিয়া কাল্পনিক তপোবনের মধ্যে সর্ব্বজীবের হিংসাহীন মিলনভূমির আদর্শ রচনা করিয়াছেন। শকুন্তলার তপোবনে কেবল যে তরুলতার সহিত মনুষ্যের প্রীতিবন্ধন, কেবল যে মৃগশিশুর প্রতি ঋষিকন্যাদের মাতৃস্নেহ, তাহা নহে ; নরবালকের সহিত সিংহশাবকের সাহচর্য্যে কবি সমস্ত প্রাকৃতিক হিংসার সম্পর্ক ভুলিবার এবং ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই আদর্শের অনুগত ধর্ম্ম যদি পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কালে পালিত হইয়া থাকে ত সে ভারতবর্ষে। আজি যে অধঃপতিত ভারত গো-রক্ষার জন্য নির্ম্মম বিদেশীর কঠোর উৎপীড়ন সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ নহে, সে কেবল এই পশুজাতির প্রতি স্নেহবশতঃ। দুগ্ধবতী গাভী এবং হলবাহক বৃষ চিরকাল আমাদের গৃহপার্শ্বে পরিবারের সহিত স্থান পাইয়াছে। তাহারা আমাদিগকে স্তন্যদানে পালন করিয়াছে, অন্ন আহরণে সাহায্য করিয়াছে, তাহারা আমাদের নিত্য গৃহকর্ম্মের সহচর ও সহকারী। বিদেশীরা বলে,

তাহা হউক্ না কেন, তবু ত গোরু জন্তু বটে, তাহার সহিত ভক্তিবন্ধন ধর্ম্মবন্ধন কিসের ? ভারতবর্ষ বলে, হউক্ না পশু, তবু ত সে আমার মাতার মত হিতকারিণী, সখার মত সুখদুঃখভাগী। পশু বলিয়াই যে, তাহার সহিত ব্যবহারে মানবহৃদয়কে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অন্য জাতি যে ভাবটিকে বাড়াবাড়ি মনে করিয়া হাস্য করে, আমাদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। পশুপক্ষী, এমন কি, জড়-প্রকৃতির সহিতও ভারতবর্ষ আপনার হৃদয়ের সংযোগ অনুভব করে এবং তাহাদের প্রতি হৃদয়ের কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

পৃথিবীতে এমন অন্য কোন জাতি আছে কি না জানি না, যে জাতি এককালে মাংসাশী ছিল, অথচ ক্রমে মাংসাহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হইয়া উঠিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষেই দেখা যায়, মাংসাশী আর্য্যগণ মাংসভোজন ত্যাগ করিয়া তাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে এমন ধর্ম্মনীতি আছে কি না জানি না, যাহাতে প্রীতির সম্পর্ক মনুষ্যকে ছাড়াইয়া পশুরাজ্যে বিস্তার করিবার অনুশাসন আছে। মনুষ্যপ্রেমে প্রাণ-সমর্পণ অন্য দেশের কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উচ্চতম আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু ক্ষুধিত শ্যেনপক্ষীর জন্য নিজ দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দেওয়ার কথা বোধ হয় গল্পচ্ছলেও কোথাও উচ্চারিত হয় না। আমাদের বৌদ্ধগ্রন্থে এরূপ গল্প কর্ত্তব্যের আদর্শ বলিয়া শত শত বার আখ্যাত হইয়াছে। এ আদর্শ অসঙ্গত এবং অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেও ইহা হইতে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি বুঝা যাইতে পারিবে। যেমন হিন্দুধর্ম্ম, তেমনই বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্মও যে ভারতবর্ষীয় হৃদয় হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, সে কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

পশুস্নেহ ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে এক প্রধান লক্ষণ, তাহা একটি কাহিনীতে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যাধ যখন ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে বধ করিল, তখনই বাল্মীকির মুখে ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারিত হইল। যুদ্ধ নহে, স্ত্রীপুরুষের প্রেম নহে, জীবে দয়াই ভারতবর্ষে প্রথম শ্লোক উৎপত্তির কারণ। কথাটা ঐতিহাসিক সত্য না হইতে পারে, বাল্মীকির পূর্ব্বেও দেবস্তুতি উপলক্ষ্যে অনুষ্টুভ্ ছন্দ রচিত হইতে পারে, কিন্তু গল্পটির মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। সেটি এই যে, সর্ব্বভূতে দয়া ভারতীয় প্রকৃতির মূল উৎস। সামান্য একটি ক্রৌঞ্চপক্ষিহনন পবিত্র শ্লোকসৃষ্টির আদিকারণ বলিয়া যে দেশে প্রচলিত হইতে পারে, সে দেশের হৃদয়ের কথাটি কি, তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না। এই জন্য

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥

এ শ্লোকটি পবিত্র শ্লোক। না—ব্যাধ কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, ভারতে সে চিরকাল অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে একটা পাখীর দুঃখ বুঝিতে পারে না, কামমোহিত বিহঙ্গকে যে অকাতরে হত্যা করিতে পারে, যাহার চিত্তবৃত্তি এতই অসাড় অচেতন, সে কখনই শাশ্বতী গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না—ইহার মধ্যে বড় একটি গভীর কথা আছে।—দুর্ব্বলের প্রতি স্নেহ, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি পৃথিবীতে বড় কম। কিন্তু যেখানে ইহা দেখা যায়, সেখানে মর্ত্ত্য স্বর্গ হইয়া উঠে, সেখান হইতে কুৎসিত অত্যাচার চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হয় এবং সেখানে বৃহৎ মনুষ্যত্ব সমস্ত বিশ্বকে আপন বক্ষনীড়ে টানিয়া আনিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে।*

ভারতবর্ষের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব অনেকাংশে সেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ বোধ হয় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম সর্ব্বলোকে, সর্ব্বজীবে, দেবতা হইতে কীটাণু

* এইখানে প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক আমিয়েলের দৈনন্দিন লিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে বড় একটি সার কথা আছে। জন্তুদের প্রতি অবিচার ক্রমে যে মানুষ পর্য্যন্ত উঠে, ইহা একটি চিন্তনীয় বিষয়।

6th October, 1866.—I have just picked up to the stairs a little yellowish cat, ugly and pitiable. Now, curled up in a chair at my side, he seems perfectly happy and as if he wanted nothing more. Far from being wild, nothing will induce him to leave me, and he has followed me from room to room all day. I have nothing at all that is eatable in the house, but what I have I give him—that is to say, a look and a caress—and that seems to be enough for him, at least for the moment. Small animals, small children, young lives—they are all the same as far as the need of protection and of gentleness is concerned ···People have sometimes said to me that weak and feeble creatures are happy with me. Perhaps such a fact has to do with some special gift or beneficent force which flows from one when one is in the sympathetic state. I have often a direct perception of such a force; but I am no ways proud of it, nor do I look upon it as anything belonging to me, but simply as a natural gift. It seems to me sometimes as though I could woo the birds to build in my beard as they do in the headgear of some cathedral saint! After all, this is the natural state and the true relation of man towards all inferior creatures. If man was what he ought to be he would be adored by the animals, of whom he is too often the capricious and sanguinary tyrant. The legend of Saint Francis of Assisi is not so legendary as we think; and it is not so certain that it was the wild beasts who attacked man first··· But to exaggerate nothing, let us leave on one side the beasts of prey, the carnivora, and those that live by rapine and slaughter. How many other species

এবং কীটাণু হইতে অচেতন পরমাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেবতার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। এবং সর্ব্বত্রই দেবতার অধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্ববিশ্বকে প্রীতি করিয়া সেই দেবতাকেই প্রীতি করে। সুতরাং তাহার অন্তরে হিংসা ও অপ্রীতি স্বভাবতই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। এবং পশু পক্ষী সচেতন হইয়া মনুষ্যত্বের সহবাস লাভ করে। সেই জন্যই বৈষ্ণব কবির গান—

আজ্ বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই॥
ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।

are there, by thousands, and tens of thousands, who ask peace from us and with whom we persist in waging a brutal war? Our race is by far the most destructive, the most hurtful, and the most formidable, of all the species of the planet. It has even invented for its own use the right of the strongest,—a divine right which quiets its conscience in the face of the conquered and the oppressed; we have outlawed all that lives except ourselves. Revolting and manifest abuse; notorious and contemptible breach of the law of justice! The bad faith and hypocrisy of it are renewed on a small scale by all successful usurpers. We are always making God our accomplice, that so we may legalise our own iniquities. Every successful massacre is consecrated by a Te Deum, and the clergy have never been wanting in benedictions for any victorious enormity So that what, in the begining was the relation of man to the animal becomes that of people to people and man to man.

If so, we have before us an expiation too seldom noticed but altogether just. All crime must be expiated. and slavery is the repitition among men of the sufferings brutally imposed by man upon other living beings, it is the theory bearing its fruits.—The right of man over the animals seems to me to cease with the need of defence and of subsistence So that all unnecessary murder and torture are cowardice and even crime The animal renders a service of utility; man in return owes it a need of protection and of kindness In a word, the animal has claims on man and the man has duties to the animal.—Buddhism, no doubt, exaggerates this truth, but the Westerns leave it out of count altogether. A day will come, however, when our standard will be higher, our humanity more exacting, than it is to-day. *Homo homini lupus* said Hobbes: the time will come when man will be humane even for the wolf—*homo lupo homo.*

কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণুরবে ॥
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পুরিল উচ্চরবে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যামঅঙ্গ চাটে ॥
দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘন ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন ॥

এবং সেই জন্যই এই চেতনালব্ধ সর্ব্বজীবের তৃপ্ত্যর্থে সর্ব্ববিশ্বের উদ্দেশে ভারতবর্ষ প্রতি দিন তর্পণ করিয়া থাকে—

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জৃম্ভগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥

'সাধনা', চৈত্র ১৩০০

কাব্যে প্রকৃতি

শেক্ষপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হয় যে, শেক্ষপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার সামাজিকতা বড় নাই। এবং তাঁহার নাটকে নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনাবলীর উপর প্রকৃতির যে প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা কেবল ছায়ার মত চতুর্দ্দিকের মানব-হৃদয়ে ও ঘটনার উপরে ঘনাইয়া আসে মাত্র; কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ন্যায় প্রকৃতি সেখানে মানবজীবনের সহিত বর্দ্ধিত ও

পরিপুষ্ট হইয়া মানবহৃদয়ের সহমর্ম্মিণী সঙ্গিনী হইয়া উঠে নাই, এবং মানবী সখীর সুখে দুঃখে মানবীর ন্যায় সে বিচলিত হয় না বা মানবীর বিরহে একান্ত সন্তপ্ত ও মিলনে অতিমাত্র হৃষ্টও হয় না।

যেখানে সমগ্র নাটকটিকে শেক্ষপীয়র লোকালয় হইতে বহু দূরে এক জনহীন দ্বীপে লইয়া ফেলিয়াছেন, সেখানেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার পারিবারিক প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই—প্রকৃতির অনেকগুলি দানবী শক্তি যেখানে নির্ব্বিবাদে আধিপত্য করিতেছিল, সেইখানে তিনি এক মহামহিম মানব প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এই মানব প্রভু প্রস্পেরোকে বন্য শক্তি আরিয়েল ও ক্যালিবান যমের মত ভয় করিয়া চলে এবং যদি কালক্রমে এই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আপন স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়, এই আশায় দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রস্পেরো অথবা মিরান্দার সহিত এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির কাহারও কোনরূপ সমকক্ষতা নাই এবং বহু দিন একত্র বাসে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাও জন্মে নাই। কেবল প্রস্পেরো আদেশ করেন, আরিয়েল ও ক্যালিবান—প্রকৃতির দুই বিভিন্ন শাক্ত—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই আদেশ পালন করে। প্রস্পেরো বলেন, ঝড় উঠাও; প্রকৃতির সমস্ত শক্তি সাগরে তরঙ্গ তুলে, আকাশে বজ্রধ্বনি করে, পৃথিবীতে প্রলয়ের রোল উঠাইয়া দেয়। প্রস্পেরো বলেন, এই চাহি—দাসেরা তাহাই সংসাধন করে। শেক্ষপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব জয়ী হইয়াছে—প্রকৃতির উপর সে কর্তৃত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না।

কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রকৃতি মানবের সহিত সমান আসন পাইয়াছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে উভয়ের মধ্যে একটি সুমধুর গার্হস্থ্য বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছে। ভবভূতির নাটকে তমসা, মুরলা, বাসন্তী প্রভৃতি, নদ নদী ও আরণ্য প্রকৃতি সীতার দুঃখে যেরূপ সমবেদনা অনুভব করিয়াছে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে যেরূপে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে, তাহা শেক্ষপীয়রে নিতান্ত দুর্লভ। রাম যখন বনে আসিলেন, তখন সীতার দুঃখরজনী অবসান আশায় সেই গোদাবরীপ্রদেশের বন্য প্রকৃতি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিল! পরিপাণ্ডুদুর্ব্বল-কপোলসুন্দর বিলোলকবরী মূর্ত্তিমতী করুণা বা শরীরিণী বিরহব্যথার ন্যায় জানকীর বর্ণনায় তমসার কত প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে! বাসন্তী রামকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ছত্রে ছত্রে সীতার প্রতি তাঁহার কি গভীর সহানুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে! এমন শুশ্রূষাপরায়ণা সান্ত্বনাদায়িনী প্রকৃতি ইংরাজি নাটকে কোথায়? এই প্রেমে, করুণায়, শুশ্রূষাপরায়ণতায় উত্তরচরিতের প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাসের নাটকেও প্রকৃতি এইরূপ মানবেরই সখী। শকুন্তলার সখীগণের নাম করিতে হইলে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার সহিত সেই মালিনীতীরস্থা শ্যামলা প্রকৃতিরও উল্লেখ করিতে হয়। তপোবনের প্রতি তরুলতার সহিত শকুন্তলার সোদরস্নেহের সম্বন্ধ। এবং শকুন্তলার বিদায়কালে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার চক্ষু যেমন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, অসহায় হরিণ-শিশু যেমন অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে বার বার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তপোবনের এই পল্লবিত প্রকৃতিও সেইরূপ অশ্রুছলছল নতনেত্রে আপন নির্ব্বাক্ বেদনা জানাইয়া শাখাবাহু দ্বারা প্রিয়সখীকে বুকভরা আলিঙ্গন দিয়াছিল।

শকুন্তলায় এই প্রকৃতি নাটকের মেরুদণ্ড। মানবী সখী যখন শকুন্তলার বল্কল-বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, প্রকৃতি তখন কুরবকশাখায় বল্কল আট্‌কাইয়া দিয়া মানবী সখীর সহিত সেই প্রণয়ব্যাপার ঘনাইয়া আনে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমকে তপোবনের এই রমণীয় প্রকৃতি যেন ভরাট্ করিয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শকুন্তলার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, কণ্ব, গৌতমী, সমস্ত মিলিয়া একটি নির্জ্জীব মানবস্তূপ পড়িয়া থাকে মাত্র—এবং কালিদাসের প্রেম সহসা অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক বলিয়া মনে হয়।

কেবলি শকুন্তলায় নহে, কুমারসম্ভবে যেখানে মহাদেবের প্রতি মদন বাণ উদ্যত করিয়াছে, সেখানেও সমস্ত প্রকৃতি অনুকূল ভাবে পূর্ণ হইয়া হরপার্ব্বতীর প্রেমকে সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ করিয়াছে। কালিদাসের মানবপ্রেম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে—চতুর্দ্দিক হইতে তাহার উপরে প্রকৃতি ঘনাইয়া আসিয়া সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ করে। এই জন্য যোগিজনবিচরিত তপোবনেই তাঁহার প্রেম সম্পূর্ণ সফল হয়—যেখানে আরণ্য প্রকৃতি মানবের স্নেহে সিঞ্চিত হইয়া কোমল ও মধুর হইয়া আসিয়াছে এবং মানব-হৃদয় নাগরিকতা পরিহারপূর্ব্বক আরণ্য শ্যামলতায় সরস হইয়া উঠিয়াছে; যেখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, সিংহ মৃগশিশুকে হত্যা করে না, মৃগশিশু মানবের পদপ্রান্তে বসিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নীবার রোমন্থ করে, এবং সর্ব্ব লোক, সর্ব্ব জীব, চেতন অচেতন জড়, সকলের মধ্যে একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতা সংস্থাপিত হয়।

শেক্সপীয়রে প্রেমের সহিত প্রকৃতির এত ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। সেখানে সুখসুপ্ত চন্দ্রালোকে প্রণয়িযুগলের মনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের বহু প্রণয়কাহিনী আসিয়া উদয় হয় এবং পুরাতন কালের সমস্ত প্রেম এই নবীন প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এবং এইরূপে যুগযুগান্তের মানবপ্রেম আসিয়া মানবকে আপনার মহিমায় অধিকতর ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না, হয় ছায়ার মত, নয় মানবের আজ্ঞাধীন

সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চ্যাণ্ট অফ্ ভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেষ্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয়ঘটনায়।

সংস্কৃত কবিরা প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখেন। সেই জন্যই সংস্কৃত নাটকে প্রকৃতি মানবের সহকারিণী সখী। ভবভূতির নিকট তিনি শুশ্রূষাপরায়ণা গভীরহৃদয়া ; এবং কালিদাসের নিকট তিনি সুন্দরী। কালিদাস নারীকে সৌন্দর্য্যেই সম্যক্ দেখিয়াছেন—প্রকৃতিকেও তিনি এই ভাবেই উপভোগ করেন।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগে আধুনিক কবিদিগের সহিত কালিদাসের অনেক প্রভেদ। সে কালের কবি যেমন রমণীকে অল্প হউক্ অধিক হউক্, পুরুষের ভোগ্যা বলিয়া জানিতেন, প্রকৃতিকেও কতকটা সেইভাবেই দেখিয়াছেন। সেই জন্য কালিদাস যখন প্রিয়া সহ সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে দীর্ঘ বর্ষ যাপন করেন, ছয় ঋতু আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন মদিরা দিয়া তাঁহার পাত্র ভরিয়া দেয় এবং সুন্দরী দাসীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করে।

ভবভূতিতে যে প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, ভবভূতির প্রকৃতি জননীর ন্যায় শুশ্রূষাপরায়ণা ও কল্যাণদায়িনী। আমাদের দেশে নারী সৌন্দর্য্যে পূজিতা নহেন ; জননী ও সতীরূপে গৃহের কল্যাণ ও আনন্দরূপেই তিনি এ দেশের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃতিও যখন আমাদের নিকট এই ভাবে প্রতিভাত হয়, তখনই আমরা তাহাকে দেবী করিয়া তুলি।

য়ুরোপে শিভল্‌রি নারীকে অন্যরূপে দেখিয়াছে। সেখানে কবিদিগের রচনায় যে সৌন্দর্য্যের পূজা প্রচারিত হইয়াছে, সে সৌন্দর্য্য কেবল ইন্দ্রিয়মাত্রের দ্বারা উপভোগ্য নহে। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরে যে সৌন্দর্য্যশক্তি নিহিত আছে, নারীসৌন্দর্য্যে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট বলিয়া নারীপূজায় সেই সৌন্দর্য্যেরই পূজা করা হয়। এবং এই সৌন্দর্য্যপূজা নারী হইতে ক্রমে সমস্ত প্রকৃতিতে যেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক কবি এই সৌন্দর্য্যশক্তিকে অদৃশ্য প্রভাবের মত অনুভব করেন। বসন্তের বাতাস যেমন চঞ্চল পক্ষে ফুলে ফুলে নিশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া যায়, এই অদৃশ্য প্রভাবের ছায়াও সেইরূপ সর্ব্ববিশ্বের উপর দিয়া—লোক-লোকান্তর স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয়। এই অদৃশ্য প্রভাব—এই ছায়া—শুধু সঙ্গীতের স্মৃতির মত—অত্যন্ত রহস্যময়, কিন্তু এই রহস্যবশতই প্রিয়তর। এই সৌন্দর্য্যের মূলশক্তি, বাহ্য প্রকৃতিতে, মানবহৃদয়ে, প্রেমে, আশায়, স্বপ্নে, সর্ব্বত্র ছায়া ফেলিয়াছে। কবি এই চরাচরপ্লাবী সৌন্দর্য্যরহস্যে নিমগ্ন হইয়া দেখিতেছেন যে, এই সমস্তই সেই মহাসৌন্দর্য্যে ওতপ্রোত ; এবং এই সৌন্দর্য্য অবলম্বন করিয়াই মানবের অন্তরের সহিত প্রকৃতির অন্তরের অনির্ব্বচনীয় যোগসূত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের এই অদ্বৈতবাদই আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতার মর্ম্মস্থল। ইহাকে অদ্বৈতবাদ না বলিয়া ঐক্যবাদ বলা উচিত। সমস্ত চরাচর চেতন অচেতনের মধ্যে যে একমাত্র মহীয়সী সৌন্দর্য্যশক্তি উদ্ভাসিত, ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।—

এই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি দ্বারা সমস্ত খণ্ড জগৎ একটি সর্ব্বব্যাপী সুমধুর মিলনে আবদ্ধ হইয়া একটি অখণ্ড সঙ্গীতের ন্যায় বৃহৎ এবং এক হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের বিচ্ছিন্ন স্বরগুলি স্বতন্ত্র ভাবেও শ্রুতিমনোহর হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে আদ্যোপান্ত একটি অবিভক্ত সৌন্দর্য্য, একটি মহা-রাগিণীর সমগ্রতা আবিষ্কার করা যায়, তখন আনন্দ সুনিবিড় হইয়া উঠে এবং একটি বিপুল রহস্যময় পুলকে সমস্ত অন্তরাত্মা চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের ন্যায় আন্দোলিত হইতে থাকে। প্রাচীন কাব্যে প্রকৃতি কোথাও এরূপ সম্মিলিত সমতানে অনাদ্যন্ত নভস্তল হইতে মানবের অন্তর-গুহা পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। সেখানে খণ্ড প্রকৃতি—খণ্ড সৌন্দর্য্য—মানবের সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক বিশ্বব্যাপিনী মহীয়সী সত্তা মানবাত্মাকে চরাচরের সহিত সৌন্দর্য্য-পুষ্পমাল্যে আবদ্ধ করিয়া মহীয়ান্ করে নাই।

কেবল আমাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থে, বেদে, এই মহাসঙ্গীত উদ্গীত হইয়াছে। তেমন সহজে, তেমন সতেজে, তেমন সংক্ষেপে আর কোন দেশের কোন কাব্যে জগতের এই রহস্যবার্ত্তা প্রচারিত হয় নাই। ঋষিরা বলিয়াছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী জন্মলাভ করিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই সমস্ত প্রাণী জীবিত রহিয়াছে এবং আনন্দের অভিমুখেই প্রবেশ করিতেছে।

ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে সকল কথাই বলা হইয়াছে। সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত সুখ, সমস্ত চেতনা, সমস্ত প্রাণ এক অনাদি অনন্ত মহানন্দের দ্বারা সন্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—সেই জগচ্চরাচরের জগদতীত আনন্দ-ঐক্য যে মহাত্মা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনি আর,

ন বিভেতি কুতশ্চন,
ন বিভেতি কদাচন।

'সাধনা', বৈশাখ ১৩০১

দিল্লীর চিত্রশালিকা

নব্যতন্ত্রের হিসাবে হয় ত সে সূক্ষ্ম ছায়া আলোকও নাই এবং তুলিকার সে দূরানুসূচী লঘুস্পর্শও এখানে দুর্লভ, কিন্তু তথাপি আমাদের পুরাতন কলাভবনের এই লুপ্তপ্রায় চিত্রশিল্পের মধ্যে যে একটি মনোহর মোহ আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। শুধু যে পুরাতন বলিয়া, সে কালের বলিয়াই ইহার আদর, তাহা নহে; ইহার বিচিত্র সূক্ষ্ম রেখাপাত ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রাচ্য বর্ণবিন্যাসে যে সুন্দর কারুকার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, এমন রমণীয় কলানৈপুণ্য অন্যত্র কদাচ লক্ষিত হয়। এবং এই কলানুসৃত নিপুণ কারুকার্য্যই ভারতবর্ষের শিল্পিজনচিত্তে এই সুরঞ্জিত চিত্রফলক এত দিন ধরিয়া এমন অম্লান আদর্শে সঞ্জীবিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য চিত্রকলার সহিত ইহার সম্বন্ধ অল্পই—না ভাবে বিশেষ ঐক্য, না বর্ণবিন্যাস ও রচনাপ্রণালী একবিধ; এমন কি, উভয়বিধ রচনার অন্তর্নিহিত প্রতিভার মধ্যেও যেন বহু দেশ ও বহুতর সমুদ্রের ব্যবধান। প্রাচ্য জীবনপ্রবাহেরই মত এই চিত্রার্পিত জীবনস্রোত রূপে বর্ণে আলোকে, বিচিত্র মিলন বিরহ সম্ভোগে, কখনও হাসিতে, কখনও অশ্রুচ্ছ্বাসে, কখনও সুখে, কখনও বেদনায়, কোথাও নিবিড় নির্জ্জন দাম্পত্যের রমণীয় স্নিগ্ধচ্ছায়ে, অন্যত্র আলোকচ্ছটাবিচ্ছুরিত সহস্রসখীপরিরম্ভাকুলিত নৃত্যগীতরস-রভসে হিল্লোলিত ও বিহ্বলিত হইয়া মদালসময়ী মন্দগতিতে নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। এবং ভারতবর্ষীয় সকল শিল্পকলারই মত ইহার অবলীলাগতিভঙ্গে শিল্পীর সেই প্রায়নির্লিপ্তবৎ অনতিসচেতন রচনাকলা সকল চেষ্টার ভাব অপসারিত করিয়া দিয়া কেমন একটি প্রশান্ত স্থৈর্য্য সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের নিকট ইহা স্বভাবতই রমণীয়—বিষয়গুণেও বটে, এবং আরও বিশেষতঃ ইহার রবিকরোদ্ভাসিত বর্ণাভাসে। সে ঔজ্জ্বল্য আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না। প্রতীচ্য চিত্রে স্বভাবতই তদ্দেশেরই সূর্য্যালোক দীপ্তি পাইয়া থাকে, এবং প্রতীচ্যবিদ্যা-শিক্ষিত নব্য আর্টস্কুলের ছাত্রের রচনায়ও আলোকসন্নিবেশ প্রায়ই বিলাতী ছবির অনুরূপ হওয়ায় তদ্দেশীয় মৃদু আলোকেই এদেশীয় চিত্র উদ্ভাসিত হয়। আমাদের পুরাতন সূর্য্যালোক অবহেলালাঞ্ছিত তাহার সেই পুরাতন চিত্রপট আজিও পরিত্যাগ করে নাই। তাহা যেন কেবল এই প্রাচীন চিত্রফলক এবং যে বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার মধ্যে এই চিত্রকলা চিরদিন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে; তাহারই বিচিত্রাভ বর্ণসঙ্গমে একান্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

সেই জন্যই বোধ করি, এই সমস্ত দেশীয় বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার আবহাওয়ার

মধ্যেই এই চিত্রগুলি সমধিক উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইবার অবসর পায়। বিলাতী ফ্রেম ইহার সহিত কিছুতেই বেশ শোভন সঙ্গত হয় না। এবং পণ্যশালাবৎ অগণ্য বস্তু-বিস্তারবহুল টুকিটাকিকণ্টকিত আধুনিক'অভ্যর্থনাগৃহে বিলাতী শিক্ষিত অবহেলাসজ্জিত অসঙ্গতির মধ্যে সহস্রধা প্রতিহত হইয়া ইহার মর্ম্মনিহিত সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন একান্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে। এই শিল্পসৌন্দর্য্যের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘনায়মান য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু নিরর্থক বাহুল্যভার দূরে অপসারিত করিয়া দিতে হয়, যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে তাহা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে।

যে গৃহভিত্তিমূলে এই ছবিগুলি বসিবে, তাহার মর্ম্মরহর্ম্ম্যতলে, চিত্রিত প্রাসাদকক্ষে যেরূপ ঘননিবিড় কোমল বিচিত্রাভপুষ্পিত পারস্য গালিচার উপরে উষ্ণীষশোভিতশির সুদীর্ঘচাপকাননিবদ্ধবপু রাজসভাসদ্গণের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐরূপ পুরু খাপী কুসুমসুকুমারস্পর্শ নানা পুষ্পলতাবিচিত্র গালিচার উপরে কনককারুখচিত আমেদাবাদী কিংখাবের গেলাপমণ্ডিত গুটিকতক সুগঠিত গভীর আরাম-উপাধান বৈ আর বড় কিছু থাকিবে না। এবং লাক্ষাবিলেপচিত্রিত সহস্র বর্ণের আভানিস্যন্দী ছাদহর্ম্ম্যতলে দন্তিদন্ত-খচিত আদ্যন্তখোদিত চন্দনপাদপীঠোপরি জয়পুরী কারুকার্য্যময় সুবর্ণদীপাধানে সুগন্ধী স্নেহাভিষিক্ত বর্ত্তিকাশিখামুখ হইতে ধূপধূম্রগন্ধবৎ একপ্রকার লঘু স্নিগ্ধ সৌরভ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে মৃদু অনুকূল মোহ সঞ্চারিত করিতে থাকিবে।

চিত্রও যেরূপ, চতুষ্পার্শ্বিক সমস্তই তদনুরূপ হওয়াই সঙ্গত। গৃহের স্থাপত্যে আগ্রার সেই সুরম্য প্রস্তরসন্নিবেশ এবং অলিন্দের আলিসায় সেইরূপ জালিকাজের রচনা, কপাটে মহীসুরী খোদাই অথবা লক্ষ্ণৌয়ের কনকঝালরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, খিলানের খাঁজে খাঁজে বিলম্বিত রবিকিরণকীর্ণ কনকঝালরের ইন্দ্রজালমায়া, এবং উদ্যানপ্রান্তের দূর তোরণমণ্ডপ হইতে নহবতের শেষপ্রায় স্বর্ণরেশটুকু; এবং আমরা দর্শকের দল এই রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধমোহময়ী চিত্রশালিকায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সভ্য প্রাচ্য রীতি অনুসারে দ্বারদেশে পাদুকা উন্মোচনপূর্ব্বক ভব্য উষ্ণীষ চাপকান চূড়ীদার এবং তদুপরি বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুতল দিয়া বিলম্বিত সোনালী পাড়ের বায়ব উত্তরীয়-পরিশোভিত হইয়া গেলেই সমস্তটির সহিত সম্যক্ একীভূত হইয়া যাই।

কিন্তু বাঙ্গলার পাঠকসাধারণের নিকট এ প্রাচীন চিত্রকলা বোধ করি, সেরূপ সুপরিচিত নহে এবং এতদানুষঙ্গিক এই বর্ণ-গন্ধ-গীতি-সৌন্দর্য্যময়ী শোভা-সম্পদ্-সুখ-বিলাস-উৎসববিচিত্রা জীবনযাত্রাও নব্য শিক্ষাগুণে বিস্মৃতপ্রায়। সেই জন্য এ সকল অনেকের নিকট দুরূহ প্রহেলিকা প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কিছু দিন পশ্চিম দেশে যাপন করিয়াছেন এবং দিল্লীর শ্রেষ্ঠিচত্বরে অথবা

জয়পুরের কলাভবনে বিচিত্র দেশীয় শিল্পকলার মধ্যে এই মনোহারিণী চিত্রবিদ্যার পরিচয় গ্রহণের অবসর পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ভরসা করি, এই সকল কথা প্রহেলিকা বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। কিন্তু যাঁহাদের অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার নব্য রাজধানীর নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে বড় যায় না, তাঁহারা যদি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কলিকাতার রাজপথে পরেশনাথের যে উৎসবযাত্রা বাহির হয়, তৎপ্রতি একটু লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন এবং কল্পনার সাহায্যে সেই হয়গজরথধ্বজাসমন্বিত বিচিত্রবেশ রম্য দৃশ্যটুকুকে যথাযথ চিত্রপটে আরোপিত করিয়া তুলিতে পারেন, তবে তাঁহাদের মনে এই চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট হয়। তেমনি লাল নীল সোনালী বেগুনী শ্বেত পীত জরী জহরৎ ঝক্‌মক্ ঝিকিমিকি, অথচ এত ঔজ্জ্বল্যেও কেমন একটি প্রশান্ত কমনীয়তা—কোথাও কোনরূপ বর্ব্বর আতিশয্য চক্ষুকে পীড়া দেয় না বা মনকে ক্লিষ্ট করে না।

আমাদের সমালোচ্য চিত্রাবলীমধ্যে গুটিকতক চিত্র আছে, যাহা বিশেষরূপে এই পরেশনাথ যাত্রাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বোধ করি, কোন্ দেশের রাজকুমারীর সহিত কোথাকার রাজপুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, নগরের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া তাই ভারে ভারে থালে থালে বিবিধ ফল মূল মিষ্টান্ন ও নানাবিধ রাজভোগ্য সামগ্রী লইয়া বৃহতী রাজবাহিনী গীতবাদ্য সহকারে বরপক্ষীয় প্রাসাদ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। সঙ্গে পাটল শ্বেত কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণের চতুরশ্বযোজিত স্বর্ণরথোপরি বেগুনী চন্দ্রাতপতলে নহবতখানা। এবং পুরোভাগে, এই প্রাচ্য বিলাসকলা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতেই যেন, সারঙ্গী ও সেতারে, নূপুরে বলয়ে, বাহুবিক্ষেপে ও অবলীলা দেহভঙ্গীতে নিয়ত হিল্লোলিত ও মুখরিত কলাকুশলা নর্ত্তকীর মনোহারিণী লাস্যলীলা। দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ রক্ষিবর্গ—আসমানী গোলাপী শ্বেত পীত হরিদ্বর্ণের আজানুতলবিলম্বিত বসনোপরি সোনালী জরীর কটিবন্ধে নিবদ্ধ গাঢ় বেগুনী মখমলের ছোরার খাপ, স্কন্ধে স্বর্ণমণ্ডিত চারু দণ্ড, এবং তাম্বূলরাগরক্ত অধরে সচেতন পদমর্য্যাদার ঈষৎ স্মিত ভাব; এবং এই সুরঞ্জিত দৃশ্যপটে পার্শ্ববর্ত্তিনী নর্ত্তকীদিগের পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিঘূর্ণিত ও বিচ্ছুরিত জরীর পাড়ের ঢাকাই মসলিনের গিলাকরা পেশোয়াজের মধ্য হইতে ঈষদ্ব্যক্ত বিবিধ বর্ণের চূড়ীদার পায়জামা ও পিনদ্ধ কঞ্চুলিকানিবদ্ধ সঘনস্পন্দিত কনকযৌবনমোহ সঞ্চারিত হইয়া বসন্তমদোন্মত্ত বুল্‌বুলের গীতমুখরিত সিরাজপুরীর একখানি সুন্দর মরীচিকা রচনা করিয়াছে।

কিন্তু নিপুণ চিত্রকর এত ক্ষণ ধরিয়া শুধু একটি মূক দৃশ্যের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই—তাঁহার প্রত্যেক নরনারীই সচল সজীব সহৃদয় মানুষ। এবং

হস্ত্যশ্বরথোপকণ্ঠবিলম্বিত ঘণ্টিকারণিত ও চারুচরণতাড়িত নূপুরশিঞ্জিত দীর্ঘ পথ তাহারা মূক ও বধিরের মত চুপ করিয়া আসে নাই, কিন্তু বহু লঘু প্রণয়পরিহাসে, অপাঙ্গের বিলোল কৌতুককটাক্ষে, চিত্তহারী মধুর সম্ভাষণে ও সরস ভাষণপ্রসঙ্গে পরস্পরের চিত্তবিনোদন করতঃ পথশ্রম এককালে বিস্মৃত হইয়াছে। এবং চিত্রেও সেটুকু অতি সুন্দররূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে।—কোথায় এক শ্যামাঙ্গী পুষ্পপেলবা বিলাসিনী পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া ললাটের স্বেদবিন্দু মোচনার্থে কখন্ একবার পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, এবং সেই শুভ অবসরের প্রলোভনটুকু সম্বরণ করিতে না পারিয়া এক চঞ্চলচিত্ত তরুণ মাহুত দূর হস্তিপৃষ্ঠ হইতেই বাহবাসূচক একটি সস্মিত সেলাম নিবেদনে নিজ মনো-বেদনা জ্ঞাপন করিল, চিত্রকরের দৃষ্টি সেটুকও অতিক্রম করে নাই। নহবতখানায় সানায়ে ফুৎকারমাত্র নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনা বাদক একদৃষ্টে সম্মুখের নৃত্যকলাকৌশল উপভোগ করিতেছিল, সেই নিবিষ্ট দৃষ্টিটুকু চিত্রকর নিঃশব্দে আপন চিত্রপটে হরণ করিয়া আনিলেন। যে খঞ্জননয়নার উৎসুক দৃষ্টি বোধ করি কোন পরিচিত প্রিয়মুখ সন্দর্শনের আশায়, ইতস্ততঃ কিছু ঘন ঘন সঞ্চালিত হইতেছিল, তাহার সুর্মাঙ্কিত কৃষ্ণ ভ্রূযুগের মনোজয়ী কুঞ্চনবিলাস এখানে তুলিকার মোহস্পর্শে ধরা দিয়াছে। এবং এই-সকলগুলিতেই প্রাচ্য মুখভাবের নানাবিধ ভঙ্গী ব্যক্ত হইয়া চিত্রকলার মনোহারিতা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে।

আর একটি চিত্রে এই রাজকীয় বিবাহের বরযাত্রা বাহির হইয়াছে—রাজকীয় বরযাত্রা যেমন হইয়া থাকে, মশালে দীপালোকে আতসবাজীতে রাত্রি উজ্জ্বল এবং সহস্র উন্মুক্ত কিরীচ ও তরবারির বিচিত্র আস্ফালনে বিচ্ছুরিত হইয়া সে ঔজ্জ্বল্য দিকে দিকে ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সুগ্রীব শ্বেত অশ্বোপরি বরবেশ পরিয়া তরুণ রাজকুমার। দুই পার্শ্বে দুই জন উষ্ণীষধারী পদাতিক ময়ূরপুচ্ছের চামর ব্যজন করিতেছে এবং পশ্চাতে শুভ্রবেশ পরিচর বৃহৎ সুবর্ণ-তালবৃন্ত সঞ্চালন করতঃ রাজমর্য্যাদারক্ষণে নিযুক্ত আছে। সম্মুখে পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহীর দল এবং তৎসহ অশ্বপৃষ্ঠে ও পদব্রজে লাল নীল গোলাপী ক্ষীরী ও ফলসাই রঙ্গের বেশপরিহিত তিন চারি দল বাদক। পুরোভাগে কনকমঙ্গলঘটশ্রেণীর দক্ষিণে ও বামে চারু চতুর্দ্দোলোপরি ললিত কলিত নৃত্যকলায় শুভযাত্রানুসূচী নটীগণ ও অগ্রপশ্চাৎ রাজকীয় ধ্বজাদণ্ড-চামরপ্রবাহের কনকহিল্লোল। এবং পথের উভয় পার্শ্বে স্থাপিত আতস-উৎস হইতে আগ্নেয় কনকচম্পকরাশি উচ্ছ্বসিত ও বর্ষিত হইয়া নীল নৈশাকাশতলে ধূমে আলোকে এক অভিনব তাম্রকপিশ গোধূলি-আভা সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছে। এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল রম্যালোকে এই বিচিত্রবর্ণ বরযাত্রাভিযান যেন একখানি নাট্যশালার দৃশ্যপট—ইহার

সকলই বর্ণে আভায় সৌন্দর্য্যে মোহে রমণীয় এবং সকলই নাট্যদৃশ্যবৎ অভিনব লাবণ্যে উদ্ভাসিত।

নাট্যকলার সহিত ইহার কলাগত ঐক্যও যথেষ্ট। রঙ্গমঞ্চে যেমন বাস্তবকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই অভিনেত্রীবর্গের স্বাভাবিক মুখশ্রী তুলিকাস্পর্শে সমধিক অভিব্যক্ত করিয়া তোলা আবশ্যক হয়—নহিলে আমাদের মনে সেরূপ অনুকূল মোহ উৎপাদন করে না, চিত্রপটেও সেইরূপ বাহিরের বস্তুকে রেখায় ও বর্ণে হুবহু কাপি না করিয়া তাহার মর্ম্মনিহিত ভাব অনুসরণে অনেক সময় শিল্পীর মনঃকল্পিত শোভন সৌন্দর্য্যের যথোচিত প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। যে বৃহৎ আকাশপটে প্রকৃতির দৃশ্যাবলী চিত্রার্পিত হইয়াছে, তাহা ত আর আমাদের সম্যক্ আয়ত্ত নহে এবং ক্ষুদ্র চিত্রপটের সীমামধ্যে তাহাকে অক্ষুণ্ণ সন্নদ্ধ করিয়া তোলাও অসম্ভব। সুতরাং আমাদের স্বরচিত জমির উপরে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণ চেষ্টা যে অনেক সময় অসঙ্গত ও ব্যর্থ হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে আর বিচিত্র কি! সমস্ত চতুষ্পার্শ্বের সহিত ত একটা ঐক্য চাহি। প্রকৃতিতে কোন বস্তু আমাদের মনে কেবল নিজ বর্ণ ও রেখামাত্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পায় না, কিন্তু যে বিস্তীর্ণ পটের উপরে তাহা সুলিখিত, সেই পটভূমির বর্ণদৃশ্য সৌন্দর্য্য ও আনুষঙ্গিক নানা ভাবের সহিত সঙ্গত হইয়া একটি অখণ্ড সমগ্রতায় প্রতিভাত হয়। ভাবের এই অখণ্ড সমগ্রতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিতেই শিল্পীকে ক্ষেত্র বুঝিয়া নিজ প্রতিভা পরিচালনা করিতে হয়। সেই জন্যই নিপুণ চিত্রকরেরা ছোটখাট সকল খুঁটিনাটিতে প্রকৃতির বাহ্ রেখা ও বর্ণবিন্যাসটুকু মাত্র নকল না করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত মর্ম্মানুসারে নিজ নিজ রচনায় বর্ণবিন্যাস করিয়া থাকেন। এবং তাহাতেই আমাদের মনে সেই মোহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন—যাহাতে সমগ্র চিত্রখানি তাহার স্বাভাবিক সঙ্গতিতে আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এই জন্যই আমাদের চিত্রপটে অশ্বের আসমানী ও হরিদ্বর্ণ, প্রকৃতির অনুকরণ না হইয়াও বেশ সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইয়াছে। এবং জনতার মুখমণ্ডল বিচিত্র বর্ণাভাসে আনুপূর্ব্বিক স্বভাবানুযায়ী না হইয়াই সমধিক শোভা পাইয়াছে। প্রাচ্য চিত্রকর সমস্ত পটটির উপরে যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল রমণীয় আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই চিত্রখানি মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, এই আলোকসন্নিবেশের উপরে বর্ণসঙ্গমের স্ফূর্ত্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এবং অনেক সময় এই আলোকবিক্ষেপের হেরফেরে কোথাও কৃত্রিমতাও সুশোভন হইয়া উঠে, কোথাও স্বাভাবিকতাও নেত্রপীড়া উৎপাদন করে।

এই প্রয়োগবিজ্ঞানে অমোঘ পটুত্বই আমাদের ভারতবর্ষীয় শিল্পীর প্রধান গৌরব। এমন কি, এই অশিক্ষিতপটুত্বে শিক্ষিত পাশ্চাত্য রুচি যেখানে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেখানেই তাহার বর্ব্বর স্পর্শে শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অশিল্পী বর্ব্বরেরা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দুইটা শব্দ ও তাহার আভিধানিক অর্থ শিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র, প্রয়োগবিষয়ে তাহাদের ধারণা বালকেরও অধম। তাহারা গালিচার কৃত্রিম পুষ্পকে সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চাহে এবং আমাদের চিরন্তন শালের পাড়ে নেত্রঝলসী বর্ণে বিলাতী আদর্শানুযায়ী স্বাভাবিক প্যাটার্ণ সূচিত করিবার প্রয়াস পায়। ফলে, প্যাটার্ণ যতই স্বভাবানুরূপ হইয়া আসে, শিল্পের মনোহারিতা ততই দূর হইতে থাকে।

চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যে কারণে গালিচার জমিতে ও শালের সূচি-কার্য্যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি নিষ্ফল হয়, ঠিক সেই কারণেই আমাদের চিত্রশিল্পে নব্যতন্ত্রের স্বাভাবিকতা স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠে না। গৃহভিত্তিমূলে যে চিত্র অঙ্কিত হয়, ক্ষুদ্র গৃহাকাশের প্রস্তরনিবদ্ধ চতুষ্পার্শ্বে এবং স্থাপত্যের কৃত্রিম গঠনপ্রণালী ও সহস্র কারুকার্য্যের সহিত তাহার সঙ্গতি সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। এবং এই সঙ্গতি-রক্ষার্থেই খুঁটিনাটির প্রতি দেশীয় চিত্রকরের দৃষ্টি এরূপ তীক্ষ্ণ। গৃহের প্রাচীরবেষ্টনমধ্যে কি রেখাবর্ণ-সমাবেশ সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন হয়, আমাদের শিল্পীরা তাহার মর্ম্মটুকু আশ্চর্য্য আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি, আমাদের চিত্রকলা স্থাপত্যের একটি প্রধান অনুরঞ্জনী অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

নব্য পাশ্চাত্য চিত্রলেখার প্রণালীই কিছু স্বতন্ত্র। শিল্পী সেখানে যে উচ্চভূমিপরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের দৃশ্যপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে রেখাবর্ণের প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বৃহৎ প্রকৃতি সেখান হইতে সমগ্রভাবে ভালরূপ চোখে পড়ে। এই জন্য, ঐ সকল ছবি দেখিতে গেলেও একটু তফাতে দাঁড়াইতে হয়, যাহাতে খুঁটিনাটি দৃষ্টিপথে না পড়িয়া সমস্ত চিত্রখানি এক দৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমরা সচরাচর যে ভাবে দেয়ালে ছবি টাঙ্গাইয়া গৃহকে সজ্জিত করি, তাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য্য যে সম্যক্ বিকশিত হইবার অবসর পায়, এমন বোধ হয় না। তাহার দূরানুসূচিতা অনেক সময় গৃহভিত্তির চতুঃসীমামধ্যে প্রতিহত হইতে থাকে এবং বাহিরের মুক্তাকাশের ছায়ালোকও বোধ করি, বদ্ধ গৃহে কথঞ্চিৎ অসঙ্গত হইয়া উঠে।

আমাদের চিত্রশিল্প দূর হইতে কেবল মনোহর বর্ণসঙ্গম মাত্র এবং নিকটে কারু-কার্য্যে চিত্তহারী। গৃহের মধ্যে লোকে অনেক সময়ে কাছে আসিয়া দেখিবে, ইহা আশা করাই যায়। সুতরাং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের এখানে বিশেষ সার্থকতা আছে।

কিন্তু এ কারুকার্য্য কেবলই জ্যামিতিক রেখাবিন্যাস মাত্র নহে, এবং বারাণসী শাড়ী বা কাশ্মীরী শালের সূচিকার্য্যের সহিত কলাগত ঐক্য বা সাদৃশ্য থাকিলেও নরনারীর বিচিত্র মুখভঙ্গী ও হাবভাবে ইহাতে যে একটি সরস সজীবতা সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে।

এবং ভারতবর্ষীয় চিত্রকরের রচনা এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার্হ। সভামধ্যেই কি, অন্তঃপুরেই কি, উৎসবেই কি, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বাবস্থাতেই তাহার রচিত চরিত্রগুলির মুখে চক্ষে ভাবে ভঙ্গীতে একটু বিশেষ রকম আছে।—আমাদের আলোচ্য চিত্রাবলী-মধ্যে বিবাহযাত্রার পরেই একখানি অন্তঃপুরের চিত্র আছে—রাজার অন্তঃপুর যেরূপ হইতে হয়, আগ্রার বাদশাহী বেগমমহলের অনুরূপ বিচিত্র কারুচিত্রিত শুভ্র মর্ম্মরহর্ম্ম্য এবং সুদীর্ঘ প্রাচীর নীরন্ধ্র হিমমর্ম্মর শুভ্রতায় চিত্রপটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি প্রসারিত এই অন্তঃপুরকক্ষদ্বারে কিংখাবের সুবর্ণপুষ্পিত পর্দ্দার বাহিরে ঈষৎ ধূমায়িত ফলসাহী জমির উপরে স্বর্ণরেণুসিঞ্চিত বিচিত্রবেশী সপ্ত রমণী ও সুগঠনা শ্যামাঙ্গী বীণাবাদিনীর চিত্র। সকলেরই একটু ছলছল ভাব, এবং বীণাবাদিনী সম্মুখে অগ্রসর হইতে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়াছেন। তাঁহার ঘনপল্লবিত আবেশময় টানা চোখে একটি প্রশান্ত বিষাদানম্র স্থৈর্য্য এবং তনু অধর রেখাপাতে একটুকু সসম্ভ্রম দৃঢ়তা। বেশভূষার বিশেষ আতিশয্য বড নাই, অথচ বেশ একটু পারিপাট্য আছে। সোনালী রঙের ঘাগরার উপর গোলাপী উত্তরীয়খানি স্তনপরিসরটুকু মাত্র আচ্ছাদন করিয়া দুই স্কন্ধদেশ হইতে পশ্চাদ্দেশে বিলম্বিত হইয়া পডিয়াছে, কর্ণে দুইটি মরকতমণির দুল, কণ্ঠে সাতনলীর মত মতির মালা, বাহুতে তাবিজ, প্রকোষ্ঠে কনককঙ্কণ, এবং কটিদেশে প্রাচ্য কবিদিগের চিরপ্রিয় মেখলা নাভিনিম্ন হইতে দুইখানি চন্দ্রকলার মত নামিয়া আসিয়া মধ্যভাগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। একটি অল্পবয়স্কা বালা করজোড়ে বীণাবাদিনীর নিকট কি মিনতি করিতেছে। সব শুদ্ধ, দৃশ্যটিতে বিষাদে বিলাসে, কঠিন মর্ম্মর দেয়ালে ও মানবমুখে করুণ মিনতিতে এমন একটি সুন্দর মোহ সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে! এই একটি নারীসমাগমের রহস্যে আমাদের সমস্ত মন একান্ত পরিপ্লুত হইয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধি ইহার অন্তস্তল অবধি পঁহুছে না। শুধু মনের মধ্যে কেমন একটি অনুরণন থাকিয়া যায়।

অন্তঃপুরের আর একখানি চিত্রে চিত্রকর আর একটি দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া তুলিয়াছেন। তরুণী তন্বঙ্গী সুবর্ণপালঙ্কে উপাধানবিন্যস্ত বামকরতলে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধালসাবেশে সর্ব্বাঙ্গ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন; নিম্ন অঙ্গে জরীর ফুলকাটা রক্তবর্ণ চীনাংশুকের পায়জামা, এবং উত্তরাঙ্গে একখানি লঘু সূক্ষ্মাম্বর ঈষন্নালিমুখ আতুঙ্গ

লাবণ্যরাশি সমুদ্ভাসিত করিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। শিয়রদেশে সুন্দরী পরী পক্ষ উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন এবং পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তিনটি পরী পরিচারিকা—বেশভূষা কতকটা পুরুষেরই মত, আসমানী, অলক্তক ও সবুজ রঙের চাপকান এবং তদুপরি সোনালী পাড়ের শুভ্র, ম্লানস্বর্ণ ও রক্তবর্ণের তিনটি কটিবন্ধ। ঘরদুয়ারগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন—কোথাও আগ্রার সুন্দর জালিকাজ, কোথাও মর্ম্মর-প্রস্তরের সুগঠিত স্তম্ভ, কপাটে মৈনপুরী তারকষির সোনালী কারুকার্য্য, হর্ম্ম্যতলে অতি সূক্ষ্ম নীল ও অলক্তকরাগের পুষ্পখচিত শুভ্র গালিচা। অনতিদূরে পশ্চাতে একটি নিবিড় উদ্যানের ঘনপল্লবিত তরুশিরশ্রেণী দেখা যায়, এবং সম্মুখে রজতমুকুলিত চারুপুষ্পবাটিকা। সকলই এখানে, কিন্তু যেন কেমন লঘু ও মায়াময়। এই কঠিন পাষাণবন্ধও মনে হয়, যেন আরব্যোপন্যাসের এক রাত্রির বিলাসকাহিনী মাত্র।

কিন্তু এ কি! আবার সেই বীণাবাদিনী—মৃদু চন্দ্রালোকে এক নিবিড় বনান্তে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি সমাসীন হইয়া অনন্যমনে বীণা বাজাইতেছেন, সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া এক সুসজ্জিত পুরুষ, দুই অলৌকিক পক্ষে তাহার অমানুষ বংশ নির্দ্দেশ করিতেছে এবং স্বর্ণমুকুটে পদমর্য্যাদাও যে সূচিত না করিতেছে, এমন বলা যায় না। দূরে বৃক্ষান্তরালান্ধকারে চারিটি লাঙ্গুলী বিকটমূর্ত্তি একটি স্বর্ণ আসন নামাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।—এই দলপতি এবং দলবলকে আমরা বহু পূর্ব্বে, আমাদের চিত্রাবলীর সর্ব্বপ্রথম পৃষ্ঠায়, এক পার্ব্বত্য উপত্যকাভূমিতে ছাড়িয়া আসিয়াছি। এই সুসজ্জিত পুরুষবর সে দিন ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া দৈত্যদিগকে কি আদেশ সংবিধানার্থে দক্ষিণ তর্জ্জনী নির্দ্দেশপূর্ব্বক শাসন করিতেছিলেন, এবং পর্ব্বতের উপরিদেশে একটি বৃহল্লাঙ্গুল দৈত্য বৃহৎ চুপড়ির মধ্য হইতে একটি তরুণ মানবকে বাহির করিয়া বহিয়া আনিতেছিল।—তাহার পর কত চিত্র গিয়াছে—নূতন নূতন চিত্রে নব নব দিনের ঘটনা। কোথাও শাহেনশাহ বাদ্‌শাহ মন্ত্রিবর্গপরিবৃত হইয়া দরবারগৃহে সমাসীন—খাতাপত্র লইয়া মুন্সীর দল বসিয়া গিয়াছে এবং চামরধারী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্বর্ণ-চামর ব্যজন করিতেছে; অন্যত্র আমদরবারের মুক্তাঝালরখচিত চন্দ্রাতপতলে বৈদেশিক রাজদূত কুর্নিশান্তে বাদ্‌শাহ সমীপে এক ছড়া মহামূল্য রত্নহার নজর নিবেদন করিতেছে; কোথাও তরুণ রাজকুমার কোন্ রাজকন্যার উদ্দেশে সদলবলে যাত্রা করিয়াছেন—সে যাত্রাদৃশ্য কাদম্বরীর রাজপুত্রের পাঠসমাপনান্তে গৃহাগমনবর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়; অন্যত্র সেই অশ্রুছলছল সপ্ত নারী ও চূড়ানিবদ্ধকেশপাশ বীণাবাদিনী; চিত্রান্তরে অশ্রুসজল তরুণ রাজা এবং লেখনী হস্তে চিন্তান্বিত বৃদ্ধ মন্ত্রী; ক্রমে সেই পরীসমাগত অন্তঃপুরকক্ষ, সেই শুভ্র সুন্দর মায়াপুরী; তাহার পর নূতন দৃশ্যে আবার

সেই বীণাবাদিনী, সেই সুপক্ষ পুরুষবর, সেই লাঙ্গুলী দৈত্যদল। মনে হয়, যেন সকল-গুলির মধ্যে কোথায় একটি অন্তঃপ্রবাহিত যোগসূত্র আছে, যেন সেই সমস্ত লোক জন দৃশ্য সমস্তটি মিলিয়া একখানি মহানাটকের উপসংহার ঘনাইয়া আনিতেছে। কিন্তু কে জানে, কিছুই ধরা দেয় না, শুধু সংশয় এবং অনুমান, চিন্তা এবং কল্পনা, রহস্য হইতে রহস্যান্তরে নিয়ত অবগাহন।

কিন্তু এ উৎসব কিসের? কিংখাবের বরশয্যোপরি রাজকুমার উপবিষ্ট, বাম পার্শ্বে সেই মুকুটধারী দৈত্যপতি, গালিচার উপরে শ্রেণীবদ্ধ সভাসদ্‌গণ আসীন, এবং সম্মুখে বিচিত্র ভঙ্গী সহকারে নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। চিত্রকর এই দৃশ্যপটে নর্ত্তকীর সারেঙ্গী ও তব্‌লাওয়ালার যে মুখভঙ্গীটুকু চিত্রিত করিয়াছেন, কেবল ঐটুকুতেই তাঁহার নিপুণ রসগ্রাহিতা আশ্চর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর প্রত্যেকের মুখে তিনি এমন এক একটি স্বাভাবিক সহজ অথচ স্বতন্ত্র ভাব বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, এই দশাঙ্গুলিপরিমিত স্থানমধ্যে দর্শকের চিত্ত বহু ক্ষণ যাপন করিয়াও কিছু মাত্র ক্লিষ্ট হয় না।

চন্দ্রাতপের উপরে একটি পারসী বয়েৎ লেখা। চিত্রখানি এই লিপিরই অনুরঞ্জিনী। ইংরাজী লিপিরঞ্জনী চিত্রকলার সহিত যাঁহারা পরিচিত, ইহার রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বলিবার বিশেষ কিছু নাই; কেবল, ভারতবর্ষীয় চিত্রকরের বর্ণসমাবেশনৈপুণ্যে ও পারসী অক্ষরের সহজ শোভায় ইহা সমধিক চিত্তহারী হইয়া উঠিয়াছে। এত বিচিত্র সূক্ষ্ম বর্ণবিন্যাস, এত অসংখ্য রঙের সমাবেশ ও তাহার এরূপ মনোহর সামঞ্জস্যসাধন অন্যত্র এরূপ সুলভ নহে। বিলাতী লিপিরঞ্জনে অনেক স্থলে কেবল লাল এবং নীলেরই প্রাচুর্য্য এবং তাহার উপর স্বর্ণরেণুসিঞ্চিত কারুকার্য্য, কিন্তু রেখায় রেখায় এরূপ নব নব বর্ণ এবং আভার অপূর্ব্ব মেলন সেখানে অতি বিরলদৃশ্য। এখানে গালিচার পাড়ে, বরাসনের কারুকার্য্যে, সম্মুখের দীপাধানের ডালে ডালে, এমন কি, প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকাশিখামুখে পর্য্যন্ত রঙের কারুকার্য্য অতি বিচিত্র। এবং লাল নীল সোনালী বেগুনী আস্‌মানী ফলসাহী গোলাপী ক্ষীরী আল্‌তাই ধূপছায়া ধূসর কপিশ, সকল বর্ণেরই এখানে প্রাদুর্ভাব, দুর্লভ কেবল রাণীগঞ্জের কৃষ্ণতমিস্র অঞ্জনগঞ্জনা। এই এতগুলি চিত্রের পর গুটিকতক পারসী অক্ষর ব্যতীত কালো রঙের বড় কিছু ত মনে পড়িতেছে না; এবং তাহাও শ্বেত ও সোনালী চতুঃসীমার মধ্যে উজ্জ্বল হইয়াই উঠিয়াছে বৈ অন্ধকার গাঢ় করে নাই।

কিন্তু স্থান সঙ্কীর্ণ এবং পাঠকগণের ধৈর্য্যেরও সীমা নিরবধি নহে; ইহার উপরে চিত্রের যে সৌন্দর্য্য, তাহা আমার এই জড় ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব; সুতরাং সুদীর্ঘ

বর্ণনায় ছেদ দিবার যথেষ্ট সময় হইয়াছে।—এখনও দৃশ্য অনেকগুলি। অন্তঃপুরের উদ্যানবাটিকায় ষোড়শী তরুণী বহু সখীসমাগমের মধ্যে বীণাবাদিনীর আবার আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে বীণা নাই, শুধু একটি সস্মিত সেলামে সমাগত যুবতিবৃন্দকে তিনি সাদর অভিবাদন জানাইতেছেন এবং তরুণীরা থালে থালে ভারে ভারে বহু উপঢৌকন লইয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করিতেছেন।—আবার রাজসভা, নজর নিবেদন; বৃক্ষবাটিকায় পরিচারিকা ও সখী সহ বিষাদানতমুখ রাজ-অন্তঃপুরিকার নিভৃত অবস্থান; পরদৃশ্যে বাষ্পগদগদ রাজা রাণী এবং বীণাবাদিনী ও দৈত্যপতি; সহস্র ধারাযন্ত্রনিঃসৃত জলকণাস্নিগ্ধ বেগমমহলের লাস্যময়ী বিলাসকলা; রক্তবস্ত্রের আচ্ছাদনতলে তরুণবয়স বরকন্যার প্রথম শুভদৃষ্টিবিনিময়; বধূ সহ রাজপুত্রের মাতৃসমক্ষে আগমন; আবার সেই বীণাবাদিনী ও দৈত্যপতিসমাগম—শুভ্র মর্ম্মরহর্ম্ম্যতলে বীণাখানি এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে এবং সুবর্ণথালের উপরে স্ফাটিক পানপাত্র ও সরকভাণ্ড সুসজ্জিত, পানভূমির সিন্দূররক্ত অনতিউচ্চ জালিকাটা প্রাচীরবাহিরে দৈত্য দানবের দল মনের উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। তাহার পর মহোৎসবের মত্ততায় ও প্রিয়সমাগমের পরমোৎসাহে দিল্লীর এই প্রাচীন চিত্রাবলীর উপসংহার। এবং যবনিকা পতনের পর সমগ্র নাট্যখানি মনের মধ্যে যেরূপ দৃশ্যে আলোকে রূপে গীতে সৌন্দর্য্যে শৃঙ্গারে বর্ণে অভিনয়ে ঘনাইয়া আসিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এই চিত্রকলাও সেইরূপ আমাদের মন-অন্তঃপুরে তাহার ভাবে ভঙ্গীতে বর্ণে লাবণ্যে মুখশ্রী ও গঠনপারিপাট্যের সমাবেশে একটি সুন্দর মায়ালোকমোহে রমণীয় হইয়া আসে। মনে হয়, যেন পুরাতন ভারতবর্ষের কোন্ কলাভবনপ্রদর্শনী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, যেখানে কালিদাসের কাব্য, কাদম্বরীর বর্ণনা, তাজমহলের স্থাপত্য, দিল্লীর অন্তঃপুরের প্রসাধন-বিলাস, কাশ্মীরী শাল, পারস্য গালিচা, ঢাকাই মসলিন, কটকী রূপার কাজ, দক্ষিণের চন্দনখোদাই শিল্প, এই সমস্ত একত্র সুরক্ষিত হইয়াছে এবং সকলগুলির মধ্য হইতে ভারতবর্ষের কারুকুশলা প্রতিভা বিকশিত হইয়া কোথায় একটি মনোহর ঐক্য সূচিত করিতেছে। এই ঐক্যসূত্রেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা চির-সজীব এবং ইহাতেই আমাদের পুরাতন কলাভবন এত চিত্তহারী।

'ভারতী', বৈশাখ ১৩০৫

কথাটা শুনিতে পরিহাসের মত বোধ হয়, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ভারতবর্ষ অপেক্ষা স্বল্পপরিচিত দেশ বাস্তবিকই বিরল। জন্মাবধি ইংলণ্ডের নগর পল্লী, পথ ঘাট, সমাজ শিল্প, কলকারখানা, জল বায়ু, মায় খানা ডোবা, গোষ্ঠ ও গোচারণ ভূমি, যেখানে যাহা আছে, তাহার সহিত সুপরিচিত হইতে এবং তদুপরি সর্ব্বাপেক্ষা অনাবশ্যক কতকগুলি ধারাবাহিক প্রজাপীড়কের কঠিন নামাবলী ও তৎসংযুক্ত রক্তাক্ত কীর্ত্তিকলাপ আয়ত্ত করিতেই আমাদের এত কাল কাটিয়া যায় যে, স্বদেশ সম্বন্ধে রেলওয়ে গাইডের সুলভ মানচিত্রের ইংরাজী অক্ষরসন্নদ্ধ গুটিকতক বিন্দুর অতিরিক্ত আর বড় কিছু ধারণা করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে না। ভারতবর্ষ আমাদের মানসপটে যেন একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমির মত প্রতিভাত হয়—তাহার মধ্যে মধ্যে কেবল লৌহবর্ত্মসন্নিবদ্ধ রেলওয়ে-ষ্টেশন ও লালপাগড়িচ্ছটাদীপ্ত পুলিশের থানা, ইংরাজের দূরে দূরে অবিচ্ছিন্ন শৈলশৃঙ্গের নিভৃত বিলাসভবন ও প্রমোদোপবনগুলির সান্নিকট্য ও শান্তিসংরক্ষণে নিযুক্ত। এতদ্ভিন্ন, দেশ সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ কোন ধারণা নাই বলিলেই হয়—কৃষি শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, আর্থিক সমস্যা ও প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতি তত্ত্ব ত দূরের কথা, ঘরের কাছে দ্বারের সম্মুখে কোথায় কি আছে না আছে, তাহারই আমরা সন্ধান জানি না।

কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপরেও এ সকল বিষয়ে ধারণা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। দেশের শিল্প বাণিজ্য ও এতৎসংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার সন্ধানসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের কাহারও জ্ঞানতঃ কোনরূপ সংশয় নাই, কিন্তু বাহিরের সহিত যে সম্পর্ক ও সংঘর্ষের ফলে এ সকল বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে মনের বিশেষ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য স্বতঃ উদ্দীপিত হয়, আমাদের জীবনযাত্রায় শ্রেষ্ঠিজনসুলভ সে উত্তেজনা বড় লক্ষিত হয় না। আমরা হয় জমিদার, অথবা রাজকর্ম্মচারী, নয় ত ব্যবহারজীবী—সুতরাং আমাদের মনে ভারতবর্ষ প্রথমেই যে তাহার রেলপথ-সন্নিবদ্ধ কোতোয়ালীপরম্পরা লইয়া উপস্থিত হয়, ইহাতে আর বিচিত্র কি! এই কোতোয়ালী ও আদালতের নিত্য-সংঘর্ষেই আইনে ও শাসনতন্ত্রঘটিত বিষয়ে ব্যুৎপত্তির সহিত আমাদের একটু আন্তরিক স্পৃহাও জন্মিয়াছে। এবং দেশের কল্যাণের জন্য সুনিয়ত শাসনতন্ত্র ও শুভসংকল্প রাজবিধির বিশেষ আবশ্যকতা ও কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া ইহার সুব্যবস্থা সম্পাদনে আমাদের অনেকের আন্তরিক চেষ্টা হইয়াছে।

বিষয়বিশেষে এই আন্তরিক অনুরাগ ও উদ্যোগী অভিনিবেশ কতকটা যেমন অন্তরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, বাহিরের নানা অবস্থা ও ঘটনাবলীর উপরেও তেমনি কতক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। এক অনুকূল অবস্থায় দেশের আইন এবং শাসনতন্ত্র আমাদের মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আর এক অনুকূল অবস্থায় দেশের সহিত—দেশের যথার্থ অবস্থা ও অভাবের সহিত আমাদের সমুচিত পরিচয় সংসাধনের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আফিস এবং আদালত যে দুইটি আশ্রয়, এ বিষয়ে আমাদের প্রধান বাধা ছিল, স্থানসঙ্কীর্ণতাবশতঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাস সত্ত্বেও অনেকের পক্ষে ক্রমেই দুর্গম হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং রাজসরকারের উন্মুক্ত ধ্রুব অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া অনেক শিক্ষিত মনকে অগত্যা নূতন নূতন পথে নিজের ভাগ্য ও দেশের শুভ সূচিত করিতে হইতেছে।

এবং এই মনের গতি সহজেই যে দেশীয় শিল্প ও পণ্যজাতের পথ অবলম্বন করিতেছে, স্বল্পকাল মধ্যে দেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পসভা ও দেশীয় দ্রব্যজাত প্রদর্শনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্যভবনগুলিই তাহা সপ্রমাণ করে। দাক্ষিণাত্য ও পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বদেশবস্তুব্যবহার প্রচলনার্থে যে সকল সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে চাহি না—ঐ সকল দেশের নিরভিমান নির্ব্বাক্ কর্ম্মনিষ্ঠ দেশানুরাগ সর্ব্বজনবিদিত—কিন্তু সাহেবিয়ানার আদি তীর্থ এই বঙ্গদেশে কয় বৎসরের মধ্যে এতদনুকূলে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহুযত্নসিঞ্চিত "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এসোসিয়েশন", চুঁচুড়ার নিঃশব্দকর্ম্মরত "স্বদেশী এজেন্সি", এবং স্বল্পদিনমাত্র কতিপয় বন্ধুজনের যত্নে স্থাপিত "স্বদেশী সভা", এবং তাহারই সহায়তা জন্য প্রতিষ্ঠিত "স্বদেশী ভাণ্ডার", এই সকলগুলিতেই এই পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। এতদ্ভিন্ন, রাজধানী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু দূরে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে এতদনুরূপ অনামিকা চেষ্টাও যে হইতেছে, এতৎসংবাদ শ্রবণে এই মনোভাবের ব্যাপকতা সম্বন্ধে সংশয় অনেক পরিমাণে অপনীত হয়।

তিন বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের এরূপ অবস্থা ছিল—এবং এখনও যে তদবস্থা আমরা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারিয়াছি, সাহসপূর্ব্বক এমন বলা যায় না—যে, অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থের উপরেও একটা বিলাতী ছাপ পড়িলে আমাদের চিত্তোদ্বেগ শান্ত রাখা কঠিন হইয়া উঠিত এবং তদভাবে কোন ভাল জিনিস দেখিলেও কুঞ্চিত নাসিকায় তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে সঙ্কোচ হইত না। যে বোম্বাই কলের সুতা হইতে প্রস্তুত কাপড় পরিয়া ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত জনেরা গৌরব অনুভব করিতে উৎসুক হইয়াছেন,

তিন বৎসর পূর্ব্বে কোন একটি দেশীয় কোম্পানি বিলাতীর পরিবর্ত্তে বোম্বাই হইতে ঐ কাপড় আনাইয়া কেবলমাত্র দেশী ছাপের গুণে, উপযুক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেবল দেশী জিনিস বিক্রয়ের জন্য প্রয়াগে কাশীধামে ও কলিকাতায় কিছু দিন পূর্ব্বে কয়খানি দোকান খোলা হয়—অনাদরের উপেক্ষায় বহু ক্ষতি স্বীকারের পর বিলাতী লংক্লথ ও ছিটের জামা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া কোন কোনটিকে গণপতির বিমুখতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। আজ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অনেকে দেশী জিনিস চাহিতেছেন এবং সকল সময় আবশ্যকমত যথেষ্ট পাইয়া উঠিতেছেন না। শুভ অবসর এমনি করিয়াই নিঃশব্দপদসঞ্চারে সমাগত হয়।

নিজের দেশের সহিত সুপরিচিত হওয়া সম্বন্ধে আমাদের বাস্তবিকই কেমন একটু ঔদাসীন্য ছিল। স্বদেশ সম্বন্ধে যে পরিশ্রম করিয়া জানিবার কিছু থাকিতে পারে, এ কথাটা অনেক সময় সহজে মনে আসে না। বিলাতীর পরিবর্ত্তে যথাসম্ভব দেশী জিনিস ব্যবহার সংকল্প সুসিদ্ধ করিতে কত অজ্ঞাত অশ্রুতপূর্ব্ব প্রান্ত হইতে দ্রব্যজাত সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়, সুতরাং দেশের শিল্পজাতের কল্যাণসাধন চেষ্টায় তাহার যথার্থ অবস্থার সহিতও পরিচয় স্বতই সংঘটিত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ ক্রমে আমাদের মনে তাহার ধন ধান্যে, কৃষি শিল্প বাণিজ্যে, তাহার বক্ষতলনিহিত গুপ্ত যক্ষভাণ্ডারে ও বিধিদত্ত সহজ শোভাসম্পদে স্ফুটতর হইয়া উঠে। এবং এই অতুল সম্পদের দারুণ দুর্দ্দশা বিস্মৃত হইয়া কুক্কুরের মত পরপদলাঞ্ছিত হীন বিলাসে জীবন যাপন করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়।

কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইচ্ছাসত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে মনঃসংযোগপূর্ব্বক পরিহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাত পদে পদে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা সেই জন্য আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-গুলির মধ্যে যেগুলি এ দেশে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। এবং তৎসহ যে সকল দ্রব্য এ দেশে না পাওয়া গেলেও পরিহার করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা দেখা যায় না, তাহারও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিবার ইচ্ছা আছে। এই নীরস বিষয়ের অবতারণা সাহিত্যামোদী অধিকাংশ পাঠকগণের পক্ষে কিছু অপ্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে মধ্যে মধ্যে এরূপ সাহিত্যরসহীন প্রসঙ্গের অবতারণা অনিবার্য্য জানিয়া, তাঁহারা ভরসা করি, আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। এবং সুবিধা ও অবসরমত একটু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক নিজ নিজ জেলায় যত প্রকার দেশী জিনিস প্রস্তুত হয়, তাহার ঠিকানা, কারিকরের নাম ধাম, মূল্য, পরিমাণ, কলিকাতায় পাঠাইবার উপায় ও খরচা প্রভৃতি সম্বন্ধে

তালিকা এবং যদি সম্ভব হয় ত নমুনাদি পাঠাইয়া আনুকূল্য করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

এক্ষণে দেশীয় দ্রব্যজাতের তালিকা সুরু করিবার পূর্ব্বে আমাদের জন্য বিলাত হইতে নিত্য যে সকল দ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। এ প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমেই কাপড়ের উপরে দৃষ্টি পড়ে—বিশেষতঃ আমাদের মত কাপড়প্রিয় জাতির দৃষ্টি। আমাদের বসনবৈচিত্র্যের ত অন্ত নাই—ধুতি চাদর পিরান শার্ট চোগা চাপকান কোট টাই চায়নাকোট পার্সীকোট ওয়েষ্টকোট পাজামা পেণ্টালুন সকলেরই আমাদের ত্বকের উপরে সমান অধিকার এবং আমরাও সকলেরই অধিকার সমান ভাবে বজায় রাখিয়া সুবিধামত সাটে বেসাটে যথেচ্ছা মেলন করিয়া থাকি। সুতরাং কাপড়ের কারবারের পরিসর এ দেশে কিরূপ বিস্তৃত, তাহার বাহুল্য ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এবং ম্যাঞ্চেষ্টরের কল্যাণে নিতান্ত অন্ধের দৃষ্টিতেও তাহা প্রতিভাত না হইয়া যায় না।

সূক্ষ্ম তথ্যতালিকার প্রয়োজন দেখি না, প্রতি দিন আমাদের চক্ষে যত লোক পতিত হয়, সকলের পরিধেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ের একরকম মোটামুটি ধারণা জন্মিয়া যায়। ধুতি, শাড়ী, উড়ানী; পিরান ও কামিজের লংক্লথ, নয়ানসুক, টুইল, নানাবিধ চেক ও ডোরা, সাদা ও রঙ্গীন ছিট্‌, মলমল, তাঞ্জের; কোট পেণ্টালুন ও চোগা চাপকানের ড্রিল, সার্টিন জিন, খাকি, টুইড্‌; মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সকলই বিদেশ হইতে আমদানি। এতদ্ভিন্ন নিত্যব্যবহার্য্য আরও অনেক বিলাতী জিনিস আছে; যথা, নানাবিধ তোয়ালে, গামছা, ঝাড়ন, ন্যাপকিন, মশারির থান, নেট, মার্কিন, তোষক, বালিশ প্রভৃতির খোলের জন্য বিচিত্র রঙ্গীন ও সাদা কাপড়, সালু ও ছাতার কাপড়, সূতী রেপার ইত্যাদি। টেবিলচাদর, কার্টেন ও পর্দ্দার কাপড়, গৃহসজ্জাবরণ ও পাখার ঝালরের জন্য হলাণ্ডক্লথ, নানাবিধ রঙ্গীন টেবিল ও টিপয়-কভার প্রভৃতি নব্যতন্ত্রীর আবশ্যকীয় অনেক প্রকারের বিলাত-আমদানি কাপড়, যাহা উপরিলিখিত তালিকার মধ্যে ধরা হয় নাই, তাহাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এতদুপরি আধুনিক কুলস্ত্রীগণের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল বেশভূষোপযোগী নানাবিধ লেস্‌, চিকন, রিবন, গজ, জালি কাপড় ও নানান টুকিটাকির সংখ্যাও নিতান্ত কম হইবে না।

আমাদের নূতনলব্ধ সভ্যতার আদর্শ ইহাতেও সম্যক্ পরিতৃপ্ত হয় না। আমরা দেখি, বিলাতী জাহাজে বোঝাই দিয়া সুসভ্য পশ্চিম কেবলই যে সূতার কাপড় পাঠায়, তাহা নহে; আমাদের প্রতি মায়াবশতঃ বর্ষে বর্ষে রাশি রাশি রেশম পশম পাটের মিশ্র ও অবিমিশ্র নানাবিধ বিচিত্রনাম কাপড় পাঠাইতেও ত্রুটি করে না। অতএব

শরীরে সহ্য হউক বা না হউক, সভ্যতার দায়ে আমাদিগকে ঐ সকল জিনিস খরিদ করিয়া, প্রাণ হারাইলেও, মান বজায় রাখিতেই হয়। আলপাকা, প্যারামেটা, ফ্রেঞ্চ কাশ্মীর এবং নানান রঙের ডোরা ও চেক্ জুট ত এখন আমাদের মাধ্যাহ্নিক আপিসের বেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং বিচিত্র ফ্রেঞ্চ সিল্ক, সার্টিন, মখমল, রেশমের লেস্ ও রিবন এবং এতদ্ভিন্ন অজ্ঞাতনাম বহুবিধ বস্ত্রখণ্ড নানা কার্য্যে আমাদের গৃহিণীগণের এক্ষণে নিত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ভিন্ন, ঋতুরও পরিবর্ত্তন আছে, এবং তদনুসারে মেরিনো, ফ্ল্যানেল, বনাত, সার্জ কাশ্মীর, পশমী টুইড্, কম্বল, ফেল্ট, জার্সি, এ সকলেরও প্রয়োজন হয়। এবং কাশ্মীর, সার্জ ও বনাতের চাদর আমদানি সুরু হইয়া অবধি এ সকল বিলাতী দ্রব্যজাতের চাহিদাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন বিলাতী নকল শাল রুমাল আলোয়ান এবং রেপার বগ্ প্রভৃতিরও আমদানী সামান্য নহে। ইহার উপর গলবন্ধ, কোমরবন্ধ, মোজা, কাডিগান, ব্ল্যাক্লাভা ও নাইটক্যাপ এবং ইংরাজের অর্দ্ধ-উপেক্ষিত বাবুশিরশোভী গোল টুপি, এমন অনেক জিনিস আছে—তাহার আনুপূর্ব্বিক তালিকা সংযোগ করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্যের প্রতি আক্রমণ করিতে সাহস করি না।

এরূপ দুঃসাহসের বোধ করি আবশ্যকও নাই। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত এখানকার ইংরাজ দোকানগুলির—বিশেষতঃ কাপড়ের দোকানের ক্যাটালগ দেখিয়া থাকিবেন। ঐ সকল ক্যাটালগে বেশভূষা হইতে সুরু করিয়া এন্টিমেকেসর, টি-কোজি, কুশন, কার্পেট পর্য্যন্ত বহুবিধ সূতী রেশম পশম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য-জাতের তালিকা দেখা যায়, উহার অধিকাংশই আমাদের নবসভ্যতাভিশপ্ত ভবনে প্রবেশ লাভ করে। সুতরাং দীর্ঘ তালিকা উদ্ধৃত না করিয়া ঐ ক্যাটালগগুলির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব। ব্যবহারবশতঃ তাহা আমাদের অনেকেরই একরূপ মনস্থই আছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

তালিকাটি ত বড় সামান্য নহে। সুতা, রেশম, পশম, পাট, তাহার কয়েকটি বিভাগ মাত্র; আনারস, ঘাস, রিয়া, তিসি, এমন কি, কাঠ হইতেও আঁশ বাহির করিয়া বিলাত আমাদের বসনবিলাস বর্দ্ধনে নিযুক্ত আছে। সে কালের বল্কল কিরূপ ছিল জানি না,—পায়নাপ্ল্, ক্রেপ বা কাঠরেশম বোধ করি, সে বৈরাগ্যের পক্ষে কিছু অতিরিক্ত গুরু হইত,—কিন্তু ইংরাজের আমদানি এই সৌখীন বল্কল আমাদিগকে ত প্রায় বৈরাগ্যধর্ম্মী করিয়া তুলিয়াছে, বিশেষতঃ স্বদেশীয় দ্রব্যজাত সম্বন্ধে।

শুনিলে বিশ্বাস করিতে লজ্জা বোধ হয়, আমাদের বসনান্তরালের নিভৃত ঘুন্শিটি পর্য্যন্ত এক্ষণে জর্ম্মনি হইতে আমদানি হইতে সুরু করিয়াছে। এবং কেবলমাত্র এই রঙ্গীন

সুতাগাছি দিয়া জর্ম্মনি বর্ষে বর্ষে নিঃশব্দে কয় লক্ষ মুদ্রা গৃহে লইয়া যাইতেছে। আমরা এমনি নির্ব্বোধ যে, বানরের মত কটিদেশে ঐ রজ্জুখণ্ড বাঁধিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছি ; গলায় বাঁধিয়া ঝুলিবার সুবুদ্ধিটুকু একবারও মনে উদয় হইল না! বোধ করি, এখনও অপেক্ষা করিয়া আছি, ম্যাঞ্চেষ্টর কবে বিভিন্ন গোত্রের জনকতক ব্রাহ্মণের অপভ্রংশ ধরিয়া লইয়া গিয়া একেবারে বিলাতী কল হইতে সদ্যঃপ্রসূত মন্ত্রপূত উপবীত রপ্তানি সুরু করে, এবং এখানে চৌরঙ্গীর পণ্যশালায়, পগেয়াপটি ও সুতাপটির দোকানে, চাঁদনির পদপথপ্রান্তে আমাদের গলবন্ধন জন্য এই সূত্রখণ্ড গোত্রীয় নম্বরানুসারে সুলভে বিক্রয় সুরু হয়!

কিন্তু এক্ষণে উপায় কি? বিলাতী সুলভ নাগপাশে যখন একবার স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছি, তখন বণিক্‌কুল কি সে মায়াবন্ধ হইতে সহজে আমাদিগকে মুক্তি লাভ করিতে দিবে? শুধু ত তন্তুজাত দ্রব্য নহে, আমাদের আবশ্যকীয় কুটাটুকুর জন্য পর্য্যন্ত বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। শৈশবে বিলাতী পুতুল লইয়া আমরা খেলা আরম্ভ করি এবং বয়োবৃদ্ধিসহকারে ক্রমে বিলাতী পাদুকাযুগলকেও অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হই। বাস্তবিকই, লণ্ডনের চর্ম্মকারবর্গ অকস্মাৎ বিমুখ হইলে জুতা অভাবে আমাদের পদতল তিন সুতা পরিমাণ ক্ষয় হইয়া আসে। তাহার পর ব্যাগ বাক্স ষ্ট্র্যাপ ঘোড়ার সাজ চসমার খাপ প্রভৃতি বিহনে যে অন্ধকার দেখিতে হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

বিলাতী চীনা বাসন ও কাচের দ্রব্যজাত কয় বৎসরের মধ্যে দেশের সর্ব্বত্র যেরূপ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তদভাবেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। ঝাড় লণ্ঠন আস্‌বাবাদি ধরি না, কাচের চুড়ী না পাইলে গৃহিণীর চন্দ্রবদন যে কি আকার ধারণ করিবে, অভিজ্ঞ পাঠককে ধ্যাননেত্রে সেই মূর্ত্তিটুকু অবলোকন করিতে অনুরোধ করি মাত্র। বৈকালিক প্রসাধনক্রিয়ার জন্য দর্পণ, তৈলের শিশি ও বাটি ও সন্ধ্যা হইয়া আসিলে দর্পণের একপার্শ্বসম্মুখে স্থাপিত করিবার উপযুক্ত চিমনি সহ ল্যাম্প, এ সকল অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলি আহরণ করিবার পক্ষে জায়াচিত্তরঞ্জনেচ্ছু সুধীগণকে বহুল পরামর্শ দিবার প্রয়োজন নাই। ফুলদানি, খেলনা এবং নানাবিধ মণি-মুক্তার কৃত্রিম অনুকরণের প্রতি যুবতিজনচিত্তের স্বাভাবিক স্পৃহাও সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং ভারতবর্ষে বিলাতী কাচদ্রব্য বহুল প্রচলনের কারণ দূরে খুঁজিতে হয় না।

তাহার পর ধাতুদ্রব্যও কম নহে। অস্ত্রশস্ত্র ছুরী কাঁচি প্রভৃতি বাদ দিয়া ধরিলেও নিত্যব্যবহার্য্য তালা চাবি, বাক্‌স পেটরা, সিন্দুক আলমারি, কড়া কাতলী, শিকল

পেরেক, কল কব্জা স্ক্রু স্থচি পিন কাঁটা সংখ্যায় নিতান্ত সহজগণ্য হইবে না। চিরুনি ব্রুশ কৌটা প্রভৃতিও এখন নানা ধাতুর প্রস্তুত হইতেছে। এবং কলাইকরা বাসনের আমদানি সুদূর পল্লীগ্রাম অবধি পঁহুছিয়াছে। এতদ্ভিন্ন যন্ত্রাদি, সৌখীন দ্রব্য, ষ্টেশনারি, মায় তুরস্ক ফেসানের নারগিলা পর্য্যন্ত বিলাতী জাহাজে নিত্য এ দেশে আনীত হইতেছে। এবং আমাদের মধ্যে অনেকে, নারগিলা না ধরিলেও, বিলাতী নল-সংযোগে আলবোলা হইতে ধূম্রাকর্ষণ সুরু করিয়া দিয়াছেন।

এ সকলের উপরে কাঠের জিনিস, কাচকড়া, ঝিনুক, হাড় ও হাতীর দাঁতের প্রস্তুত নানাবিধ সামগ্রী, রবরের জিনিস, তেল সাবান বাতি এসেন্স ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য, নানা রুচির সুলভ চিত্রাদি, বোতলে ও টিনে বদ্ধ দুগ্ধ মাখন পনির জ্যাম জেলি মিষ্টান্ন বিস্কুট উদ্ভিজ্জ ফলমূল মৎস্য মাংস মদ্য এবং এতদ্ভিন্ন সহস্রাধিক নব নব দ্রব্যজাত চালান দিয়া বিলাত আমাদিগকে মজ্জাবধি বিবশ করিয়া তুলিয়াছে। এবং এখনও বা যতটুকু বাকী আছে, প্রতি দিন নানা উপায়ে বিলাসকে সুলভতর করিয়া তুলিয়া সেটুকু অসম্পূর্ণ না রাখিবার পক্ষে সাধ্যমতে যত্নের ক্রটি করিতেছে না।

ইংরাজ বণিক্, সহধর্ম্মী স্বজাতীয় মিশনরীরই অনুসরণে, আমাদের দ্বারের কাছে দোকান খুলিয়া, অযাচিত ক্যাটালগ পাঠাইয়া, বাড়ীতে জিনিস বহিয়া দিয়া আসিয়া, দেশী এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া, যত প্রকার উপায়ে সম্ভব, আমাদিগকে অষ্টপ্রহর আগলিয়া আছে—সর্ব্বদাই সতর্ক, পাছে আমাদের কোনও অভাব মোচনের ক্রটি হয় অথবা কোনরূপে নব নব অভাবগুলি আমাদের অনুভূতি এড়াইয়া যায়। এমন কি, আবশ্যকমত চিরপরিচিত গৃহসারমেয়ের মত আমাদের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া কেমন হেলাভরে আমাদের নিদারুণ অনাদরবেদনা ঘুচাইয়া দেয়, এবং পুনশ্চ কেমন অবলীলাভঙ্গীতে, আমাদেরই শিক্ষাবিধানার্থে চিরন্তন অতি মৃদু অনতিস্ফুট "What can I do for you, Sir" পদটিকে, ঈষৎ রূঢ় হইলেও, অনায়াস-শ্রুতিগম্য "What do you want Babu" পদে রূপান্তরিত করিয়া লইয়া প্রখর সভ্যতাবেগকে লঘু ও আমাদের পক্ষে সমধিক উপযোগী করিয়া তুলে। এবং সেই জন্যই ইংরাজী পণ্যভবনদ্বারে, বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায়, আমাদের নির্ব্বাণকামনা সমধিক প্রগাঢ় হইয়া উঠে।

কিন্তু বিলাতী জিনিসের দেশী দোকানে এত শত সাংঘাতিক আকর্ষণ নাই। কিন্তু একেবারে যে কোন আকর্ষণই নাই, এ কথা বলা চলে না। বিলাতী জিনিসের মজ্জায় মজ্জায় আমাদের প্রতি যে বিষবিদ্রূপ নিহিত রহিয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণ কোথায়? বিলাতী কাপড়ের মধ্য হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার নিঃশব্দে পরিহাস করে,—হে আর্য্য, আমরা ত বহুদিনের ম্লেচ্ছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মাতা স্ত্রী দুহিতার

লজ্জা নিবারণ করে কে? যে বস্ত্রখণ্ডসংবৃত হইয়া, হে স্বদেশহিতৈষি, এই ম্যাঞ্চেষ্টারকে গালি দিয়া এত সহজে তুমি দেশের করতালি সংগ্রহ কর, সে বস্ত্রখণ্ডের জন্য তুমি কাহার নিকট ঋণী? বিলাতী কাতলীর মধ্য হইতে চা-পায়ী নব্য-ভারতকে বার্মিংহাম একটুকু কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অবসরলাভের জন্য অনুরোধ করে। বিলাতী বেণ্টউড্ চেয়ার কংগ্রেসের প্রত্যেক রেজোল্যুশনকে পরিহাস করিয়া বলে, দেশের টাকা বিলাতে যায় বলিয়া বিদেশী গবর্মেণ্টকে তোমরা যে তিন দিবস ধরিয়া দোষ দাও, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যে আসনে বসিয়া সেই গালি পাড, সেই আসনের ইতিহাসটা কি। —সুতরাং এই পরিহাসলাঞ্ছনার আকর্ষণ ইংরাজের দোকান ভিন্ন দেশীয় লোকের বিলাতী দোকানেও যথেষ্ট।

কিন্তু পতঙ্গও বহ্নিমুখ পরিত্যাগের সংকল্প করিতেছে—আমাদের মধ্যেও অনেকেই এই বিলাতী পণ্যশালার আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে নানাবিধ নূতন নূতন কলকারখানার সূত্রপাতও হইতেছে। একদিনে অবশ্য আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না। সর্ব্বাংশে বিদেশের উপর নির্ভর পরিত্যাগ করা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নহে; তথাপি যে সকল সামগ্রী এ দেশে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে বিদেশের অনুগ্রহলাঞ্ছনাটুকু উপেক্ষা করা বোধ করি, নিতান্ত কঠিন হইবে না। এবং বিদেশীয় দ্রব্যজাতের সাহায্যে নিজেকে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টার মধ্যে হীনতা যতই উপলব্ধি করিতে পারিব, স্বদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ততই আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। আপাততঃ কোন কোন স্থলে একটু আধটু সৌখীনতা ত্যাগ করিতে হইতে পারে; কিন্তু ভদ্রজনদিগের তাহাতে কুণ্ঠার কোনরূপ কারণ নাই। কারণ, বসন ভূষণের চাকচিক্য কোথাও ভদ্রতার পরিচায়ক নহে, আচরণই তাহার একমাত্র পরিচয়স্থল। এবং ভদ্রজনের পক্ষে যে বেশভূষায় একটি পরিপাটি সংযম প্রকাশ পায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন।

কিন্তু তৎসম্বন্ধে সুদীর্ঘ মুখবন্ধনের প্রয়োজন নাই। বিলাতী আমদানীর মোটামুটি তালিকা উপরে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার মধ্যে কোন্ জিনিসগুলি দেশেই পাওয়া যাইতে পারে এবং যেগুলি বা না পাওয়া যায়, সেগুলি কতদূর পরিহার করা চলে, ইহাই প্রধান আলোচ্য। তালিকাটি স্থির করিতে পারিলে পাঁচ জন ভদ্রসন্তান একত্র বসিয়া আলোচনাপূর্ব্বক আমাদের এই পণ্যসমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কারণ, মনের ভাব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বিরোধ অল্পই; কেবল সকল সুবিধা অসুবিধা সকলের জানা না থাকায় বাহিরে অনেক সময় ব্যবহারের বহু বৈপরীত্য লক্ষিত হয়।

প্রবন্ধান্তরে আমাদের স্বদেশীয় ব্যবহারিক শিল্পের তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এ বিষয়ে পাঠক সাধারণেরও সানুগ্রহ সহায়তা লাভের আশা রাখি।

'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

প্রাচ্য প্রসাধনকলা

কবি যদিও কহিয়াছেন—"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্", রূপসীরা কিন্তু এই বচনের উপর নির্ভর করিয়া বল্কলমাত্রাবলম্বনে কবির মনোহরণ অভিসারে বাহির হইতে সম্যক্ সাহসী হয়েন না। কবিকে তাঁহারা নিতান্তই কল্পনাজীবী জানিয়া মনে মনে বলেন, হে কল্পলোকের অতিথি, তুমি আমাদের এই নিরাভরণ তন্বঙ্গের যতই মনোহারিতা প্রকাশ কর না কেন, আমরা মনে স্থির জানি, কতখানি তুমি এই উৎপলনেত্রে মুগ্ধ, আর কতখানিই বা ইহার মধ্যে কজ্জলকালিমার মোহ, কতটুকু এই অপাণ্ডুরস্নিগ্ধ অধরপুটের আকর্ষণ, আর কতখানি বা তপ্ত লাক্ষারাগের উদ্দীপনা। উৎসাহাবেশে তুমি যাহাই বল, আমাদের প্রতি অঙ্গ তাহার কেয়ূরকঙ্কণমেখলানূপুরে তোমার অন্তরে মুখরিত হইয়া উঠে, আমাদের যৌবনলাবণ্য বিবিধ রাগরঞ্জিত হইয়া তোমার চিত্তে অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে; তোমার মুগ্ধ দৃষ্টি যেখানে দেখে বাহুকটিচরণভঙ্গিমা, আমরা সেইখানেই অনুভব করি কেয়ূরকাঞ্চীনূপুরলাঞ্ছনা, যে গণ্ডস্থলের তরুণ অরুণিমা তোমাকে একান্ত মুগ্ধ করিয়া রাখে, আমরা বুঝি তাহার কতটুকু এই স্মিতগণ্ডের, কতটুকু বা মোহিনী তুলিকার রাগ-রচনাগত। যুগের গুণে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রূপ যেখানে আছে, প্রসাধনের সাধনা সেখানে না থাকিয়া যায় না।

সংস্কৃত কবি, বোধ করি বহুদিনের অভিজ্ঞতায়, আর কিছু না হউক, এই জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য কোন সময়ে মধুরাকৃতিদিগের মনোজ্ঞতাবর্দ্ধনবিষয়ে মণ্ডন-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন বলিলেও, অন্তঃপুরের প্রসাধনকক্ষদ্বারে সুবিধামত অপাঙ্গ-বিক্ষেপ করিয়া আসিতে তিনি কখনও ছাড়েন নাই। এবং প্রসাধন-কলাটিকে স্বল্পদিন মধ্যেই বহুতর সৌন্দর্য্যসিঞ্চনে তাঁহার কাব্যলোকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কেয়ূর কঙ্কণ মেখলা হার নূপুর কুণ্ডল ক্রমে যেন সেই কাব্যলোকেরই অনিবার্য্য অলঙ্কার হইয়া উঠিয়াছে এবং কজ্জল কুঙ্কুম অলক্তক লোধ্ররজ অগুরু ধূপ প্রভৃতি সেই কল্পলোক-বাসিনীদিগের প্রসাধনী কলার প্রধান উপকরণরূপে পরিণত হইয়াছে। নব নব ঋতুপর্য্যায়ে সেখানকার সুমধ্যমা কৃশাঙ্গীগণের স্থূল সূক্ষ্মাম্বর কখনও কুসুম্ভপরাগরাগে,

কখনও বা ঈষৎ বাসন্তী রঙ্গে, কখনও নিবিড়জলদাভ, কখনও কনকচম্পকপ্রভ, ঋতুচিত নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া থাকে, এবং তৎপ্রতি কবির বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ পায়। সংস্কৃত কবি এইরূপে, একদিকে "কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" ইত্যাদি মনোহর বচনে এবং অন্য দিকে রূপসীগণের নানাবিধ সুশোভন প্রসাধনসংসাধনে, নারীহৃদয়ে সহজেই সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এবং বোধ করি, সাহস করিয়া বলা যায়, কামিনীগণের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সেবা আর কোন দেশের কবি এমন সুনিপুণ অবলীলাসহকারে করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নব্যতন্ত্রীরা যদি রাগ না করেন, তাহা হইলে সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে, যতই নারীপূজক হউন না কেন, আধুনিক পাশ্চাত্য কবি কি কখনও তাঁহাদের সহস্রমুকুর-বিম্বিত প্রসাধনভবনদ্বারে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া এরূপ সেবাশীল ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? আধুনিক বিজ্ঞান নিত্য নূতন আবিষ্কার দ্বারা প্রসাধনবিলাস অনেক বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে এবং আসন মুকুর গৃহসজ্জা দীপালোক প্রভৃতির নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে অপেক্ষাকৃত সহজ ও অনায়াসসাধ্য করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু যে রমণীয়কুহকসঞ্চারে নারীজাতির এই নিত্যকর্ম্ম সে কালে কবিতার কল্পলোকলাবণ্যে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কুহক, সে মোহময়ী রমণীয়তা এ প্রসাধনশালায় কোথায়? এবং বোধ করি, এই পাশ্চাত্য আদর্শানুসরণেই আমাদের নব্য প্রসাধনশালাও কবির সর্ব্বাঙ্গীন স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। যেখানে বা আধুনিক প্রাচ্য কবির এতৎপ্রাত একটুকু সানুভব দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে দেখা যায়, সেখানে তিনি সেই সে কালের অন্তঃপুরদ্বারে, পুরাতন উজ্জয়িনীর প্রাসাদবাতায়নসম্মুখে অথবা তমালতরুচ্ছায়ানীল বৃন্দাবনের আভীরকন্যাপরিসেবিত প্রাঙ্গণে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন; নব্যাঙ্গনাগণের বিচিত্রোপকরণ প্রসাধনকলা তাঁহার হৃদয় তাদৃশ মন্থন করিয়া তুলে নাই।

সে কালের প্রসাধনকলায় তবে না জানি কি মোহ ছিল, যাহাতে কবিহৃদয় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। অথবা কে জানে, সেই বিগতা রূপসীদের রূপযৌবন-ভঙ্গীরই বা কি অমোঘ কুহক ছিল যে, তাঁহাদের পেলব দেহলতার প্রতি স্পন্দনে, বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গে, মৃণালভুজসঞ্চালনে, চারুচরণবিক্ষেপে এই মনোহর প্রসাধনকলা কাব্যের ছন্দে ঝঙ্কৃত ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত! উপকরণ ত এখনও বহু আছে—লোধ্ররজ নাই বটে, কিন্তু শ্বেতহস্তচূর্ণিত শুভ্র রজ এখনও সমুদ্রপার হইতে নিত্য আমদানি হইয়া থাকে, অলক্তক পূর্ব্ববৎ ব্যবহৃত না হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে নব নব গাঢ় রক্তদ্রাব প্রচলিত হইয়াছে, অগুরু ধূপ না থাক, কিন্তু হেয়ার-ওয়াশের গন্ধও হীন নহে; তবে

অভাব কিসের ? অলঙ্কার এখনও সেই সুন্দর মণিবন্ধে একান্ত সন্নদ্ধ হইয়া রহে, এখনও হারযষ্টি তনু গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া ধরে, এবং যৌবনশ্রী চিরদিন যাহা ছিল, সেইরূপই অনিন্দ্যসুন্দর কমনীয়তায় তনু মন প্রাণ হরণ করিয়া লয় ; তবে কবিতার কল্পকাননে এই প্রসাধনবিচিত্র যৌবনকলা তাহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত হয় কেন ?

কবিকুলকেও সহসা অপরাধী সাব্যস্ত করিতে প্রবৃত্তি হয় না ; মনে হয়, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে তাঁহাদের কাব্যনাড়ী পীড়িত করে। হয় ত বর্ত্তমান কালের প্রসাধনকলামধ্যে, আধুনিক সকল বিষয়েরই মত কোথাও একটি অতিসচেতন ভঙ্গী প্রকাশ পায়, কোথাও আবরণমধ্য হইতে সর্ব্বদা সতর্ক চেষ্টার ক্লিষ্ট মূর্ত্তিখানি ব্যক্ত হইয়া মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিমুখ করিয়া দেয়। কারণ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে, সে কালে প্রসাধনকলা এখনকার মত এত গোপন ব্যাপারও ছিল না এবং তাহার মধ্যে কোনপ্রকার রহস্যভেদাশঙ্কা না থাকায় সর্ব্বদা আবরণরক্ষার দুশ্চিন্তাও ছিল না। নব্য পাশ্চাত্য প্রসাধনকলা সে হিসাবে সর্ব্বদাই সতর্ক ও সন্দিগ্ধ, এবং নানা ছদ্ম আচ্ছাদনে আত্মগোপন করা তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, তাহার মধ্যে অনেক নিদারুণ দ্বন্দ্ব এবং চেষ্টা, কঠিন পীড়ন এবং নিষ্ঠুরতা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা ব্যক্ত হইলে তাহার সমস্ত সৌকুমার্য্য একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়। পাশ্চাত্য বেশবন্ধ যাঁহাদের পরিচিত, তাঁহারাই অবগত আছেন যে তাহার বিপুল বাহুল্য কোথাও অসঙ্গতরূপে স্ফীত হইয়া উঠিয়া যেমন স্বভাবকে লঙ্ঘন করে, সেইরূপ তাহার কঠিন বন্ধন কোথাও নির্দয়ভাবে পিনদ্ধ হইয়া তনুমধ্যকে তনুতর করিবার প্রয়াসে প্রাণবায়ু চলাচলের পথ পর্য্যন্ত প্রায় রুদ্ধ করিয়া দেয়। এই কৃচ্ছ্রসাধন, এই শরীরপীড়ন ও মনের উদ্বেগ, এই অস্বাভাবিক অসঙ্গতি, ইহাই বোধ করি, কবিহৃদয়ের স্নেহধারা হইতে এই প্রসাধনকলাকে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে তপঃসাধনের কঠোরতা সমস্তই আছে, কিন্তু তাহার শান্তিময় উচ্চ লক্ষ্যটুকু কোথাও নাই, যাহাতে হৃদয় তৃপ্তি মানে। কেবলি বন্ধন এবং বেধন, পিন এবং রিবন, কুঞ্চন এবং সম্প্রসারণ, পীড়ন এবং প্রয়াস ; কলাবিদেরা যে আনন্দ এবং পূর্ণতাকে কলার প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহার সম্পূর্ণ অভাব।•

আমাদের অন্তঃপুরে প্রসাধন একটি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে, এবং আমাদের সকল নিত্যকর্ম্মই যেরূপ ভাবে সম্পাদিত হয়, এই সজ্জাকলাও সেইরূপ বিনা আড়ম্বরে অবাধে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে গোপনীয় বড় অধিক নাই এবং তাহা অত্যন্ত গোপনভাবে সমাধাও হয় না। আমাদের রমণীগণ পঙ্ক-কারু-পিচ্ছল হর্ম্ম্যতলে মাদুরটি বিছাইয়া, সম্মুখে দর্পণখানি স্থাপিত করিয়া, কাজললতা ও সিন্দূরের কৌটা এবং

কেশপাশবেধনবন্ধনের উপকরণ লইয়া যেখানে বসিয়া কেশবিন্যাস সম্পাদনে নিযুক্ত হয়েন, সে স্থান প্রায়ই গতিবিধির পথপ্রান্ত হইতে প্রচ্ছন্ন নহে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বাধা হয় না। নানাসখীসমাগত হাস্যপরিহাস, গল্পগুঞ্জন ও রসালাপপ্রসঙ্গের মধ্যে প্রসাধনব্যাপার যেন লীলাচ্ছলে সংসাধিত হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে নিত্যকর্ম্মের অভ্যাসটুকু ব্যতীত কোনরূপ দারুণ দুঃসাধ্য সাধন নাই। বেশভূষা যেমন শরীরের কোন অঙ্গকে অতিমাত্র পীড়িত বিকৃত করে না, তেমনি অতিসচেতন চেষ্টা মনকে কোথাও ক্লিষ্ট করিতে থাকে না।

আমাদের প্রসাধনকলা প্রকৃতির সহিতও নানা ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ। এমন কি, পাশ্চাত্য কলার সহিত তুলনায়, ইহাকে প্রকৃতির স্বহস্তরচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোধ্ররজই কি, তাম্বূলরাগই কি, কুঙ্কুমলেখাই কি, চন্দনরচনাই কি, সকলই আমাদের প্রকৃতির দান। তাঁহার তরু লতা ফুল ফল পত্র বৃক্ষনির্য্যাস হইতে, তাঁহার স্বকীয় প্রসাধনপেটিকা হইতে সঞ্চিত। এমন কি, রূপসীগণের বস্ত্ররঞ্জন করিতে হইলেও আমাদিগকে প্রকৃতির সজ্জাভবনদ্বারে উপস্থিত হইতে হয়, এবং ঋতু অনুসারে কখনও কুসুম্ভ, কখনও শেফালীবৃন্ত, কখনও লট্‌কান, কখনও বা হরিদ্রা, কখনও নীল, কখনও বা বল্কলরস দানে প্রকৃতি আমাদের প্রমদাগণের শাটিকা ও চোলি রঞ্জিতকরণে সহায়তা করেন।

পাশ্চাত্য প্রসাধনকলাকেও এ সকল বিষয়ের জন্য যে প্রকৃতির দ্বারস্থ হইতে হয় না, তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃতির সেখানে প্রকৃতিস্থ থাকিবার জো নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়া, পেটেণ্টের পাট্টা, মকদ্দমার আরজি, ট্রেডমার্কের ছাপ, বিজ্ঞাপনের ঘোষণাপত্রে বল্কলধারিণী বনচারিণীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের প্রসাধনে প্রকৃতির উপর কোথাও এরূপ জবরদস্তি প্রকাশ পায় নাই; পণ্যশালার মধ্যেও সে আপনার সরল শুচি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। আমাদের রমণীগণ স্বহস্তেই মুখমণ্ডলে লেপনজন্য দুগ্ধ হইতে সরটুকু তুলিয়া রাখেন, রৌদ্রে গোলাপপাতা শুকাইয়া আমলকী কুটিয়া লইয়া কেশধূপ রচনা করেন, সযত্নসজ্জিত তাম্বূলরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া তৃপ্ত হয়েন, দীপটি জ্বালিয়া তদুপরি কাজললতাখানি ধরিয়া আঁখির অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া লয়েন, চন্দনকাষ্ঠ ঘষিয়া লইয়া পত্ররচনা করেন, ইহার মধ্যে কোথাও পেটেণ্ট আপিসের কোনও উপদ্রব নাই।

প্রাচ্য প্রসাধনকলার এই যে একটি নিরুদ্বেগ সহজ গার্হস্থ্য ভাব, ইহাতেই ইহা রমণীয় এবং এই ভাবের গুণেই কবিহৃদয়ে ইহা এমন সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমাদের মনে আমাদের প্রমদাগণের চিত্র যেন তাঁহাদের বিচিত্র প্রসাধনের সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবদ্ধ। সিন্দূরের টিপ্‌টি, কবরীর বেষ্টনটি, অঞ্চলের প্রান্তটি, অবগুণ্ঠনের পাড়টি, দুইখানি প্রকোষ্ঠসন্নদ্ধ বলয়কঙ্কণ এবং কণ্ঠবিলম্বিত চারু হারলতাটি, এমন কি, নূপুরের নিক্বণটুকু পর্য্যন্ত আমাদের অন্তরে কুলকন্যাগণের কমনীয় মূর্ত্তির সহিত একান্ত বিজড়িত। এইগুলি বাদ দিয়া অন্য কোনও নূতন বেশে বোধ করি আমরা তাঁহাদিগকে ঠিক এরূপ ভাবে দেখি না। উচ্চগোড়ালি সূক্ষ্মাগ্র বিলাতী পাদুকা-নিষ্পীড়িত পদপল্লব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তেমন স্থির করিয়া গিয়া পড়ে না। জামায় লজ্জা নিবারণ করে, অতএব তাহার দোষ দিতে পারি না, কিন্তু জ্যাকেটের সজ্জাবাহুল্যে ভূষণ-ঘোষণা করে অথচ শ্রী এবং হ্রী রক্ষা করে না। ইহা নিশ্চয় যে, গৃহপ্রাঙ্গণে উৎসবক্ষেত্রে কোন শুভ অনুষ্ঠানে এই সকল ফ্যাশান-স্ফীতিমার অসঙ্গতি যেন সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

কারণ, আমাদের সকল শুভকার্য্যেই বাহিরে যেমন নহবত না বসিলে নয়, অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণতলে সেইরূপ নূপুর কঙ্কণ অঙ্গদ কুন্তল রুণুঝুণু রিণিঝিনি না বাজিলে সকলই শূন্য ও শ্রীহীন। হ্রীসংযতা নারীগণের কলকণ্ঠের পরিবর্ত্তে এই সকল অলঙ্কার-শিঞ্জিতেই বাহিরের পুরুষগণ অন্তঃপুরের পরিপূর্ণ আনন্দোৎসবের সংস্পর্শ অনুভব ও উপভোগ করেন। এবং তাঁহাদের অন্তর একটি মনোহর সৌন্দর্য্যলোকের কল্পনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যেখানে আনন্দের অবসান নাই এবং কোথাও কোনরূপ অভাবের সূচনামাত্র নাই। এই ধ্বনি-বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে একটি পিনদ্ধনিচোলা নীলাম্বরী-পরিহিতা ঈষদবগুণ্ঠনবতী কল্যাণী মূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, সেই লক্ষ্মীরূপিণীই আমাদের মনোরাজ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এবং এই চিরস্নেহময়ীর অধিষ্ঠানেই আমাদের গৃহ নিত্যোজ্জ্বল।

যে গৃহে পাশ্চাত্য গৃহসজ্জার সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ আসবাব নাই—না আছে কৌচ, না আছে সোফা, না আছে পিয়ানো, না আছে হোয়াট্‌নট্‌, না আছে দেয়ালে পেরেক ও হুকে বিলম্বিত অগণ্য ব্র্যাকেট, ফুলদানি, আয়না, পাখা, চিত্রিত জাপানী চিকের টুকরো, কোণে শেল্‌ফ, কোথাও চিজেল, কোথাও জার্ডিনিয়র, অন্যত্র নানাভঙ্গীবিশিষ্ট উচ্চ নীচ বক্র ত্রিকোণ ক্যাবিনেটরাজি এবং তদুপরি সজ্জিত অসংখ্য শঙ্খ শম্বুক প্রবাল পুত্তল ফটোফ্রেম ও রীতিমত একখানি মণিহারীর দোকান। চিত্রিত গৃহভিত্তি কলাকুশলা তন্বঙ্গীগণের বহুযত্নলিখিত বিচিত্র আলেপনরচননৈপুণ্য ব্যক্ত করে মাত্র এবং পঙ্কের মেঝের উপরে দন্তখচিত পর্য্যঙ্কতলে রঞ্জিত-সূত্র-চিত্রিত আস্তরণশয্যায় আমাদের গৃহসজ্জাভাব পূর্ণ করিয়া দেয়, অথবা উপাধানসঙ্কুল নির্ম্মল শুভ্র বিস্তীর্ণ বিছানায় অভ্যাগতদিগকে সর্ব্বদা উন্মুক্ত স্বাগত নিবেদন করে। তাহার কোথাও কোনও

আতিশয্য নাই, যাহাতে দর্শকের মনে সর্ব্বদা একটি পণ্যভবনের প্রসঙ্গ উপস্থিত করে বা কোনরূপ নিরর্থকতা সূচিত করিয়া দেয়। আছে কেবল অবাধ প্রচুর সূর্য্যালোক, ধূলিবিহীন নিরবচ্ছিন্ন পারিপাট্য এবং সর্ব্বদা একটি প্রশান্ত পরিচ্ছন্ন সংযত আরাম। এই উড্ডীনরেণু তপ্ত প্রাচ্যদেশে আসবাববিরলতার যে কি শ্রী এবং শোভা, এবং আরাম এবং শান্তি, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতা জানে না, এবং সভ্যতাদগ্ধপক্ষ বহ্নিমুখী পতঙ্গ আমরাও অনেক সময় প্রাণপণে না জানিবার চেষ্টা করি।

কিন্তু আমাদের চিরাগত প্রসাধনকলার মনোহারিতা সম্যক্ অনুভব করিতে হইলে একবার এই গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হওয়া আবশ্যক। এই যে বিরলবস্তু পরিষ্কার পরিপাটি বিচিত্রচিত্রিত চারুচিক্কণ গৃহখানি, এই পটভূমির উপরেই আমাদের সহজ শোভন বিচিত্র প্রসাধিত চারু নারীমূর্ত্তি সম্যক্ ফুটিয়া উঠে। এবং আমাদের কবিগণ হর্ম্ম্যরাজির বাতায়ন ও গবাক্ষপথ দিয়া সেই মর্ম্মস্থলে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের কাব্যে নারীসৌন্দর্য্য প্রসাধনকলায় এরূপ সমুদ্ভাসিত। কখনও হর্ম্ম্যতলে নিদাঘকাতর আলুলায়িত দেহযষ্টি, প্রখর রবিকরজ্বালায় স্থূল বস্ত্র পরিহার করিয়া সূক্ষ্মাম্বরপরিহিতা, কণ্ঠে লঘু মুক্তাহার, মণিবন্ধে মণিময় বলয়, শ্লথ দেহলতা মেখলাভারবহনেও অক্ষম; কখনও যে দিন ভবনশিখরে ঘনঘটা করিয়া নীল মেঘ নামিয়া আসে, শিখী পুচ্ছ বিস্তারপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, জলদ মেঘ-মল্লারে গম্ভীর গর্জ্জন করে, ঘননীল চোলীখণ্ডোপরি কুসুম্ভরাগরক্ত শাটীখানি জড়াইয়া, কর্ণাটছন্দে কবরী বাঁধিয়া, চিবুককুহরে কস্তুরীবিন্দুটুকু নিবদ্ধ করিয়া, বন্ধুজীব অম্বুজ এবং নীপকুসুমের মালা পরিয়া, কর্পূরচন্দন-চর্চ্চিতদেহে সীঁথি-কুণ্ডল-হার-অঙ্গদ-কঙ্কণ-কাঞ্চী-মঞ্জীরমণ্ডিতা—বর্ষার মর্ম্মমন্দিরে যেন তাহার অধিষ্ঠাত্রী তড়িল্লতা; কখনও সুদীর্ঘ শারদ নিশান্তে কাশশুভ্রাংশুকা, অগ্রহায়ণে আপক্কশালিশ্যামলাম্বরা, বসন্তজ্যোৎস্নায় বকুলমাল্য-ভূষণা। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির তরুলতাপুষ্পপল্লবে যেমন বিচিত্ররাগসঞ্চারে নব নব চাঞ্চল্য অনুভূত হয়, আমাদের স্ত্রীনিকুঞ্জেও সেইরূপ যেন কখনও নীলাম্বরীতে, কখনও কুসুম্ভরক্তবস্ত্রে, কখনও বাসন্তীবসনাঞ্চলে প্রকৃতির সেই অন্তরের পুলকরশ্মি বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এমন কি, উৎসবজনতার বেশবৈচিত্র্যে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, যেন শ্রীপঞ্চমী, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, কোজাগর-পূর্ণিমা, এইগুলি ঋতুচিত প্রসাধনেরই এক একটি আনন্দ-উৎসব।

কিন্তু পাশ্চাত্য ভূমিতে সুন্দরীগণের প্রসাধনবৈচিত্র্য কম নহে, বরং আমাদের তুলনায় বহুগুণে অধিক; সেখানে কেবলি যে ঋতুতে ঋতুতে সুন্দরীগণের বেশ

পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা নহে; দিবসে নিশীথে, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে, চা-পানসময়ে ও ডিনার-আসনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বেশভূষা। এবং সেখানকার সাপ্তাহিক মাসিক সাময়িক অসাময়িক সচিত্র বিচিত্র নানা পত্রে নিয়ত আন্দোলিত আলোচিত বিজ্ঞাপিত হইয়া এতৎপ্রতি সর্ব্বদাই সাধারণের মনোযোগ অত্যন্ত সজাগ করিয়া রাখা হয়। কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব লইয়া এত আন্দোলন আলোচনা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত ইহা কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়া একটি স্থায়ী আনন্দসত্তা লাভ করে নাই। আমাদের প্রসাধনের মত পাশ্চাত্য ভূমিতে প্রকৃতির সহিত তাহার সেই অনিবার্য্য প্রাসঙ্গিকতাটুকু নাই।

'ভারতী', ভাদ্র ১৩০৫

শুভ উৎসব

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসবকলা যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। দোল দুর্গোৎসবেই কি, বীর ব্রত অনুষ্ঠানাদিই কি. আর জাতকর্ম্ম অন্নপ্রাশন বিবাহাদি সংস্কারগুলিই বা কি, অল্পদিন মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়াকর্ম্মেই যেন কি একটি পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে—প্রাচীন কালে ইহার মধ্যে যে শুভ আনন্দটুকু ছিল, তাহা বুঝি আর থাকে না, ইহার ব্যাপক সার্ব্বজনীন ভাব সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া ক্রমশঃ ইহা ব্যক্তিবিশেষের সমারোহময়ী তামসিকতামাত্রে আসিয়া না পরিণত হয়। কারণ, আমাদের দেশে, সমাজবন্ধনগুণেই হউক বা লোকের প্রকৃতিগুণেই হউক, উৎসবমাত্রেই চতুষ্পার্শ্বের সর্ব্বসাধারণের যেন একটি চিরন্তন অধিকার ছিল; আমার গৃহের পূজা-পার্ব্বণে, আমার পারিবারিক সকল শুভ কর্ম্মে কেবলমাত্র আমি এবং আমার গৃহিণীর নিকটসম্পর্কীয়গণ নহে, কিন্তু নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত পল্লীর অন্তরে উৎসব ঘনীভূত হইয়া আসিত, এবং সকলেরই মনে হইত, যেন তাহার নিজের বাড়ীর কাজ। এক্ষণে নবাগত সভ্যতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষাচ্ছলে আত্মপরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই দুরতিক্রমণীয় করিয়া তুলিতেছে—আমরা সকল অধিকার আইনের পাকা মাপকাঠির সাহায্যে নূতন করিয়া বুঝিতেছি; সুতরাং হৃদয়ের কাঁচা সরস সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রক্ষা করা অনেক স্থলেই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ফলে যে সকল উৎসবকলা হৃদয়ের তাপে এত দিন সজীব ও নবীন ছিল, হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সেগুলি ক্রমশঃ মৃত্যুর মত হিমপাণ্ডু হইয়া আসিতেছে। এবং এই মৃত্যুহিমবিবর্ণতাটুকু ঢাকিবার জন্যই বাহিরের সাজসজ্জা ও সমারোহবাহুল্য অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু মুখরাগলেপনে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের তপ্ত লাবণ্যসঞ্চারচেষ্টার মত উৎসবশ্রী-সম্পাদনে এই সমারোহাড়ম্বর সম্পূর্ণ নিষ্ফল। উৎসবের সহস্র চঞ্চল আলোকরশ্মি জনতার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে ও উৎসাহহীন ম্লান মুখে প্রতিফলিত হইয়া অবসাদের শীর্ণ মূর্ত্তিখানিই ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে হৃদয়ের সম্বন্ধাধিকারে যখন আইনের এত চুলচেরা সূক্ষ্ম বিভাগ ছিল না, একের উৎসব তখন সহৃদয়তাগুণে দশের হইয়া উঠিত। উদ্যোগপর্ব্বের ভারও তখন পাঁচ জনের মধ্যে স্বেচ্ছায় বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত এবং উত্তরকাণ্ডেও সকলের সমবেত যত্ন চেষ্টা উৎসাহ আনন্দে উৎসবকলা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া উঠিত। নব্যতন্ত্রের নাগরিক অধিকার অনধিকার বিধি তখনও হয় নাই—সুতরাং আমার কাজে খাটিয়া দিতে পাঁচ জনের অনধিকার সঙ্কোচও বোধ হইত না এবং নিজের কাজের ভার পাঁচ জনের উপর চালাইয়া দিতে এ পক্ষেরও কোনরূপ দ্বিধা মনে আসিত না। কেহ আটচালা নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শনে নিযুক্ত হইত, কেহ দীপ জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিত, কেহ কদলীপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিত, কেহ কটিবন্ধ দৃঢ়রূপে আঁটিয়া পরিবেশনে লাগিয়া যাইত, কেহ বা ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, কেহ বসিয়া বসিয়া কেবল পরামর্শ সরবরাহ করিত, নিতান্ত কোন কাজ না পাইলে ডাকহাঁক ও মোড়লী করিয়া লোকে নিজের একটা কর্ম্ম গড়িয়াও লইত। এইরূপে নিশ্চেষ্ট ঔদাস্যভরে দেখিবার অবসর না পাওয়ায় এবং উৎসবসৌষ্ঠব সম্পাদনবিষয়ে কথঞ্চিৎ নিজ হস্ত উপলব্ধি করিয়া সকলেই আপনাকে ইহার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে অনুভব করিতে পারিত। এবং ইহা হইতেই একের উৎসব সাধারণের হইয়া সমধিক সরস ও সজীব হইয়া উঠিত, এবং বৃহৎ সমাজের সর্ব্বাঙ্গ একটি অখণ্ড সৌষ্ঠবলাভে সমধিক মনোজ্ঞ সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হইত।

এক্ষণকার উৎসবগুলি কিন্তু ক্রমশই যেন আপিসী ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গাম যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্ব্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয় ত সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার মত প্রবল ছিল, কিন্তু অন্যপ্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবী সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড় প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ী ফিরিতেন না, কিন্তু দাতা-গৃহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধবন্ধন ছিল যে, দক্ষিণার আর্থিকতা তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। নাপিত ক্ষৌরকার্য্য সারিয়া যে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিত তাহা নহে, সে কালে বরঞ্চ পাওনাগণ্ডা এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশীই ছিল, কিন্তু নাপিতের সহিত সম্বন্ধ এমনি, যেন সে বিনা অর্থেও ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন

করিয়া যাইত এবং উক্ত কার্য্য না করিলেও কর্ত্তা তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। কুম্ভকার শুভ কার্য্যের দিনে গুটিকতক চিত্রিত নূতন ভাণ্ড আনিয়া না দিলে যেন কর্ম্মই বন্ধ হইয়া থাকে, পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিনিয়া আনিলে উৎসবের অঙ্গহানি হয়। সকলেরই সঙ্গে আমাদের এইরূপ একপ্রকার আত্মীয়তাবন্ধন—এবং উৎসবাদিতে এই আত্মীয়তাটুকু যেন সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভের অবসর পায়। সেই জন্যই মন্ত্রপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে সুরু করিয়া কামার কুমার ধোপা নাপিত হাড়ি ডোম পর্য্যন্ত যে যেখানে আছে, সকলেরই নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে উৎসবাঙ্গে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—কাহাকেও বাদ দিলে চলে না।

কিন্তু এখন ইংরাজী পণ্যশালার অনুগ্রহে যান্ত্রিক ভাবেই অনেক কার্য্য নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এক কলমের আঁচড়ে হ্যারিসন হ্যাথারে, হোয়াইট্যাওয়ে লেড্‌ল, অস্‌লর, ল্যাজারাসের ভবন হইতে যাহা কিছু আবশ্যক—আনাইয়া লওয়া যায়, এমন কি, নাপিত পাচক পরিবেশকাদিও সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সহৃদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শে যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়।—তখনকার দিনে বড়লোকের বাটীতে কোনও ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষ্যে মাসেক কাল পূর্ব্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানী পসারীরা গতিবিধি সুরু করিত। শালওয়ালা ভাল ভাল কাশ্মীরী শাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ তসর ও রেশমী বস্ত্র আমদানী করিত, ঢাকা শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা সিমলার বেপারীরা কত প্রকারের সূক্ষ্ম ও বিচিত্রপাড় কার্পাসবস্ত্র এবং পশ্চিমী ক্ষেত্রীরা বেণারসী ও চেলির জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণকার কর্ম্মকার মালাকার ময়রা গোয়ালা পাথরওয়ালা কাংস্যপিত্তলবিক্রেতা নানান জনে নানাবিধ ফরমাসে নিত্য গতায়াত করিত। এমন কি, বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশী কাবুলীওয়ালা পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিতান্তই বাহিরের লোকের মত ছিল না। এবং এই খরিদবিক্রয়-টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইত না। সকলেই উৎসাহসহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠানবিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কি হইবে না হইবে, দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলীওয়ালা তাহার সখের জরীর কোর্ত্তা গায়ে দিয়া প্রসন্নমুখে দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিতান্ত জড় বিনিময় মাত্র না হইয়া আমরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং

মুদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে অন্তরে "ফাউ" আদানপ্রদানটুকু, ইহাতেই আমাদের বিশেষ আনন্দ। এবং এইটুকুর জন্যই আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা যায় না।

কেবলি যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদানপ্রদান ছিল, তাহাও নহে। অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নব নব ফুলভার যোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপিতানী দিদিঠাকুরাণী ও বধূঠাকুরাণীদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘষিয়া আল্‌তা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনী নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরী ও বিচিত্রবর্ণের শাটিকা লইয়া আসিত, গোয়ালিনী মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালপাড়ার দুইটা মন্তব্য শুনাইয়া যাইত, এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণঠাকুরাণী স্বহস্তকর্ত্তিত কয়গাছি পৈতার সুতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষীয়সী ও যুবতীসমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হাস্যপরিহাস গল্পগুঞ্জন সমালোচনা বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ ও বিচার প্রসঙ্গে বয়স ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত—দেনাপাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয় পরিজনবর্গের মধ্যে—যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোন শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভকামনা কার্য্য করে। এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্ম্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হয়। নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্যবিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের পদমর্য্যাদা যথেষ্ট থাকিলেও কুলের গৌরবকে প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এমন কি, বেতনভুক্ সামান্য দাসদাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই যে হৃদ্যতাটুকু—এই যে ব্যথার ব্যথী ভাব—ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পরিজনবর্গের সহিত পূর্ব্বের মত একসংসারভুক্ত অবশ্যপোষ্য সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়া বিদেশী ইংরাজের দৃষ্টান্তে কেবলমাত্র কাজ আদায় ও বেতনদানের সম্বন্ধই দিনে দিনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। এমন কি, পাকা নব্যতন্ত্রিগণের নিকট সে কালের মাঠাকুরাণী দিদিঠাকুরাণী প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক সম্বোধনগুলি পর্য্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল সামান্য পরিবর্ত্তন হয় ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা, এবং উৎসবপ্রসঙ্গে এ সকল তুচ্ছ বিষয়ের উত্থাপন না করিলেও চলিত, কিন্তু ইহাতে এইটুকু অন্ততঃ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনই অনেক সময় অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিত জন এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড় পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাহাদের হৃদয়ের অধীশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। অন্তরে অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ অনিবার্য্য যোগ নাই।

আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহসহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসবপ্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণগান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক, যখন যাহা হয়, উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্ত্তা তাহা উপভোগ করেন।

কেবলি যে বড় বড় পূজাপার্ব্বণে এই বিধি তাহা নহে, ছোটখাট বারব্রত যে-কোন অনুষ্ঠানেই এই শুভ ভাবটি রক্ষণীয়। এবং অনুষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আজ পূজা, কাল ব্রত, পরশ্ব গঙ্গাস্নানের যোগ, অন্য দিন কোনও শুভ তিথি বা বারমাহাত্ম্য, কখনও নবান্ন, কখনও পৌষপার্ব্বণ, কোন দিন বা অরন্ধন, জ্যৈষ্ঠে জামাতৃপূজন, কার্ত্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, মধ্যে রাখীবন্ধন, কোন মাসে পুত্রের বিবাহ, কোন দিন পৌত্রের জাতকর্ম্ম, তাহার পর জন্মতিথি, হাতে খড়ি, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত—যেন একটির পর একটি শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দ-প্রবাহের অন্ত নাই। প্রচলিত প্রবচনে বারো মাসে তের পার্ব্বণ মাত্র স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গণনায় বোধ করি প্রতি মাসে ত্রয়োদশ সংখ্যা ছাড়াইয়া যায়। এবং কর্ম্মকার্য্যের সহিত জড়িত হইয়া সকলগুলিই আমাদের শুভকর্ম্ম। দান ধ্যান সদনুষ্ঠান ও দশ জনের সহিত আত্মীয়তা প্রকাশ ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করাই উদ্দেশ্য। একটা উপলক্ষ্য পাইলেই হয়।

এবং যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশ জনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষ্যের অভাব ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই, তাহা পাঁচ জনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই

কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটখাট বিষয়েও আমি হয় ত একটুকু আনন্দ পাই, নিজের বাড়ীখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে লাগে ভাল, গোরুগুলির কল্যাণ কামনা করি—গৃহপ্রবেশ, জলাশয়প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী, এইরূপ এক একটি উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী পোষ্য-পরিজন দীন দুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী করিতে চাহি। আমি যে আজ একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবের কিছুমাত্র সুখবিধান করিতে সক্ষম হই, আমার এ সৌভাগ্য অন্তর যেন সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাতৃষষ্ঠী উপলক্ষ্যে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়, বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্য-সুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ্য।

সেই জন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর সামান্য হাতের লোহা ও মাথার সিন্দূর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্ব্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসী অলঙ্কাররাজি তাহা পারে না, প্রীতিবিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূতপল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিবসুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তাড়িতালোক ও বিলাস-উৎসে সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের ধান্যদূর্ব্বামুষ্টি অন্তরের অকৃত্রিম শুভকামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভাণ্ডারেরও তুলনা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মত ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে—বাহ্যাড়ম্বরবাহুল্যের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

'ভারতী', অগ্রহায়ণ ১৩০৫

গৃহকোণ

আমাদের পুরাতন প্রবচনে গৃহের বর্ণনা বড়ই সুন্দর এবং সরল। সংস্কৃত কবি দুইটি মাত্র চরণে আমাদের গৃহখানি একান্ত চিত্তহারী করিয়া তুলিয়াছেন—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

সুতরাং গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্তবগানে মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক

কার্য্যারম্ভ করা শ্রেয়, যাহাতে শুভ কার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন না জন্মে বা অশুভ না উৎপন্ন হয়। সে কালের নারীচিত্তাবগাহী রসিক কবিজনেরা সেই জন্য এই গৃহলক্ষ্মীকে কখনও ভামিনী, কখনও চণ্ডী, কখনও মানিনী, কখনও বা অন্য কোনরূপ মনস্তুষ্টিকর প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্বোধনে প্রসন্ন না করিয়া লেখনী ধারণ করিতেন না। এবং আমরাও এই সকল প্রাচীন মহাজনগণের পন্থানুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সেই ভামিনী গৃহিণীর চরণবন্দনাপূর্ব্বক তাঁহার শুভ্র মন্দিরে প্রবেশ করি—হে ভামিনি, প্রসন্না হও, তোমার চরণাঙ্গুলিনখকিরণে যেন আমরা পথের সন্ধান করিয়া লইতে পারি, এবং সেই আলোকেই যেন তোমার মন্দিরের চারু কারুসজ্জা আমাদের চক্ষে উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হয়। আমরা তোমারই মন্দিরের যাত্রী। এবং হে সুনিপণে, তুমিই আমাদের সাধনার পরম ধন।

এই গৃহবর্ণন বিষয়ে সংস্কৃত কবির সহিত আধুনিক আমাদের কিছুমাত্র মতভেদ নাই। আমাদের গৃহখানি একমাত্র গৃহিণীর অধিষ্ঠানেই পরিপূর্ণ—তিনিই আমাদের সমস্ত গৃহ জুড়িয়া আছেন। আর যাহা সেখানে আছে, তাহা অতি সামান্য—সংসারের নিত্যব্যবহার্য্য ঘটি বাটি থালা, শয্যা আসন, বসন ভূষণ, দেয়ালে আলিপনা, মেঝ্যাতে মাদুর, পিল্‌সুজে প্রদীপ, কুলুঙ্গিতে কড়ির সিন্দূরচুপড়ি, এক পার্শ্বে মকরশোভিত পালঙ্ক এবং অপর পার্শ্বে কাঁঠালকাঠের একটি পুরাতন সিন্ধুক। এবং এই সকলই কেবল এক গৃহিণীর অধিষ্ঠানেই শোভমান, যেমন দেবমন্দিরের সকল আয়োজন একমাত্র দেবতার অধিষ্ঠানেই সার্থক। গৃহিণী বিনা এই সকল সজ্জোপকরণ সম্পূর্ণ নিষ্ফল। এবং তাঁহার অধিষ্ঠানে এই জড় উপকরণগুলিও যেন সজীব ও ভাবময় হইয়া উঠে। এবং এই ভাবের উপরেই আমাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা।

নহিলে আমাদের আসবাব আড়ম্বরবাহুল্য কোন কালেই বড় নাই। তখন দেশে এত আলোক ছিল না—তাড়িতালোক, গ্যাসালোক, এ সকল ত ছিলই না, এমন কি, কেরোসিনশিখারও প্রাদুর্ভাব হয় নাই—পুরাতন পিলসুজের সরু ডাঁটার উপরে মাটির প্রদীপমুখে ঈষৎ স্নেহসিক্ত শলিতাগ্রভাগে মিটি মিটি যে আলোটুকু জ্বলিত, তাহাতেই আমাদের গৃহকোণের অন্ধকার কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইত; এবং সেই বাত-বিকম্পিত ক্ষীণালোকে দিদিমার মুখের আষাঢ়ে গল্পে, মায়ের ঘুমপাড়ানী গানে, ভাইবোনের নানাবিধ প্রশ্নোত্তরে, একান্তোপবিষ্ট ননদ ভাজের মৃদু হাস্যালাপে ক্ষুদ্র গৃহকোণটুকু এমনি জমিয়া উঠিত—সে জমাট বাহিরের কিছুতেই হয় না। নূতন সভ্যতা নব নব বৈজ্ঞানিক আলোকে আমাদের গৃহপ্রান্তরে এই অন্ধকারটুকু একান্ত বিদূরিত করিতে যেখানেই প্রয়াস পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের গৃহভিত্তি

হইতে অনেকগুলি চিরন্তন স্মৃতি ও বিচিত্র বিস্মৃতি একেবারে মুছিয়া গিয়া একটা সাদা দেয়ালের কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ক্ষীণ প্রদীপশিখাটুকুর বিকম্পনে আমরা যে মাতৃদৃষ্টির স্নেহালোক, তরুণী বধূর করুণ মুখের পৌর্ণমাসী সুধা, স্নেহপ্রীতিভক্তির সহস্রধারনিস্যন্দিত মৃদু রশ্মি-বিকিরণ অনুভব করি, সেটুকু ত বাহিরের এডিসন দিতে পারে না।—এবং এই বধূ ও মাতৃরূপিণী গৃহিণীর চারু চরণচ্ছটাতেই আমাদের গৃহ উজ্জ্বল। এমন কি, সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দরিদ্রের সামান্য ঘটি বাটি পিলসুজ কাজললতা সিন্দূরের কৌটাটি পর্য্যন্ত একটি নূতন শ্রী ধারণ করে, এবং আমাদের মর্ম্মস্থল অবধি তাহার প্রভা আসিয়া পড়ে।

বাস্তবিকই, বাহিরের দর্শকের চক্ষে ইহা যতই সামান্য হউক, ঘরকন্নার এই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির আমাদের নিকট একটু বিশেষ আদর আছে। এই সকল অতি-তুচ্ছ ছোটখাট মৃৎ-কাংস্য-পিত্তল-বংশ-তৃণ-কাষ্ঠবিনির্ম্মিত সামগ্রীগুলি আমাদের গৃহিণীগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সহস্র অদৃশ্য সূত্রে যেন চিরগ্রথিত। ইহাদের প্রত্যেক ব্যবহারে কখনও তাঁহাদের বাহুবিক্ষেপ, কখনও চরণভঙ্গ, কখনও কঙ্কণের কিঙ্কিণী, কখনও বা সর্ব্বাঙ্গে লঘু বেপথু যেন নানা ছন্দে হিল্লোলিত ও মুখরিত হইয়া উঠে। এবং সেই সঙ্গে কোথাও পুকুরপাড়, কোথাও বাঁধা ঘাট, কোথাও সরিষা-ক্ষেতের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথরেখা, কোথাও তক্‌তকে নিকান প্রাঙ্গণ, কোথাও দীপালোকিত বাতায়নপথ, চিত্রের পর চিত্র সঞ্চারে মনে যেন ক্ষুদ্র বঙ্গভূমি তাহার সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য্য লইয়া একান্ত ঘনাইয়া আসে।

এই পুকুরপাড়ে ঘাটের ধাপে আম্রকুঞ্জ ও বাঁশঝাড়ের ছায়ায় আমাদের চির-হাস্যময়ী গ্রাম্য বধূর নিত্য রঙ্গভূমি। প্রতি দিন প্রভাতে ঐখানে ঘাটের চাতালটিতে বসিয়া তিনি রাশীকৃত তৈজসপত্র মার্জ্জন ঘর্ষণ ও পরিষ্করণে নিযুক্ত থাকেন। কত রকমের থালী, কত রকমের বাটি, কত বিচিত্র গঠনের ঘটি,—কাঞ্চননগরী, গয়েশ্বরী, জগন্নাথী, বলেশ্বরী, খাগড়াই, পশ্চিমী, দক্ষিণী, কত গঠন এবং কারুকার্য্য, কত আকার এবং প্রকার, কত কলানৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম কৌশল। অতি পুরাতন কাল হইতে দিদিমা কি ঠাকুরমা যখন যে তীর্থে গিয়াছেন, সেখান হইতে নানাবিধ জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন—কোশাকুশি, ঘণ্টা পঞ্চপ্রদীপ, ধূপাধার, ধুনাচি, বহুবিধ মনোহর ভাণ্ড, পানের বাটা, গামলা, হাঁড়ি, হাতা, বেড়ী, গণনায় সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। এবং গৃহের বধূকে প্রতি দিন এইগুলি মাজিয়া ঘষিয়া তক্‌তকে করিয়া রাখিতে হয়—নহিলে, লক্ষ্মী চঞ্চলা হয়েন। তাহার পর কলসী কক্ষে নিত্য দুই বেলা জল সহিতে যাওয়া এবং হাস্যপরিহাসগল্পগুঞ্জনসুখমুগ্ধচিত্তে সরিষা ও অড়হরক্ষেতের মধ্য দিয়া

আঁকাবাঁকা পথে আর্দ্রবস্ত্রে মন্থরগমনে গৃহে ফিরিয়া আসা। ঐ কলসীর জলোচ্ছ্বাস-ছলছলে সেই পুকুরঘাটের যত কাহিনী যেন স্বপ্নবিম্ববৎ ফুটিয়া উঠে। এবং ঐ সুমার্জ্জিত তৈজসপ্রভায় বধূর মুখে যেন কত দিনের শ্বশুর শ্বশ্রূ ননন্দা ঠাকুরমার স্নেহাশীর্ব্বাদপ্রভা প্রতিভাসিত হয়।

কিন্তু কেবল এক তৈজসমাত্রই আমাদের সম্বল নহে, এবং পুকুরপাড়েই আমাদের বৈঠক নহে। ধনীই হউক, দরিদ্রই হউক, আমাদের সকলেরই এক একটি থাকিবার স্থান আছে। এবং ক্ষুদ্র হইলেও সে গৃহে অতিথিকে আশ্রয় দিবার সঙ্কুলান হয়। সে জন্য কোনপ্রকার অতিরিক্ত আসবাববাহুল্যের প্রয়োজন হয় না। ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিলেই অতিথিকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলা যায়। গৃহীর অবস্থাভেদে সে মাদুর মোটা কাঠির, কখনও বা রেসমবস্ত্রবৎ কোমল মেদিনীপুরী মছলন্দ, কখনও বা দন্তিদন্তারুণাভ মণিপুরী শীতলপাটি। এই মাদুর আমাদের অভ্যর্থনাগৃহের প্রধান আসবাব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এমন আরামের আসন অল্পই আছে। এবং মাদুরের পাড়ে বিচিত্র রঙ্গীন কারুকার্য্যে অনেক সময় গৃহের ঔজ্জ্বল্যও বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। শীতাকাশতলে পুরু থাপি পারস্য গালিচার যে শোভা, বৈশাখী দিনে এই ঈষৎ শ্যামাভ সূক্ষ্ম মছলন্দ-শয্যার শোভা তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এবং এই চারু আস্তরণোপরি মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুটিকয়েক উপাধান এবং এক একখানি শুভ্র তালবৃন্ত হইলেই মোটামুটি আমাদের গৃহশয্যা একরূপ সম্পূর্ণ হয়। তাহার পর সঙ্গতি অনুসারে এই শুভ্র স্নিগ্ধ ভাবটি রক্ষা করিয়া আরও অনেক করা যায়। এমন কি, এত দূরও যাওয়া যায় যে, তাহাতে কার্পণ্য অপবাদের কোনরূপ সম্ভাবনাই থাকে না। কেবল সকল খুঁটিনাটির প্রতি একটুকু নিজের চিত্ত এবং চিন্তা প্রয়োগ করিতে হয়।

কারণ, ল্যাজরেস কোম্পানীর প্রতি অনেকগুলি রজতচক্র সহ একটি সংক্ষিপ্ত হুকুম জারী করিয়া এ ক্ষেত্রে কার্য্য উদ্ধারের সুবিধা নাই। দেশের সূর্য্যালোকের সহিত, চতুষ্পার্শ্বের ঘনায়মান প্রকৃতির সহিত আমাদের অন্তরের যুগযুগান্তরাগত শুভ ভাবের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আমাদের চিরন্তন সজ্জাকলাটিকেই আধুনিক কালোপযোগী করিয়া অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বিসদৃশ বিলাতী ফেসানের কতকগুলা আবর্জ্জনা যথেচ্ছা সংগ্রহ করিয়া একটা অশোভন পণ্যশালা সাজাইয়া বসিয়া, তাহাকেই একখণ্ড দেশী গালিচার জোরে আমাদের অভ্যর্থনাগৃহ আখ্যা দেওয়া চলিবে না। আসল কথা, আমরা ভুলিয়া না যাই যে, ইংরাজ দোকানের বিলাতী আসবাবগুলি নিতান্তই আমাদের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হয় নাই। যে দেশে দক্ষিণা

বাতাসের জন্য সারা ক্ষণ দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হয় না এবং রুদ্ধ সাসীর মধ্যে ধূলি-প্রবেশের সুবিধা নাই, সে দেশে যে সকল আসবাব গৃহের শ্রী এবং শোভা সম্পাদনে নিয়োজিত হয়, আমাদের মুক্তবাতায়ন ধূলিবহুল প্রাচ্য গৃহে সে সকল গৃহসজ্জা সম্যক্ সুশোভন না হইতেও পারে। বিশেষতঃ ইংরাজের মত টেবিল চেয়ার কৌচ কার্পেটের পশ্চাতে অহরহ লাগিয়া থাকা আমাদের পোষায় না। এবং সেরূপভাবে একান্ত লাগিয়া থাকিতে না পারিলেও এ সকল জিনিস অত্যল্প ধূলিসঞ্চয়েই দেখিতে দেখিতে খেলো হইয়া আসে। আমাদের আধুনিক ইংরাজের অনুকরণ ড্রয়িংরুমগুলিই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

সকল দেশেই সাহিত্যই কি, শিল্পই কি, বসনভূষণই কি, গৃহসজ্জাই কি, সংক্ষেপে সভ্যতা তাহার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া দেশের মর্ম্মস্থল হইতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহার শিকড় থাকে দেশের মাটিতে এবং সমস্ত জাতির হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শাখাপল্লবে ক্রমশঃ তাহা গগন ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার কোনও আস্‌বাবেরই অভাব ছিল না—এখনও সহস্র মন্দিরভিত্তিতে, ভগ্ন স্তূপে, প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষসমূহে সুখাসন পাদপীঠ প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক কালোচিত গৃহসজ্জোপকরণ দেখা যায়; কিন্তু সেই সকলগুলির মূল ছিল দেশের মধ্যে। ধনী এবং দরিদ্রের গৃহসজ্জার পার্থক্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা সুগভীর ঐক্যও ছিল। এক্ষণকার ড্রয়িংরুমগুলির মত একেবারে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র বিজাতীয় কোন কিছু আমাদের মধ্যে কখনও উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। এবং সেই জন্য সময় সময় মনের এক কোণে একটু আশারও সঞ্চার হয় যে, হয় ত বা এই বিজাতীয় সজ্জাসরঞ্জাম-সংঘর্ষে আমাদের নির্ব্বাপিতপ্রায় সজ্জাকলা সহসা একদিন পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিতেও পারে। সে দিন সমস্ত দেশের সহিত একটি অখণ্ড যোগসূত্রে আমাদের আতিথ্যও সম্ভ্রম ও গৌরবের হইবে। নহিলে, সান্ধ্য সমিতির নিমন্ত্রণই করি আর ইংরাজের মত ধুমধামই করি, তাহার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন প্রহসন হইতে নিষ্কৃতি নাই।

আমাদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, আমাদের গৃহসজ্জা ও আদর অভ্যর্থনা ত বিলাতী সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইলেই সার্থক হয় না। তাহার মধ্যে বরঞ্চ যতটুকুতে আমাদের অন্তঃপুরের একটুকু ছাপ পড়ে, সেইটুকুই শোভন ও মনোহর হইয়া উঠে। যে গৃহসজ্জার পারিপাট্যে গৃহিণীর শুচিতা প্রকাশ পায়, যে ব্যঞ্জনরন্ধনে তাঁহার কোনরূপ প্রযত্ন বা উপ্পাদেশ থাকে, যে তাম্বূলরচনায় তাঁহার শুভ অঙ্গুলিস্পর্শ মধু সঞ্চার করে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তহারী এবং তাহাতেই আমাদের সার্থকতা। আমাদের মনে

এই সকল বাহিরের জিনিসের মধ্য দিয়া সেই যুবতিপরিবৃত তাম্বুলরচনাশালা, সেই নিরন্তরগল্পগুঞ্জনহাস্যপরিহাসধ্বনিত পাকগৃহ, সম্মার্জ্জনীসংক্ষুব্ধ গৃহপরিষ্করণশব্দ, উৎসাহ-আনন্দ-গতিবিধি-উদ্যমসজাব উদ্যোগপর্ব্ব কেমন যেন সহজ অবলীলাভরে নানা চিত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এই সকল চিত্রপরম্পরা আমাদের ক্ষুদ্র গৃহকোণটিকে চিরউজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সর্ব্বপ্রকার সামাজিকতার মধ্যে নেপথ্য হইতেও গৃহিণীর শুচি স্মিত প্রসন্ন সংযত কল্যাণী মূর্ত্তিটুকু প্রকাশ পায়। এবং গৃহের সাজসজ্জা আস্‌বাব উপকরণের সহিত তাঁহার মহিমা নিরন্তর জড়িত। তিনি স্বহস্তে প্রদীপের শলিতা উসকাইয়া না দিলে যেন দীপশিখা তেমন জ্বলে না, এবং তাঁহার ঈষৎ স্ফুরদধরপল্লবনিঃসৃত মৃদু ফুৎকার ব্যতীত তাহার নিভিয়াও শান্তি হয় না। বাতায়নপার্শ্বে শুভ্র শয্যা-আস্তরণ-খানি বিছাইয়া সযত্নরচিত কবরীবন্ধে বেলফুলের মালাগাছি পরিয়া কঙ্কণকিণাঙ্কিত-প্রকোষ্ঠ বামকরতলে চিবুকটি রাখিয়া তিনি যখন নিথর রজনীতে দূরপ্রবাসাগত প্রিয়জনের প্রতীক্ষায়-পথ চাহিয়া বসিয়া থাকেন, এই ক্ষীণ দীপশিখাই তাঁহার একমাত্র নিভৃত সঙ্গী। আর গৃহের চৌকাঠের বাহিরে বহুযত্নমার্জ্জিত জলপরিপূর্ণ ভৃঙ্গারোপরি সযত্নরক্ষিত একখানি নির্ম্মল নির্ম্মঞ্ছনী সেই প্রবাসাগতকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাইতে স্থাপিত হয়। এবং সেই কম্পিত দীপশিখা তরুণীর মুখ হইতে পালঙ্কের শয্যাবিস্তারে এবং তথা হইতে চৌকাঠপারের ভৃঙ্গারগাত্রে ছায়ায় আলোকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত হইতে থাকে।

এই সকল ভাবপ্রসঙ্গ আমাদের গৃহকোণের সর্ব্বত্র এবং গৃহের সকল জিনিসপত্র যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কেবলই যে শয়নকক্ষের দীপটি, পালঙ্কটি, মাদুরটি, কুলুঙ্গিস্থ পাত্রটি এই প্রতীক্ষা ও মিলনাশায় সঞ্জীবিত হইয়া মনোহর, তাহা নহে, শয়ন উপবেশন প্রসাধন দেবপূজা—নানা সূত্রে আমাদের বহুতর সামগ্রী যেন জড়জগৎ হইতে ভাবরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রসাধনের আসনখানি, চুলের দড়িগাছি, কাজললতাখানি, সিন্দুরের কৌটা, দর্পণ, তৈলপাত্র, সরু চিরুনী, টিপের মোড়ক, এমন কি, প্রসঙ্গক্রমে আলুলায়িত অঞ্চলপ্রান্তনিবদ্ধ চাবির গুচ্ছটি পর্য্যন্ত যেন আমাদের অঙ্গনাগণের নানাবিধ গ্রীবাভঙ্গী ও কুতূহলী দৃষ্টিসঞ্চারে সঞ্জীবিত, এবং তাহার মধ্যে নারীহৃদয়ের যেন একটি আভাসপ্রসঙ্গও সূচিত হইতে থাকে। পূজার ঘরের পুষ্প চন্দন নৈবেদ্যপাত্র ও কুশাসনের সহিত শুচিস্নাতা সুসংযতবেশা গৃহিণীর ভক্তিভরে অবনত চারু মূর্ত্তিখানি দেবপ্রসাদপ্রসঙ্গে গৃহখানিকে অন্তরে যেন সম্যক্ প্রতিষ্ঠা দেয়। এই সকলেরই মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি অনিবার্য্য

প্রাসঙ্গিকতা একান্ত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও কোনরূপ নিরর্থকতা নাই বা পুতুলের খেলাঘরের ভাব মনে উদয় হয় না।

সেই জন্য এই বাহুল্যবিবর্জ্জিত সরল সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে আসিয়া প্রথম যখন অগণ্য কৌচক্যাবিনেট্‌কণ্টকিত আধুনিক কোন নব্যতন্ত্রীয় ভবনে প্রবেশ করা যায়, অনেক ক্ষণ ধরিয়া কিছুই যেন ভালরূপ ঠাহর হয় না—এমন কি, বলিতে সাহস হয় না, অনেক সময় সেই অভ্যর্থনাকক্ষের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীকে দেখিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না যে, তিনি আমাদেরই একজন ভ্রমপ্রমাদসুখদুঃখমোহময়ী মানবী—না, বিলাতী সাহেবের অদৃশ্য তারবিলম্বিত কোনরূপ আশ্চর্য্য কলের পুতুল। কারণ, অনভ্যস্ত চক্ষে তাঁহাদের গতিবিধি, তাঁহাদের গুরু গাম্ভীর্য্য ও লঘু হাস্যবিকিরণ, তাঁহাদের আতিথ্য ও অভ্যর্থনা, সকলই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় যান্ত্রিক বলিয়া ঠেকে। এবং খানিক ক্ষণ সেই চুরোটিকাধূমকুণ্ডলিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে থাকিতে নিজেকেও যেন রঙ্গালয়ের অভিনেতা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এবং সে অভিনয়ও বড সহজ নহে, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় যে, কখন্ কোন্ ভঙ্গীটি বেদস্তর হইয়া পড়ে। কারণ, এ ভঙ্গীকলার মধ্যে কোনরূপ যুগযুগান্তরাগত ভাবপ্রবাহ নাই, যাহাতে আমাদিগকে অবলীলাভরে পরিচালিত করে—আছে কেবল কতক পরিমাণে নেপথ্যের তারওয়ালা সাহেবের অদৃশ্য হস্ত এবং আর কতক পরিমাণে শিথিলপ্রকৃতি কয়েকটি দেশী পুত্তলিকার হস্ত পদ ও রসনা সঞ্চালন।

কিন্তু তরুণী ভামিনীগণ আক্ষেপোক্তিতে দোষ গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা যে স্রোতের মধ্যে পড়িয়াছি, তাহাতে দেশকালের সর্ব্ববন্ধনচ্যুত হইয়া একটা উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়হীনতার অকূলে গিয়া উপনীত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। এই একটানার মধ্যে তাঁহারাই যথাস্থানে নোঙ্গর ফেলিয়া আমাদিগকে কূলের নিকটে টানিয়া রাখিতে পারেন। এবং বন্যার প্রথম প্রকোপ শান্ত হইয়া আসিলে আবার আমরা শুভ ক্ষণে নিজগৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি—দেয়ালে দেয়ালে কম্পিত দীপশিখায় যেখানে মরা বর ও সুয়ো রাণী দুয়ো রাণী নিত্য সুখে কালযাপন করেন, যেখানে ঠাকুরমার মুখের রামসীতার দুঃখ-কাহিনী ও কুরুপাণ্ডবের বৃহৎ কথা প্রতি দিন গৃহের নববধূ ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবর ও ননন্দাগণের অন্তরোচ্ছ্বসিত অশ্রু অভিষেকে পরিবারের অন্তরে অক্ষয় অম্লান গৌরবে মুদ্রিত হইয়া রহে, এবং নিত্য নব শুভ আনন্দোৎসবে কঙ্কণে বলয়ে হেমহারে মেখলায় নূপুরে গুর্জ্জরীতে কনককিঙ্কিণীশিঞ্জিতে শুভ্র হর্ম্ম্যতল স্পন্দিত ও মুখরিত হইয়া উঠে। আমরা সেই গৃহকোণমুখী প্রবাসী—শুধু এই সুসজ্জিত খেলাঘর

মধ্যে পুত্তলবৎ নৃত্যসুখ হইতে মুক্তি কামনা করি। হে গৃহিণি, তুমিই তাহার প্রধান সহায় হও। এবং তোমারই চারুচরণনখমণিপ্রভায় আমাদের পুরাতন গৃহকোণ নূতন সৌন্দর্য্যে ও শোভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

'ভারতী', মাঘ ১৩০৫

নিমন্ত্রণ-সভা

ধনীই হই বা দরিদ্রই হই, আমাদের নিমন্ত্রশালার সজ্জায়োজন বড় অধিক নহে। কদলীপত্র ও মৃৎপাত্র হইলেই আমাদের বৃহৎ যজ্ঞ অনায়াসে সমাধা হয়, এবং ইহার উপরে যদি এক একখানি কুশাসন জুটে, তাহা হইলে যজ্ঞশালাসজ্জার কোন অঙ্গই অসম্পূর্ণ থাকে না। তাহার পর অভ্যাগত নিমন্ত্রিতগণকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আনিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে আসন পরিগ্রহ করিতে বলা যায়, এবং গৃহকর্ত্তা প্রসন্ন স্মিতমুখে পাতে পাতে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন সুরু করিয়া দেন। ধনীর ভবনে দুই ভাগ ব্যঞ্জন অধিক হয়, এবং হয় ত দুই দশ জন লোকও বেশী হইতে পারে; তদ্ভিন্ন আসনে বাসনে পরিবেশনে বা ভোজনশালার অন্যান্য আয়োজনে ধনী দরিদ্রের কোনরূপ পার্থক্য চক্ষে পড়ে না। আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপার যেরূপ বিপুল, তাহাতে সজ্জাড়ম্বরের কিছুমাত্র বাহুল্য থাকিলে ধনিগণেরই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া আসিত, দরিদ্র জনের দুর্দ্দশার ত কথাই ছিল না।

কারণ, ইংরাজের মত দশ কুড়িটি অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পরম বন্ধু লইয়া আমাদের কারবার নহে; আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিকটস্থ দুই দশ পল্লী, পাঁচ সাত গ্রাম, দূরতম আত্মীয়ের দূরসম্পর্কীয় বৈবাহিককুল এবং বন্ধুর বন্ধুজনকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে, এবং সকলের প্রতি নির্ব্বিশেষে যথোচিত আতিথ্য প্রয়োগপূর্ব্বক গৃহস্থকে আত্মরক্ষা করিতে হয়। যেখানে বিশ পঁচিশ জন মাত্র বন্ধুসমাগম, সেখানে মঞ্চসজ্জা ও নানান খুঁটিনাটি অলঙ্করণের প্রতি দৃষ্টি রাখা সহজ, কিন্তু কথায় কথায় যাহাদের শতাধিক লোক জমিয়া যায় এবং দফায় দফায় যাহাদের প্রাঙ্গণ নিকাইয়া আসন বিছাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে এরূপ খুঁটিনাটি পরিপাটি রক্ষার ব্যবস্থা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং বাহিরের এ সকল আড়ম্বর খর্ব্ব করিয়া অন্য উপায়ে তাহাদিগকে লোকের পরিতোষ সাধনে চেষ্টা পাইতে হয়। হৃদ্যতা ও আত্মীয়তাই তাহার একমাত্র প্রশস্ত পথ।

সেই জন্য আমাদের নিমন্ত্রণে গৃহকর্ত্তার স্থান ঠিক পাশ্চাত্য গৃহকর্ত্তার অনুরূপ নহে।

সে দেশে নিমন্ত্রণমজলিসে গৃহকর্ত্তা একরূপ সভাপতিস্থানীয় বলিলেই হয়—ভোজন-মঞ্চের শীর্ষস্থানে বসিয়া তিনি সকলকে যথোপযুক্তরূপে মর্য্যাদা বণ্টন করিয়া দেন এবং অতিথিরা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা। গৃহকর্ত্তা ধনে মানে কুলে শীলে যত বড় লোকই হউন না কেন, দীনতম অতিথির নিকটেও তিনি সশঙ্কিত। এবং সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া, সকলের সর্ব্বপ্রকার ফরমাস যোগাইয়া, তবে তিনি দুই এক গ্রাস অন্ন মুখে গুঁজিবার অবসর পান। অতিথির এখানে সর্ব্বপ্রকার জুলুম করিবার অধিকার আছে এবং প্রতাপও বড় অল্প নহে। আহারে যোগদান করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া অতিথি গৃহস্থকে পলকের মধ্যে অপদস্থ করিতে পারেন, তখন হাতে পায়ে ধরিয়া গৃহস্থকে তাঁহার ক্রোধশান্তি করিতে হয়। কোন কারণে কেহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না আসিলে গৃহস্বামী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েন এবং মর্ম্মে মরিয়া থাকেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যেখানে নিমন্ত্রণ পাইয়া লোকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ পায় না, আমাদের দেশে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহস্বামীই যেন ধন্য হয়েন।

এইরূপে আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে গৃহস্থের বড একটি মনোহর বিনয় প্রকাশ পায়। এবং তাহাতেই তিনি সর্ব্বজনের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করেন। আমাদের অভ্যাগতগণের ক্ষমতা ও অধিকার এক দিকে যেরূপ অপরিসীম, সেইরূপ অন্য দিকেও বলা যায় যে, নিতান্তই পরের মত খাড়া না থাকিয়া তাঁহারা গৃহস্থকে সর্ব্বপ্রকার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তাও করিয়া থাকেন। গৃহস্থও যেন তাঁহাদেরই মধ্যে এক-জন, মধ্যে কোনরূপ দুরধিগম্য ব্যবধান নাই। তাঁহার কর্ম্মটি যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং কোন বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি থাকিয়া না যায়, তাহা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। এবং সেই জন্য নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে যিনি যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও যাঁহার যেরূপ শোভা পায়, তদনুসারে কেহ কটি বাঁধিয়া পরিবেশনে লাগেন, কেহ সারি সারি আসন বিছাইয়া যান, কেহ আহারান্তে তাম্বূল বিতরণ করেন, কেহ কাহাকেও তামাক সাজিয়া রাখিতে বলেন, এবং যাঁহারা পংক্তিতে বসিয়াছেন, তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী জনের পাতে লুচি অথবা সন্দেশের অভাব দেখিলে তাহা পূরণ করিবার জন্য যথোচিত ডাকহাঁক ও হুকুমহাকাম পরিচালনা দ্বারা আসর সরগরম করিয়া তুলেন; সকলেই যেন পরস্পরের আতিথ্যবিষয়ে সর্ব্বদাই উন্মুখ এবং সকলেরই যেন নিজের ঘরবাড়ী।

এই হৃদ্যতা ও পরস্পরাত্মীয় ভাবেই আমাদের এত বড় বড় নিমন্ত্রণসভাগুলি জমাট হয়। ইহার মধ্যে বড একটি পরিতোষ ও সদ্ভাব নিহিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য ভোজনশালার সর্ব্বাঙ্গীন পারিপাট্য আমাদের নাই বটে, এবং কোলাহল কলরবটাও

আমাদের কিঞ্চিদধিক—এমন কি, বিদেশীর নিকট তাহা কতকটা বর্ব্বরতারও পরিচায়ক ঠেকিতে পারে—কিন্তু সর্ব্বজনের আন্তরিক প্রীতিগুণে ইহার একটি বড় শুভ প্রভাব অনুভব হয়। পাশ্চাত্য নিমন্ত্রণে যে পরিমাণ আমোদমাত্রোপভোগ, ইহাতে আমোদ ততখানি আছে কি না সন্দেহ; কারণ, আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপার নিতান্ত আমোদ নহে, তাহা কাজ, এবং কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার উপরেই তাহার আনন্দ। এই কারণে তাহার আনন্দও ঢের বেশী ব্যাপক এবং উচ্চ স্তর হইতে নিম্ন ভূমি অবধি তাহা প্রবাহিত। পাশ্চাত্য নিমন্ত্রণগুলি ইহার তুলনায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। একজন ধনী ব্যক্তি সেখানে অসম্ভব ব্যয়ে দেশদেশান্তরের দুইটি দুর্লভ ফল বা উপাদেয় মদিরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দুই দশ জন ধনী বন্ধুর রসনাতৃপ্তি করিয়া সন্তোষ অথবা গর্ব্ব অনুভব করেন মাত্র। আমাদের নিমন্ত্রণের মত সর্ব্বজনের পরিতোষ সাধন তাহার লক্ষ্যই নহে।

অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, ঘরের কাছেই দুএকটি ছোটখাট উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। সকলেই জানেন, আমাদের নিমন্ত্রণাদিতে প্রভুর আহারের পর ভৃত্যদেরও আহারাদির যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আমি যেখানে নিমন্ত্রণে যাই, সেখানে আমার পাল্কীবেহারা বা গাড়োয়ানের খোরাকীর জন্য কখনই ভাবিতে হয় না। কারণ, তাহারা ক্ষুধিত থাকিলে গৃহের আতিথ্য ক্ষুণ্ণ হয়। বরঞ্চ অভ্যাগত জনের দাসবর্গ নিমন্ত্রণভবনে যেরূপ আদর যত্ন ও আতিথ্য লাভ করে, তাহা আমাদের আজকালকার বিবেচনায় কিছু অতিরিক্ত। তাহাদেরও যেন গৃহস্থের উপরে দাবী আছে, সেখানে তাহারা উপদ্রব করিতে পারে। এই গেল আমাদের দেশী ব্যবস্থা। ইহার অনতিদূরেই চৌরঙ্গীর ময়দানের সম্মুখে ইংরাজের নিমন্ত্রণ-ভবনের দৃশ্য দেখা যায়। রুদ্ধ সাসীর মধ্যে তাড়িতালোকে যতক্ষণ নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রভুর রসনাতৃপ্তি করিতেছে এবং আমোদপ্রবাহ ডিশের উপর ডিশ ছাপাইয়া পড়িতেছে, বেচারা গাড়োয়ান ততক্ষণ দুই সহিস সহ নিরাশহৃদয়ে শীত-রজনীর হিম ভোগ করে মাত্র, এবং পার্টিশেষে প্রভুকে লইয়া যথাসময়ে জুড়ী হাঁকাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। প্রভুর সুখদুঃখবেদনা আনন্দ উৎসব সমারোহের সহিত, কেবল মাত্র সজ্জার হিসাবে ভিন্ন, ভৃত্যের সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই। চাপ্‌কান আঁটিয়া ও তকমা পরিয়াই তাহাদের যাহা কিছু সুখ—হৃদ্যতার গণ্ডির মধ্যে তাহারা স্থান পায় না।

এই কারণে ইংরাজের নিমন্ত্রণকলা আমাদের নিকট নিতান্ত নীরস দস্তুররক্ষা বলিয়া বোধ হয়। তাহা বন্ধ্য আমোদ মাত্র, সহৃদয় শুভ কর্ম্ম নহে। আমাদের নিমন্ত্রণ-

ব্যাপারে গৃহস্থের কত প্রযত্ন ও উদ্যম, কত উদ্বেগ ও পরিশ্রম, কত সংযম ও হৃদ্যতা। বাহিরের জাঁকজমকে ইহার সফলতা নহে। প্রত্যেক ছোটখাট অনুষ্ঠানে প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে গৃহস্থের অন্তরের যেন একটি ছাপ পড়া চাহি—নহিলে তাহার মর্ম্মস্থলের বেদনাটুকু ব্যক্ত হয় না, এবং সমুদয় ব্যর্থ হইয়া যায়। তকৃতকে নিকান প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র কুশাসন এবং সম্মুখে এক একখানি শ্যামল কদলীপত্র ও নূতন মৃৎপাত্রের সারি ; গৃহকর্ত্তা পাড়াপ্রতিবেশী পাঁচ জন মুরুব্বি ও বন্ধুজনের সহিত মিলিয়া পরিবেশন করিতেছেন, এবং সমবেত অভ্যাগতেরা পরিতোষব্যঞ্জক বিবিধ ধ্বনি সহকারে গ্রাসের পর গ্রাসে ভোজ্যাবলীর যথোচিত মর্য্যাদারক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্তঃপুরে রন্ধনশালা ; প্রাঙ্গণের রোয়াকের উপরে রন্ধনশালার কপাটের ফাঁকের মধ্য হইতে অন্তঃপুরিকাজনের কুতূহলী কুবলয়দৃষ্টি সযত্নপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ও নানাবিধ অভিনব মিষ্টান্নাদিতে একটি মনোহারিণী প্রীতি সঞ্চারিত করিয়া দেয়, এবং পরিতৃপ্তচিত্ত অতিথি জনের প্রশংসাকুশল পরিতোষবাক্যে তাঁহাদের সর্ব্বান্তঃকরণ ভরিয়া উঠে ও শ্রম সার্থক হয়। এই সুমধুর হৃদ্যতা ও নিরতিশয় পরিতোষ, এক দিকে আন্তরিক প্রীতিপ্রযত্ন ও অন্য দিকে সর্ব্বাঙ্গীন শুভকামনা, গৃহস্থের সংযত নিষ্ঠা ও নিমন্ত্রিত জনের অক্ষুণ্ণ সদ্ভাব, ইহাতেই নিমন্ত্রণ-সভার মনোহারিতা। এখানে পাত পাতিয়া বসিয়া খাইতেও সুখ এবং দৃঢ়রূপে কটি বাঁধিয়া পরিবেশন করিতেও আনন্দ।

কারণ, এই নিমন্ত্রণব্যাপারে কোনরূপ বিজাতীয় ভাড়াটিয়া ভাব নাই। ইহার কুটনা কোটা হইতে সুরু করিয়া হাঁড়ি নামান এবং আসন বিছান হইতে পরিবেশন পর্য্যন্ত, এমন কি, আহারান্তে তাম্বূলসেবনবিধি অবধি সকল কর্ম্মে সকল অনুষ্ঠানে অন্তঃপুরের একটি শ্রীহস্ত ও শুভ দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। এবং নিজগৃহে যেমন মাতা স্ত্রী কন্যা ও আত্মীয়া জনের যত্নে আহারের ব্যবস্থাটি পরিপাটি হয়, নিমন্ত্রণভবনেও সেইরূপ আহারের ব্যবস্থায় বন্ধু জনের শুচিস্নাত অন্তঃপুরের একটি ঐকান্তিক প্রযত্ন প্রকাশ পায়, যাহাতে ব্যঞ্জনের স্বাদ শতগুণ বর্দ্ধিত করে এবং অন্তরে বেশ একটি নিরাবিল আনন্দ সঞ্চারিত করিয়া দেয়। সেই জন্য সামান্য দধি চিপিটকেও গৃহস্থের আতিথ্যগুণে যে পরিতোষ জন্মে, তাহার তুলনায় ভারতবিদিত পেলিটি এবং উইল্সনের বিপুলায়োজনও ব্যর্থ হইয়া যায়।

কিন্তু ইংরাজের উইল্সন পেলেটি—এবং সস্তা স্থলে মঙ্গলু খানসামা—ক্রমশঃ আমাদের ভবনেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে দেখা যায়। নব্যতন্ত্রীরা বলেন, টাকা ফেলিয়া দিলেই যেখানে হাঙ্গামা চুকে, সেখানে অনর্থক গৃহিণীকে পাকশালায় পাঠান কেন? নিমন্ত্রণের মধ্যে যে একটি পবিত্র নিষ্ঠার ভাব আবহমান কাল আমাদের মধ্যে

চলিয়া আসিতেছে, এবং যাহার উপরে আমাদের নিমন্ত্রণসভার প্রতিষ্ঠা, সে সকল প্রীতিভাব বিস্মৃত হইয়া আমরা ইহাকেও আপিসী কাজের সামিল করিয়া লইয়াছি, এবং ঠিকা লোক দিয়াই হউক বা যে উপায়েই হউক, কাজ সারিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই পরম চরিতার্থতা লাভ করি। সেই জন্য এই সকল নিমন্ত্রণে কোনরূপ আনন্দ বা পরিতোষ নাই—উদরতৃপ্তিও হয় বটে, রসনাতৃপ্তিও যথেষ্ট হয়, কিন্তু সমস্ত আড়ম্বর লইয়াও ইহা মনের কোণে কিছু মাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এমন কি, বলিতে সঙ্কোচ হয়, আমাদের গৃহিণীরা আসিয়া এই ভোজনশালা উজ্জ্বল করিয়া বসিলেও ইহার মধ্য হইতে সেই মনোজ্ঞ শুভ পরিতৃপ্তিটুকু পাওয়া যায় না।

বরঞ্চ, গৃহিণীও এখানে নিষ্প্রভ প্রতিভাত হয়েন। অন্ততঃ আমাদের গৃহে নিত্য তাঁহার যে লক্ষ্মীশ্রী কল্যাণী মূর্ত্তি, সকল কাজে কর্ম্মে গতিবিধিতে স্নেহে যত্নে ভাবে ভঙ্গীতে উছলিয়া পড়ে, সেটুকু এখানে প্রকাশ পায় না। তাঁহারা যদি রাগ না করেন, তাহা হইলে সাহস করিয়া বলি, তাঁহাদের সমস্ত গতিভঙ্গী বেশবিন্যাস রকম-সকম এখানে কেমন যেন ছাঁচে ঢালা হইয়া আসে—তাহার মধ্যেই যেন কি একটি সন্ত্রস্ত সচেতনতা আমাদিগকে সারা ক্ষণ বিদ্ধ করিতে থাকে। সে অন্নদা অন্নপূর্ণাকে এখানে কিছু মাত্র অনুভব করা যায় না। শুধু যেন আমাদিগকে ইংরাজের টেবিলের আদবকায়দা অভ্যাস করাইবার জন্য কয়টি কলের পুত্তলী বলিয়া ভ্রম জন্মে।

কারণ, এখানে খানসামাহস্তপরিবেশিত অন্নে তাঁহার শুভ হস্ত স্পর্শ মাত্র করে নাই, এবং কোন দ্রব্যে তাঁহার অন্তরের শুভাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয় নাই। আমাদের নিমন্ত্রণ-ব্যাপারে অন্ততঃ মিষ্টান্নেও তাঁহাদের রচনাকলার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাম্বূলরচনা ত অন্তঃপুরিকাগণের বাঁধা কাজ বলিলেই হয়। এবং শসার চাটনি, আদার কুচির সহিত কালো জীরা ও নেবুর রস দিয়া চাটনিবৎ একটা কিছু, দধির লুড়কি, ক্ষীরকমলা কিম্বা অভিনব দু একটা কিছুতে না কিছুতে তাঁহাদের সিদ্ধ হস্ত প্রকাশ পাইতই। সে কালে, এমন কি, এক একটি জিনিসে এক এক বাড়ীর বিশেষ একটু প্রতিপত্তিও থাকিয়া যাইত। কোনও বাড়ীর পান সাজা, কোনও বাড়ীর মিষ্টান্ন, কোনও ঘরের কাসন্দী, কোনও গৃহের নবান্ন, কাহারও বাড়ীর আমানি, কাহারও বাড়ীর রন্ধন। এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্মে নিপুণাগণের বিশেষ সমাদরও ছিল। বহু দূর হইতে পাল্কীভাড়া দিয়া সাধনা করিয়া লোকে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইত। এবং লোকের বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্মে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া তাঁহাদের পরিতোষও যথেষ্ট হইত।

নব্যতন্ত্রিণীরা ইহা পছন্দ করিবেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে বড় একটি শ্রী

ছিল, এবং নারীজন্মের যেন বিশেষ একটু সফলতা ছিল। এবং সত্য কথা বলিতে কি, অধুনাতন পার্টিতে রমণীর যে স্থান, তদপেক্ষা ইহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদাও ছিল। কারণ, তাঁহারা আমাদের সর্ব্ব শুভ কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী কল্যাণীরূপে বিরাজ করিতেন। এক্ষণকার মত সখের পার্টিতে তাঁহারা নিতান্তই পুরুষের ক্রীডাপুত্তলী মাত্র ছিলেন না। এবং তাঁহাদের সম্মানও অন্যরূপ ছিল। তরুণেরা সেখানে শ্রদ্ধাভরে নত হইয়া রহিত, এবং বৃদ্ধেরা আশীর্ব্বচনে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। রুমালকুডান ডিগ্রী-পাওয়া সুলভ গ্যালান্ট্রী তখনও এ দেশে আমদানি হয় নাই, এবং স্ত্রীসম্মানবিষয়ে এত বড বড বিলাতী ফাঁপা কথাও আসিয়া জুটে নাই।

অন্ততঃ সহরের বড় বড বিলাতফেরতী পার্টিগুলি দেখিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধ চিত্তে এইরূপই ধারণা জন্মে। কয়েকটি বাঁধি গতে সাধনা করিয়া কোনও মহিলাকে পিয়ানোতে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং অপর কাহাকেও বার বার অনুরোধ করিয়া সঙ্গীতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। এবং সঙ্গীতও সুরু হয়, গল্পও জমিতে থাকে, অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই নিমন্ত্রণশালা সহস্র কণ্ঠের যুগপৎ গুঞ্জনে ভ্রমরের চাকের মত মুখরিত হইয়া উঠে। যেমন পিয়ানো থামে, এক পসলা করতালিবর্ষণ হইয়া যায়, এবং অপেক্ষাকৃত সাহসী ড্রয়িংরুমবীরেরা চিরাভ্যস্ত সনাতন কম্প্লিমেণ্টমুখে পিয়ানোর একটু নিকটে ঘেঁষিয়া আসেন। এবং যথাসময়ে একটু তফাতে সরিয়া দাঁডাইয়া ইয়ার বন্ধুজন সহ, সমাগত মহিলাবৃন্দ সম্বন্ধে, আমাদের দেশের কল্পনাতীত অশোভন ইঙ্গবঙ্গ ভাষায় নির্লজ্জভাবে সমালোচনা সুরু করিয়া দেন।

এই করতালি ও কম্প্লিমেণ্টে সৌভাগ্য অনুভব করেন, এরূপ লঘুচিত্ত তরুণী যদি কেহ থাকেন জানি না, কিন্তু আমাদের কুলকন্যাগণের এত দূর অবনতি ত কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। মাতৃ-অনুক্রমে তাহারা সমস্ত দেশের হৃদয় হইতে যে ভাষাহীন সম্ভ্রম লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহার সহিত কি এই ড্রয়িংরুমরঙ্গমঞ্চের দীর্ঘচ্ছন্দ বক্তৃতাগত সম্মানের তুলনা হয়? আমাদের দেশে রমণী গৃহলক্ষ্মীরূপে সকলের হৃদয় হরণ করেন। সে সম্ভ্রম, সে প্রতিষ্ঠা আন্তরিক, তাহা চায়ের পেয়ালার উপর কথার ফুৎকারে বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠে না। যেখানে গৃহ আছে, সেইখানেই গৃহিণীর আদর ; যেখানে যে ক্রিয়াকর্ম্ম হয়, গৃহিণীরা না মিলিলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং তাঁহার মর্য্যাদা আমাদের নিকট স্বাভাবিক। তাঁহার একটি বিশেষ কাজ আছে—এবং কর্ম্মানুযায়ী পদও আছে—তাহা নিতান্ত অনুগ্রহের দান নহে। সেই জন্য কাজ করিয়া তাঁহাদের পরিতোষ, এবং তাঁহাদের প্রসাদে আমাদেরও আনন্দ।

গৃহস্থালীর যে সৌন্দর্য্য, তাহা গৃহী ব্যক্তিই বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন। এবং

আমাদের নিমন্ত্রণসভা এই গৃহস্থালীরই উৎসব বলিয়া আমাদের এত হৃদয়গ্রাহী। যে গৃহিণী নিত্য নানা প্রকারে স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন পোষ্য পরিজনবর্গের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়া সংসারের কল্যাণসাধন করিতে থাকেন, এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারে তাঁহার মহিমা যেন সমস্ত সমাজে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এবং সমস্ত লোকের পরিতোষজনিত শুভ কামনা তাঁহার অভিমুখে উত্থিত হইয়া শুভ কর্ম্মে তাঁহাকে অধিকতর উৎসাহিত করে। এবং সারা বৎসর ধরিয়া কখনও কাসন্দী প্রস্তুতে, কখনও চাল কোটায়, কখনও বড়ি দেওয়ায়, এইরূপ নানাবিধ খুঁটিনাটি ছোটখাট আয়োজনে যেন এই বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা চলিতে থাকে।

এই সকল আয়োজনের মধ্যেও বিশেষ একটু শ্রীছাঁদ আছে। স্নানাহ্নিক হইতে সুরু করিয়া নানাবিধ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক এই সকল আয়োজন করিতে হয়। ইহার আদ্যোপান্ত একটি শুচিশুভ ভাব বিদ্যমান। বৈশাখ মাসে কাসন্দীর দিন। দুই দিন পূর্ব্ব হইতে বধূরা আসিয়া ঢেঁকিশালের মেঝ্যা ও সম্মুখের দাওয়াটি বেশ করিয়া নিকাইয়া দিয়া যায়, এবং সায়াহ্নে গোয়ালঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে আসিয়া গৃহিণী ঢেঁকিশালায়ও ধূপধুনার গন্ধ ছড়াইয়া যান। শুভ দিনে গ্রামের তরুণীরা মিলিয়া পুকুরঘাট হইতে ধামা ধামা সরিষা ও হলুদ ধুইয়া আনেন এবং রৌদ্রে শুকাইয়া শুচিবাসে তৎসহ ঢেঁকিশালে প্রবেশ করেন। সেখানে তেল থাকে, সিন্দূর থাকে, একটি কাঁচা আম ও একটি কচি লেবু থাকে; ঢেঁকিকে বরণ করিয়া হুলুধ্বনিপূর্ব্বক প্রথম পাড় দেওয়া হয়। এবং তরুণী এয়োগণের অলক্তকরঞ্জিত চারু চরণতাড়নে ছন্দে ছন্দে তালে তালে ঢেঁকি সরিষা কুটিতে থাকে। পানাপুকুরপাড়ে চিতার বেড়াঘেরা আম্রকুঞ্জবনমধ্য হইতে বউ-কথা-কও থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠে, এবং পল্লীগ্রামের ঝাঁঝাঁ মধ্যাহ্ন যেন নিঃশব্দে সেই কাসন্দীর ঝালের মধ্যে তাপ সঞ্চার করে। এমনি, কাসন্দীর পর কুলচুর, কুলচুরের পর বড়ি, কুমড়া কোটা, ডাল কোটা, সরুচুকলি ও পিঠার সময় চাল কোটা, ধান ভানা, এক ঢেঁকিশালেই কত অনুষ্ঠান। এবং ঢেঁকিশালের বাহিরেও অনুষ্ঠান কম নহে। সে জন্য কুরুণী আছে, বঁটি আছে, ছাঁকনি আছে, অজ্ঞাতনাম আরও অনেক প্রকারের সরঞ্জাম আছে; এবং সেই সঙ্গে বিচিত্র আসন করচালন গ্রীবাভঙ্গী ও গৃহলক্ষ্মীগণের একান্ত অভিনিবেশ সংযুক্ত হইয়া সমস্তটিকে চিত্তহারী করিয়া তুলিয়াছে।

এবং আমাদের গৃহিণীগণের এই সকল আচার অনুষ্ঠানও যেমন বিচিত্র, নিমন্ত্রণের মধ্যেও সেইরূপ বৈচিত্র্য আছে। ইংরাজের যেমন চা আছে, ডিনার আছে, প্রাতরাশ আছে, এবং বিবাহ ও পর্ব্বাদির বিশেষ বিশেষ ভোজ আছে, আমাদেরও সেইরূপ

ভাতের নিমন্ত্রণ, জলপানের নিমন্ত্রণ, ফলাহারের নিমন্ত্রণ, পূজার নিমন্ত্রণ, শুভ কার্য্যের নিমন্ত্রণ, অরন্ধন, নবান্ন, শ্রীপঞ্চমী, পিঠাপার্ব্বণ ইত্যাদি বিচিত্র প্রকারের নিমন্ত্রণ আছে এবং তাহাতে আহারাদির ব্যবস্থারও যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এখানে তাহার তালিকা দিবার প্রয়োজন নাই—মোটামুটি সকলেরই এ সকল জানা কথা। এতদ্ভিন্ন, আমের সময় ব্রাহ্মণ কাঙ্গাল দীন দুঃখীকে আম সন্দেশ না খাওয়াইয়া সুগৃহিণী আম্র মুখে তুলেন না। বৈশাখ মাসে অতিথিদের জন্য ডাব বাতাসার ব্যবস্থা। এবং ইহার উপর বার ব্রত উপলক্ষ্যেরও অভাব নাই। সবশুদ্ধ অতিথিপরায়ণতা প্রাচ্য জাতির একটি বিশেষ ভাব। এবং নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সামাজিকতায় এই আতিথ্যধর্ম্মের একটি বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব হয়। আমাদের সকল ব্যাপারেরই অন্তরে অন্তরে যে একটি সাত্বিক শুভ ভাব প্রবাহিত, তাহাতেই আমাদের অন্তরের সমুদয় আকর্ষণ।

এবং এই শুভ সংকল্পটুকু ক্রমশঃ আমাদের অন্তঃপুর হইতেও যে তিরোহিত হইতেছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়। আমোদ আহ্লাদের মধ্যে আমাদের একটি শুভ ভাব থাকা চাহি—নহিলে, তাহা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয় না। দান করিয়া, খাওয়াইয়া, সেবা করিয়া পাঁচ জনকে সুখী করিয়া সুখ। অন্তঃপুরেও যদি অতিথি-বিমুখতা আসে, সেখানেও যদি তামসিকতা মাত্র মনোহর হইয়া উঠে, ক্রিয়াকর্ম্মে কেবল বাহিরের আড়ম্বর ও বাজে জাঁকজমকের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে এ দরিদ্র দেশের দুর্গতির আর শেষ কোথায়? জাঁকজমকে আড়ম্বরে ত পরিতোষ কোথাও নাই, এবং অগাধ অর্থব্যয়ে এক ব্যক্তি যাহা করে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অন্য জনের পক্ষে তাহা আদর্শ হইতে পারে না। সেই জন্যই আমাদের চিরদিন কলাপাতা ও মাটির খুরি ব্যবস্থা। এ দিকে বাজে ধুমধামে অনর্থক বিপুল অর্থ ব্যয় না করিয়া, সেই অর্থে আমরা দশ জনকে আহ্বান করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করি। আমাদের সরঞ্জাম অল্প, লোক অনেক। যত লোকের সহিত মিলিয়া আমরা আনন্দ উপভোগ করি, ততই আমাদের আনন্দ অধিক হয়। হে গৃহিণি, তোমার তকৃতকে গৃহপ্রাঙ্গণে পুরাতন দিনের মত আমাদিগকে আবার আহ্বান কর এবং তুমি স্বহস্তে পাতে পাতে অন্ন পরিবেশন করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন কর। তোমার ভাণ্ডার অক্ষয় হউক, তোমার কীর্ত্তি অবিনশ্বর হউক।

'ভারতী', ফাল্গুন ১৩০৫

শিবসুন্দর

আমাদের মনে সৌন্দর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই একটি বিশেষ শুভ ভাব বিজড়িত। সুন্দরীর রূপবর্ণনায় এই জন্য আমরা কথায় কথায় লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার উপমা দিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহার কল্যাণী মূর্ত্তিখানিই আমাদের অন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রূপের দাহিকা শক্তি নিতান্ত প্রবল না হয়। লক্ষ্মী আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহার চরণের অরুণরাগস্পর্শে আমাদেব গৃহের অন্ধকার বিদূরিত হয়, তাঁহার সকরুণ শুভদৃষ্টিতে আমাদের মনের সমস্ত তমঃ পলকে কাটিয়া যায়—যেমন রূপ, তেমনি গুণ; এবং রূপ এখানে গুণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। সুতরাং এই লক্ষ্মীরূপিণী সুন্দরীর শুভ প্রভাব আমাদের জীবনে নিতান্ত সামান্য নহে। তাঁহার সকলই শুভ এবং এই শুভ ভাবেই তিনি আমাদের হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আমাদের এই শুভ ভাবনাটুকু বাহিরের দৃষ্টিতে সহসা ধরা না পড়িতে পারে; কারণ, বাহিরে হয় ত সৌন্দর্য্যের একটা হিল্লোলস্পন্দন মাত্র অনুভব হয়, কিন্তু যাহাদের সহিত অন্তরের সম্বন্ধ, তাহারা সেই শুভটুকুই যেন অধিক করিয়া দেখে, ইহাই বিশেষরূপে উপলব্ধি করে। সুন্দরীর চারু চরণতল ধরা স্পর্শ করে কি না করে—তাহার প্রত্যেক পদবিক্ষেপে যেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর শুভ পাদপাতস্পন্দন অনুভব হয়; তন্বঙ্গীর মনোহর অবলীলাগতি পশ্চাতে যেন কমলালয়ার কমলকুঞ্জের সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া যায়—কোনরূপ ত্রুটি ঘটিলে তাহা যে কেবলই অশোভন তাহা নহে, তাহা অশুভ, তাহাতে অলক্ষ্মী প্রশ্রয় পায়; আমাদের গৃহলক্ষ্মীর কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গীতে সংসারের সর্ব্ববিধ কাজে কর্ম্মে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনুষ্ঠানে নিয়ত একটি লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশ পায়, আমাদের নিকট যাহা বিশেষরূপে শুভ এবং শুভ বলিয়াই একান্ত কমনীয়।

এই শুভ ভাবের প্রভাব এইখানেই শেষ নহে। কোথায় সীমন্তের সিন্দূররেখা, কোথায় চরণের অলক্তরাগ, কোথায় চিরন্তন কেশধূপরচনা, কোথায় তন্বঙ্গে চন্দন-পঙ্ক-লেপন, প্রকোষ্ঠে বলয়কঙ্কণ, গ্রীবাদেশে হারযষ্টি, এমন কি শাড়ীর রক্তবর্ণ পাড়টি অবধি আমাদের অন্তরে প্রধানতঃ যেন একটি শুভ সূচিত করে। প্রসাধনকলার এই শুভ-সূচিতা আমাদের নব্যশিক্ষিত অন্তরে প্রথম দৃষ্টিতে হয় ত কেবল কুসংস্কার মাত্র বলিয়াই প্রতিভাত হয়, কিন্তু হৃদয়ের যোগে সৌন্দর্য্য যে শুভ হইয়া উঠে, যেখানে কেবল মাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ছিল, সেখানে অন্তরের একটি মনোহর পরিতোষ ভাব সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে অনেক বড করিয়া দেয়, এ কথা আমরা বিস্মৃত না হই। কেবল প্রসাধন বলিয়া নহে, আমাদের যে কোন কাজে—কি গৃহসজ্জা, কি উৎসবকলা,

কি শঙ্খধ্বনি, কি মঙ্গলঘট স্থাপন, কি অন্য কোন কিছু—হৃদয় যেখানে আপন ব্যাপকতা সঞ্চার করিয়াছে, সেইখানেই সুন্দর শুভ হইয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই শিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অন্য দেশের সহিত আমাদের এই ভাবে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে। রমণী যে দেশে আছেন, সেখানেই যে অলঙ্কারমণ্ডন ও বেশবিন্যাস-পারিপাট্যের ব্যবস্থা না থাকিয়া যায় না, সে কথা বলাই বাহুল্য। এবং এই বেশভূষা প্রসাধনের মধ্যে কোথাও সচেতনভাবে, কোথাও বা অজ্ঞাতসারে মনোহরণের একটি বিশেষরূপ চেষ্টা প্রকাশ পায়। কিন্তু এই মনোহরণ বোধ করি, আর কোনও দেশে আমাদের দেশের মত স্বামীর শুভ কামনা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মধ্যে পুষ্ট হইয়া তাহার বণিক্‌ভাব হইতে মুক্ত হয় নাই। আমাদের গৃহিণীগণের অলঙ্কারমণ্ডন একটি অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে—তাহাতে প্রিয়জনের কল্যাণ হয় এবং পরিবারের লক্ষ্মীশ্রী অক্ষুণ্ণ থাকে। এই শুভ কামনায় ইহার ভিতরকার অনেক নিদারুণ দৈন্য ও মালিন হীনতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে—বরঞ্চ ইহাতে সৌভাগ্যবতীদের একটু গৌরবের বিষয় হইয়াছে। এবং এই কারণেই প্রিয়বিয়োগে আমাদের গৃহিণীরা একেবারে নিরাভরণা হয়েন—স্বামীর কল্যাণের সহিত যে প্রসাধনের একান্ত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তদভাবে তাহাতে আর প্রয়োজন কি? বাহিরের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট অন্তরের শুভ ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে এতই নিষ্ফল।

শুভ কর্ম্মের দিন আমাদের গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট কেবলমাত্র বহিঃশোভাসম্পাদক নহে, কিন্তু তাহা চূতপল্লবরমণীয় হইয়া উৎসব ব্যাপারে আমাদের একটি মঙ্গল ইচ্ছা ব্যক্ত করে। সেই কারণে তাহা আমাদের মানসচক্ষে য়ুরোপের বহুমূল্য গৃহসজ্জা অপেক্ষা সুন্দর। তাহা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর না হইতে পারে, কিন্তু তাহা গৃহকর্ত্তার আন্তরিক কল্যাণ ভাবের বাহ্য প্রতিমাস্বরূপ (Symbol)। এই কারণে তাহা আমাদের চক্ষু আকর্ষণ করিবার পূর্ব্বেই এক মুহূর্ত্তে অন্তঃকরণের সুগভীর সুস্নিগ্ধ প্রসন্নতা আকর্ষণ করিয়া আনে। বিদেশীর কাছে ইহা নিরর্থক, কিন্তু শিশুকাল হইতে যাহারা প্রত্যেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে এই মঙ্গলঘটের প্রত্যক্ষ ভাষা বুঝিয়া আসিয়াছে, তাহাদের নিকট ইহা একান্ত অন্তরতররূপে রমণীয়।

আমাদের ভাষায় যেমন শুভ এবং শোভা শব্দের একই ধাতু, তেমনি ভারতবর্ষীয়ের মনের মধ্যেও মঙ্গল এবং সুন্দর একত্র মিশিয়া আছে। এরূপ মিশ্রণ আর কোথাও নাই। এই মিশ্রণপ্রভাবে আমরা সৌন্দর্য্যকে চোখ দিয়া না দেখিয়া হৃদয় দিয়া দেখি, ধর্ম্মচক্ষু দিয়া উপলব্ধি করি। সেই জন্য পাত পাড়িয়া মাটির খুরি সাজাইয়া মাটিতে

বসিয়া ধনী দরিদ্র আহূত রবাহূত অনাহূত সকলে মিলিয়া আহার করার মধ্যে কিছুই অসুন্দর দেখি না। আমাদের চক্ষে বিচ্ছিন্ন কদলীপত্র ও সুলভ মৃৎপাত্র অশোভন নহে, কিন্তু যদি দীনতম অতিথি গৃহস্বামীর অনাদর কল্পনা করিয়া বিমুখ হইয়া যায়, তবে তাহাই অশোভন; কারণ, তাহা অশুভ; কারণ, তাহা যজ্ঞ-সমবেত জনসংঘের বিপুল হৃদয়গত অখণ্ড সদ্ভাববন্ধনের বিচ্ছেদজনক, সুতরাং কুশ্রী।

বরণ আমাদের একটি সনাতন অনুষ্ঠান। যাহাকে আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, যাহার শুভ কামনা করি, তাহাকে বরণ করিবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। ঋগ্বেদের সময় সদস্য বরণ সকল উৎসবের একটি প্রধান অনুষ্ঠান ছিল। সেই বরণক্রিয়া অদ্য আমাদের দেশে নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তীর্ণ হইয়া আমাদের গৃহের মধ্যে স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার করিতেছে। বিবাহ হউক, অন্নপ্রাশন হউক, বারব্রত হউক—কখনো বধূ, কখনো জামাতা, কখনো স্বামী, কখনো পুত্র, কখনো অতিথি বা ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া লইতে হয়; এমন কি, নিতান্ত পক্ষে গোষ্ঠের গোরু অথবা ঢেঁকিশালের ঢেঁকিকে বরণ না করিয়া শুভ কর্ম্ম সমাধা হয় না। জীব ও জড়, আত্ম ও পর, সকলের মধ্যে এই অক্ষুণ্ণ সদ্ভাবের উত্তাপহীন সৌম্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে তবেই আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের সৌন্দর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কেবল ঝাড় লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটায় হয় না।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই শুভ সুন্দর ভাব যে বৌদ্ধ পালিমন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধের উপসংহারে মঙ্গলশঙ্খধ্বনি উদ্‌ঘোষিত করুক:—

"সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুখ্‌খ পমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।"

সর্ব্বজীব সুখী হোক, অবৈর হোক, অবধ্য হোক, অহিংসিত হোক—সুখী আত্মা হইয়া কালহরণ করুক। সর্ব্বজীব দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হোক। সর্ব্বজীব যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হোক।

'প্রদীপ', আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৬

গান

এই বিশাল জগতের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতের প্রাণের মধ্যে শান্তি ছড়াইতেছে—যে মহান্ ছন্দে গ্রথিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রেরা নীরবে নিঃশব্দে নিজের কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, সেই শান্তিময়ী ছন্দোময়ী ধ্বনির নামই গান। জগতের প্রাণের রুদ্ধ উৎস টুটিয়া যে আনন্দহিল্লোল তাঁহার মরমে আসিয়া আঘাত করে এবং মরমের সমস্ত তন্ত্রীগুলি সুরলয়তানে বাজিয়া উঠে, সেই আনন্দহিল্লোলের ঘাতপ্রতিঘাতধ্বনিই আমাদের সুরলয়তানযুক্ত ছন্দ—আমাদের প্রাণের প্রাণ সঙ্গীত। এই মহান্ ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিধ্বনি মানবের কণ্ঠে গিয়া আঘাত করে; এই জন্যই শুধু মনুষ্য সঙ্গীতের মর্ম্ম কতকটা বুঝিতে পারে—জগতের মহান্ সঙ্গীতের সামান্য অনুকরণ করিয়াও সুখী হয়।

মরমের লুকান প্রদেশ হইতে গানের উৎপত্তি, শ্মশানের গম্ভীর ছায়ায় তাহার কায়া এবং চিরশান্তির অনন্ত আশ্রয়ে তাহার বৃদ্ধি। দূর স্বপনের মত প্রাণের পরে সে একবার যে পদচিহ্নগুলি ফেলিয়া যায়, ইহজন্মে তাহা আর মুছে না—সে সুধামাখা রেখাগুলি চিরদিনের জন্য স্মৃতির জীবন্ত ছায়ার মধ্যে অন্ততঃ অস্ফুট আকারেও বিরাজ করিতে থাকে। চারি দিক্ হইতে শত সহস্র ছোট বড় বিস্মৃতি তাহাদের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে; কিন্তু স্তম্ভিতহৃদয়ের মত এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

আমরা সামান্য মনুষ্য—ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে আমরা সকল জিনিসকেই কতকটা বাঁধিয়া রাখিতে যাই। মহত্ত্বের বন্ধন নাই—আঁটা-আঁটি বাঁধাবাঁধি সীমার ভাবে মহত্ত্বের কায়া কলঙ্কিত নহে। অসীম ভাবের অসীম ক্ষেত্র। কিন্তু আমরা এমনি নির্ব্বোধ যে, এই অসীম ক্ষেত্রকে পর্য্যন্ত বদ্ধ করিতে পারিলে—একটা সীমানা দিয়া ঘর বাড়ী তুলিয়া প্রাচীর গাঁথিয়া এই অসীম ক্ষেত্রের মুক্ত বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইলে, আপনাদিগকে পরম পণ্ডিত বলিয়া মনে করি। গান পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া—তারকাখচিত নীল নভোমণ্ডলের দিগন্তব্যাপী ক্ষেত্রকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া অনেক দূর উঠিয়াছে। আমাদের পৃথিবীর দুই চারিটা 'সা-রে-গা-মা'র মধ্যে সে কখনই বদ্ধ নহে। কতকগুলা কটমট কথার মধ্যে তাহার ভাবকে কিছুতেই আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। গান স্বাভাবিক সরল জ্যোৎস্নাময়ী। তাহার অনন্ত উচ্ছ্বাস, অনন্ত প্রাণ। তর্কের দুয়ারে আজীবন হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলেও তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না। ভাবের দুয়ার, প্রাণের দুয়ার প্রশস্ত করা চাই, খুলিয়া রাখা চাই, তবে গান আমাদের

প্রাণে পঁহুছাইবে। প্রাণেই গানের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। হৃদয় সেই প্রতিধ্বনিকে ধরিয়া রাখিতে চায়।

গান এ জগতের সামগ্রী নহে—পার্থিব ধূলিকণায় তাহার দেহ মলিন নহে। সে কোন জ্যোৎস্নার দেশ হইতে আসিয়াছে। নয় ত তাহার প্রাণ জ্যোৎস্নাময়ী স্বপ্নময়ী হইল কেন? অনন্তত্বের ছায়াই গানের প্রাণ। সে শুষ্ক ধরণীতে শুধু শান্তি ছড়াইতেই আসিয়াছে—ধরণীর কঠিন বক্ষকে শ্যামল ভাবে গঠিত করিতে আসিয়াছে—জীর্ণ প্রাণের জীর্ণ কক্ষে এক ফোঁটা মৃতসঞ্জীবনী আনিয়া দিয়া মরণের প্রজাকে জমিদারের অত্যাচার হইতে মুক্তি দিতে আসিয়াছে।

কবিত্ব এই মহান্ গানের ছায়া। কবিত্বের জ্যোৎস্নালোকে এই মহান্ সঙ্গীত ফুটিয়া উঠে। স্তব্ধ জগতের নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া এই গানের হিল্লোল যখন প্রাণে আসিয়া আঘাত করে, তখন প্রাণের বেলাভূমি সেই তরঙ্গাঘাতে টুটিয়া গিয়া তাহার কোলে চিরজনমের তরে মিলাইয়া যায়—আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ লোভ মোহ তাহার গভীর অতলস্পর্শ জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া চিরদিনের মত আমাদিগকে পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া যায়।

এ মহান্ গান শুনিতে হইলে সংসারের পরপারে যে এক বিস্তৃত "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" ভূমি পড়িয়া আছে, সেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। সেখানে দাঁড়াইলে জগতের মহান্ গীতিধ্বনি আমাদের মরমের অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়—আমাদের হৃদয়ের চিরশান্তিময় নিভৃত আবাসে গিয়া পঁহুছায় এবং ক্ষুদ্র প্রাণে মহত্ত্বের সঞ্চার করিয়া দেয়। পার্থিব কোলাহলের মধ্যে অন্যমনস্ক থাকিলে এ ধ্বনি শুনিব কিরূপে? পৃথিবীর ধূলায় প্রাণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে সে প্রাণে পঁহুছিবে কিরূপে।

হৃদয়ের নীরব অশ্রুজলের মধ্যে জগতের মহান্ অশ্রুজলের যে শুভ্র হাসির ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় বিশ্বের এই অমর গান সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণে এই অশ্রুজলের মধ্য দিয়াই তাহার অনন্ত ভাব আসিয়া আঘাত করে। আমরা সে অনন্ত ভাব অনেক সময় ধরিতে না ধরিতেই তাহা মিলাইয়া যায়; কিন্তু তাহার শুভ্র পদচিহ্নগুলি ইহজনমের মত আমাদের হৃদয়ের প্রশস্ত দুয়ারে বসিয়া যায়—আমাদের হৃদয়ের বদ্ধ বায়ুতে মলয়ানিল আনিয়া দিয়া আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে কতকটা আকৃষ্ট করে।

এই মহান্ গানের মহদ্ভাব অশ্রুজল ভিন্ন আর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। আর কিছুই তাহার গভীর তলে ডুবিতে পারে না। এক ফোঁটা অশ্রুজল এতদূর

গভীর যে, তাহার মধ্যে জগতের এই মহান্ গানও প্রস্ফুটিত হয়। আমরা অশ্রুজলকে নিতান্ত 'কিছুই না' মনে করি—তাহার গভীরতা না বুঝিয়া তাহাকে এক ফোঁটা বলিয়া উপেক্ষা করি। কিন্তু ইহা আমাদের অতিশয় ভ্রম। এক ফোঁটা অশ্রুজলের মধ্যে শত শত বৃহৎ সাম্রাজ্যের চিরদিনের মত সমাধি হইতে পারে—এক বিন্দু অশ্রু-বারির তোড়ে শত সহস্র যৌবনের দম্ভ অহঙ্কার অভিমান চূর্ণ চূর্ণ হইয়া যায়। বাঁধ বাঁধিয়া মনুষ্য কিছুতেই অশ্রুজলকে বাধা দিতে পারে না—সীমানা দিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারে না। সে অসীম বলিয়াই তাহাতে অসীম গানের ছবি ফুটিয়া উঠে। গান সসীমের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

আমরা যখন ক্রমাগত সুখের সময়, দুঃখের সময়, সম্পদে বিপদে এই সুধাময় সঙ্গীত শুনিতে থাকিব, তখনই জানিব—আত্মার অনন্ত উচ্ছ্বাস কোথায়। তখন আমাদের চারি দিকে শান্তি, চারি দিকে শুধু অনন্ত আনন্দ। তখন,

"চারি দিকে সৌরভ, চারি দিকে গীতরব
চারি দিকে সুখ আর হাসি,
চারি দিকে শিশুগুলি মুখে আধ আধ বুলি
চারি দিকে স্নেহ প্রেমরাশি!"

'পুণ্য', পৌষ ১৩০৭